মাসুদ রানা

আই লাভ ইউ, ম্যান-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।

হেড অফিস-মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

শনিবার।

শেষ ফাইলটা দেখা শেষ করে রিস্টওয়াচে চোখ বুলাল মাসুদ রানা। দুটো বাজতে এক মিনিট বাকি। নিজের অজান্তেই দরজার দিকে তাকাল একবার। কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। সোহানার আজ হয়েছে কি? ভাবছে ও। কোন প্রোগ্রাম থাকলে আধঘন্টা আগে এসে ঘাড়ে চেপে বসে থাকে, কাজে মন বসাতে দেয় না, কিন্তু আজ সময় পেরিয়ে যেতে চলেছে, অথচ আসার নাম নেই-ব্যাপারটা কি? নাকি ভুলেই গেছে...অসম্ভব! অনেক মান-অভিমান ইত্যাদি নারীসুলভ কৌশল খাটিয়ে লাঞ্চের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে ওর কাছ থেকে সোহানা, ভুলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

চেয়ার ছেড়ে একটা হাই তুলল রানা, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর আবার তাকাল দরজার দিকে। বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল ওর চেহারায়, একটা বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস ধরিয়ে পা ঝুলিয়ে বসল টেবিলের কিনারায়। আজ একশো একটা জরুরী কাজ সারতে হবে ওকে। একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, একজন অ্যাডভোকেট এবং একজন আর্কিটেক্টের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট

আছে ওর। ঢাকা এবং লায়নস ক্লাব, দু'জায়গায় মীটিং। এছাড়াও অন্তত দুটো পার্টিতে হাজিরা না দিলেই নয়। এতসবের মধ্যে বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছে ও সোহানাকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে। অথচ! চোখের সামনে আবার হাত তুলল ও। আঁতকে উঠে টেবিল থেকে নেমে পড়ল। সর্বনাশ! দুটো পাঁচ! সোহানা আজ ডোবাবে। কিন্তু হল কি ওর? ভাবতে ভাবতে নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ল সে, মুখ তুলে তাকাল টাইপ-রতা সেক্রেটারি, মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে পাশের কামরা পেরিয়ে চলে এল রানা করিডরে। দ্রুত এগোচ্ছে।

পর্দা ঝুলছে সোহানার কামরায়। খুক করে একটু কেশে ভিতরে ঢুকল রানা। ঢুকেই থমকে গেল। নিজের চেয়ারে বসে আছে সোহানা, কামরায় আর কেউ নেই। টেবিলের উপর মাথা ঠেকে আছে তার, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলে ঢাকা পড়ে গেছে মুখ। পায়ের শব্দেও নড়ল না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে একটা হাত রাখল রানা তার কাঁধে।

'কে মেরেছে, কে ধরেছে, কে দিয়েছে গাল? সোহানা, কি হয়েছে?'

'কিছু না,' টেবিল থেকে মাথা না তুলেই বলল সোহানা।

'কিছু না তো এভাবে বসে আছ কেন? শরীর খারাপ?'

'না।'

'তবে?'

ঝট করে হঠাৎ মুখ তুলল সোহানা। অভিমান, ক্ষোভ আর দুঃখের ছায়া দেখল তার মুখে রানা। 'জানো,' প্রচণ্ড অভিযোগের সুরে বলল সে, 'আমি নাকি একেবারে জঘন্য ভাবে ব্যর্থ হয়েছি আমার দায়িত্ব পালনে। আমি যেসব ভুল করেছি সেগুলো নাকি লজ্জাজনক, নতুন এজেন্টরাও নাকি এ ধরনের ভুল করে না।'

'তার মানে? এসব কি বলছ তুমি?' কিছুই বুঝতে পারছে না রানা।

'আরও শুনবে?' কার উপর যেন ফুঁসে উঠল সোহানা। 'আমি

নাকি বিয়ে আর ঘর-সংসার বাঁধার কথাই সবসময় ভাবি, তাই কাজে মন বসাতে পারি না...তারপর-থাক। সে-সব কথা শুনে তোমার দরকার নেই। বিশ্বাস কর, ডেকে পাঠিয়ে ঝাড়া দু'টি ঘন্টা শুধু বকেছে আমাকে...'

'বকেছে? কে বকেছে?'

'ওই বুড়ো।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠল রানা।

'তুমি হাসছ?' আহত বিস্ময়ে চেহারা কালো হয়ে গেল সোহানার।

'একটু বকুনি খেয়েছ, তাতেই এই?' বলল রানা।

'একটু নয়, ঝাড়া দু'ঘন্টা,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সোহানা, 'তোমাকে এসব কথা বলে লাভ নেই। জীবনে কখনও এই পরিস্থিতিতে পড়নি তো। আমার মত যদি কখনও বকুনি খেতে, তবে বুঝতে কেমন লাগে...'

'বুড়ো শুধু বকাঝকা করেছেন তোমাকে,' বলল রানা। 'কিন্তু মারধর করেননি। নাকি তাও করেছেন?'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সোহানার। রেগে কাঁই হয়ে গেছে। 'তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ?'

'কিংবা,' হাসছে রানা। 'কোন শাস্তি দেননি তো?'

একটা হাত লম্বা করে দরজার দিকে আঙুল দেখাল সোহানা। 'তুমি এখন যেতে পার, রানা।'

'লাঞ্চ কি তবে...'

'সরি, আজ আমার মুড নেই।'

দ্রুত রিস্টওয়াচ দেখে নিয়ে ভাবল রানা, সোহানা মত পাল্টাবার আগেই কেটে পড়া উচিত। ওর অভিমান ভাঙাবার আরও অনেক সময় পাওয়া যাবে। 'ঠিক আছে, চললাম তাহলে,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, এগোল দরজার দিকে।

‘সত্যি চলে যাচ্ছ?’ প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় পিছন থেকে বলল সোহানা।

এই সেরেচে, ভাবতে ভাবতে থামল রানা, ঘুরে দাঁড়াল। বলল, ‘তো কি করব? তুমিই তো বললে...’

ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠল সোহানার চেহারা। ‘ঠাট্টা নয়, রানা। এই অপমানের একটা প্রতিশোধ নিতে চাই আমি।’

চোখ কপালে উঠে গেল রানার। ‘অপমান? প্রতিশোধ?’

‘হ্যাঁ,’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল সোহানা। টান দিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা এনভেলাপ বের করল সে। ‘আমি রিজাইন দেব। ধমক খেয়ে চাকরি করা আমার পোষাবে না। রিজাইন লেটার টাইপ করে রেখেছি...’

‘মাই গড!’ দ্রুত টেবিলের কাছে ফিরে এল রানা। ‘তুমি পাগল হয়েছ, সোহানা? আমাকে যা বলার বলেছ, আর কাউকে বোলো না-শুনলে সবাই হেসে খুন হয়ে যাবে।’

‘বকুনি আমি খেয়েছি, অপমান আমাকে করা হয়েছে...’

‘বকুনি খায়নি কে?’ সোহানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, ‘এই অফিসে এমন কেউ আছে যে বলতে পারবে চীফের ধমক আর বকাঝকা খেয়ে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে চুপিচুপি কাঁদেনি? তোমাকে অন্য রকম চোখে দেখেন, তাই কখনও বকাঝকা করেননি চীফ, কিন্তু...’

‘তুমি ঠিক জান সবাইকেই এভাবে বকেন?’

‘যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। বোকা, চীফের ধমক না খেলে কেউ আমরা মানুষ হতে পারতাম ভেবেছ? শুধু বকেন না, কঠোর শাস্তিও দেন তিনি।’

‘শাস্তি?’

‘আমার কথাই ধর না,’ বলল রানা। ‘চাকরিতে ঢোকার প্রথম দিকের কথা। সাংঘাতিক একটা ভুল করে ফেলেছিলাম। ব্যস, আর যায় কোথায়, এমন শাস্তি দিলেন যে তা মাথা পেতে নেয়ার

চেয়ে আত্মহত্যা করে মরে যাওয়া ভাল। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল। একেবারে দ্বীপান্তর!’

‘হোয়াট!’ চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল সোহানার। ‘বল কি! দ্বীপান্তর?’ সোহানার চোখে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি।

রিস্টওয়াচ দেখে আঁতকে উঠল রানা, ‘সর্বনাশ!’

‘কি অপরাধে দ্বীপান্তর, বলছ না কেন?’

‘সময় নেই, আরেক দিন বলব,’ বলল রানা। ‘আমি এখন...’

হাতের এনভেলাপটা দেখিয়ে জানতে চাইল সোহানা, ‘এটা তাহলে কি করব? তুমি বলছ সবাইকেই উনি এভাবে...’

‘এক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলে দাও ওটা,’ বলল রানা। ‘কেউ দেখে ফেলবার আগেই। তোমার সাথে কাল ডিনার খাবার কথা থাকল। জরুরী কাজ আছে, চললাম।’

‘ইস্,’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহানা। ‘চললাম বললেই হল! লাঞ্চ চুলোয় যাক, তোমার দ্বীপান্তরের কথাটা শুনতেই হবে আজ আমাকে। মেয়েদের কৌতূহল কেমন জিনিস, জানো না?’ রানার হাত ধরল ও। ‘বাইরে যাবার দরকার নেই, পিয়নকে দিয়ে লাঞ্চ আনিয়ে নিচ্ছি-তুমি বস।’

ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠল রানার চেহারা। ‘লোকজনকে কথা দিয়েছি, যেতেই হবে আমাকে-বিশ্বাস কর, কথা দিচ্ছি, আরেক দিন সময় করে...’

‘উঁহুঁ,’ এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে সোহানা। ‘আজই শুনব আমি।’

স্রেফ আপাতত মুক্তি পাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত রাজি হল রানা, বলল, ‘ঠিক আছে, আজই। তবে এখন নয়।’

‘কখন?’

‘রাতে।’

‘কোথায়?’ জানতে চাইল সোহানা।

‘তোমার বাড়িতে,’ বলল রানা। ‘কাজ সেরে রাত দশটায় যাব

আমি।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'বেশ,' বলল সোহানা। তারপর রানার হাত ধরে দরজার দিকে ওকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তাই বলে লাঞ্চটা ফাঁকি দেবে, সেটি হচ্ছে না!'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও লাভ নেই জেনে চুপ করে গেল রানা। ভাবছে, এখন না হয় লাঞ্চ খাইয়ে বিদায় করা যাবে, কিন্তু রাতে? গল্প শোনার ভূত একবার ঘাড়ে চাপলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত নামানো যাবে না। অসম্ভব! সারারাত জেগে অতীত রোমন্থন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে উপায়? হঠাৎ মাথায় সহজতম বুদ্ধিটা এল। কথা দিয়েছে ঠিক, কিন্তু কথা না রাখলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।

তাই করবে ও। আজ রাতে সোহানার বাড়িতে যাবে না।

রাত দশটা পর্যন্ত খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটল রানার। তিনটে পার্টির একটাতেও যাওয়া হয়নি, শরীর সাংঘাতিক ক্লান্ত, এখন আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, নাকে মুখে দুটো গুঁজেই বিছানা নেবে, কাল রবিবার, বেলা বারোটা পর্যন্ত নাক ডেকে ঘুমাবে ও।

রান্নাবান্না করে রেখে আজ বিকেলে দেশে গেছে রাঙার মা। বাড়ি খালি। গ্যারেজে গাড়ি রেখে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে এল ও, বারান্দায় উঠে দাঁড়াল দরজার সামনে। কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে তালা খোলার সময় সোহানার কথা ভেবে আপন মনে একটু হাসল ও। পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে সে ওর জন্যে। আরও কিছুক্ষণ দেখবে, তারপর ফোন করবে ওকে। কিন্তু ফোন ধরবে না ও। সাড়া না পেয়ে ভাববে, বাড়িতে নেই ও। সাংঘাতিক খেপে যাবে, সন্দেহ নেই। শ্রাগ করল রানা, কিছু করার নেই ওর।

দরজা খুলে বেডরূমে ঢুকল রানা। অন্ধকারে হাতড়ে বোতাম টিপে আলো জ্বালল। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ফর্সা দুটো পা দেখা যাচ্ছে বিছানায়। মুখের দিকে তাকাতেই রক্তশূন্য হয়ে গেল ওর চেহারা-যেন ভূত দেখছে!

'তুমি!'

চিৎ হয়ে রানার বিছানায় শুয়ে আছে সোহানা। হাসছে। বলল, 'জানতাম ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে। অপেক্ষা করে ঠকতে মন চাইল না, তাই এখানে চলে এসেছি,' বিছানার উপর উঠে বসল সে। 'হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিংরূমে এস, তোমার সাথে খাব বলে আমিও খেয়ে আসিনি।' বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগোচ্ছে সোহানা। 'কার পাল্লায় পড়েছ সে-খবর রাখো না! কথা দিয়ে গল্প শোনাবে না-চালাকি!' রানার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে রাজনন্দিনীর মত গর্বিত ভঙ্গিতে চলে গেল সে।

খেতে বসে আন্তরিকতার সাথে, মৃদু কণ্ঠে বিনয়াবনত ভঙ্গিতে শুরু করল রানা, 'দেখ, সোহানা, সেটা আমার কাঁচা বয়সের কথা, শাস্তিটা ছিল দ্বীপান্তর, প্রায় চারটে বছর কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি-সেসব আমি স্মরণ করতে চাই না। যা চাও তাই দেব, কিন্তু সে-গল্প দয়া করে তুমি শুনতে চেয়ো না। বলার মত তেমন কিছুই ঘটেনি সেখানে। তাছাড়া, আজ আমি ক্লান্ত, ঘুমাতে না পারলে...প্লীজ...'

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে সোহানার। রানার আবেদন যেন তার কানেই ঢোকেনি। সবিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'দ্বীপান্তর! মেজর জেনারেল রাহাত খান শাস্তি দিয়ে তোমাকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছিলেন?' চটাস করে টেবিলের উপর চাপড় মারল সে, 'এ গল্প আমার শুনতেই হবে।'

'সোহানা...' করুণ চেহারা দাঁড়িয়েছে রানার।

সবজান্তার ভঙ্গিতে, অতি উৎসাহের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল সোহানা, 'চাকরিতে ঢোকার প্রথম দিকে প্রায় চারটে বছরের কোন

রেকর্ড নেই তোমার ফাইলে-এখন বুঝতে পারছি, ওই সময়টা দ্বীপান্তর ভোগ করেছিলে তুমি। মাই গড! অ্যাদ্দিন এ খবর তুমি চেপে রাখলে কিভাবে? এর জন্যে তো আরও কঠিন শাস্তি পাওনা হয় তোমার-আমার তরফ থেকে। নাও, শুরু করো...'

'দূর ছাই!' চরম বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'কথা বুঝতে চাও না কেন? এতবার করে বলছি সে-সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি...'

'কিছুই ঘটেনি?' তীক্ষ্ণ হল সোহানার দৃষ্টি। 'চারটে বছর একটা দ্বীপে তুমি কাটালে, অথচ কিছুই ঘটল না-একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?'

সোহানার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করল রানা। ওকে ইতস্তত করতে দেখে সোহানা উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'খবরদার, মিথ্যে কথা বলে আমাকে এড়াতে পারবে না। তোমার চেহারা বলছে কিছু না কিছু ঘটেছিল-এখনও অস্বীকার করবে?'

হেসে ফেলল রানা।

'উত্তর দাও, ঘটেনি কিছু?'

চাপের মুখে পড়ে সত্যি কথাটাই বলতে হল রানাকে। 'ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেছিল-কিন্তু আমার অফিশিয়াল দায়িত্বের সাথে তার তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। চারটে বছরের এই সামান্য ঘটনাটাই শুধু আজও মনে আছে আমার-মনে পড়লেই প্রতিটা খুঁটিনাটি পরিষ্কার জ্বলজ্বল করে ওঠে, বাকি সব ঝাপসা, ভুলে গেছি।'

'জ্বলজ্বল করে ওঠে?' ব্যগ্র কৌতূহলে খাওয়ার কথা ভুলে হাত গুটিয়ে বসে আছে সোহানা। 'তাহলে নিশ্চয়ই সেটা সাংঘাতিক কোন ঘটনা? রানা, প্লীজ, আর আমাকে কষ্ট দিয়ো না-খাওয়া হল তোমার? উঠে পড়, আমি কড়া কফি তৈরি করে আনছি, শুয়ে শুয়ে শুনব তোমার দ্বীপান্তরের কাহিনী।'

'কিন্তু...'

'এই শালা, কানে তোমার কথা যায় না?' ঝট করে উঠে দাঁড়াল সোহানা চেয়ার ছেড়ে। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে হাত রাখল দু'কোমরে। 'অ্যায়সা এক বক্সিং মারব...'

একসাথে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল দু'জনেই। কিন্তু দ্রুত মুখের চেহারা গম্ভীর করে ফেলল রানা। ঘাড় থেকে ভূত নামানো যাবে না, বুঝতে পেরেছে ও। রাতটা জেগেই কাটাতে হবে। কিন্তু এর বিনিময়ে কিছু আদায় করে নেবার একটা সুযোগ সে-ই বা ছাড়বে কেন!

'সোহানা,' বলল ও। 'আমার একটা শর্ত আছে।'

'তোমার যে কোন শর্ত...' রানাকে লোভাতুর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘোর ভাঙল সোহানার, শর্তটা কি তা বুঝে নিল এক নিমেষে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল মুখটা। 'তবে রে...' টেবিল ঘুরে তেড়ে গেল সোহানা। 'পাজি, শয়তান, সুযোগ-সন্ধানী, ব্ল্যাকমেইলার...' রানার বুকের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, তারপর কানে কানে নিচু গলায় বলল, 'তোমার শর্তটা কি তা আমি শুনতে চাই না। তবে যাই হোক পূরণ করব। কিন্তু গল্প শোনার পর।'

বেডরূমের আলো অফ করে দিয়ে অন্ধকারে মুখোমুখি বসে আছে ওরা। পাশেই জানালা, গ্রিল ছুঁয়ে একফালি ম্লান চাঁদের আলো ঢুকে পড়েছে কামরার ভিতর। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে রানা বাগানের দিকে। ফুরফুরে বাতাস লাগছে মুখে, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বারবার। মনটা কেমন উদাস লাগছে ওর।

'খুব কি করুণ কাহিনী, রানা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সোহানা। 'তবে না হয় থাক। কষ্ট পাবে মনে করলে না হয়...'

বাগান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল রানা। আবছা অন্ধকারে

সোহানার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান একটু হাসল ও। বলল, 'আবার সব নতুন করে মনে পড়ে গেছে, সোহানা, এখন যদি কাউকে বলতে না পারি, দম ফেটে মরে যাব আমি-রাতের পর রাত ঘুমাতে পারব না। না, এখন আর বাধা দিয়ো না। বলতে দাও আমাকে...কিন্তু, কোথা থেকে শুরু করব, বল তো?'

চুপ করে ভাবছে রানা। সোহানাও ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে।

তারপর একসময় সোহানাই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'একটানা চার বছরের শাস্তি, একেবারে দ্বীপান্তর-কি এমন অপরাধ করেছিলে তুমি যার জন্যে এতবড় শাস্তি পেতে হল তোমাকে?'

'শাস্তি বটে, কিন্তু অনেক পরে জেনেছি, সেটা ছিল আমার জন্যে আশীর্বাদ,' বলল রানা। 'ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানো হচ্ছিল আমাকে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান সরকারের, শুধু কার্যকরী করা বাকি ছিল। মেজর জেনারেল রাহাত খান ব্যাপারটা টের পেয়ে তড়িঘড়ি নিজের ঘাড়ে সব দায়িত্ব নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন দ্বীপান্তরে, সেন্ট মেরী দ্বীপে-আসলে প্রাণে বাঁচিয়ে দিলেন তিনি আমাকে।'

'ফায়ারিং স্কোয়াড!' গলাটা কেঁপে গেল সোহানার। 'কেন? কি করেছিলে তুমি?'

নড়েচড়ে বসল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'তাড়াতাড়ি আসল কাহিনীটা শুরু করতে চাই, তাই সংক্ষেপে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আমি, কেমন? যেখানে বুঝবে না সেখানে প্রশ্ন করে পরিষ্কার হয়ে নেবে।'

'ঠিক আছে,' বলল সোহানা। 'প্রথম প্রশ্ন-ফায়ারিং স্কোয়াড কেন? রেকর্ডে তো নেই এসব কথা?'

'সেটা ছিল আমার ট্রেনিং পিরিয়ড,' শুরু করল রানা। 'সেজন্যেই এ সময়ের ঘটনাগুলো আমার রেকর্ড ফাইলে নেই।'

'কোথায় ট্রেনিং নিচ্ছিলে?'

'লণ্ডনে। কোর্সের শেষ পর্যায়ে আকস্মিকভাবে আমি কিছু মূল্যবান তথ্য পেয়ে যাই। সিডনি শেরিডান নামে একজন মিলিওনিয়ার পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে প্রচুর টাকা খাচ্ছিল, বিনিময়ে পাকিস্তান তার কাছ থেকে নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছিল। পি. সি. আই. অত্যন্ত খাতির করত লোকটাকে। হঠাৎ আমি টের পেয়ে যাই এই সিডনি শেরিডান ডাব্‌ল এজেন্টের ভূমিকা পালন করছে। সে ভারতের কাছ থেকেও প্রচুর টাকা খেয়ে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত তথ্য পাচার করছে। ব্যাপারটা জানতে পেরে আমার ইমিডিয়েট বসদেরকে বললাম, কিন্তু কেউ আমাকে পাত্তা দিল না। আমার হাতে কোন তথ্য প্রমাণ ছিল না, তাই দমে গেল মনটা। এই সময় আরেকটা ঘটনা ঘটে। এক লর্ডের ছেলে, হেসটিংস আমাকে ডায়মণ্ড স্মাগলারদের একটা গোপন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। গুরুদয়াল সিং, একজন ভারতীয় ডায়মণ্ড স্মাগলার-সবাইকে আমার এই পরিচয় দেয় হেসটিংস। ওরা বিশ্বাস করেছিল। ওখানে আবার আবিষ্কার করলাম সিডনি শেরিডানকে। ডায়মণ্ড স্মাগলারদের রিঙ-লিডার সে। খোঁজ নিয়ে জানলাম বন্ধু সেজে যে লোকটা পাকিস্তানের চরম ক্ষতি করছে এই শেরিডান সেই শেরিডানই। প্রথমে আমার পরিচয় জানতে পারেনি ও, ভারতীয় মনে করে খুব খাতির করত আমাকে। না চাইতেই অত্যন্ত মূল্যবান সব তথ্য পেতাম আমি ওর কাছ থেকে। এবং সে-সব তথ্য পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অ্যাকটিভ এজেন্টদেরকে আমি গোপনে জানিয়ে দিতাম। এভাবেই চলছিল। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না বলে কাউকে কিছু না জানিয়ে গোটা রিঙটাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে বসলাম। এক ঢিলে দুটো পাখি মারার ইচ্ছে ছিল আমার। সিডনি শেরিডানের মুখোশ উন্মোচনটাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তখন বয়স অল্প, বুঝিনি যে অফিশিয়াল অনুমতি না নিয়ে এ ধরনের

পদক্ষেপ নেয়া ঘোরতর অন্যায়। যাই হোক, সমস্ত তথ্য আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, লণ্ডন পুলিস এবং ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে জানিয়ে দিই। একই দিনে আরেকটা দুঃসাহসের পরিচয় দিই আমি, এবং প্রফেশন্যাল লাইফের প্রথম ভুলটা করি। হেসটিংসও একজন স্মাগলার ছিল, তাকে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি আমার। দু'জনে ফাঁদ পেতে সিডনি শেরিডানের একটা ব্রিফকেস ভর্তি দু'লক্ষ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং দামের ডায়মণ্ড ছিনতাই করি আমরা। শেরিডানকে হাতেনাতে ধরার ইচ্ছে ছিল আমার, ফাঁদটা সেজন্যেই পাতা হয়েছিল, কিন্তু গায়ে আঁচড়টি কাটার সুযোগ না দিয়ে ফসকে গেল সে এবং টের পেল, আমি তার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছি। যাই হোক, হেসটিংসকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে দু'ঘন্টা পর হোটেলে ফিরে এলাম আমি...'

'কামরায় ঢুকে দেখ হেসটিংস তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'হাতে পিস্তল। স্রেফ আত্মরক্ষার জন্যেই যা কিছু করলাম আমি, কিন্তু লোকটা যে সাততলার ব্যালকনি থেকে একেবারে নিচে পড়ে যাবে তা ভাবতেই পারিনি।'

'হোটেল থেকে পালিয়ে কোথায় গেলে তুমি?'

'ছদ্ম পরিচয় নিয়ে অন্য হোটেলে,' বলল রানা। 'পরদিন সমস্ত খবরের কাগজে বড় বড় হেডিংয়ে খবরটা বের হল। একজন বাদে স্মাগলার চূড়ামণিরা ধরা পড়েছে সবাই। পলাতকের নাম গুরুদয়াল সিং। লর্ড-পুত্র হেসটিংসকে খুন করার অভিযোগও আনা হল আমার বিরুদ্ধে। সাংবাদিকরা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে আভাস দিল গুরুদয়াল সিং এবং তার সহকর্মীদেরকে একটি দেশের স্পাই বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আমি বুঝলাম শেরিডানই এসব তথ্য সরবরাহ করছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে।'

ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সোহানা, 'সিডনি শেরিডানের

বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নাওনি তুমি?'

'ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারিনি আমি,' বলল রানা। 'লোকটা সাংঘাতিক চতুর, কোন অপরাধের প্রমাণ রাখত না। এর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কেও বিচিত্র সব কাহিনী শুনতাম, একটাও অবিশ্বাস করিনি। সিডনি শেরিডানকে ভয় করে না ব্রিটিশ আণ্ডার গ্রাউণ্ডে এমন কেউ ছিল না তখন। আমি নিজেও লোকটাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম।'

'তারপর?'

'কত বড় ভুল করেছি, বুঝলাম পরদিন,' বলল রানা। 'আমি তখন ব্রিটিশ পুলিসকে ফাঁকি দেবার জন্যে আতঙ্কিত ইঁদুরের মত ছুটোছুটি করছি। এই সময় পি. সি. আই-এর একটা মেসেজ পেলাম। মেসেজে ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ জানলাম আমি। গোটা ইউরোপ-জোড়া ইন্টেলিজেন্স নেটওঅর্ক আমাদের খতম হয়ে গেছে। আমার সূত্র ধরে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সমস্ত এজেন্ট, অপারেটর এবং কর্মকর্তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেছে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স আর সুইডেন ত্যাগ করতে বলা হয়েছে তাদেরকে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিজের চেষ্টায় ইমিডিয়েটলি ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে হবে। ওখানে গেলে পরবর্তী আদেশ পাব আমি।'

'ব্রিফকেসটা ছিল তোমার কাছে...'

'দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং দামের ডায়মণ্ড ছিল ওতে,' বলল রানা। 'ওগুলো নিয়ে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করা সম্ভব নয়, আবার ফেলে রেখে যেতেও মন চায়নি। তখন অবৈধ ডায়মণ্ডের সবচেয়ে বড় ক্রেতা বলতে সিডনি শেরিডানকেই বোঝাত। এত টাকা দামের ডায়মণ্ড একমাত্র তার পক্ষেই কেনা সম্ভব।'

'কিন্তু সে তো তখন তোমার প্রাণের দুশমন,' বলল সোহানা। 'নিশ্চয়ই তার কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাওনি?'

'সাহস করে তাই গিয়েছিলাম,' বলল রানা। 'ব্রিটিশ

ওভারসীজ ব্যাঙ্কের একজন কর্মকর্তার গোপন চেম্বারে সিডনি শেরিডানের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। এল সে, এবং আমাকে দেখে আপাদমস্তক চমকে উঠল। দেরি না করে কাজের কথা পাড়লাম আমি। চলতি বাজার দর হিসেবে ডায়মণ্ডের মোট যা দাম হয় তার চেয়ে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং কম দেবে সে আমাকে। ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক পাবেন দশ পার্সেন্ট কমিশন। এই মুহূর্তে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে আমার অ্যাকাউন্টে মোট পাওনার একটা চেক লিখে জমা দিতে হবে তাকে। ভুরু কুঁচকে বেশ কিছুক্ষণ ভাবল শেরিডান। ব্যবসায়ী লোক, প্রস্তাবটা মেনে নিল অবশেষে। কিন্তু সবজান্তা ঢংয়ের হাসি ঠোঁটে নিয়ে আমার কানে কানে বলল, "মনে রেখ, আমার ডায়মণ্ড আমি কিনে নিলাম। এই ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকের সম্মানে আজ তোমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি আমি। কিন্তু ভবিষ্যতে খুব সাবধানে থেকো, গুরুদয়াল। তোমাকে আমি আবার খুঁজে বের করব।" মৃদু হেসে বিদায় নিলাম আমি। আমার গ্যারান্টি ছিল ওই ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক। কথা দিয়েছিল শেরিডানকে অন্তত একটি ঘন্টা তার চেম্বারে গল্প-গুজবের মধ্যে আটকে রাখবে সে।'

'এবং ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করার জন্যে ওই একটি ঘন্টা তোমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'জাল পাসপোর্ট তৈরিই ছিল, শুধু চেহারা বদল করে নিতে যা একটু দেরি হল। তারপর লণ্ডন থেকে জুরিখ হয়ে প্যারিসের ওরলি এয়ারপোর্ট, সেখান থেকে প্যান অ্যামে চড়ে সোজা সিডনি চলে এলাম। এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করলেন স্বয়ং যমদূত-মেজর জেনারেল রাহাত খান।'

'ওহ্, গড!'

'হোটেলে পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত একটা কথাও বলেননি চীফ,' বলল রানা। 'কিন্তু গাড়িতে দু'বার অসুস্থ বোধ করলাম আমি, প্রতিবার মনে হল আমি বোধহয় মারা যাচ্ছি। হোটেল কামরার

দরজা নিজের হাতে বন্ধ করে পকেটে হাত ভরলেন চীফ, অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। কিন্তু গুলি-টুলি করলেন না। তবে যা বললেন, তখন মনে হচ্ছিল এর চেয়ে মরে যাওয়াও হাজার গুণে ভাল। আমার দেয়া রিপোর্টটা নিঃশব্দে পড়া শেষ করলেন তিনি। তারপর ভুরু কুঁচকে বললেন, শেরিডান ডাব্‌ল এজেন্ট, তুমি প্রমাণ করতে পারবে? জান, পাকিস্তানের কত বড় উপকারী বন্ধু সে? আমি বললাম, না, স্যার। বন্ধু নয়, শত্রু-আরও কিছুদিন সময় পেলে আমি প্রমাণ করতে পারব। চীফ বললেন, আমি বিশ্বাস করলাম তোমার কথা-কিন্তু আর কে বিশ্বাস করবে? আমার ইজ্জতটা শেষ করে দিয়েছ, বোকা ছেলে! সরকারকে আমার জবাবদিহি করতে হয়, একথা জান না? একশোবার করে বলে দিয়েছি যেহেতু বাঙালী, প্রতিটা কাজে দ্বিগুণ সাবধান হবে, ভাবনা চিন্তা করে পা ফেলবে-গর্দভ! এখন তোমাকে বাঁচাব কিভাবে বলে দাও!'

'ফায়ারিং স্কোয়াডের কথা বললেন না?'

'না। সম্ভবত ভয় পাব বলে কথাটা প্রকাশ করেননি। অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত জানতে চাইলেন, টাকাটা কি করেছ? বললাম, আছে। বললেন, কি করতে হবে কালকে জানতে পারবে। বলেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।'

'তারপর?'

'পরদিন বিস্তারিত সব জানানো হল আমাকে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের কাছাকাছি ভারত মহাসাগরে ছোটখাট একটা দ্বীপ, নাম সেন্ট মেরী, সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্যে পোস্টিং দেয়া হয়েছে আমাকে। সুয়েজ তখন বন্ধ, তাই সারা দুনিয়ার তেলবাহী জাহাজ ওই সমুদ্র পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে। সব দেশের এসপিওনাজ নেটওঅর্ক তৎপর ওখানে। তাছাড়া, এলাকাটা আন্তর্জাতিক স্মাগলারদের স্বর্গ বিশেষ। আমার কাজ হবে সমস্ত এসপিওনাজ

নেটওঅর্কের মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করা এবং আরও নানান সূত্রে পাওয়া ইনফরমেশন হাই ফ্রিকোয়েন্সির অয়্যারলেসের মাধ্যমে কায়রোর পি. সি. আই-এর ব্রাঞ্চ অফিসে পাঠানো। প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার ব্যাপারে কঠোর ভাবে নিষেধ করে দেয়া হল আমাকে। মনটা একেবারে দমে গেল আমার।'

'কেন?'

'ভারত মহাসাগরের এই এলাকায় শুধুমাত্র অযোগ্য অপারেটরদেরকে পাঠানো হত,' বলল রানা। 'আসলে তেমন কোন কাজ ছিল না ওখানে-শুধু সময় কাটানো। যাই হোক, এরপর এল নির্দেশের বিশদ ব্যাখ্যা। একশো পঁচিশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং দিয়ে একটা বোট কিনতে বলা হল আমাকে। সেন্ট মেরী দ্বীপে আমার পরিচয় হবে, আমি পাকিস্তানী বাইশ পরিবারের কোন এক পরিবারের এক অভিমানী ছেলে, মা-বাবার সাথে রাগ করে একটা বোট নিয়ে সেন্ট মেরী দ্বীপে এসে পড়েছি, এবং দ্বীপটা আমার ভাল লেগে গেছে। তাই স্থায়ী ভাবে থাকার জন্যে সেন্ট মেরীর নাগরিকত্ব পাবার জন্যে আবেদন জানিয়েছি।'

'এবং ঠিক তাই করলে তুমি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তাই করলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেল খুদে দেশটা আমার। দ্বীপটা খ্রিস্টান প্রধান, তবে অল্প কিছু বহিরাগত হিন্দু এবং মেইন ল্যাণ্ড থেকে আসা মুসলমানও আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা সবাই নিগ্রো-গায়ের রঙ কালো, মাথায় কোঁকড়া চুল খুলি আঁকড়ে বসে আছে, কিন্তু চোখগুলো ধবধবে সাদা। দ্বীপবাসীরা সবাই সরল প্রাণ। ভালবেসে ফেললাম। বিনিময়ে পেলাম ওদেরও অকুণ্ঠ আতিথেয়তা এবং আন্তরিক প্রীতি। আমাকে ওদের ভাল লাগার কারণও ছিল। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিল কোটিপতির একমাত্র সন্তান আমি, অথচ জীবিকা অর্জনের জন্যে উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করি। ওদের চোখে আমি ছিলাম ভিনদেশী এক রাজপুত্র

যে সাধারণ প্রজাদের সাথে বসবাস করার জন্যে, তাদের দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার হওয়ার জন্যে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে নেমে এসেছে পর্ণ কুটিরে।'

'দ্বীপটা কেমন, রানা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সোহানা।

'স্বর্গ,' এক কথায় জবাব দিল রানা। 'বোটে একগাদা ফুয়েল ড্রাম তুলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে রওনা দিই আমি। এই দু'হাজার মাইল পাড়ি দেবার সময় প্রেম হয় আমার সাথে জলকুমারীর...'

'জলকুমারী?'

'তোমার সতীন,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ভয় পেয়ো না, বেঁচে নেই সে। গল্পটা আমার বোট এই জলকুমারীকে নিয়েই। আর...' হঠাৎ খাদে নেমে এল রানার কণ্ঠস্বর, '...আর দ্বীপে পা দিয়েই কুড়িয়ে পেলাম দুটো সোনার টুকরো-রডরিক আর ল্যাম্পনি। আমার গল্প ওদেরকে নিয়েও।' একটু থেমে আবার শুরু করল রানা, 'দ্বীপে উঠেই কিনলাম পঁচিশ একর ছায়া সুনিবিড় শান্তি, সেখানে নিজের হাতে তৈরি করেছি চারটে কামরা, চওড়া একটা বারান্দা, বাগান আর লতা-ঝোপের বাউণ্ডারি ওয়াল। আম গাছ দিয়ে ঘেরা বাড়িটা থেকে সাদা সৈকত দেখতে পাওয়া যায়। শোনা যায় সাগরের উদাত্ত আহ্বান।'

'অপূর্ব-রানা, ওই দ্বীপে আমার যেতে ইচ্ছে করছে,' ফিসফিস করে বলল সোহানা। 'তারপর?'

'তিন বছর কেটে গেল ওখানে,' বলল রানা। 'এর মধ্যে তেমন কিছুই ঘটেনি। ইতিমধ্যে শুধু দ্বীপের একজন হয়ে উঠেছি আমি। সবাই ধরে নিয়েছে, এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যাব না আমি। নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করার ছয় বছর পর স্থায়ী নাগরিকত্ব পাবার কথা। সবাই জানে, তখনই আমি নাগরিকত্ব পেয়ে গেছি, তিন বছর পর শুধু আনুষ্ঠানিকতাটুকু সম্পন্ন হবে।'

'তারপর?'

'সাঁতার কাটি, বোটটাকে ভাড়া খাটাই, মদ খাই, গান করি-তারপর এল মাছের মওসুম। সোহানা, গল্প শুরু হল। কিন্তু আজ এই পর্যন্তই থাক, কেমন? রাত তো অনেক হল। গৌরচন্দ্রিকা শেষ, আবার অন্য একদিন শুরু করা যাবে মূল কাহিনী, কি বল?'

'আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব।' কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠস্বরটা রানার কানে অকৃত্রিম বলেই মনে হল।

হাসল রানা। 'ঠিক আছে, তবে শোন। কিন্তু তার আগে...'

'আবার কি?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জানতে চাইল সোহানা।

'গরম কফি হলে জমত, কি বল?'

'এক্ষুনি, স্যার।' চেয়ার ছেড়ে দমকা বাতাসের মত আঁচল উড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সোহানা।

দুই

সেবারের মওসুমে অনেক দেরি করে এল মাছ। বোট এবং ক্রুদের গাধার খাটনি খাটাচ্ছি, প্রতিদিন উত্তর দিকে বহু বহু দূর চলে যাচ্ছি, নিশুতি রাতে ফিরে আসছি গ্র্যাণ্ড-হারবারে-খালি হাতে। দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা কেটে যাচ্ছে-কিন্তু কই, কোথায় মারলিন! তারপর হঠাৎ একদিন, নভেম্বরের রোদ ঝিলমিল সাগরে ঝিক করে হেসে উঠল আমাদের ভাগ্য। মোজাম্বিক স্রোতের স্বচ্ছ নীল-বেগুনি ঢেউয়ের সফেন মাথা থেকে বড়সড় একটাকে নামতে দেখলাম আমি।

ইতিমধ্যে একটা মাছের জন্যে মরিয়া জেদ চেপে গেছে আমার। ক্রুসহ বোটটাকে চার্টার করেছে টাকার কুমীর টনি রুমার, নিউ ইয়র্কের একটা বিজ্ঞাপন সংস্থার মালিক। লোকটা আমার বাঁধা খদ্দের। গত তিন বছর ধরে প্রতি মওসুমে ছয় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে বড় মারলিনের আশায় তীর্থ করতে আসছে সে

সেন্ট মেরী দ্বীপে। বেঁটে, লালমুখো বানরের মত চেহারা, কিন্তু সদালাপী-লক্ষ্মী খদ্দের হিসেবে তাকে পছন্দ করি আমি। আর প্রাণচঞ্চল তরুণ বোট মালিক মাসুদ রানার উপর ভরসা করার একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছে রুমারের। চেহারা যাই হোক, মনে অসীম ধৈর্য আর গায়ে শক্তি আছে রুমারের, বড় মাছ নিয়ে খেলতে হলে যা একান্ত দরকার।

পানির উপর দুই হাতের চেয়েও বড় গোটা ফিন দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার বুক। ডগার দিকটা চওড়া এবং বাঁকানো দেখেই বুঝে নিলাম ওটা মারলিন-শার্ক বা পরপয়জ নয়। আমার সাথে একই সময়ে মাছটাকে দেখতে পেয়েছে জিলেট ল্যাম্পনি, ফোরডেকে দাঁড়িয়ে মাস্তুলের দড়িদড়া ধরে ঝুলে পড়ল সে, উত্তেজনায় চেঁচাচ্ছে। পাকানো দড়ির মত চুলের গোছাগুলো রোদ পোড়া মুখের দু'দিকে দোল খাচ্ছে তার।

স্যাৎ করে তীরবেগে ঢেউয়ের মাথায় চড়ছে মাছটা, গতি মন্থর হয়ে এলে মুহূর্তের জন্যে ঢেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছে। তার চারপাশ থেকে সরে যাচ্ছে পানি, ব্যাঙের মত লাগছে দেখতে অনেকটা-কালো, ভারী, বিশাল। সাবলীল ভঙ্গিতে বাঁক নিচ্ছে মাছটা, সেটার অনুকরণে বাতাস লাগা পতাকার মত ঢেউ জাগছে পিঠের পাখনায়। ঢেউয়ের মাথা থেকে পিছলে নামছে সে পরবর্তী ঢেউয়ের মাঝখানে, হুড়মুড় করে ছুটে এসে ঢেকে দিচ্ছে পানি তার ঝলমলে চওড়া পিঠ।

ঘাড় ফিরিয়ে ককপিটের দিকে তাকালাম। এরই মধ্যে টনি রুমারকে ফাইটিং চেয়ারে বসতে সাহায্য করছে ফিলিপ রডরিক। বেল্ট দিয়ে চেয়ারের সাথে রুমারকে আটকে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, মনে হল বোটে একটা হিমালয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যেন। প্রকাণ্ডদেহী বুনো ভাল্লুকের সাথে রডরিকের পার্থক্য শুধু এটুকু যে বুক ছাড়া তার শরীরে কোথাও তেমন লোম নেই। গায়ের রঙ শুধু কালো বললে রঙের উজ্জ্বলতাকে অপমান করা হয়। কালো

মার্বেল পাথরের মত আশ্চর্য একটা স্বচ্ছ গভীরতা এবং দ্যুতি আছে সেখানে। মস্ত থাবায় ঢাকা পড়ে গেল তার প্রকাণ্ড মুখটা, সশব্দে চপ করে একটা চুমো খেল সে, তারপর হাতটা ছুঁড়ল আমাকে লক্ষ্য করে। প্রতীক্ষার অবসানে, নগদ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় উত্তেজনার ঢেউ লাগছে তার শরীরেও। কিন্তু আমাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে নৈরাশ্যবাদী লোক সে-ই, আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলছে তার বুক। বলল, 'বড় সতর্ক, সাত ঘাটের পানি খাওয়া মাছ।'

নিঃশব্দে হাসছি আমি, 'ওর কথায় কান দিয়ো না টনি,' বললাম, 'একটু সবুর কর, দেখ কিভাবে বাধিয়ে দিই মাছটা।'

'এক হাজার ডলার বাজি,' ঢোক গিলে চাপা গলায় বলল টনি রুমার। এ বাজি জিতে নয় হেরে আনন্দ পেতে চায় সে। উত্তেজনায় চকচক করছে তার চোখ দুটো।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। হাজার ডলার বাজি হারার সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু পরমুহূর্তে বুক টান করে জোর গলায় জানিয়ে দিলাম, 'রইল তাই।' তারপর মন দিলাম মাছের দিকে।

ঠিক ধরেছে রডরিক, এসব মাছের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার দিক থেকে গোটা ভারত মহাসাগরে রডরিকের জুড়ি নেই। প্রকাণ্ড মাছটা সতর্ক, সাবধান হয়ে আছে।

যত কায়দা-কৌশল জানা আছে, এক এক করে সবগুলো খাটিয়ে পাঁচবার টোপ সাধলাম মাছটাকে। প্রতিবার বাঁক নিয়ে সরে গেল সে। নাক ঘুরিয়ে যতবার তার ঠোঁটের সামনে দিয়ে যেতে চাইল জলকুমারী, প্রতিবার ডুব দিয়ে ফাঁকি দিল সে।

'রডরিক, আইস-বক্সে তাজা একটা ডলফিন টোপ আছে,' মরিয়া হয়ে বললাম আমি। 'বের করে আনো ওটা।'

মাছটাকে এবার ডলফিন সাধলাম। টোপটা অনেক খেটে নিজে তৈরি করেছি আমি, স্বাভাবিক সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতরে বেড়াচ্ছে পানির নিচে সেটা। টোপ গ্রহণ করার মুহূর্তটা চিনতে

পারলাম। মারলিনের বিশাল দুই কাঁধ নিম্নমুখী হয়ে যাচ্ছে দেখে তীক্ষ্ণ হল আমার দৃষ্টি। পরমুহূর্তে গড়ান দিয়ে বাঁক নেবার সময় এক ঝলক আলোর মত দেখতে পেলাম পেটটা-পানির নিচে একটা আয়না যেন ঝিক করে উঠল।

'ধাওয়া করছে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার ছাড়ল ল্যাম্পনি। ডেক থেকে পা খসে পড়ল তার, দড়ি ধরে দোল খাচ্ছে সে বানরের মত।

সকাল দশটার দিকে খেলাবার জন্যে রুমারকে ছিপটা দিলাম আমি। তার আগে টানাহেঁচড়া করে বেশ অনেকটা কাছে নিয়ে এলাম সেটাকে। পানিতে বেশি লাইন থাকলে অতিরিক্ত চাপ পড়ে রড ধরা লোকটার ওপর। দাঁতে দাঁত চেপে ফাইবার গ্লাসের ভারী রড ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়াটাই একমাত্র কাজ নয় আমার-টোপ গিলেই উন্মত্তের মত মুখ ঝাপটা দিয়ে বড়শি ছাড়াতে চেষ্টা করছে মাছটা, না পেরে আতঙ্কিত হয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটেছে, লাফ দিয়ে উঠে যাচ্ছে পানির উপর দিয়ে, ঝপাৎ করে পড়ছে আবার-সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে বোট চালাচ্ছি আমি, অনুসরণ করে যাচ্ছি মাছটাকে।

দুপুরের খানিকটা পর অবশেষে পরাস্ত করল রুমার মাছটাকে। পানির উপর আসতে বাধ্য হয়েছে মাছটা, বিশাল একটা বৃত্ত রচনা করে প্রথমবার চক্কর মারা শেষ করেছে এই মাত্র। এখন শুধু প্রতি চক্করে খানিকটা করে কাছে টেনে নিয়ে আসবে তাকে রুমার।

'হেই, বস্!' আমার মনোযোগ ভেঙে দিয়ে হঠাৎ ডাকল ল্যাম্পনি। 'একজন অতিথি এসেছেন!'

'ব্যাপারটা কি, ল্যাম্পনি?'

'উজান ঠেলে আসছেন বড় সাহেব,' হাত তুলে দেখাল ল্যাম্পনি। 'মারলিনের মুখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, গন্ধ পেয়েছেন তিনি।'

ল্যাম্পনির হাত অনুসরণ করে তাকাতেই হাঙ্গরটাকে দেখতে পেলাম। সোজা, একরোখা গতিতে পানি কেটে এগিয়ে আসছে একটা ভোঁতা ফিন। শুধু রক্তের গন্ধে নয়, পানির তোলপাড়েও আকৃষ্ট হয়েছে সে। প্রকাণ্ড একটা হ্যামারহেড হাঙ্গর এটা, দেখেই বুঝলাম। 'ব্রিজে এস তুমি জলদি, ল্যাম্পনি!' হাঁক ছাড়লাম আমি।

'দেখ, রানা,' দরদর করে ঘামছে টনি রুমার, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে সে রডটা, মাথা কাত করে কাঁধের কাপড়ে জুলফি আর কান ঘষে নিয়ে উত্তেজিতভাবে বলল, 'শালা খচ্চরটা যদি আমার মাছে একটা দাঁতও বসাতে পারে, হাজার ডলারের কথা ভুলে যেতে হবে তোমাকে।'

ল্যাম্পনিকে হুইল দিয়ে তিন লাফে ছুটে মেইন কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম আমি। ঝপ করে হাঁটু গেড়ে বসেই দড়ির গিঁট খুলে ইঞ্জিন হ্যাচটা সরিয়ে দিলাম, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে গহ্বরের ভিতর, ডেকিংয়ের নিচে হাত গলিয়ে ইনার টিউবের গোপন সিলিংয়ে ঝোলানো এফ-এন কারবাইনের স্টকটা মুঠো করে ধরলাম।

ডেকে বেরিয়ে আসার আগেই রাইফেলের লোডিং চেক করা হয়ে গেছে আমার, বুড়ো আঙুলের ঠেলা দিয়ে সিলেক্টরের কাঁটা অটোমেটিক ফায়ারের ঘরে নিয়ে গেলাম।

'ল্যাম্পনি,' দ্রুত কণ্ঠে বললাম, 'বড় সাহেবের পাশে নিয়ে চল বোট।'

জলকুমারীর বো-তে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে পড়েছি আমি, বাগিয়ে ধরে আছি কারবাইনটা। কোর্স বদলে সোজা হাঙ্গরটার দিকে এগোচ্ছে বোট, দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব-এখন আর কোন সন্দেহ নেই আমার, হ্যামারহেডই। ডগা থেকে লেজ পর্যন্ত বারো ফুট লম্বা, স্বচ্ছ পানির নিচে গায়ের রঙ তামাটে ব্রোঞ্জ। মাথার আকৃতি বদলে সমতল হয়ে গেছে যেখানটা, দুই

অক্ষিগোলকের মাঝখানে, সতর্কতার সাথে লক্ষ্য স্থির করেই ছোট্ট করে ট্রিগারে একবার চাপ দিলাম আমি। গর্জে উঠল এফ-এন, অস্ত্রটা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা খালি পিতলের কেস, এবং সাগরের পানি দ্রুত ছলকে উঠল বার কয়েক।

গোটা শরীর ঝাঁকি খাচ্ছে হাঙ্গরটার। মাথার চামড়া ফুটো করে ভিতরে ঢুকে গেছে বুলেটগুলো, ধবধবে সাদা খুলির হাড় চুরমার করে দিয়ে ছোট্ট মগজটুকু উড়িয়ে দিয়েছে। উল্টে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে সে।

'থ্যাঙ্কস, রানা,' ভেজা টকটকে লাল মুখটা শার্টের আস্তিনে মুছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল রুমার।

'সেবা পরম ধর্ম,' মুচকি হেসে ল্যাম্পনির কাছ থেকে হুইল নেবার জন্যে চলে গেলাম আমি।

খুব ভোগাল মাছটাকে রুমার, যতভাবে সম্ভব শাস্তি দিয়ে লাইন গুটিয়ে ধীরে ধীরে টেনে আনল বোটের কাছে। ছড়ানো লেজটা পানির উপর নিস্তেজভাবে বাড়ি খাচ্ছে। দীর্ঘ ঠোঁট জোড়া দ্রুত ফাঁক আর বন্ধ হচ্ছে। চকচকে চোখটা পাকা আপেলের মত। দীর্ঘ শরীরে হাজারখানেক উজ্জ্বল রূপালী, সোনালী আর রয়্যাল পারপল রঙের চোখ ধাঁধানো টানা লম্বা দাগ।

স্টেনলেস স্টীলের লম্বা রড হাতে অপেক্ষা করছে রডরিক, রডের শেষ মাথায় তিন কাঁটার হুকটা রোদ লেগে ঝিলিক মারছে। দস্তানা পরা হাত দিয়ে হুকহীন আরেকটা রড ধরেছি আমি, ধীরে ধীরে টেনে আনছি মারলিনকে রডরিকের দিকে। 'ঠিক জায়গা মত বেঁধানো চাই,' বললাম ওকে।

তাচ্ছিল্যের সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল রডরিক, ভাবটা যেন, ছেলেমানুষের কথা এভাবেই উড়িয়ে দিতে হয়।

'ঢেউটার জন্যে অপেক্ষা কর,' ঠাট্টা করে উপদেশের সুরে সাবধান করছি ওকে। অন্য সময় হলে বোটটা দুলে উঠত রডরিকের অট্টহাসিতে। কিন্তু মারলিন তার সমস্ত মনোযোগ

কেড়ে নিয়েছে এখন। আমার অহেতুক উপদেশ কানে ঢুকতে ঠোঁটের কোণ একটু বাঁকা হল শুধু।

ঢেউটা উঁচু করে ধরল মাছটাকে। পানি সরে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল দু'দিকের ছড়ানো পাখনার মাঝখানে পারদের মত চকচকে চওড়া বুক। 'এইবার!' রুদ্ধশ্বাসে বললাম আমি।

'হেঁইয়ো!' হুঙ্কার ছেড়ে তিন কাঁটাওয়ালা হুকটা থ্যাচ করে মারলিনের বুকে গেঁথে দিল রডরিক। উজ্জ্বল ক্রিমসন রঙের রক্ত ছুটল ফোয়ারার মত। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে পানির উপর মাছটা, সাদা ফেনার একটা পাহাড় সৃষ্টি হচ্ছে তার চারপাশে, কয়েকশো গ্যালন লোনা পানি ছিটকে আসছে লেজের ঝাপটায়, ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের সবাইকে।

ক্রেনের ডেরিক থেকে নামিয়ে অ্যাডমিরালটি জেটিতে ঝুলিয়ে দিলাম মাছটাকে। হারবার মাস্টার বেনসন সার্টিফিকেট সই করার সময় মাছের ওজন লিখল আটশো সতেরো পাউণ্ড। চোদ্দ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা।

ওদিকে ভক্তরা উল্লাসে মেতে উঠেছে, একদল কালো মাণিক ওরা, ছয় থেকে তেরো চোদ্দ বছর বয়স। কেউ খালি গায়ে, কারও শার্টের বোতাম ছেঁড়া, রাস্তাগুলো ধরে খালি পায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তারা সবাই। চেঁচাতে চেঁচাতে ফুলে উঠেছে সবার গলার রগ। 'জেটিতে রানা ভাই পাহাড় ঝুলিয়েছে! জেটিতে রানা ভাই...।'

দ্বীপবাসীদের জন্যে এর চেয়ে মোক্ষম অজুহাত আর হতে পারে না। কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে উৎসুক কৌতূহলে দলে দলে ছুটে আসছে সবাই। দেখতে দেখতে উৎসবমুখর হয়ে উঠল বন্দর এলাকা।

কথাটা গভর্নমেন্ট হাউজ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল। অবিরাম হর্ন বাজিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটে আসছে প্রেসিডেনশিয়াল ল্যাণ্ড-

রোভার, বনেটের একধারে পতপত করে উড়ছে রাষ্ট্রীয় পতাকা। ভিড় দু'ভাগ করে ছুটে এসে জেটির কাছে থামল গাড়িটা। প্রায় ছিটকে নেমে এলেন মহৎ হৃদয় ব্যক্তিটি। জন্মসূত্রে দ্বীপের বাসিন্দা যারা তাদের মধ্যে স্বাধীনতার আগে একমাত্র শিক্ষিত এবং আইনবিদ ছিলেন গডফ্রে পিডল। তাঁর শিক্ষা জীবন কেটেছে লণ্ডনে।

'মিস্টার রানা...ও মাই গড!' মাছটাকে চাক্ষুষ করে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'কি সাংঘাতিক! কি ভয়ঙ্কর! এই নমুনা দেখে ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসবে ট্যুরিস্টরা, আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে আমাদের ট্যুরিস্ট ব্যবসা!' এগিয়ে এসে সহাস্যে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকি দিলেন তিনি, হাতখানেক নিচে থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। মিনার বসানো কালো টুপি পরা সত্ত্বেও আমার বগল পর্যন্ত কোনরকমে পৌঁচেছেন তিনি।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মি. প্রেসিডেন্ট, স্যার,' মৃদু হেসে বললাম। কালো গায়ের রঙ ঢাকার জন্যেই কিনা কে জানে সব সময় কালো উলেন স্যুট, কালো চামড়ার জুতো, কালো মোজা এবং কালো চামড়ার রিস্টওয়াচ পরে থাকেন তিনি। তাঁর শরীরে দুটো মাত্র জিনিস সাদা, তবে এ দুটোর ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দের কোন অবকাশ নেই বলেই আজও সেগুলো যা ছিল তাই আছে। মাথার সাদা চুল কলপ লাগিয়ে কালো করে নিয়েছেন, কিন্তু হিটলারী গোঁফ আর ঝকঝকে দাঁতগুলো ধবধবে সাদা।

প্রেসিডেন্ট গডফ্রে পিডলের শুধু মুখভঙ্গি লক্ষ করলে তাঁকে ভুল বোঝার অবকাশ সব সময় থেকে যায়। এই যেমন এখন। আমার দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি, চোখমুখ বিকৃত করে চেঁচাচ্ছেন, হাত পা ছুঁড়ে নাচানাচি করছেন চারপাশে-যেন মারধর শুরু করবেন তিনি এখুনি। কিন্তু তাঁকে বুঝতে হলে তার বক্তব্য শুনতে হবে। তিনি উত্তেজনায় লাফাচ্ছেন আর বলছেন, 'মিস্টার রানা, তুমি আমাদের গর্ব। তোমাকে আমি অভিনন্দন

জানাই। দ্বীপবাসীদের পক্ষ থেকে তোমাকে আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, এবং...' শেষের এই কথাটা সুযোগ পেলেই পুনরাবৃত্তি করেন তিনি, '...এবং সেন্ট মেরী দ্বীপের একজন সাচ্চা নাগরিক হিসেবে তোমাকে পেতে যাচ্ছি বলে আমরা গর্বিত।' কেন যেন আমাকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে-সেই প্রথম দিন থেকেই। জাতীয় উৎসবে বা কোন অতিথির আগমনে যখনই গভর্নমেন্ট হাউজে কোন রাজকীয় খানাপিনার আয়োজন হয়, আমাকে নিমন্ত্রণ করতে কখনও তাঁর ভুল হয় না।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ছবি তোলার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এল ঢ্যাঙা গোখলে রামাদীন। মান্ধাতা আমলের ক্যামেরাটা তে-পায়ার উপর বসিয়ে কালো কাপড়ের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। বিশাল শিকারের পাশে দাঁড়ালাম আমরা। মাঝখানে টনি রুমার, হাতে রড নিয়ে। তাকে ঘিরে বাকি সবাই দাঁড়াল। আমার পাশে দাঁড়িয়েছে রডরিক, আরেক পাশে ল্যাম্পনি। ল্যাম্পনিকে প্রায় ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে আমার পাশে চলে এলেন প্রেসিডেন্ট গডফ্রে পিডল। দাঁত বের করে তাঁর সাথে হাসছে সবাই। কিন্তু রডরিক তার বিশাল দুই কাঁধের উপর বসানো প্রকাণ্ড মুখটাকে কৃত্রিম আতঙ্কে বিকৃত করে তুলেছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত-তাকিয়ে আছে লেন্সের দিকে। চার্টার পার্টিদের মুগ্ধ করার জন্যে এ ছবি আগামী মওসুমে অবদান রাখবে সন্দেহ নেই। দর্শনীয় চেহারার ক্রু, বিশাল শিকার, খোদ প্রেসিডেন্ট এবং চার্টার পার্টিকে নিয়ে তরুণ স্কিপারকে ফটোতে দেখে শিকার বিলাসী সৌখিন পার্টিরা প্রলুব্ধ হবে। অন্তত স্কিপারের ক্যাপের নিচে এবং বোতাম খোলা শার্টের ভিতর থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসা চুল আর উঁচু হয়ে থাকা পেশী, তার সাথে গর্বিত হাসিটুকু-একবার দেখলে ভুলতে পারবে না কেউ। এইসব ভাবছি তখন আমি।

পাইনঅ্যাপেল এক্সপোর্ট শেডের কোল্ডস্টোরেজে মাছটাকে আপাতত রাখার ব্যবস্থা হল। পরবর্তী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

শিপমেন্টে লণ্ডনের রোল্যাণ্ড ওয়ার্ডে পাঠানো হবে এটাকে। ল্যাম্পনি আর রডরিককে জলকুমারীর ডেক পরিষ্কার করার কাজে লাগিয়ে দিয়ে রুমারকে নিয়ে রওনা দিলাম আমি। কাজটা শেষ করে হারবারের শেষ মাথার কাছে শেল বেসিনে নিয়ে গিয়ে জলকুমারীতে তেল ভরবে ওরা, তারপর বন্দর থেকে খানিক দূরে নোঙর ফেলবে।

আমার পুরানো রঙচটা ফোর্ড পিকআপে রুমারকে নিয়ে উঠলাম। স্টার্ট দিতে যাব, এমন সময় দেখি মাটি কাঁপিয়ে কালো একটা ঝড় ছুটে আসছে আমাদের দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ির পাশে এসে থামল রডরিক। প্রকাণ্ড মাথাটা জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে কানে ঠোঁট ছুঁইয়ে নিচু গলায় বলল সে, 'বোনাসের কথাটা ভুলে গেছি, রানা! আমি বলতে চাই, মানে...তুমি তো জানোই...'

'জানি,' বললাম। 'বেগম রডরিককে বোনাসের কথাটা জানানো চলবে না, এই তো? এর জন্যে ছুটে না আসলেও চলত তোমার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' প্রতিবারের মত উত্তর দিল রডরিক। 'না জানালে ভাল হয়, এই আর কি!' যমের মত ভয় করে সে স্ত্রীকে।

'ঠিক আছে বাবা, এখন তুমি যাও, কাজ করগে।'

পরদিন সকালে টনি রুমারকে প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম। মালভূমি থেকে নামার সময় সারাটা রাস্তায় গলা ছেড়ে গান গাইছি, ফোর্ড পিকআপের বিচিত্র হর্ন বাজিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দ্বীপবাসী মেয়েদের। পাইন অ্যাপেলের মাঠে কাজ করছে তারা। পরিচিত পিপ্ পিপ্ পিপ্, পিপ্-পিপ্ পিপ্ কানে যেতেই সিধে হয়ে তাকাচ্ছে সবাই, চওড়া স্ট্র হ্যাটের কার্নিসের নিচে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে চেহারাগুলো, হাত নাড়ছে তারা।

রামাদীন'স ট্র্যাভেল এজেন্সিতে এসে রুমারের আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্র্যাভেলার্স চেকটা ভাঙালাম। বরাবরের মত এবারও

বিনিময়ের হার নিয়ে দরকষাকষি করতে হল রামাদীনের সাথে। ঢ্যাঙা রামাদীনের শরীরের কোথাও মাংসের কোন খবর নেই, তালগাছের মত ছয় ফুট লম্বা সে। উদ্যোগী পুরুষ, সম্ভাব্য সব ব্যবসার সাথে জড়িত রাখে নিজেকে। লোকটা ভারতীয়, ব্যবসা করতে এসে চিরস্থায়ী হয়ে গেছে দ্বীপে। যখন ঢুকলাম দেখি চামড়ার ব্যাগ হাতে রোগী দেখতে যাবার তোড়জোড় করছে সে। ক্যামেরাম্যান এখন কবিরাজের ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে।

গত তিন বছর ধরে রামাদীনই সমস্ত চার্টার পার্টি জোগাড় করে দিচ্ছে আমাকে। প্রতিবারের মত ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে দশ পার্সেন্ট কেটে নিল সে। দ্বীপের একমাত্র ইনশিওরেন্স এজেন্সির মালিকও সে, এই সুযোগে জলকুমারীর বীমা বাবদ বাৎসরিক প্রিমিয়ামের টাকাটাও কেটে নিতে ভুল করল না। মোট তিনবার গুণে বাকি টাকা ফেরত দিল আমাকে। স্টীল রিমের চশমা পরা লোকটাকে নিরীহ, ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না বলে মনে হলেও বই-পুস্তকে যত রকম ছলচাতুরীর কথা লেখা আছে তার সবগুলো জানা আছে তার, অতিরিক্ত আরও দু'একটার কথা জানে সে যেগুলো এখনও লেখা হয়নি কোথাও। তাই সতর্কতার সাথে নিজেও একবার গুনলাম টাকাগুলো।

চোখেমুখে পিতৃসুলভ সস্নেহ ভাব ফুটিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে রামাদীন। আমি টাকা গোনা শেষ করতেই মৃদু উপদেশের সুরে স্মরণ করিয়ে দিল সে, 'কাল আরেকটা চার্টার পার্টি আসছে, মনে আছে তো, মিস্টার?'

'আছে,' বললাম আমি। 'চিন্তা করবেন না, আমার ক্রুরা সবাই সুস্থ থাকবে।'

'এরই মধ্যে লর্ড নেলসনে পৌঁছে গেছে ওরা,' একটু গম্ভীর হল রামাদীন, আমার ভাল-মন্দ সম্পর্কে কত যেন মাথাব্যথা তার! 'ল্যাম্পনি এরই মধ্যে পৌনে এক ডজন মেয়েকে ডেকে নিয়ে গেছে...' দ্বীপের কোথায় কখন কি ঘটছে তার নিখুঁত খবর রাখে

রামাদীন।

'তাতে হয়েছে কি?' বললাম আমি। 'একটু মদ খেলে বা মেয়েদের নিয়ে একটু আড্ডা মারলে কাল সকালের মধ্যেই মারা যাবে না ওরা।'

কথা বাড়াবার আর সাহস হল না রামাদীনের, নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে সে। জিলেট ল্যাম্পনি আর ফিলিপ রডরিক, এই দু'জন সম্পর্কে কোনরকম বিরূপ মন্তব্য সহ্য করতে পারি না আমি। দ্বীপে এমন বেশ কিছু লোকজন পাওয়া যাবে যারা ওদের বিরুদ্ধে আমার মন বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে আমার হাতেই উত্তম-মধ্যম খেয়ে দু'চারদিন করে হাসপাতালে কাটিয়ে এসেছে। এসব অজানা থাকার কথা নয় রামাদীনের।

ড্রেক স্ট্রীট পেরিয়ে এডওয়ার্ড স্টোরে এলাম। দোকানের পিছনের গলিতে লাইন দিয়ে হৈ-চৈ করছে পঁচিশ-ত্রিশটা কালো মাণিক, শুনতে পেলাম। আমাকে অভিনন্দন জানানর জন্যে মা এডি তার তিন মেয়ে এবং তাদের এক ডজন বান্ধবীদের নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে বৃদ্ধা নিজে বেরিয়ে এল কাউন্টারের এপারে। মাথার পিছনে হাত দিয়ে টেনে নিল নিজের বিশাল দুই স্তনের মাঝখানে। কোমল মাংসে নাক ডুবে গেল আমার, দম আটকে এল। তারপর ছেড়ে দিয়ে বুড়ি সহাস্যে জানাল, 'মেয়েদের হাত ধরে তোর মাছ দেখতে গিয়েছিলাম।' হাত ধরে দরজার কাছ থেকে কাউন্টারের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা টুলে বসিয়ে দিল আমাকে। 'শেলী, বাছাকে ঠাণ্ডা এক ক্যান বিয়ার দাও জলদি।'

'ইয়েস, মিসাস!' কর্মচারী মেয়েটা লাফ দিয়ে ছুটল।

মানিব্যাগ থেকে টাকার বাণ্ডিল বের করলাম আমি। এক ঝাঁক মুরগীর বাচ্চার মত কিচির মিচির করে উঠল মেয়েরা। চোখ বিস্ফারিত করে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মা এডি। 'দু'হাতে টাকা কামাও, বাবা। দিনে দিনে উন্নতি কর তুমি...'

আশীর্বাদ করছে বুড়ি।

দোকানের পিছনের গলি থেকে টুঁ-শব্দটি আসছে না এখন আর। কালো মাণিকের দল কিভাবে যেন টের পেয়ে গেছে আমার উপস্থিতি।

'কত পাওনা হয়েছে, মিসাস এড?' জুন থেকে নভেম্বর, এই ছয় মাস মাছ পাওয়া যায় না, ফলে এক পয়সা রোজগার করি না আমি-এই বিপদের সময়টা যখন যা দরকার হয় সব বাকিতে দিয়ে সাহায্য করে আমাকে মা এডি।

হিসাবের খাতাটা টেনে নিয়ে যোগফলটা শুধু দেখলাম, তার নিচে ত্রিশ জোড়া রাবারের জুতো, সুতি কাপড়ের শার্ট ও হাফ প্যান্ট এবং ত্রিশ প্যাকেট চকলেটের দাম লিখে মোট পাওনা যা দাঁড়াল তার চেয়ে কিছু বেশি টাকা জমা রাখলাম।

বিয়ারের ক্যান হাতে শেলফের দিকে তাকিয়ে জিনিসপত্র বাছাই করছি, মই বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে মেয়েরা সেগুলো পেড়ে আনার জন্যে। মিনি স্কার্ট পরা নিগ্রো মেয়েদের পা আর মাংসল ঊরু বারবার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে...থুড়ি!

দ্বীপের তৈরি সরু একটা চুরুট ধরিয়ে মা এডির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বেরিয়ে আসার সময় শুনতে পেলাম অদম্য খুশি আর আনন্দে আবার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে কালো মাণিকের দল। সোজা শেল কোম্পানি বেসিনে এসে ম্যানেজারের সাথে দেখা করলাম। বিশাল সব সিলভার ফুয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্কের মাঝখানে তার অফিস।

'মি. রানা,' আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ম্যানেজার। 'বসুন। সকাল থেকে অপেক্ষা করছি আপনার জন্যে। আপনার বিলের ব্যাপারে হেড অফিস এমন কান্নাকাটি শুরু করেছে...'

'এবার ওদেরকে হাসতে বলুন,' জলকুমারীর ফুয়েল বাবদ সব পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বললাম। কিন্তু জলকুমারী সুন্দরী নারীর

মতই, বড় বেশি খরচ ওর পেছনে-শেল কোম্পানি থেকে বেরিয়ে এসে পিকআপে ওঠার সময় পকেটটা অনেক হালকা মনে হল আমার।

লর্ড নেলসনের বিয়ার গার্ডেনে অপেক্ষা করছে ওরা। ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির ক্রু এবং অফিসারদের জন্যেই বিশেষ করে চালু করা হয়েছিল এই বার অ্যাণ্ড রেস্তোরাঁ। তখন এখানে স্থানীয় দ্বীপবাসীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। দ্বীপটা স্বাধীন হওয়ার পর বদলে গেছে সবকিছু। কিন্তু দুশো বছরের ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও ব্রিটিশ ফ্লীটের একটা স্টেশন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেন্ট মেরী। রয়্যাল নেভি তাদের স্টেশন প্রত্যাহার করেনি বলে দ্বীপবাসীরা গর্বিত। গ্র্যাণ্ড হারবারে প্রতিদিনই দু'একটা যুদ্ধ জাহাজ, রসদবাহী জাহাজ এবং ফুয়েল ট্যাঙ্কার নোঙর ফেলছে। সেই সাথে আনাগোনা করছে নানান দেশের বাণিজ্যিক জাহাজ, গভীর মসুদ্রে চলছে চোরাকারবারীদের মহোৎসব। এবং এসপিওনাজের জটিল নেটওঅর্ক।

হারবারের উপরে হেডল্যাণ্ডে কংক্রিটের তৈরি হিলটনের চেয়ে লর্ড নেলসনে আড্ডা মেরে অনেক বেশি আনন্দ পাই আমি। ছায়া সুশীতল বাগানে বসে যতই হুল্লোড় কর, গান ধর, মদ খাও-কেউ তাকিয়েও দেখে না। অবশ্য রাত যখন গভীর হয়, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হিলটনে প্রায়ই যেতে হয় আমাকে।

বাগানের পাঁচিল ঘেঁষে একটা বেঞ্চিতে গা ঠেকিয়ে বসে আছে বেগমকে নিয়ে রডরিক। দু'জনেই আজ তাদের বিয়ের পুরানো পোশাক পরে এসেছে। শুধু এই পোশাক যখন পরে ওরা তখনই দু'জনকে আলাদা ভাবে সহজে চিনতে পারা যায়। রডরিকের থ্রি-পীস স্যুটের একটা বোতাম নেই, বাকিগুলোর কিনারা ভেঙে গেছে। তার মাথার ডীপ-সী ক্যাপটা শুকনো রক্ত আর স্বচ্ছ লবণের গুঁড়োয় নোংরা হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই। বেগম রডরিকের পরনে আজানুলম্বিত ভারী কালো, উলের পোশাক,

কালের ছোঁয়ায় রঙ সবুজ হয়ে এসেছে, পায়ে গোড়ালি ঢাকা বোতাম আঁটা চামড়ার ভারী জুতো। এই পোশাক ছাড়া চেহারা, ওজন, শারীরিক কাঠামো এবং রঙ কোথাও দু'জনের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে সব সময় ক্লিন শেভ হয়ে থাকে রডরিক, কিন্তু বেগমের নাকের নিচে গোঁফের পাতলা রেখাটা কারও চোখে না পড়ে উপায় নেই।

'হ্যালো, মিসাস রডরিক, কেমন আছ?' বললাম আমি।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার রানা,' সংক্ষেপে বলল বেগম রডরিক। ছেলেমানুষকে লাই দিলে মাথায় চড়ে বসবে, তাছাড়া আমি যেহেতু একাধারে তার স্বামীর বস্ এবং বন্ধু, তাই খুব কম কথা বলে সে আমার সাথে। তার একমাত্র দুশ্চিন্তা স্বামীর পাওনা টাকাটা আমার কাছ থেকে উদ্ধার করে কিভাবে কোথায় লুকিয়ে রাখবে। এ ব্যাপারে তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতা দিই আমি। জানি, বউ যদি একটু ঢিল দেয় সব টাকা মদ খেয়ে ওড়াবে রডরিক।

'বল, কি আনাব তোমার জন্যে,' জানতে চাইলাম।

'সামান্য একটু অরেঞ্জ জিন হলেই চলবে, মিস্টার রানা।'

চুপ করে বসে আছে রডরিক, স্থির উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে আছে তার পেশী। আমার হাত থেকে টাকা নিয়ে গুনছে বেগম, নিঃশব্দে নড়ছে তার পুরু ঠোঁট জোড়া। আমার সাথে চোখাচোখি হতে ঢোক গিলল রডরিক, আবেদনের দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে। আজ আবার সবিস্ময়ে ভাবলাম, বউ এত সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধরে কিভাবে রডরিক তাকে বোনাসের টাকাটা ফাঁকি দিচ্ছে। ব্যাপারটা বেগমের তরফ থেকে ইচ্ছাকৃত প্রশ্রয় নয় তো!

গোঁফ ভিজিয়ে গ্লাসে শেষ চুমুক দিল বেগম রডরিক, বহু কষ্টে বিশাল শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'এবার তাহলে আমি আসি, মিস্টার রানা। আবার দেখা হবে।'

বাগান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে থপ থপ পায়ের শব্দ তুলে বেগম রডরিক, বয়-বেয়ারারা সসম্ভ্রমে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে তাকে। অন্য কোন কারণে নয়, তার প্রকাণ্ড শরীরটাই সম্মান কেড়ে নেয় মানুষের। বেগম অদৃশ্য হয়ে যেতেই টেবিলের তলা দিয়ে বোনাসের টাকাটা রডরিককে দিলাম আমি। খুশিতে ঝকমক করে উঠল দৈত্যের দু'চোখ। দু'জন একসাথে চললাম প্রাইভেট বারের দিকে।

দু'পাশে দু'জন এবং কোলের উপর একটি মেয়েকে নিয়ে বসে আছে জিলেট ল্যাম্পনি। নাভির কাছে বেল্ট পর্যন্ত খোলা টকটকে লাল সিল্কের শার্ট পরে আছে সে, বুকের চকচকে পেশী দেখা যাচ্ছে তার। টাইট ফিটিং প্যান্টটা কামড়ে ধরে আছে শরীরের চামড়া, তার যে পুরুষাঙ্গ আছে সে-ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেনি। পায়ের বুট জোড়া সদ্য পালিশ করা, আয়নার মত ঝকঝক করছে। উদার হস্তে নারকেল তেল ঢেলেছে মাথায়, তারপর ব্যাকব্রাশ করেছে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চের মত উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে গোটা কামরা উদ্ভাসিত করে রেখেছে সে। আমি তাকে তার পাওনা মিটিয়ে দিতেই প্রত্যেক মেয়ের ব্লাউজের সামনের দিকে একটা করে ব্যাঙ্ক নোট পিন দিয়ে আটকে দিল সে।

'হেই, লিজা,' ব্যস্ততার সাথে বলল সে, 'কানী, দেখতে পাচ্ছিস না, শালা মনিব এসে হাজির হয়েছে! যাও ছুকরী, বসের কোলে গিয়ে আস্তানা গাড়ো, ওকে খুশি করো। কিন্তু সাবধান! বস্ শালা এখনও একটা ভার্জিন, বুঝে-সমঝে নাড়াচাড়া করবি ওকে, বুঝলি!' হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ করে হাসতে শুরু করল সে, তারপর ফিরল রডরিকের দিকে। 'অ্যাই শালা, রডরিক, তোর এই ফিক ফিক হাসি থামালি তুই!'

হাসছিল তো না-ই, ভুরু আরও কুঁচকে গিয়ে চারপাশের ফুলে ওঠা মাংসে চোখ দুটো প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল রডরিকের।

মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে চেহারাটা এক নিমেষে ঠিক বুলডগের মত কদাকার এবং বীভৎস হয়ে উঠল।

'উফ! ভয়ে মরে যাই!' তাচ্ছিল্যের সাথে মুখ ভেঙচাল ওকে ল্যাম্পনি। 'ওই বুলডগ সেজেই থাক্, আমার গায়ে হাত তুলবি সে-সাহস তোর কোনদিনই হবে না। রানা যতক্ষণ...'

'মাসুদ যখন না থাকে?' কর্কশ গলায় দ্রুত জানতে চাইল রডরিক।

জোঁকের মুখে লবণ পড়ল যেন, নিমেষে শান্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করল ল্যাম্পনি। 'হ্যাঁ, তখনকার কথা আলাদা।'

'এখন তাহলে আয় মদ খেয়ে হুল্লোড় করি?'

'উত্তম প্রস্তাব,' গম্ভীর ভাবে বলল ল্যাম্পনি। এই প্রথম সরাসরি তাকাল আমার দিকে। আন্তরিক সমীহের সাথে জানতে চাইল, 'তুমি কি বলো, শালা বস্?'

ভুরু কুঁচকে চিন্তান্বিত ভঙ্গিতে বললাম, 'মদ? হ্যাঁ, তা তো খেতেই হবে। মদ খেতে না পারলে আজ আমি মরেই যাব।'

ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল বারম্যান। কাউন্টারে ট্রে সাজানো হয়ে গেছে অনেক আগেই। তার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে বেয়ারা ছুটোছুটি করে পরিবেশন শুরু করল।

বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দেদার চালিয়ে গেলাম আমরা।

কেউ কারও চেয়ে কম খাইনি, কিন্তু তিনজনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে তিন রকম। টেবিলের উপর উঠে পদ্মাসনে বসে গেছে ল্যাম্পনি, সামনে মদের গ্লাস, তার পাশে ফেলে রেখেছে ক্ষুরের মত ধারালো বেইট নাইফটা, মাথা নিচু করে বিড় বিড় করে প্রলাপ বকছে। খানিক পর পরই বুড়ো আঙুল দিয়ে ছুরির ধার পরীক্ষা করছে সে, তারপর ঝট করে মুখ তুলে আক্রমণাত্মক, হিংস্র ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে কামরার চারদিকে। দেখছে, কেউ তার দিকে কোন নজর দিচ্ছে কি না।

আমার পাশের একটা চেয়ারে বসে আছে রডরিক। চুপচাপ

হাসছে সে। ঝকঝকে সাদা দাঁত আর গোলাপী রঙের মাড়ি দেখা যাচ্ছে তার।

সরু চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছি আমি, ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে লক্ষ করছি দু'জনকে।

'মাসুদ,' মুখটা আমার মুখের কাছে সরিয়ে এনে চোখে চোখ রাখল রডরিক। ঢুলু ঢুলু চোখ দুটো নিমেষে স্বাভাবিক হয়ে এল তার। নেশার চিহ্নমাত্র নেই এখন তার দৃষ্টিতে। ব্যাকুল ভাবে কি যেন খুঁজছে সে আমার চোখে। দশ সের ওজনের পেশীবহুল একটা হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। 'ইউ আর এ গুড বয়, মাসুদ। একটা কথা বলব বলব করে কক্ষনো কোনও দিন তোমাকে বলা হয়নি।' একটু থেমে নিজেকে গুছিয়ে নিল রডরিক। অদ্ভুত একটা মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার চোখে। প্রত্যেক বেতনের দিন এই কথাটা বলে সে আমাকে। 'মাসুদ, আই লাভ ইউ, ম্যান। আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসি আমি তোমাকে!'

শুকনো রক্ত আর লবণের গুঁড়ো মাখা নোংরা ক্যাপটা তুলে রডরিকের খয়েরী রঙের কামানো মাথার গম্বুজে ছোট্ট একটা চাঁটি দিলাম আমি। বরাবর যা বলে থাকি তাই বললাম, 'আমিও।'

মুখটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পাঁচ সেকেণ্ড ধরে ভাল করে নিরীক্ষণ করল আমাকে রডরিক, সত্যি বলছি কিনা বোঝার চেষ্টা করছে যেন। ধীরে ধীরে দুই কানে গিয়ে ঠেকল হাসি। অর্থাৎ, বিশ্বাস করে ও আমাকে।

আরও দুই পেগের অর্ডার দিলাম, এই সময় বারে ঢুকল গোখলে রামাদীন। সরাসরি এগিয়ে এসে আমাদের টেবিলে বসল সে। স্টীল রিমের চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে ফ্রেমের উপর দিয়ে আমার দিকে তাকাল। হাসলাম। বলল, 'মিস্টার রানা, লণ্ডন থেকে এইমাত্র জরুরী একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি আমি। আপনার চার্টার বাতিল হয়ে গেছে।'

ধীরে ধীরে হাসিটা মুছে গেল আমার মুখ থেকে। দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল মনটা। গোটা মওসুমে একটামাত্র পার্টি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে নাকি? পকেটে বড় জোর আর তিনশো ডলার আছে, সারাটা বছর চলব কিভাবে? এই এলাকার দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মেজর জেনারেল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন খরচের টাকা সব আমাকেই জোগাড় করে নিতে হবে। ক্যামোফ্লেজের নিরাপত্তার জন্যেই প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনরকম ব্যক্তিগত আদানপ্রদান বা যোগাযোগ করা চলবে না। হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়্যারলেস সেটটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে শুধুমাত্র অফিশিয়াল ইনফরমেশন পাঠানর কাজে ব্যবহার করা যাবে।

'যেভাবে হোক নতুন একটা পার্টি ধরুন,' বললাম আমি।

ছুরিটা তুলে নিয়ে ঘ্যাচ করে টেবিলের উপর গাঁথল সেটা ল্যাম্পনি। কেউ তার দিকে কোন খেয়াল দিল না। আবার সে হিংস্র ভঙ্গিতে কামরার চারদিকে তাকাচ্ছে।

'হে, হে-,' সবিনয়ে হাসল রামাদীন। তারপর বলল, 'আমার তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু বোঝেনই তো, মওসুম প্রায় শেষ হতে চলেছে কিনা...'

'যাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাদের টেলিগ্রাম করুন,' বললাম ওকে।

কালক্ষেপ না করে দ্রুত জানতে চাইল রামাদীন, 'টেলিগ্রামের টাকাটা কে দেবে?'

চোখ গরম করে রামাদীনের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠে চেয়ারের পিঠের সাথে সেঁটে গেল হাড়সর্বস্ব লোকটা। 'ঠিক আছে,' বললাম, 'আমিই দেব।'

হে-হে করে হেসে দ্রুত কেটে পড়ল রামাদীন।

'মন খারাপ কোরো না,' চোখ মটকে বলল রডরিক। 'স্টিল আই লাভ ইউ, ম্যান।'

পিছু হটে ধপ করে আমার পাশের চেয়ারে পড়ল ল্যাম্পনি।

ব্যাপারটা লক্ষ করে ব্যস্ত হাতে টেবিল থেকে বোতল আর গ্লাসগুলো একপাশে সরিয়ে নিল রডরিক। 'ধন্যবাদ,' ঢুলু ঢুলু চোখে রডরিকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ল্যাম্পনি, তারপর টেবিলে মাথা নামিয়ে চোখ বুজল সে, এবং সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল। চারদিক থেকে শকুনির মত এগিয়ে আসছে মেয়েরা, তাই দেখে ল্যাম্পনির পকেট থেকে বেতনের টাকাটা বের করে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলাম আমি।

আরেক প্রস্থ মদের অর্ডার দিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় একটা গান ধরল রডরিক। পিঠ, কোমর, কাঁধ, মাথা-সুরের সাথে বিচিত্র বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে আন্দোলিত হচ্ছে। এদিকে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছি আমি।

পার্টি পাওয়া না গেলে আবার বোট নিয়ে নাইট ডিউটিতে যেতে হবে আমাকে। প্রথম দিকে চোরাচালানের এই ঝুঁকিবহুল পথে ইনফরমেশন জোগাড়ের আশায় যেতে হত। উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্যে তালে তাল মিলিয়ে কিছু ব্যবসাও করতে হত আমাকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কাজ হাসিলের পদ্ধতি পানির মত সহজ করে নিয়েছিলাম আমি। এখন আর নিশুতি রাতে নাইট ডিউটিতে গিয়ে ইনফরমেশন সংগ্রহ করতে হয় না, এই দ্বীপে বসেই কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে সব জানতে পাবার নিখুঁত ব্যবস্থা করে নিয়েছি। এতে অবশ্য কিছু খরচ হয়, কিন্তু নির্ভেজাল এবং গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনের তুলনায় তা খুবই নগণ্য।

পার্টি পাওয়া না গেলে তাই যাব, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিয়ে মনটাকে শান্ত করলাম। মাসুদ রানা নাইট ডিউটিতে যেতে চায়, কথাটা তাহলে প্রচার করে দিতে হবে আগ্রহী লোকদের মধ্যে।

আরও একটা চুরুট ধরিয়ে রডরিকের সাথে গান ধরলাম। কিন্তু একটু পর সন্দেহ হল দু'জনে একই গান গাইছি কিনা। প্রতিটি বিরতিতে রডরিকের আগেই পৌঁছে যাচ্ছি আমি।

সম্ভবত দ্বৈত-সঙ্গীতের মধুর আকর্ষণেই বারে এসে ঢুকল স্বয়ং

আইন। সেন্ট মেরীতে আইন বলতে বোঝায় একজন ইন্সপেক্টর এবং চারজন ট্রুপার। দ্বীপের প্রয়োজনের তুলনায় বাহিনীটাকে বড়ই বলতে হবে। গত তিন বছর বউ-পিটুনির কদাচ দু'একটা ঘটনা ছাড়া আর কোন অপরাধ আজ পর্যন্ত ঘটেনি।

ইন্সপেক্টর পিটার টালি একজন ব্রিটিশ, আরও পাঁচ বছরের চুক্তিতে দ্বীপের পুলিস বাহিনী-প্রধানের চাকরিতে রয়ে গেছে। আগামী বছর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে তার। দ্বীপের নাগরিক সাব-ইন্সপেক্টরকে সবাই ইন্সপেক্টর হিসেবে চায়, তাই পিটার টালির চুক্তির মেয়াদ বাড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সেটা বুঝতে পেরেই সম্ভবত গোলমাল আর অপরাধের গন্ধ খুঁজে বেড়ায় সে ডালকুত্তার মত, এবং কোথাও তেমন কিছু ঘটতে দেখলে কড়া শাসনের স্বাক্ষর রাখার চেষ্টা করে, যাতে সে চলে যাবার পরও দ্বীপবাসীরা সহজে তাকে ভুলে যেতে না পারে।

ইন্সপেক্টর পিটার টালির মুখটা লাল, ঠোঁটের উপর কালো রঙের চিকন গোঁফ, পরনে গাঢ় সবুজ রঙের ইউনিফর্ম। সিলভারের ব্যাজ লাগানো ক্যাপের কার্নিসটা অস্বাভাবিক চওড়া। তার হাতের আঠারো ইঞ্চি লম্বা ছড়িটার হাতল পালিশ করা চামড়া দিয়ে মোড়া। ইউনিফর্মের গায়ে বুকের দু'দিকে, দশটা করে পদক এবং মেডেল ঝুলছে। এগুলো সে পেয়েছে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে, দ্বীপে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি এই রিপোর্ট লিখে।

'মি. রানা,' টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে অপর হাতের তালুতে ছড়ির হালকা বাড়ি মারছে ইন্সপেক্টর টালি। 'আমি চাই না, আজ রাতে দ্বীপে কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হোক।'

'মি. রানা, স্যার...' কিভাবে আমাকে সম্বোধন করতে হবে বলে দিলাম আমি। লোকটাকে দু'চোখে দেখতে পারি না। প্রতিটি জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ঘুষ খায় সে। সুযোগ পেলে আমার কাছ থেকেও খেতে ছাড়ে না।

মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের। কিন্তু রাগ চেপে রেখে আবৃত্তি করল সে, 'মি. রানা, স্যার।'

'ইন্সপেক্টর, এখানে আমরা কেউ মারামারি করছি না, ঠিক?'

'হ্যাঁ...তা করছেন না।'

'প্রকাশ্যে মধুর কণ্ঠে গান গাওয়া অপরাধ নয়, ঠিক?' আবার জানতে চাইলাম আমি।

'হ্যাঁ...কিন্তু...'

দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলাম টেবিলের উপর। 'তাহলে এখনও আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান, কেটে পড়ুন...'

আমার দেখাদেখি রডরিকও টেবিলের উপর ঘুসি তুলছে দেখে তার হাত ধরে ফেললাম বাধা দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললাম, 'এটা কারও মাথা নয়, বোকা। ভেঙে লাভ কি?'

একটা গোলমাল পাকাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি আমরা, বুঝতে পেরে সাবধান হয়ে গেল ইন্সপেক্টর টালি। কাঙাল যেভাবে তার ছেঁড়া কম্বল আঁকড়ে ধরে সেভাবে নিজের সম্মানটুকু আঁকড়ে ধরে পিছিয়ে গেল সে, বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার ওপর নজর রাখছি আজ থেকে।' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, হন হন করে বেরিয়ে গেল বার থেকে।

খানিক পর দরজায় আবার গোখলে রামাদীনকে দেখে আরেক প্রস্থ পানীয়ের অর্ডার দিল রডরিক।

'মিস্টার রানা, আপনার জন্যে একটা পার্টি পেয়েছি আমি।'

'মিস্টার রামাদীন,' বলল রডরিক, 'আমরা তোমাকে ভালবাসি।'

কিন্তু নাইট ডিউটিতে যাবার আর দরকার হবে না বুঝতে পেরে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল আমার। নাইট ডিউটিতে বিপদের ঝুঁকি আছে পুরোমাত্রায়, সেটুকু উপভোগ করে মজা পাই। 'কখন আসছে ওরা?'

‘এসে গেছে। অফিসে ফিরে দেখি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা,’ বলল রামাদীন। ‘একটা পার্টির পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে এ-খবর জানে ওরা। আপনার নামটাও ওদের অজানা নয়। টেলিগ্রাফের সাথে ওরা বোধহয় একই প্লেনে এসেছে।’

অজ্ঞাত কারণে একটা পার্টি পিছিয়ে গেল, তার বদলে অন্য একটা পার্টি ঠিক সময়ে সরাসরি এসে হাজির, এর মধ্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে-কিন্তু অন্যমনস্ক ছিলাম বলে এ নিয়ে কিছুই ভাবলাম না তখন।

‘হিলটনে উঠেছে ওরা,’ বলল রামাদীন।

‘ওদেরকে তুলে আনতে হবে?’

‘না। কাল সকাল দশটায় অ্যাডমিরালটিতে আপনার সাথে দেখা করবে ওরা।’

তিন

ফ্লাইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে পড়েছি। চোখে গাঢ় রঙের পোলারয়েড গ্লাস, জেটির উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে ড্রেক স্ট্রীটের দিকে। অবিরাম ছল-ছল-ছলাৎ বাজছে কানে, শন্ শন্ করছে বাতাস। মাঝরাত পর্যন্ত মদ খেয়েছি, নেশার ঘোরটা পুরোপুরি কাটেনি এখনও।

ফোরডেকে দাঁড়িয়ে হাত চালিয়ে কাজ করছে ওরা, একই সাথে চলছে তুমুল ঝগড়া। দড়ির জট ছাড়িয়ে গুছিয়ে রাখছে রডরিক, দরদর করে ঘামছে সে-ঘাম তো নয়, যেন নির্ভেজাল অ্যালকোহল বেরিয়ে আসছে তার লোমকূপ থেকে। আর একহারা চেহারার ল্যাম্পনি রড ধরে হাঁটার সময় টলছে।

‘বস্ শালা দ্বীপে আসতেই না তোর কপাল খুলল,’ রডরিককে

বলছে ল্যাম্পনি। ‘তার আগে তুই কি করতিস সবার জানা আছে। মদ খেয়ে গরুর লাদার মত যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতিস বছরের মধ্যে নয় মাস। তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য যে বস্ শালা ক্রু হিসেবে তোকে চাকরি দিল, তা নাহলে আজও তুই...’

একটা হোয়েল বোট ছিল রডরিকের, আজ সেটা কোন কাজেই লাগে না, মওসুমের সময় ওই হোয়েল বোট নিয়ে মাছ শিকার করত সে। গোটা ভারত মহাসাগরে ওর মত দক্ষ শিকারী আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ। দুই মাসে যা মাছ ধরত, সারা বছরের খোরাকি আর মদের দাম উঠতে চাইত না, ধারে ডুবে থাকত সে বাকি দশটা মাস। ল্যাম্পনি বাজে কথা বলছে না, চব্বিশ ঘন্টা মদ খেয়ে টং হয়ে থাকত সে। শিকারী হিসাবে ওর নাম শুনেই ওকে আমি চাকরি দিই জলকুমারীতে। সেই থেকে রয়ে গেছে আমার সাথে।

‘আর তুই?’ হুঙ্কার ছেড়ে বলল রডরিক। ‘ছোকরাদের হাতে মার খেয়ে তো মরেই যাচ্ছিলি! ঠিক সেই সময় মাসুদ যদি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ত, কাক শকুনের খাবার হয়ে যেতিস। তোরও চোদ্দপুরুষের ভাগ্য যে মাসুদ তোর মত একজন বখাটেকে চাকরি দিয়েছিল, তা নাহলে রঙবাজি করতে গিয়ে অ্যাদ্দিন কবে মার খেয়ে মরে যেতিস।’

সাংঘাতিক ডানপিটে ছিল ল্যাম্পনি। রোগাপটকা হলে কি হবে, বেজায় সাহস ছিল ওর। হুমকি দিয়ে সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলত। ছোকরা মেয়ে পটাতে ওস্তাদ, মেয়েরা ওকে ভালও বাসে। বোধহয় ডানপিটে বলেই। আমি দ্বীপে আসার আগে কোন কাজ করত না সে, দ্বীপবাসিনী মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি আর পকেট খরচের জন্যে চোখ রাঙিয়ে চাঁদা তোলা ছাড়া। চাকরির প্রস্তাব পেয়ে স্পষ্টভাবে আমাকে বলেছিল, ‘তুমি শালা কোথাকার বোকা মাল হে? জীবনে একটা কুটো পর্যন্ত নাড়িনি, কাজ কাকে বলে তাই জানি না-এমন লোককে চাকরি দিতে চাও কোন্ আক্কেলে?’

কিন্তু কাজ শিখে নিতে তিন মাসের বেশি সময় লাগেনি ল্যাম্পনির। এখন ও দক্ষ একজন ক্রু, যে-কোন বোট মালিক ওকে লুফে নেবে। আগের চেয়ে অনেক বদলেছে ও, কিন্তু শালা সম্বোধনটা ছাড়তে পারেনি। আমার প্রতি আন্তরিকতারই একটা বহিঃপ্রকাশ এটা, আমি যে কিছু মনে করি না এতে-সেটা আবার ঠিক বুঝতে পারে ও।

'এবার তোমরা থামো,' বললাম ওদেরকে। দেখতে পাচ্ছি, ড্রেক স্ট্রীট কাঁপিয়ে দ্বীপের একমাত্র ট্যাক্সিটা ছুটে আসছে এদিকে।

রাস্তার শেষ মাথায় এসে থামল ট্যাক্সি। আমার পার্টি নামছে। দু'জন লোক। ভুরু কুঁচকে ভাবলাম, দু'জন কেন? তিনজনের কথা বলেছিল রামাদীন।

কংক্রিটের চওড়া বাঁধের উপর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে আসছে ওরা। রেলিং থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়ালাম আমি। তলপেটের ভিতরে মৃদু একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করছি। নেশার ভাবটা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। একজন প্রায় আমার মতই লম্বা, প্রফেশনাল অ্যাথলেটের মত সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে। মাথাটা খালি, ব্যাকব্রাশ করা ছাই রঙা চুলের মাঝখানে গোল চাকতির মত অকালে টাক পড়েছে, ম্লান গোলাপী রঙের খুলি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ওজনে আমার চেয়ে কিছু বেশি হবে, তবে কোমর এবং নিতম্ব সরু। আশ্চর্য একটা হুঁশিয়ার ভাব রয়েছে লোকটার মধ্যে। দেখলেই চেনা যায় এই জাতের লোকদের। শক্তি আর ভয় দেখে এবং দেখিয়ে বেঁচে থাকার ট্রেনিং রয়েছে এর। লোকটা আইনের পক্ষে না বিপক্ষে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা, যে কোন ভদ্রলোকের জন্যে সে একটা সাংঘাতিক দুঃসংবাদ। সেন্ট মেরীর সুশান্ত পানিতে এই জাতের হিংস্র ব্যারাকুডা আশা করিনি আমি। দ্রুত অন্য লোকটার দিকে তাকালাম। এ-ও একই জাতের, তবে এর ধার কমে গেছে,

চর্বি আর মাংস জমে ভোঁতা হয়ে গেছে কিনারাগুলো, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারলাম-আরও একটা দুঃসংবাদ।

বয়স্ক লোকটাই লিডার, বুঝতে পারছি। লম্বা লোকটা সম্মান দেখিয়ে এক পা পিছিয়ে আছে তার চেয়ে। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে বয়স, বেল্ট দিয়ে কষে বেঁধে ভুঁড়িটাকে দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে। পরনে দামি স্যুট। অনুমান করলাম গোল্ড রিঙে বসানো ডায়মণ্ডটা দুই ক্যারেটের কম হবে না। রিস্টওয়াচটাও সোনার।

জেটি ধরে এগিয়ে এসে ঠিক আমার নিচে দাঁড়াল লোকটা। মুখ তুলে দেখল। কিন্তু হাসল না। 'মাসুদ রানা?' কর্তৃত্বের সুরে জানতে চাইল সে।

লোকটার চুলের রেখার কাছে প্লাসটিক সার্জারীর ক্ষতটা চিনতে পারছি আমি। তার মানে এটা তার চুরি করা চেহারা, আসল চেহারাটা লুকিয়ে ফেলেছে। তথ্যটা মনে রাখলাম। এবং মুহূর্তে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝলাম, এক পার্টি পিছিয়ে গেল, সাথে সাথে আরেকটা পার্টি এগিয়ে এল-এটা কাকতালীয় ঘটনা নয়। মগজ এবং পেশীর এই জোড়া মাণিককে কেউ পাঠিয়েছে, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। এদের ফোন এবং তারপরই একটা সাক্ষাৎ পেলে যে-কোন সাধারণ শিকারীর মারলিন শিকার করার সাধ সারা জীবনের জন্যে মিটে যাবারই কথা। ঘটেছেও হয়ত ঠিক তাই। 'মি. ব্ল্যাঙ্ক?' বললাম আমি। 'উঠে আসুন।'

পরিষ্কার বুঝতে পারছি আর যাই হোক, মাছ ধরতে আসেনি এরা। এদের সাথে স্পোর্টসের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

লম্বা লোকটা লাফ দিল, বেড়ালের মত নিঃশব্দে নামল ডেকের উপর। কোটের প্রান্ত বাতাসে ঝাপটা খেল তার, ট্রাউজারের ফুলে থাকা পকেটটা দেখে ফেললাম, বুঝলাম খালি পকেটে আসেনি এরা। আমাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একদিকের নাক টানল সে, তারপর এগিয়ে আমার ক্রুদের সামনে দাঁড়াল। চিবুক তুলে মাথাটা একপাশ থেকে আরেক পাশে নিয়ে

যেতে যেতে দ্রুত চোখ বুলাল ওদের উপর।

ঠোঁট মুড়ে হেসে ক্যাপের কার্নিস ছুঁয়ে বলল ল্যাম্পনি, 'ওয়েলকাম, স্যার।' আর বিড়বিড় করে রডরিক যা বলল তা আন্তরিক অভ্যর্থনা হলেও শোনাল ভয়ঙ্কর অভিশাপের মত।

নীরব তাচ্ছিল্যের সাথে ক্রুদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল লোকটা। এগিয়ে গিয়ে ডেকে নামতে সাহায্য করল বসকে, তারপর কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করেই সোজা গিয়ে ঢুকল মেইন সেলুনে। একটু পর তাকে অনুসরণ করে ব্ল্যাঙ্কও ঢুকল সেখানে। ঠিক তার পিছনেই রয়েছি আমি।

জলকুমারীর বিলাসবহুল মেইন সেলুনে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ব্ল্যাঙ্ক। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে জোরে শ্বাস টানল সে, এয়ারকণ্ডিশনের শীতলতায় ভরে নিল বুক। গদিমোড়া আরাম কেদারায় গা ছেড়ে দিয়ে বডিগার্ডের পরিচয় জানাল আমাকে, 'মাইক প্যানথার।'

ঘাড় ফেরাল না প্যানথার, ওদের দিকে পিছন ফিরে পোর্টগুলো চেক করছে, দরজা খুলছে, অহেতুক এটা-সেটা নাড়াচাড়া করছে-তার হাত দুটো অত্যন্ত অস্থির, এটাই যেন প্রমাণ করতে চাইছে সে।

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. প্যানথার,' সুবোধ বালকের মাধুর্য ফুটে উঠল আমার নিঃশব্দ হাসিতে। কিন্তু আমার দিকে এবারও তাকাল না প্যানথার, শুধু বাতাসে হাত ঝাপটা দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল একবার। কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না সে আমাকে।

'ড্রিঙ্ক, জেন্টলমেন?' কেবিনেটের দরজা খুলে জানতে চাইলাম।

একটা করে কোক নিল ওরা। আমি নিলাম জিন। তারপর গৎ বাঁধা সুরে শুরু করলাম, 'এইটুকু বলতে পারি, আমার কাছে এসে আপনারা ভুল করেননি। এই তো মাত্র গতকালই আমি

প্রকাণ্ড একটা মারলিন ঝুলিয়েছি জেটিতে। বড় মাছের সমস্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, দারুণ স্পোর্টস হবে...'

দশ সেকেণ্ড একদৃষ্টিতে লক্ষ করল আমাকে প্যানথার, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। 'এর আগে কোথায় দেখেছি তোমাকে?'

'মানে?'

দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলল প্যানথার, 'মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি চিনি।'

'অসম্ভব কি?' কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'তবে সভ্য জগৎকে আমি অনেকদিন হল ডিভোর্স করেছি।'

হাসল না প্যানথার। আমার সামনের চেয়ারে ধীরে ধীরে বসল সে। দু'জনের মাঝখানে টেবিলের উপর হাত দুটো উপুড় করে রেখে ছড়িয়ে দিল আঙুলগুলো। সেই থেকে একই দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। এ বড় কঠিন পাত্র, বুঝতে পারছি আমি।

'আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে,' সরল হেসে বললাম। 'আমরা যদি মোজাম্বিক স্রোতে মাছ ধরতে চাই, সকাল ছ'টার আগে হারবার ত্যাগ করতে হবে। কাল ভোরে...'

'আগে এই তালিকাটা মিলিয়ে দেখ, রানা,' আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল ব্ল্যাঙ্ক, 'তারপর বলো কি কি নেই তোমার কাছে।'

ব্ল্যাঙ্কের হাত থেকে এক শীট ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিলাম আমি। বল পয়েন্ট দিয়ে লেখা তালিকার উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখি সবগুলো স্কুবা গিয়ার এবং স্যালভেজ ইকুইপমেন্ট। পানির নিচে থেকে কিছু উদ্ধার করতে চায় এরা, বুঝতে অসুবিধে হল না। 'আপনারা তাহলে মাছ ধরার ব্যাপারে আগ্রহী নন?' কৃত্রিম বিস্ময়ের সাথে বললাম আমি। 'সৌখিন স্যালভেজ...'

'হুঁম। শখ করে এক-আধটু তল্লাশি চালাতে এসেছি, তার বেশি কিছু না।'

'কিছু এসে যায় না,' কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'টাকার বিনিময়ে

যা করতে বলবেন করব আমরা।'
'তালিকার সব জিনিস তোমার আছে?'
'প্রায় সব আছে। কিন্তু এয়ার ব্যাগ আর অতো দড়ি নেই।'
'জোগাড় করো,' আদেশ করল ব্ল্যাঙ্ক।
মাথা কাত করে রাজি হলাম আমি, জানতে চাইলাম, 'কখন রওনা হতে চান?'
'কাল সকালে, আমাদের সাথে আরেকজন থাকবে।'
'পাঁচশো ডলার রোজ, রামাদীন নিশ্চয়ই বলেছে আপনাকে? ইকুইপমেন্টের জন্যে আলাদা ভাড়া।'
মাথা ঝাঁকিয়ে ব্ল্যাঙ্ক বোঝাতে চাইল এসব তার জানা আছে। সে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিলাম তাকে।
'টাকার একটু চেহারা দেখলে খুশি হতাম,' মৃদু গলায় বললাম আমি।
স্থির হয়ে গেল ব্ল্যাঙ্ক। যেন লজ্জা পেয়েছি, এই ভঙ্গিতে বললাম তাকে 'মওসুমটা তেমন সুবিধে হয়নি, তাই হাত খালি। অনেক কিছু কেনাকাটা করতে হবে, ফুয়েল ট্যাঙ্কগুলো ভরতে হবে...'
নিঃশব্দে মানিব্যাগ বের করল ব্ল্যাঙ্ক। পাঁচ পাউণ্ডের ষাটটা নোট গুনে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। বলল, 'তোমার ক্রুরা আমাদের সাথে যাচ্ছে না, রানা। বোট চালাতে আমরা তিনজন সাহায্য করব তোমাকে।'
চমকে উঠলাম। এটা আশা করিনি আমি। 'কিন্তু সাথে না নিলেও পারিশ্রমিক দিতে হবে ওদেরকে।'
এইবার কথা বলল মাইক প্যানথার। আমার দিকে ঝুঁকে এল সে, বলল, 'বসের কথা তোমার কানে গেছে, রানা। বজ্জাত নিগ্রোগুলোকে কাল সকালে এই বোটে যেন দেখতে না পাই।'
পাঁচ পাউণ্ড নোটের বাণ্ডিলটা সাবধানে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে বোতাম লাগিয়ে দিলাম আমি, তারপর মুখ তুলে তাকালাম

ওর দিকে। এই প্রথম তার ঠাণ্ডা, স্থির চোখে একটা ভাব দেখতে পাচ্ছি-পরিষ্কার প্রশংসার ভাব। নিজে সে সম্পূর্ণ তৈরি, এবং বুঝতে পেরেছে ওর বেয়াড়া আচরণের পাল্টা জবাব দেবার জন্যে আমিও তৈরি হয়ে গেছি। আমাকে এক হাত দেখিয়ে দিতে চাইছে ও, যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নাক-মুখ থেঁতলে দিয়ে সুখ পেতে চাইছে। টেবিলের উপর এখনও ফেলে রেখেছে হাত দুটো, তালু দুটো নিচের দিকে, আঙুলগুলো ছড়ানো। অনায়াসে ওর সবক'টা আঙুল এখুনি আমি মাঝখান থেকে মটমট করে ভেঙে দিতে পারি, সতর্ক হবার কোন সুযোগই পাবে না ও। বোটের মতই প্রাণাধিক প্রিয় আমার ক্রুরা। শুধু কর্মচারী নয়, ওদেরকে আমি বন্ধুর মর্যাদা দিই। কেউ ওদেরকে অপমান করে আজ পর্যন্ত রেহাই পায়নি আমার হাত থেকে। কিন্তু প্যানথারকে রেহাই দিলাম। ইচ্ছে করলেই আমি পঙ্গু করে দিতে পারি ওকে বুঝতে পেরে মনটা আমার খুশি হয়ে উঠল।
'অ্যাই ছোকরা, আমি কি বললাম কানে গেছে?' হিস হিস করে উঠল প্যানথার।
ওকে শায়েস্তা করার অনেক সময় পাওয়া যাবে, তার আগে ওদের উদ্দেশ্যটা জানতে হবে আমাকে, এই ভেবে মুখে টাঙিয়ে নিলাম কাপুরুষের আপোসমূলক হাসি। 'জ্বে আজ্ঞে, স্যার। আপনাদের টাকায় নাচব আমি।'
নিজের চেয়ারে হেলান দিল প্যানথার। খুশি হয়নি সে। নিরাশার ছায়া দেখলাম ওর চেহারায়। ও একটা শক্তি, এবং নিজেকে খাটানতেই ওর যত আনন্দ।
নিঃশব্দে আমাদেরকে লক্ষ করছে ব্ল্যাঙ্ক। কোন ভাব নেই তার চেহারায়। এই মুহূর্তে কেউ খুন হয়ে গেলেও যেন ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটবে না সেখানে। আপাতত সংঘর্ষ বাধেনি দেখে একটু নড়ে উঠল সে, তারপর আবার সেই নরম গলায় বলল, 'তাহলে সেই কথাই রইল। সব সরঞ্জাম নিয়ে কাল আটটায়

অপেক্ষা করবে তুমি আমাদের জন্যে।'

চলে গেল ওরা। বসে বসে জিনটুকু শেষ করলাম আমি। এই চার্টার পার্টি সম্পর্কে মেজাজ বিগড়ে গেছে আমার। রডরিক এবং ল্যাম্পনিকে না হয় এর মধ্যে না-ই জড়ালাম, ভাবতে ভাবতে মেইন সেলুন থেকে বেরিয়ে এলাম।

'কোন একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে ওদের,' বললাম ওদেরকে, 'তোমাদেরকে বোটে নিতে চাইছে না।'

'যা ভাল বোঝো করো,' কাজ থেকে মুখ না তুলে বলল রডরিক।

রিচার্জিংয়ের জন্যে ইঞ্জিনরূমে গিয়ে অ্যাকুয়াল্যাঙ বটলগুলো এয়ার কমপ্রেশারে বসালাম আমি। জলকুমারীকে জেটিতে রেখে নেমে এলাম সবাই। আমার তৈরি এয়ার ব্যাগের ড্রয়িং নিয়ে ওরা চলে গেল ল্যাম্পনির বাপের ওয়র্কশপে। আর আমি গেলাম মা এডির দোকানে।

চারটের দিকে এয়ার ব্যাগগুলো ডেলিভারি নিয়ে ককপিট সিটের নিচে মেইন লকারে রেখে দিলাম। এরপর একটি ঘন্টা ধরে স্কুবার ডিম্যাণ্ড ভাল্ভ এবং অন্যান্য ডাইভিং সরঞ্জাম পরীক্ষা করলাম। সূর্যাস্তের সময় আমি একাই জলকুমারীকে নিয়ে গিয়ে নোঙর করলাম, এবং বৈঠা চালিয়ে তীরে ফিরে আসার জন্যে ডিঙি নৌকায় চড়তে যাবার ঠিক আগে একটা ভাল বুদ্ধি এল আমার মাথায়। কেবিনে ফিরে এসে ইঞ্জিনরূম হ্যাচটা সরালাম আমি, লুকানো জায়গা থেকে এফ-এন কারবাইনটা বের করে ব্রীচে একটা কার্ট্রিজ ঢোকালাম। সিলিংয়ে আবার রেখে দেবার আগে রাইফেলটাকে অটোমেটিক ফায়ারে সেট করে সেফটি ক্যাচ অন করে রাখলাম।

সন্ধ্যা নামতে একটু দেরি আছে এখনও। আমার পুরানো কাস্ট নেট (ঝাঁকি জাল) টা নিয়ে খাঁড়ির উপর দিয়ে সন্তর্পণে এগোচ্ছি মেইন রীফের দিকে। রঙিন ঘূর্ণিটা দূর থেকেই চোখে

পড়ল। দ্রুত চক্কর মেরে নেমে যাচ্ছে পানি, শেষ মুহূর্তের রোদ গর্তের গায়ে উজ্জ্বল তামাটে এবং আগুনের রঙ ফুটিয়ে তুলেছে। কাঁধ এবং হাত ঝাঁকিয়ে জালটাকে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলাম উপর দিকে। প্যারাসুটের মত ফুলে গেল সেটা, বড় একটা বৃত্ত হয়ে পড়ল ঝাঁক বাঁধা মুলিটের উপর। লাইন টেনে জাল গুটিয়ে নিয়ে দেখলাম এক হাত লম্বা পাঁচটা রূপালী মাছ কর্কশ ভিজে ভাঁজের ভিতর তড়পাচ্ছে।

দুটো মাছ গ্রিল করে আস্তানার বারান্দায় বসে খেলাম। পাহাড়ী ঝর্নার ট্রাউট -এর চেয়ে অনেক বেশি স্বাদ এগুলোর। খাওয়া শেষ করে গ্লাস ভর্তি হুইস্কি হাতে নিয়ে বসে থাকলাম নিশ্চুপ অন্ধকারে।

সাধারণত এই রকম অন্ধকারে দ্বীপটা আমাকে আশ্চর্য এক শান্তির কোমল ভাঁজে জড়িয়ে ফেলে, মনে হয় আমি যেন বুঝতে পারি বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়। তবে এ রাতটা সেরকম নয়। এই লোকগুলো যেন সাথে করে বিষ নিয়ে এসেছে দ্বীপে। মেজাজ বিগড়ে আছে আমার। তবু রাগের নিচে, যখন আমি নিজের সাথে কারচুপি করছি না, পরিষ্কার অনুভব করছি একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনা, একটা উপভোগ্য গা ছমছমে ভাব। আবার ঝুঁকি নেয়ার স্বাদ পাবার আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছি আমি। এখনও জানি না কিসের বাজি লড়তে হবে আমাকে, তবে অনুমান করতে পারছি সেটা দারুণ মজার কিছু, দারুণ ভয়ঙ্কর কিছু না হয়েই যায় না। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ আজ আবার আমি কঠিন পাত্রদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।

নিভৃত, নির্জন অন্ধকারে নিজের সাথে একান্তে সময় কাটিয়ে আমি যখন উঠলাম, চাঁদের আলো মাখা ঢেউগুলো তখন সৈকতের অনেক উপর পর্যন্ত উঠে আসতে শুরু করেছে। পাখা ঝাপটে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে জ্যোৎস্নায় নেশাগ্রস্ত একটা পাখি। ঘরে যেতে মন চাইছে না, অনেকটা জোর করে নিয়ে গেলাম নিজেকে

এবং বিছানায় শুয়ে অপাপবিদ্ধ শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লাম অঘোরে।

চার

কথার হেরফের হলো না, পরদিন সকালে কাঁটায় কাঁটায় আটটায় এসে পৌঁছুল ওরা।

ইতিমধ্যে দুটো ইঞ্জিনই চালু করে দিয়েছি জলকুমারীর। জেটির মাথার কাছে ট্যাক্সি থেকে নেমে হেঁটে এগিয়ে আসছে ওরা, ফ্লাইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে দেখছি ওদেরকে। সমস্ত মনোযোগ আমার দলের তৃতীয় লোকটার উপর। প্রথম দর্শনেই বুঝলাম, এর জগতই আলাদা, ঘুঘু জোড়ার সাথে একেবারেই বেমানান। ছেলেটা রোগা, লম্বা, মুখে প্রফুল্ল হাসি। সাদা চামড়া রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। সাদা শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরেছে সে। সাঁতারুর চওড়া কাঁধ, দেখেই চেনা যাচ্ছে। হাত এবং পা জোড়া শক্তিশালী। ডাইভিং সরঞ্জাম কে ব্যবহার করবে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

ছেলেটার বয়স আঠারো উনিশের বেশি নয়। এক দিকের কাঁধে মস্ত একটা সবুজ ক্যানভাসের ব্যাগ ঝুলছে। বোঝা যাচ্ছে খুব ভারী ওটা, কিন্তু অনায়াসে বয়ে আনছে সে। আর কি এক খুশিতে হরদম কথা বলে যাচ্ছে। তার সঙ্গীদের কদাচ ঠোঁট নড়া দেখে বুঝতে পারছি হুঁ-হাঁ করে সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছে ওরা। ছেলেটাকে দু'পাশ থেকে একজোড়া সেন্ট্রির মত পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে যেন।

কাছাকাছি এসে মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা, ওর চোখেমুখে তারুণ্যের প্রাণ- চাঞ্চল্য ছাড়াও রোমাঞ্চের তৃষ্ণা এবং সরলতার ছাপ দেখতে পেলাম। 'হাই,' আমার উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে হাসছে

সে।

'গ্রিটিংস,' উত্তর দিয়ে হাসলাম আমিও। কিন্তু মনে মনে ভাবছি হিংস্র নেকড়ের পালে এই হরিণের বাচ্চা এল কিভাবে?

আমার নির্দেশনায় নোঙর টেনে তুলল ওরা। কাজটা করতে গিয়ে ওরা প্রমাণ করল এই ধরনের বোটের সাথে ছেলেটা ছাড়া বাকি দু'জন পরিচিত নয়।

বন্দর ত্যাগ করার পর ছেলেটাকে নিয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠে এল ব্ল্যাঙ্ক। 'এর নাম নিরো,' বলল সে।

সাগ্রহে বাড়িয়ে দেয়া নিরোর হাতটা ধরলাম আমি। শুকনো এবং শক্ত লাগল ওর হাত। 'এটা একটা ডারলিং বোট, স্কিপার,' বলল সে, খুশিতে চিকচিক করছে চোখ দুটো। 'কত লম্বা, চুয়াল্লিশ, নাকি পঁয়তাল্লিশ ফুট?'

'পঁয়তাল্লিশ,' ওর প্রতি আরও একটু খুশি হয়ে বললাম আমি।

'নিরো তোমাকে অর্ডার করবে,' ব্ল্যাঙ্ক জানাল আমাকে, 'তুমি ওর অর্ডার মেনে চলবে।'

'চমৎকার,' বললাম তাকে, তারপর নিরোর দিকে তাকালাম।

লাল হয়ে উঠল নিরোর চেহারা। 'না, অর্ডার নয়, মি. রানা- কোথায় যাব আমরা আমি শুধু তাই জানাব আপনাকে।'

'বেশ। ঠিক সেখানেই নিয়ে যাব তোমাদেরকে আমি।'

'দ্বীপটা ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে বাঁক নেবেন আপনি।'

আমি কিছু বলার আগেই ব্ল্যাঙ্ক জানাল, 'উপকূল বরাবর আফ্রিকান মেইন ল্যাণ্ড ঘেঁষে যেতে চাই আমরা।'

'চান ভাল কথা,' ব্ল্যাঙ্কের দিকে ফিরে বললাম, 'কিন্তু ওদিকে ওরা অনাহূত আগন্তুক দেখলে খেপে ওঠে, এ-কথা কেউ বলেনি আপনাকে?'

'তীরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে থাকব আমরা।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম আমি। ভাবলাম, জেটিতে ফিরে গিয়ে এদেরকে নামিয়ে দেব নাকি? 'কোথায় যেতে চান,

নদীমুখের উত্তরে না দক্ষিণে?'
'উত্তরে,' বলল নিরো।
উত্তরে হলে ভাল, ওদিকে কোস্টাল অ্যাকটিভিটি কম। একটা মাত্র ক্রাশ বোট আছে জিনবালায়, কিন্তু সেটার ইঞ্জিন হপ্তায় বড় জোর দু'একদিন ভাল থাকে এবং তীর বারাবর স্থায়ীভাবে তৈরি বিষাক্ত পাম-রস খেয়ে ক্রুরা প্রায় সবাই উন্মাদ হয়ে থাকে। ক্রু এবং ইঞ্জিন দুটোই যখন সুস্থ থাকে, ওদের গতি ওঠে বড় জোর ফিফটিন নট, আর আমার জলকুমারী আমি চাইলেই বাইশ নট স্পীডে ছুটতে পারে।
কিন্তু নদীর দক্ষিণ এলাকায় হেলিকপ্টার নিয়ে পাহারা দেয় কোস্টাল গার্ডরা, এবং নিজেদের সমুদ্রসীমার ব্যাপারে সাংঘাতিক স্পর্শকাতর ওরা।
আমার জন্যে আরেকটা সুবিধে হল, জলকুমারীকে নিয়ে আমি উপকূল বরাবর পানিতে ডুবে এবং জেগে থাকা পাথরের গোলকধাঁধার মাঝখান দিয়ে অন্ধকার ঝড়ো রাতেও অনায়াসে যেতে পারব। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানি, ক্রাশ বোটের কমাণ্ডার এ ধরনের বীরত্ব দেখানর মধ্যে নেই। রোদ ঝলমলে প্রশান্ত দিনেও জিনবালা বে-তে পড়ে থাকতেই পছন্দ করে সে।
'ঠিক আছে,' ব্ল্যাঙ্ককে জানালাম আমি, 'কিন্তু আপনি যা চাইছেন তার জন্যে দৈনিক আড়াইশো ডলার বেশি দিতে হবে-ডেঞ্জার মানি।'
'সে ভয় আমিও করেছি-দেয়া যাবে, কি আর করা,' নির্বিকার চিত্তে বলল ব্ল্যাঙ্ক। বুঝলাম পানির মত টাকা খরচ করতে আপত্তি নেই এই লোকের।
জলকুমারীকে ঘুরিয়ে অয়স্টার পয়েন্টে আলোর কাছাকাছি নিয়ে এলাম। রোদ ঝলমলে স্নিগ্ধ আজকের সকালটা, পরিষ্কার আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেঘ দেখে বোঝা যাচ্ছে ঝাঁক বাঁধা দ্বীপগুলোর অবস্থান, চোখ ধাঁধানো কোমল সাদা পাহাড়

সারি সারি মাথা তুলে আছে। সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে আসা ট্রেড উইণ্ডের স্বাভাবিক গতি আফ্রিকা মহাদেশে ধাক্কা খেয়ে ব্যাহত হচ্ছে। ইনশোর চ্যানেলে এখানে আমরা ফিরে আসা সেই বাতাসের ধাক্কা খাচ্ছি। এলোমেলো ভাবে দমকা বাতাস ছোবল মারছে ম্লান সবুজ পানিতে, উপরটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে সাদা ফেনায় ভরিয়ে তুলছে যতদূর দৃষ্টি যায়। খুব খুশি জলকুমারী, লাফ মারার এবং পানির উপর তলা পর্যন্ত তুলে বাতাস কেটে ছোটার একটা অজুহাত পেয়ে গেছে সে।
'নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছেন আপনারা, নাকি এমনি খুঁজছেন?' কথার পিঠে কথা বলার সুরে সহজভাবে জানতে চাইলাম। উৎসাহের সাথে আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নিরো, বুঝলাম সবকথা বলতে চাইছে সে।
উত্তেজিতভাবে মুখ খুলতে যাচ্ছে সে, এই সময় দ্রুত কথা বলে তাকে থামিয়ে দিল ব্ল্যাঙ্ক। 'এমনি খুঁজছি,' ধমকের সুর বেজে উঠল তার কণ্ঠস্বরে, সাথে সাথে খোলা মুখ বন্ধ হয়ে গেল নিরোর।
'এদিকের পানি আমার চেনা। প্রতিটি দ্বীপ, প্রতিটি রীফ চিনি। আমি হয়ত আপনাদের প্রচুর সময় বাঁচিয়ে দিতে পারি-তার সাথে বেশ কিছু টাকাও।'
'তুমি খুব ভাল ছেলে,' সম্ভবত ঠিক উল্টোটা বোঝাতে চাইল ব্ল্যাঙ্ক, অন্তত তার কর্কশ, রূঢ় কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হল। 'ধন্যবাদ। আমরা নিজেরাই ম্যানেজ করতে পারব।'
'তাহলে তো কথাই নেই,' শ্রাগ করলাম আমি।
নিরোর উদ্দেশ্যে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ব্ল্যাঙ্ক, তারপর আধপাক ঘুরে হেঁটে গেল ককপিটের শেষ প্রান্তে। নিরো তাকে অনুসরণ করল। স্টার্ন রেইলের পাশে দাঁড়িয়ে নিরোকে উদ্দেশ্য করে নিচু শান্ত গলায়, কিন্তু জরুরী ভঙ্গিতে ঝাড়া দুই মিনিট কথা বলল সে। নিরোর চেহারা থেকে উজ্জ্বলতা খসে পড়তে দেখলাম

আমি। আবার যখন ফ্লাইং ব্রিজে ফিরে এল সে, তার চেহারায় রাগের ভাব দেখে একটু অবাকই লাগল আমার। বুঝলাম, ছেলেটা একেবারে পুতুল নয়।

পরিষ্কার বোঝা গেল, মাথা, অর্থাৎ ব্ল্যাঙ্কের নির্দেশেই কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ব্রিজের দিকে মুখ করে ফাইটিং চেয়ারে বসল পেশী অর্থাৎ প্যানথার। চেয়ারে হেলান দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করা একটা পা হাতলে তুলে দিয়ে বসে আছে সে, অথচ ভঙ্গিতে ফুটে রয়েছে বিশ্রামরত নেকড়ের আক্রমণাত্মক ভাব। ওর চোখে চোখ রেখে হাসলাম আমি, কিন্তু এক চুল নড়তে দেখলাম না ওর চোখের পাতা। মুখেও কোন রেখা ফুটল না। অকস্মাৎ কেন যেন মনে হল, মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে।

দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ হালকা সবুজ পানি কেটে এগোচ্ছে জলকুমারী, পানির নিচে কিম্ভূতকিমাকার দৈত্য-দানবের মত ডুব দিয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে পাথরের পাঁচিল। প্রবাল দ্বীপগুলো সাদা বালিতে ঢাকা, রোদ লেগে তুষারের মত চিক চিক করছে। তার মাঝখানে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা, সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে পামগুলো, বাতাসের ঝাপটা খেয়ে মাথা দোলাচ্ছে।

দিনভর ব্যস্তভাবে একনাগাড়ে এগিয়ে চলল জলকুমারী, এর মধ্যে অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আভাস পাবার চেষ্টা করেছি আমি। ব্ল্যাঙ্কের কথা শোনার পর থেকে নিরো এখনও গম্ভীর এবং চুপচাপ। তার ব্যাগ থেকে বেরিয়েছে একটা বড়সড় স্কেল অ্যাডমিরাল্টি চার্ট। সেটায় আমাদের পজিশন কোথায় তাকে দেখালাম, সে আমাকে কয়েকবার কোর্স বদল করতে বলল।

চার্টে বিশেষ কোন চিহ্ন না থাকলেও সেটার উপর বারকয়েক নজর ফেলার সুযোগ পেয়ে বুঝে নিলাম রোভুমা রিভারের অসংখ্য মুখের পনেরো থেকে ত্রিশ মাইল উত্তরে এবং তীর থেকে ষোলো মাইল পর্যন্ত দূরের এলাকা সম্পর্কে আমরা আগ্রহী। এই এলাকায়

কয়েক একর থেকে শুরু করে কয়েক মাইল লম্বা আনুমানিক তিনশো দ্বীপ আছে। বিশাল খড়ের গাদা থেকে ওরা একটা জং ধরা ছোট্ট পিন খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে বলে মনে হল আমার।

ব্রিজে দাঁড়িয়ে প্রিয়তমা জলকুমারীর হৃৎকম্পন উপভোগ করছি আর সামুদ্রিক জীব ও পাখিদের রকমসকম লক্ষ করছি, বেশ ভালই কাটছে সময়টা। ফাইটিং চেয়ারে বসা প্যানথারের মাথার পাতলা চুলের ভিতর টাকটা লালচে গোলাপী নিওন বাতির মত জ্বলজ্বল করছে। এই এলাকার সূর্য সম্পর্কে ওকে সাবধান করে দেবার কথা মনে হল, কিন্তু চেপে গেলাম ব্যাপারটা। পরদিন সারা গায়ে ঘামাচি ফুটল ওর, সারাটা দিন কষ্ট পেল চুলকানিতে। মুখটা সমুদ্রগামী জাহাজের পোর্ট লাইটের মত জ্বলছে।

দ্বিতীয় দিনের দুপুর নাগাদ একঘেয়েমিতে পেল আমাকে। সঙ্গী হিসেবে নিরো একেবারেই অপরিণত, তাছাড়া আগের সেই সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব এখনও সে পুরোপুরি ফিরে পায়নি। গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে এত বেশি সচেতন সে যে কফি খাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করবে কি করবে না সিদ্ধান্ত নিতে ত্রিশ থেকে ষাট সেকেণ্ড সময় নিচ্ছে।

ডিনারের জন্যে মাছ দরকার আমার, তাই একটু সতর্ক হয়ে লক্ষ রাখছি সমুদ্রের দিকে, এমন সময় সামনে একদল কিংফিশ দেখলাম, সার্ডিনের বিশাল একটা ঝাঁকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

তাড়াতাড়ি হুইলটা নিরোকে দিয়ে বললাম, 'সোজা করে ধরে রাখো শুধু।'

ককপিটে নেমে এলাম আমি। তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে আমাকে প্যানথার। কেবিনে উঁকি দিয়ে দেখি আমার ক্যাবিনেট খুলে নিজের খুশি মত জিন আর টনিক বের করে এন্তার খেয়ে চলেছে ব্ল্যাঙ্ক। এই দুই দিন কেবিন থেকে তার না বেরুবার কারণ বোঝা গেল। দিনে সাড়ে সাতশো ডলার দিচ্ছে, সুতরাং কিছু

বলতে গেলাম না ওকে। লকার খুলে একজোড়া ফিদার জিগ বেছে নিলাম। ঝাঁকের পাশ দিয়ে যাবার সময় গেঁথে ফেললাম একটা কিংফিশ। তড়পাচ্ছে, গায়ের সোনা রঙ ঝিলিক দিচ্ছে রোদ লেগে। লাইন গুটিয়ে নিলাম আমি। তারপর আমার ভারী বেইট নাইফের ফলা দিয়ে মাছটার লেজের নিচে থেকে কানকোর নিচে পর্যন্ত চিরে ফেললাম, নাড়িভুঁড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম পানিতে।

মাথার উপর একজোড়া সী-গাল ঘুর ঘুর করছিল, সাথে সাথে তারা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করে পানির দিকে ডাইভ দিল আবর্জনা তোলার জন্যে। তাদের চেঁচামেচিতে আকৃষ্ট হয়ে আরও কয়েক জোড়া উড়ে এসে নরক গুলজার করে তুলল আমাদের পিছন দিকে।

ওদের চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে, তবু পিছনের মৃদু ধাতব শব্দটা ঠিকই শুনতে পেলাম আমি। অত্যন্ত পরিচিত বলেই সম্ভবত শব্দটা ফাঁকি দিতে পারেনি আমাকে। অটোমেটিক পিস্তলের স্লাইড টেনে ছাড়া হল লোড এবং কক করার জন্যে। সচেতনভাবে নয়, সম্পূর্ণ ঝোঁক আর সহজাত প্রবৃত্তির বশে বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার শরীরে। এক পলকে বড় বেইট-নাইফটা আধপাক ঘুরে গেল আমার ডান হাতে। সেটাকে ছুঁড়ে মারার জন্যে ধরেই শরীরের একটা মাত্র ঝাঁকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝপ করে নামলাম ডেকের উপর। পায়ের পাতা আর বাঁ হাতের তালু দিয়ে ব্রেক ফল করছি, ইতিমধ্যে পিছিয়ে গিয়ে ছুরিটা উঠে গেছে আমার ডান কাঁধের উপর-টার্গেট বরাবর তাক স্থির হতেই ছুঁড়তে যাচ্ছি সেটা।

ডান হাতে বড় একটা অটোমেটিক রয়েছে প্যানথারের। ন্যাভাল পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ, পুরানো পিস্তল, কিন্তু খুন করার জন্যে তুলনা হয় না-বুকে লাগলে ফুটোটা এত বড় হবে যে অনায়াসে একটা ফুটবল ঢুকে যেতে পারবে।

বেইট নাইফের লম্বা ফলা দিয়ে চেয়ারের পিঠের সাথে গেঁথে যাচ্ছিল প্যানথার, কিন্তু দুটো কারণে নতুন জীবন লাভ করল সে। এক, পয়েন্ট ফরটি-ফাইভটা আমার দিকে ধরা নয়। দুই, তার গোলাপী মুখে সকৌতুক বিস্ময়ের ভাব।

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে নিজেকে দমন করলাম। ধাতব শব্দ শোনার পর মাত্র দুই সেকেণ্ড হয়েছে, আর এক সেকেণ্ডের দশভাগের এক ভাগ যদি দেরি হয়ে যেত, ছুরিটা ছুটে যেত আমার হাত থেকে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি। এখন ও বুঝতে পারছে মৃত্যুর কত কাছে চলে এসেছিল। রোদ পোড়া ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসিটা মলিন, জোর পাচ্ছে না। সিধে হয়ে দাঁড়ালাম আমি, টোপ কাটার বোর্ডে গেঁথে রাখলাম বেইট নাইফটা।

'নিজের ওপর যদি দরদ থাকে,' শান্ত গলায় বললাম ওকে, 'ওটা আর নাড়াচাড়া কোরো না আমার পিছনে।'

নিজেকে সামলে নিয়েছে প্যানথার, আত্মবিশ্বাসে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। হা হা করে হাসল সে। রিভলভিং ফাইটিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে স্টার্নের দিকে লক্ষ্য স্থির করল, এবং ফায়ার করল পর পর দু'বার। ইঞ্জিনের আওয়াজকে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ করে দিল বিস্ফোরণের শব্দ, আমার নাক ছুঁয়ে বাতাসে উড়ে গেল করডাইটের গন্ধ। ডানা মেলা দুটো সী-গাল ছিন্নভিন্ন হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল শূন্যে, পালকগুলো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে চিকন সুতোর মত উড়তে লাগল বাতাসে। আতঙ্কে আর্তনাদ ছেড়ে যে যেদিকে পারল দ্রুত উড়ে চলে গেল ঝাঁকের অন্যান্য সী-গাল। বুঝলাম এক্সপ্লোসিভ বুলেট ব্যবহার করেছে প্যানথার।

চেয়ার ঘুরিয়ে আবার আমার মুখোমুখি হল সে, ঠোঁটের কাছে পিস্তল তুলে ফুঁ দিল মাজলে। তারপর বলল, 'দেখো ছোকরা, তোমাকে আমার চিনতে পারা উচিত, কিন্তু চিনতে পারছি না কেন, বল তো?'

‘দেয়ালে মাথা ঠোকো,’ বলে আমি ব্রিজ ল্যাডারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

‘থামো!’ পিছন থেকে হিস হিস করে উঠল প্যানথার।

দাঁড়ানো উচিত আমার, বুঝতে পারলাম। ইতিমধ্যে ওর পিস্তল ছোঁড়ার নৈপুণ্য এবং গোলমাল পাকানর ব্যগ্রতা লক্ষ করেছি। কিন্তু তবু আমি ওর হুকুমে এখন আর দাঁড়াতে পারি না। সুবোধ বালকের খোলস একবার ঝেড়ে ফেলার পর সেই খোলসে আবার গা ঢাকা দেয়া চলে না। প্যানথারকে এখন বুঝতে দেয়া উচিত যে তাকে আমি গ্রাহ্য করি না। তা নাহলে মাথায় চড়তে চেষ্টা করবে ও।

‘থামো!’

‘লাফ দিয়ে পানিতে পড়ো!’

একহাতে জিনের গ্লাস নিয়ে এতক্ষণ কেবিনের দরজায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল ব্ল্যাঙ্ক। পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ফিসফিস করে কথা বলে উঠল সে।

‘এখন বুঝতে পারছি, তুমি কে! চেনা চেনা লাগছিল, অথচ চিনতে পারছিলাম না বলে বড়ই বেচায়েন ছিলাম আমরা।’

দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্ল্যাঙ্কের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছি নিঃশব্দে। আমাকে ছাড়িয়ে চলে গেল তার দৃষ্টি। প্যানথারকে বলল, ‘চিনতে পারছ এখন, প্যানথার?’ মাথা নাড়ল প্যানথার-চিনতে পারছে না। ব্ল্যাঙ্ক আবার বলল, ‘এর ছবি দেখেছ তুমি। কোথায় দেখেছ একটু ভেবে দেখ। তখন এর দাড়ি ছিল না।’

প্যানথার নিশ্চুপ। এখনও সে চিনতে পারছে না। ভুরু কুঁচকে ভাবছে।

‘ডায়মণ্ড কেলেঙ্কারি!’ আবার বলল ব্ল্যাঙ্ক। ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার বুক। মেজর জেনারেল রাহাত খানের একটা নির্দেশের কথা মনে পড়ে গেল। যে-কোন মূল্যে আমার আসল পরিচয় গোপন রাখতে হবে। এটা জানাজানি হয়ে গেলে আমার প্রাণের

এক পয়সা মূল্য থাকবে না আর।

‘জেসাস!’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্যানথার, ‘এইবার চিনেছি!’ বিস্ময় এবং হিংস্র উল্লাস প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। ‘গুরুদয়াল সিং!’

মই বেয়ে উঠে এলাম ব্রিজে।

‘দুঃখিত,’ নিরোর কাছ থেকে হুইল নেবার সময় আমাকে বলল সে, ‘ওর কাছে পিস্তল আছে একথা আপনাকে আমার বলা উচিত ছিল।’

দ্রুত চিন্তা করছি আমি। কার কাছে আমার ফটো দেখেছে এরা? সিডনি শেরিডান? তার সাথে কিসের সম্পর্ক এদের? খবর পেলেই শেরিডান আমার ব্যবস্থা করার জন্যে লণ্ডন থেকে হাত বাড়াবে। বুঝতে পারছি এখনই বাধা দিতে হবে আমাকে। তা দিতে হলে ব্ল্যাঙ্ক আর প্যানথারের বেঁচে থাকা চলে না। ঘাড় ফিরিয়ে ককপিটের দিকে তাকিয়ে দেখি নেই ওরা। প্যানথারকে নিয়ে নিচে নেমে গেছে ব্ল্যাঙ্ক।

এক আঘাতে একই সাথে দু'জনকে খতম করা তেমন কঠিন নয়, অ্যাকসিডেন্ট বলে চালিয়ে দেয়াও সম্ভব। বয়স অল্প ছিল বলেই এই ধরনের এসপার-ওসপার সিদ্ধান্ত নেবার কথা ভাবছিলাম আমি...কিন্তু ওদিকে সিদ্ধান্তটা কার্যকরী করার জন্যে নিজের পুরোপুরি সমর্থনও পাচ্ছিলাম না।

নিরোর দিকে তাকালাম। নিঃশব্দে হাসছে সে। প্রশংসার সুরে বলল, ‘চোখের পলকে যা দেখালেন! আর একটু হলে মাইক কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছিল।’

এই বাচ্চাটাকেও? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। ওদের দু'জনকে যদি যেতে হয়, একেও যেতে হবে, তা নাহলে ব্যবস্থাটা কাঁচাই থেকে যাবে। হঠাৎ সাংঘাতিক ঘৃণা হল নিজের ওপর। এসব কি ভাবছি আমি? আমি খুনী নই, অথচ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার কথা ভাবছি কেন?

‘আপনি অসুস্থ, স্কিপার?’ দ্রুত জানতে চাইল নিরো। আমার মুখের রঙ বদল দৃষ্টি এড়ায়নি ওর।

‘আরে না,’ বললাম ওকে। ‘আপত্তি না থাকলে আমাদের জন্যে দুই ক্যান ঠাণ্ডা বিয়ার নিয়ে আসতে পার তুমি।’

নিরোকে নিচে পাঠিয়ে দিয়ে ধীর-স্থির ভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম। ওদের সাথে রফা করব আমি। গোপন একটা উদ্দেশ্য আছে ওদের, শেষ পর্যন্ত আমার কাছে সেটা গোপন রাখতে পারবে না ওরা। ওদেরকে বলব, আমার ব্যাপারে যদি মুখ বুজে থাকে, আমিও ওদের ব্যাপারে মুখ বুজে থাকব। নিচে ওরাও সম্ভবত এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে।

হুইলে তালা লাগিয়ে পা টিপে টিপে ব্রিজের শেষ প্রান্তের দিকে এগোচ্ছি, নিচের কেবিন থেকে যাতে ওরা আমার পায়ের শব্দ শুনতে না পায়। সেলুন টেবিলের উপর ভেন্টিলেটারটাকে ভয়েস টিউবের বিকল্প বলা চলে, অনেক আগেই আবিষ্কার করেছি যে নিচের কথাবার্তা বাতাসে চড়ে ঝাঁঝরি দিয়ে চমৎকার গলে আসে। তবে পরিষ্কার শুনতে পাওয়াটা নির্ভর করে বাতাসের বেগ, কেবিনে বক্তাদের অবস্থান, আর তাদের কণ্ঠস্বরের তারতম্যের ওপর।

বাতাসের গর্জন যখন চাপা পড়ে যাচ্ছে না তখন নিরোর গলা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, সম্ভবত ভেন্টিলেটারের ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে সে এবং কথা বলছে ওদের দু'জনের চেয়ে জোরে।

‘স্কিপারকে এখুনি জিজ্ঞেস করছেন না কেন?’ বাতাসের তীব্র শিসে চাপা পড়ে গেল উত্তরটা। আবার যখন শিস থামল, নিরোর গলাই ভেসে এল ভেন্টিলেটার দিয়ে।

‘আজ রাতেই যদি কাজটা করতে চাই আমরা, কোথায় আপনি...’ পরের কথাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল বাতাস। ‘ভোরের আলো পেতে হলে আমাদেরকে...’ গোটা আলোচনাটা সময় এবং স্থান সম্পর্কে বলে মনে হচ্ছে। ভোরে হারবার ত্যাগ করে কি

সুবিধে পেতে চাইছে ওরা ভাবছি, এই সময় আবার শুনতে পেলাম নিরোর গলা, প্রতিবাদের সুরে সে বলছে, ‘কেন? আমি তো বুঝতে পারছি না অসুবিধেটা কোথায়...’ ঠিক এই সময় কড়া সুরে কথা বলে উঠল ব্ল্যাঙ্ক, নিশ্চয়ই এগিয়ে এসে নিরোর সামনে দাঁড়িয়েছে সে, এবং সম্ভবত হুমকির ভাব ফুটিয়ে তুলেছে চেহারায়।

‘দেখো, এদিকের এসব ব্যাপারে খবরদার মাথা গলাবে না তুমি। তোমার কাজ জিনিসটাকে খুঁজে বের করা, সে-ব্যাপারে ঘোড়ার ডিম কিছুই করতে পারনি তুমি এখন পর্যন্ত...’

দূরে সরে যাচ্ছে ওদের গলার আওয়াজ, পরিষ্কার আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। একটু পরই দরজা বন্ধ বা খোলার শব্দ পেলাম। দ্রুত ফিরে এসে দাঁড়ালাম হুইলের কাছে। এমনি সময়ে ডেকের কিনারায় মাথা দেখা গেল নিরোর, মই বেয়ে উঠে আসছে সে।

ওর বাড়ানো হাত থেকে বিয়ারের ক্যানটা নিলাম। আগের চেয়ে সহজ লাগছে ওকে। হাসির মধ্যে বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসের ভাব রয়েছে। ‘মি. ব্ল্যাঙ্ক বলছেন আজ আর বেশিদূর গিয়ে লাভ নেই। এবার আমরা ফিরে যাব।’

স্রোতের উপর দিয়ে জলকুমারীকে ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে এগোচ্ছি দ্বীপের দিকে। টার্টল বে-র মুখ পেরিয়ে এসে পাম গাছের ভিতর দেখতে পেলাম আমার শান্তির নীড়টাকে। হঠাৎ একটা ক্ষোভে ভরে উঠল আমার বুক।

নিজের সম্পর্কে সব সময় উঁচু ধারণা পোষণ করেছি আমি। নিজেকে চিনি, নিজের যোগ্যতার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখি বলেই সম্ভব হয়েছে এটা। শারীরিক যোগ্যতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা অর্জনের জন্যে জ্ঞান হবার পর থেকে কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমার আত্মবিশ্বাস কারও চেয়ে কম নয়, তার কারণ নিজেকে মনের মত করে গড়ে তোলার কাজে কখনও ফাঁকি দিইনি আমি।

সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্যে ভদ্র হওয়া একটা অলঙ্ঘনীয় শর্ত, সে চেষ্টাই করছি। বসুন্ধরা শক্তের ভক্ত, নিজেকে আমি সেভাবেই গড়ে তুলেছি। উচ্চাশা ছাড়া মানুষের উত্তরণ ঘটে না, তাই আমিও উচ্চাকাঙক্ষী। কিন্তু তিন বছর আগে প্রমাণিত হয়ে গেছে এসব মিথ্যে এবং পণ্ডশ্রম মাত্র। দেশের প্রতি বুকভরা ভালবাসা ছিল, সেজন্যেই সেনাবাহিনীতে গিয়েছিলাম। দেশের আরও বেশি সেবা করার সুযোগ পাব বুঝতে পেরে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল? কোন অন্যায় করিনি আমি, অথচ মাথা পেতে নিতে হয়েছে দ্বীপান্তরের শাস্তি। তবু যদি জানতাম দেশের মস্ত ক্ষতি করছে যে লোকটা, সেই সিডনি শেরিডান উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে, এতটা দুঃখ হত না। অপরাধী বেঁচে গেল, শাস্তি পেতে হল আমাকে-এটা কেমন বিচার?

বুঝতে পারি, শেষ হয়ে গেছি আমি। আমার ক্যারিয়ার খতম, উচ্চাশা খতম, দেশ সেবার কোন সুযোগ আর কখনও পাব না। তিনটি অমূল্য বছর নষ্ট হয়েছে, আরও কত বছর নির্বাসনে কাটাতে হবে জানি না। যখন দেশে ফিরব, যদি কখনও ফেরার সুযোগ হয়, কি হয়ে ফিরব তখন আমি? কে আমায় বুঝবে? গিয়ে দেখব বদলে গেছে সব কিছু, জুনিয়ররা অনেক ধাপ টপকে উঠে গেছে ওপরে, আরও ভাল ট্রেনিং পেয়েছে তারা-তাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছি আমি। সন্দেহ নেই, এই রকম দাঁড়াবে পরিস্থিতি। সেক্ষেত্রে নতুন করে শুরু করতে হবে আমাকে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

না। সম্ভব নয় জানি বলেই দেশে ফেরার কথা আর ভাবি না। বেশ তো আছি এই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় সেন্ট মেরী দ্বীপে, কি দরকার বিড়ম্বনা বাড়িয়ে? ছোট্ট একটা ভুল করেছিলাম, ব্যস, নির্মম রায় দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হল আমাকে-ভুল সংশোধনের একটা সুযোগও দেয়া হল না। একটা মাস সময়ও যদি পেতাম,

আমি জানি, সিডনি শেরিডানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সব তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করতে পারতাম আমি। কিন্তু সে সুযোগ আমাকে দেয়া হয়নি।

চুপচাপ হজম করেছি অবিচারটা, এছাড়া কিছু করার ছিল না আমার। তারপর একটু একটু করে মন বসিয়েছি স্বদেশ থেকে হাজার মাইল দূরের এই বিদেশী দ্বীপে-বেশ আনন্দেই তো আছি। কিন্তু ভাগ্যাকাশে আজ আবার দেখা দিয়েছে অশুভ কালো মেঘ।

আবার ভাবলাম, অশুভ বটে, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে এই কালো মেঘের ওপারেই লুকিয়ে আছে ঝলমলে সুদিন, এই কালো মেঘই বুঝি নিয়ে এসেছে অভিশাপ-মুক্তির একটা সুবর্ণ সুযোগ। যদিও আমার এই মনে হওয়ার পেছনে কোনই যুক্তি-প্রমাণ নেই।

কারা এরা? কে পাঠিয়েছে এদেরকে? কি খুঁজছে? কোথায় দেখেছে আমার ফটো? এক এক করে অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মনে। একটার উত্তরও জানা নেই আমার। আমার প্রতি নিরোর ক্ষীণ একটু দুর্বলতা লক্ষ করেছি, সেটাকে কাজে লাগানো যায় না? এই ভেবে ফিরলাম ওর দিকে।

চ্যানেলের ওপর দিয়ে গ্র্যাণ্ড হারবারের দিকে এগোচ্ছে জলকুমারী। গুরুত্বহীন হালকা বিষয়ে কথা বলছি আমরা। অনুমান করতে পারছি আমি, নেকড়েজোড়া তাদের উদ্দেশ্য সবটা প্রকাশ করেনি নিরোর কাছে। ছেলেটা সরল, বুঝতেই পারছে না কি ভয়ঙ্কর প্ল্যান এঁটেছে ওরা। তাই এখনও স্বাভাবিক আচরণ করতে পারছে ও। চতুরতা ওর ধাতে নেই, তাঁর প্রমাণও দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। নিরোর পুরো নাম সামরিক গুপ্ত-তথ্যের মত গোপন করে গেছে আমার কাছে ব্ল্যাঙ্ক, নিশ্চয়ই নিরোকেও সতর্ক করে দিয়েছে সে, কিন্তু নিরো সতর্ক হতে পারেনি। তার গলায় একটা সিলভারের চেন রয়েছে, তাতে একটা পিতলের চাকতি ঝুলছে, চাকতিতে খোদাই করা রয়েছে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে একটা সতর্কবাণী 'জে. এ. নিরোকে পেনিসিলিন দেয়া যাবে না'।

চাকতিটা লুকিয়ে রাখার কথা মনেই পড়েনি নিরোর।

হালকাভাবে প্রশ্ন করে এক-আধ টুকরো তথ্য জেনে নিচ্ছি। ভবিষ্যতে এগুলো কাজে লাগতেও পারে। আমার অভিজ্ঞতায় বলেঃ অজ্ঞানতাই তোমার সবচেয়ে ক্ষতির কারণ হতে পারে। নিজেকে আরও যাতে মেলে ধরার ইচ্ছা জাগে ওর তাই এমন সব বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলাম যা শুনে বিস্মিত এবং কৌতূহলী হয়ে ওঠে ও।

'চ্যানেলের ওদিকে ওই রীফটা দেখতে পাচ্ছ, যেখানে উথলে পড়ছে স্রোতটা? ওটা ডেভিল ফিশ রীফ-বিশ ফ্যাদম খাড়া নেমে গেছে সাগরের নিচে। বিশাল সব বুল গ্রুপারদের আস্তানা ওটা। ওখানে ওদের একটাকে মেরেছিলাম গত বছর, ওজন ছিল দুশো কিলোর বেশি।'

'দুশো কিলো!' সবিস্ময়ে বলল নিরো। 'মাই গড, তার মানে প্রায় সাড়ে চারশো পাউণ্ড!'

'হ্যাঁ। তার মুখের ভিতর তোমার মাথা এবং কাঁধ দুটো অনায়াসে ঢুকে যাবে।'

এর একটু পরই মুখ খুলল নিরো। ইতিহাস এবং দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করছিল সে কেমব্রিজে, কিন্তু সাগরের পিছনে বড় বেশি লেগে থাকার দরুন লেখাপড়াটা ছাড়তে হয়েছে। এখন সে ছোটখাট একটা ডাইভিং ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই কোম্পানি এবং আণ্ডার ওয়াটার স্যালভেজ আউটফিটের মালিক। এ থেকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মত রোজগারও করছে সে, আবার হপ্তায় প্রায় প্রতিদিনই ডাইভ দেয়ার সুযোগও পাচ্ছে। ব্যক্তিবিশেষের অর্ডার নেয় সে। সরকার এবং নেভীর কিছু কাজ করার জন্যেও চুক্তি করেছে।

দু'বার 'রাফেলা' নামটা উচ্চারণ করল ও। হালকাভাবে জানতে চাইলাম, 'কে? গার্লফ্রেণ্ড, নাকি ওয়াইফ?'

'বোন, স্নেহময়ী বড় বোন-ও-ই তো ব্যবসার মাথা, খাতাপত্র

সব ঠিকঠাক রাখে।' আরও কিছু কথা বলল ও। ওর বোন নাকি একজন কংকোলজিস্ট, সী-শেল থেকে বছরে দু'হাজার পাউণ্ড রোজগার করে। কিন্তু নেকড়েদের সান্নিধ্যে এল কিভাবে বা নিজের স্পোর্টস শপ ছেড়ে দুনিয়ার অর্ধেকটা ঘুরে এখানে কেন এসেছে সে-সম্পর্কে কিছু বলল না।

অ্যাডমিরালটি জেটিতে নামিয়ে দিলাম ওদেরকে। তারপর সন্ধ্যার আগে রি-ফুয়েলিংয়ের জন্যে জলকুমারীকে নিয়ে চলে গেলাম শেল বেসিনে।

পাঁচ

সেদিন সন্ধ্যায় কয়লার গনগনে আগুনে ধরে গ্রিল করে নিলাম কিংফিশটাকে। আলুর চপগুলোকে ঠাণ্ডা বিয়ারে ধুয়ে নিয়ে বসলাম বারান্দায়। পামগাছের ফাঁক দিয়ে সৈকতে দেখা যাচ্ছে সাদা ফেনারাশি। সাগর যেন উন্মাতাল হয়ে উঠেছে আজ, বড় বেশি তোলপাড় লক্ষ করছি। নাকি মনের অস্থিরতার জন্যে এমন লাগছে? পামগাছের ফাঁকে হেডলাইট দুটোকে দেখে একটুও অবাক হলাম না। জানতাম ওরা আসবে। গেটটা তাই খুলেই রেখেছি।

ভিতরে ঢুকে ট্যাক্সিটা আমার পিকআপের পাশে থামল। ড্রাইভারকে গাড়িতে রেখে নামল ওরা দু'জন। নিরোকে হিলটনে রেখে এসেছে ওরা।

পিছনে প্যানথারকে নিয়ে বারান্দায় উঠে এল ব্ল্যাঙ্ক।

'ড্রিঙ্ক?' সাইড টেবিলের বোতল আর বরফের দিকে ইঙ্গিত করলাম আমি। নিজেদের জন্যে দুটো গ্লাসে জিন ঢালল প্যানথার। আমার সামনের চেয়ারটায় বসল ব্ল্যাঙ্ক।

'গেট খোলা, টেবিলে তিনটে গ্লাস, বারান্দায় অতিরিক্ত একটা চেয়ার,' বলল ব্ল্যাঙ্ক, 'তুমি জানতে আমরা আসব?'

নিঃশব্দে হাসলাম শুধু।

আমার মাছ খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ব্ল্যাঙ্ক, তারপর বলল, 'কয়েকটা ফোন করে জানলাম বছর তিনেক আগে আগস্ট মাসে লণ্ডন থেকে গায়েব হয়ে গেছে গুরুদয়াল সিং, সেই থেকে তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। আরও কয়েক জায়গায় খবর নিয়ে জানা গেল সেই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়া থেকে মাসুদ রানা নামে এক লোক জলকুমারী নামে একটা বোট নিয়ে এই দিকে এসেছে। বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ গুরুদয়াল সিং এবং মাসুদ রানা নাকি একই ব্যক্তি। হাঁটুর উপর একটা দাগ এবং ডান বাহুর উপর একটা বুলেটের আঁচড় নাকি তাই প্রমাণ করে। এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে, মাসুদ রানা?'

'কিচ্ছু বলার নেই।' সরু, কালো একটা চুরুট ধরিয়ে ব্ল্যাঙ্কের মুখের দিকে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লাম আমি।

ঝট করে আমাদের দু'জনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল প্যানথার। তার রাগের কারণ বোঝা গেল এক মুহূর্ত পর। 'ওস্তাদের যত নরম কায়দা!' চাপা স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করছে সে। 'এত করে বললাম প্রথমে ওর ক'টা দাঁত ভাঙার সুযোগ দাও আমাকে, তা না...'

'তুমি ব্যবসা বোঝ না,' মৃদু কণ্ঠে বলল ব্ল্যাঙ্ক। তারপর চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'বেশ গুছিয়ে নিয়েছ দেখছি। আরামেই আছ তাহলে? কিন্তু দুই লাখ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের দাঁও মেরে কি এর চেয়ে আরামে থাকতে পারতে না? ভয় পেয়ে একেবারে এতদূরে, এই নির্জন, গেঁয়ো জায়গায় পালিয়ে এসেছ!'

'সিডনি শেরিডানকে সত্যি ভয় পাই,' মৃদু কণ্ঠে বললাম আমি।

কিন্তু টোপটা নিল না ব্ল্যাঙ্ক। এই নামের কাউকে চেনে সে-

ভাবই দেখাল না। আবার জিজ্ঞেস করল, 'সুখ এবং শান্তির সংজ্ঞা এক-একজনের কাছে এক-এক রকম-তুমি বোধহয় এখানে খুব সুখেই আছ, কি বল?'

'হ্যাঁ-তবে খেটে খেতে হয়।'

'কিন্তু জেলখানায় ইঁট ভাঙা বা মাটি কাটার চেয়ে আরামে আছ, অস্বীকার করতে পার?'

'তা ঠিক।'

'আমাদের নিরো খোকা কাল তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবে। সে যা জানতে চাইবে, চেপে না রেখে সব তাকে জানাবে তুমি, রানা। তোমার কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা চাই আমি। কাজ শেষ করে যখন চলে যাব, আমাদের সাথে দেখা হয়েছিল একথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে তুমি। আমরাও কাউকে বলব না কোথায় আছে গুরুদয়াল সিং ওরফে মাসুদ রানা। রাজি?'

'সম্পূর্ণ,' বললাম আমি। কিন্তু বুঝলাম, ওদের কাজ শেষ হবার আগেই আমি কিছু করে বসতে পারি ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে ওরা, সেজন্যেই আমাকে অভয় দিতে এসেছে। আপোস রফার প্রস্তাবটা ভুয়া, ওরা ফিরে যাবার আগে স্থায়ীভাবে আমার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে, তা সে যেভাবেই হোক।

ভাবলাম কাল সকালে ওরা খুব ভোরে রওনা হতে চাইবে, কিন্তু সে-সম্পর্কে কোন কথা না বলেই বিদায় নিল। ঘুম আসবে না বুঝতে পেরে সৈকতে নেমে এসে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। বে-র বাঁকটা নিয়ে মাটন পয়েন্ট পর্যন্ত চলে এসেছি। ঝড়ে ধরাশায়ী একটা গাছের চওড়া কাণ্ড কবে জানি গড়িয়ে নেমে এসেছে সৈকতে, রাতে কখনও এদিকে এলে ওটার উপর বসি আমি। আজ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম।

চারদিকে কোথাও কেউ নেই, সামনে উত্তাল সাগর, তার উন্মত্ত বিলাপ আর বাতাসের আহাজারী। নিজেকে নিঃসঙ্গ আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে হল আমার। কে আমি? কোথা থেকে এলাম,

আর কোথায় যাব? নিখিল বিশ্ব...কোথায় এর শেষ? প্রশ্নের শেষ নেই, কিন্তু কে দেবে উত্তর?

এক সময় ক্লান্তিতে চোখ বুজলাম আমি, তারপর আবার যখন চোখ মেলে তাকালাম, তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে, পাম গাছের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে-গ্রাম, শিশুকাল, শিশির ভেজা মাঠ, নকশী কাঁথা, পদ্মপাপড়ির মত মায়ের খোলা চোখ আর শোলক বলা কাজলা দিদির কথা মনে পড়ে গেল। ব্যথায় টনটন করে উঠল বুকটা। উঠে দাঁড়ালাম আমি। চাঁদের আলোয় তাকিয়ে দেখি উথালপাথাল সাগর আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, বলছে, চলে এসো, চলে এসো-আমিই তোমার আদি মাতা।

পরদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই জেটিতে পৌঁছুলাম। গিয়ে দেখি ডিঙি নৌকাটা নেই সেখানে। ফেরীর ফোরম্যান হ্যামবোন আমাকে তার ডিঙিতে তুলে নিল। নোঙর ফেলা জলকুমারী অনেক দূরে কুয়াশায় ঢাকা। কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম ককপিটে ঘোরাফেরা করছে পরিচিত একটা অস্পষ্ট মূর্তি।

'হেই রডরিক,' লাফ দিয়ে ডেকে নেমে বললাম, 'বেগম বুঝি ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে তোমাকে?'

আমার দিকে ফিরেও তাকাল না রডরিক। দিনের আলো এখনও ভালভাবে ফোটেনি, অথচ গোটা ডেক ঝকঝক করছে। ধাতুর তৈরি প্রতিটি জিনিস মেজেঘষে আয়নার মত করে তোলা হয়েছে। জলকুমারীকে আমার মতই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে রডরিক, মাঝেমাঝে সন্দেহ হয়, আমার চেয়ে বুঝি একটু বেশিই ভালবাসে।

'এটা কি একটা বারোয়ারী পেচ্ছাবখানা, মাসুদ?' সাবান-পানি দিয়ে ডেকটা দ্বিতীয়বার ধুচ্ছে রডরিক। 'কেমন লোক তোমার এই পার্টি, বোটের মর্যাদা বোঝে না! আরে, কোথায় পা ফেলছ!'

এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম আমি।

'পা মুছে তারপর যেখানে খুশি যাও,' সতর্ক করে দিল আমাকে। তারপর বলল, 'তোমার জন্যে কফি তৈরি করে রেখেছি, সেলুনে চলে যাও।'

তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম সেলুনে। বুঝলাম ঘন্টা দুই আগে পৌঁছেচে রডরিক, সেই থেকে জলকুমারীকে দম ফেলার ফুরসত দেয়নি।

খানিক পর সেলুনে এল ও। প্রকাণ্ড মুখটা থমথম করছে। বুঝলাম কি যেন বলতে চায় আমাকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ল্যাম্পনি কোথায়?'

'রায়ানো বেওয়াদের মনোরঞ্জন করছে,' কর্কশ গলায় বলল ও।

সমর্থ সব পুরুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই সেন্ট মেরীতে, তাই তাদের বেশির ভাগই রায়ানো দ্বীপে মার্কিন এয়ারফোর্স বেস-এ তিন বছরের চুক্তিতে কাজ করতে যায়। যুবতী স্ত্রীদের রেখে যায় সেন্ট মেরীতে, রডরিকের ভাষায় এই সকল মেয়েরা রায়ানো বেওয়া।

'ল্যাম্পনিকে দু'ঘা লাগানো দরকার তোমার, মাসুদ,' চিন্তিতভাবে বলল রডরিক। 'এভাবে চললে আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওর মগজ পচে যাবে। সেই সোমবার থেকে আজ পর্যন্ত রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা এতেই মেতে আছে ও।'

ল্যাম্পনির ভাল-মন্দের ব্যাপারে সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকে রডরিক, কিন্তু এই মুহূর্তে ওর কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটু ঈর্ষার সুরও লক্ষ করলাম।

আমি চুপ করে আছি দেখে প্রসঙ্গ বদল করল ও। জানতে চাইল। 'তোমার পার্টির লোকেরা কেমন?'

'প্রচুর টাকা দিচ্ছে।'

কফির কাপ থেকে মুখ তুলে এই প্রথম আমার দিকে তাকাল

রডরিক। বলল, 'তোমরা মাছ ধরছ না, মাসুদ। কুলি পীক থেকে লক্ষ্য করেছি আমি। চ্যানেলের ধারে-কাছেও যাও না। ইনশোরে কি যেন করছ তোমরা।'

'ঠিক ধরেছ, রডরিক,' এরবেশি কিছু বললাম না আমি, কোন প্রশ্নও করল না ও।

শুধু বলল, 'এই, মাসুদ। ওদের ওপর নজর রেখো। মেজাজ গরম করবে না, আর ভুলেও অসতর্ক হবে না। মানুষ ভাল না ওরা। ছোকরাটার কথা জানি না, কিন্তু বাকি দু'জন অসুবিধে।'

'মনে রাখব তোমার কথা।'

'গত বছর হোটেলে যে নতুন মেয়েটা এসেছে, মারিয়া, তাকে তো তুমি চেন।'

ভুরু কুঁচকে উঠল আমার। শুধু সুন্দরী নয়, অত্যন্ত সাদাসিধে আর সরল মেয়ে মারিয়া। দ্বীপের সবাই ওকে পছন্দ করে। 'কি হয়েছে তার?'

'গত রাতের খবর এটা,' বলল রডরিক। 'লালমুখোটা মারিয়াকে নিজের কামরায় নিয়ে গিয়েছিল।'

অতিরিক্ত দু'পয়সা কামাবার জন্যে হোটেলের কাজ সেরে বাছাই করা কিছু বোর্ডারের মনোরঞ্জন করতে যায় বটে মারিয়া। বললাম, 'তাতে কি হয়েছে?'

'লোকটা প্রচণ্ড মারধোর করেছে মারিয়াকে,' কফি শেষ করে পিরিচে ঠক করে কাপটা নামিয়ে রাখল রডরিক। 'তারপর এত বেশি টাকা দিয়েছে যে মারিয়া আর পুলিসের কাছে যায়নি।'

নিঃশব্দে শুনলাম কথাটা, কিন্তু প্যানথারের উপর রাগের মাত্রা আরও কয়েক ডিগ্রী বাড়ল আমার। মারিয়ার মত মেয়ের গায়ে হাত তোলা শুধু কাপুরষতা নয়, চরম নীচতার পরিচয়।

'লোক ভাল নয় ওরা, মাসুদ। এটা তোমার জানা উচিত বলে মনে করি।'

'ধন্যবাদ, রডরিক।'

পরমুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠল রডরিক। 'সাবধান-ফের যদি ওরা জলকুমারীকে নোংরা করে, তোমাকে ধরব আমি। সেলুন আর ডেক হেগে-মুতে বিচ্ছিরি করে রেখেছিল-চোখ বুজে ছিলে নাকি?'

জলকুমারীকে অ্যাডমিরালটি জেটিতে নিয়ে আসতে আমাকে সাহায্য করল ও, তারপর গজ গজ করতে করতে নেমে গেল। জানি, সারাটা দিন স্ত্রীর কাছে আমার নামে অসংখ্য অভিযোগ করবে ও আজ। জলকুমারীর দুর্দশা দেখলে মেজাজ ঠিক থাকে না ওর।

রোদ উঠতে একা পৌঁছুল নিরো। 'হাই, স্কিপার,' ডেকে লাফিয়ে পড়ে একগাল হাসল সে।

সেলুনে নিয়ে গিয়ে কফি খেতে দিলাম ওকে। 'আমার কাছ থেকে কি নাকি জানার আছে তোমার, সত্যি?'

'দেখুন, মি. রানা,' তার বক্তব্য আমাকে বিশ্বাস করাবার জন্যে ব্যস্ততার সাথে বলল নিরো, 'আরও আগে আপনার সাহায্য না চাওয়ার জন্যে আমি দায়ী নই। আমি ওদেরকে প্রথম থেকেই বলেছি, স্কিপার ভাল মানুষ, তার সাহায্য নিতে পারি আমরা। কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। যাই হোক, আজ হঠাৎ ওরা আমার কথা মেনে নিয়েছে।'

'যাই হোক,' অন্যমনস্কভাবে বললাম আমি। ভাবছি অন্য কথা। নিরোকে একা আসতে দিল কেন ব্ল্যাঙ্ক? এর একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে, নিরো মূল্যবান কিছু তথ্য নিজের কাছে রেখে দিয়েছে, যা সে এখুনি ওদের সাথে ভাগাভাগি করতে চায় না। এই রহস্যময় তথ্যগুলোই নিরোর ইনশিওরেন্স। তাই আমার সাথে আলোচনার সময় সাথে আর কাউকে নিতে চায়নি সে। তারাও জোর খাটাতে পারেনি।

'স্কিপার,' আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল নিরো, 'আমরা একটা দ্বীপ খুঁজছি, নির্দিষ্ট একটা দ্বীপ-কেন, তা আমি আপনাকে

বলতে পারব না। দুঃখিত।'
'কিছু এসে যায় না,' ওকে জানালাম। কিন্তু মনে মনে বললাম, ওদের কাছ থেকে কি আশা কর তুমি, নিরো? সেই নির্দিষ্ট দ্বীপে ওদেরকে একবার নিয়ে গেলেই তোমার প্রাণের শত্রু হয়ে উঠবে ওরা, এ কথা কি একবারও ভাবছ না? সুদর্শন চেহারার দিকে আরেকবার তাকালাম আমি। হঠাৎ অনভ্যস্ত স্নেহে ছেয়ে গেল আমার বুক। সম্ভবত ওর সরলতাই এর কারণ। দেখলাম রোমাঞ্চের উত্তেজনায় ছেলেটা একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, ক্লান্ত বুড়ো দুনিয়াটা যে আসলে জায়গা হিসেবে খুব ভাল নয় সে সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই।
'কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'
'একশোবার, স্কিপার-কি আবার মনে করব!' উৎসাহ দিয়ে বলল নিরো।
'কতটুকু চেন তুমি ওদেরকে, নিরো?'
বিস্ময় ফুটে উঠল নিরোর চোখে, পরমুহূর্তে গম্ভীর হল সে। 'ভালই চিনি,' সাবধানে উত্তর দিল সে। 'কেন?'
'একমাসও হয়নি ওদের সাথে পরিচয় হয়েছে তোমার,' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লাম, নিরোর চেহারা দেখে বুঝলাম ঠিক জায়গাতেই গিয়ে লেগেছে সেটা। 'কিন্তু জ্ঞান হবার পর থেকে এ ধরনের লোকদেরকে চিনি আমি।'
'কিন্তু আপনার এসব কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না, মি. রানা।' ওকে ছেলেমানুষ ধরে নিয়েছি, এটা বুঝতে পেরে বিরূপ হয়ে উঠেছে আমার ওপর।
'শোন, নিরো। যে উদ্দেশ্যেই এসে থাক, ভুলে যাও সব। তোমার ভালর জন্যেই বলছি। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও তুমি। এর মধ্যে তোমার কোন স্বার্থ রক্ষা হবে না।'
'অসম্ভব,' বলল নিরো। 'আপনি এসব বুঝবেন না।'
'বুঝি, নিরো। সত্যিই বুঝি। এই একই পথের এ মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত আসা যাওয়া করেছি আমি কয়েকবার, এর ভালমন্দ সব জানি।' এরপর কাতর কণ্ঠে বললাম, 'তোমার কোন ক্ষতি হোক, তা চাই না, নিরো। আমি হয়ত নিজেকে নিয়েই এত ব্যস্ত থাকব যে তোমার দিকে খেয়াল দিতে পারব না...'
'নিজেকে রক্ষা করতে জানি আমি। দয়া করে আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না।' মুখটা লাল হয়ে উঠেছে ওর।
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা। বুঝতে পারছি, ভাবাবেগ এবং সময় দুটোই অযথা ব্যয় করছি আমি। ওর বয়সে আমার সাথে কেউ যদি এভাবে কথা বলত তাকে আমিও অথর্ব ভাবতাম।
'ঠিক আছে, নিরো,' মৃদু কণ্ঠে বললাম ওকে, 'এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলছি না তোমাকে। কিন্তু একথা ঠিক তোমার কিছু হলে খারাপ লাগবে আমার।'
'ভাববেন না, কিছুই হবে না আমার।' ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এল নিরো। সরল, সুন্দর হাসিতে ভরে উঠল আবার তার মুখ। 'যাই হোক, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'
'দ্বীপটার কথা কি বলবে বল।'
কেবিনের চারদিকে তাকাল নিরো, তারপর প্রস্তাব করল, 'চলুন, ব্রিজে যাই।'
খোলা জায়গায় এসে চার্ট টেবিলের উপরের শেলফ থেকে একটা প্যাড আর এক টুকরো পেন্সিল টেনে নিল ও। 'আমার ধারণা, আফ্রিকার তীর ভূমির ছয় থেকে দশ মাইল দূরে, এবং রোভুমা নদীর মুখ থেকে দশ থেকে ত্রিশ মাইল উত্তরে পাওয়া যাবে দ্বীপটাকে।'
'এ তো বিশাল একটা এলাকা, নিরো,' বললাম ওকে। 'শুধু এটুকু জানলে ওটাকে খোঁজার কোন মানে হয় না-পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আর কি জানো বল।'
আমার চোখে চোখ রেখে কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল ও।

তারপর মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল। অবশেষে মনস্থির করে পেন্সিল দিয়ে প্যাডে একটা নিচু দিগন্তরেখা আঁকল। 'সী-লেভেল...,' বলল ও, তারপর দিগন্তরেখাটার গা থেকে একটা রেখা তুলে পাশাপাশি উঁচু-নিচু ভঙ্গিতে টেনে নিয়ে চলল, এবং হঠাৎ রেখাটা উঠতে শুরু করল উপরদিকে খাড়াভাবে। রেখাটা আবার নেমেও এল প্রায় খাড়াভাবে। এইভাবে তিনবার। স্পষ্ট তিনটে পর্বতচূড়া এঁকেছে নিরো, বুঝতে অসুবিধে হল না। বলল, 'কাঠামোটা সাগর থেকে এই রকম দেখতে হবে। পাহাড় তিনটে ভলক্যানিক ব্যাসাল্ট, ঘাস বা গাছপালা নেই বললেই চলে, শুধুমাত্র পাথর।'

'দি ওল্ড মেন...,' দেড় জোড়া বুড়োকে দেখেই চিনেছি আমি। 'কিন্তু হিসেবে ভুল আছে তোমার, নিরো। তীর থেকে কমপক্ষে বিশ মাইল দূরে ওগুলো।'

'কিন্তু মেইন ল্যাণ্ড থেকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে তো?' দ্রুত জানতে চাইল ও। 'দৃষ্টিসীমার মধ্যে হতে হবে...'

'তা হবে। পাহাড়ের মাথা থেকে অনেকদূর দেখতে পাওয়া যায়।'

আমার চোখে চোখ রেখে প্যাড থেকে স্কেচ আঁকা কাগজটা ছিঁড়ে নিল নিরো। সেটাকে টুকরো টুকরো করল যত্নের সাথে, তারপর ফেলে দিল হারবারে। 'নদী থেকে কতটা উত্তরে?'

'ষাট থেকে সত্তর মাইলের মধ্যে।'

চিন্তিত দেখলাম নিরোকে। একটু পর মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'হ্যাঁ, তাই হবে-তাই হওয়া উচিত,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসল একটু। 'মিলে যাচ্ছে। কিন্তু নির্ভর করছে কতক্ষণ লাগবে আমাদের...' একটু থেমে প্রশ্নটা সরাসরি করল আমাকে, '...ওখানে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন, স্কিপার?'

'পারব। কিন্তু অনেক দূরের পথ। বোটে রাত কাটাবার জন্যে তৈরি হয়ে এলে সবচেয়ে ভাল হয়।'

'ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসছি,' ব্যস্ত এবং উত্তেজিতভাবে নেমে গেল নিরো। কিন্তু জেটিতে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রিজের দিকে তাকাল আবার সে। বলল, 'দ্বীপটা সম্পর্কে...কি রকম দেখতে বা কি নাম ইত্যাদি বিষয়ে ওদের সাথে আলোচনা করবেন না-ও. কে?'

'ঠিক আছে, নিরো,' আশ্বাস দিয়ে বললাম। 'যাও তুমি।'

অ্যাডমিরালটি চার্ট দেখার জন্যে নিচে নেমে এলাম আমি। ব্যাসাল্ট পাথরের শৈলশিরার মধ্যে দ্য ওল্ড মেন পর্বতশৃঙ্গগুলো সবচেয়ে উঁচু। আফ্রিকার মেইনল্যাণ্ডের সাথে সমান্তরালভাবে দীর্ঘ দুশো মাইল বিস্তার এই রীফের। পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে রীফটা, কিন্তু খানিক পর পর আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ছড়ানো ছিটানো প্রবাল দ্বীপ, বালি-দ্বীপ এবং মগ্নচড়ার বিশৃঙ্খলতার মধ্যে এর উপস্থিতি প্রকট। দি ওল্ড মেন বসবাসের অনুপযোগী। পানি নেই ওখানে। ওগুলোকে ঘিরে রীফের ভিতর দিয়ে কয়েকটা গভীর চ্যানেল রয়েছে। যে এলাকা জুড়ে নিয়মিত আসা যাওয়া আমার, তার চেয়ে অনেক উত্তরে জায়গাটা, তবে গত বছর একদল বায়োলজিস্টকে নিয়ে ওখানে যেতে হয়েছিল আমাকে।

ওল্ড মেনের উল্টো দিকের একটা দ্বীপে তিন দিনের জন্যে তাঁবু গেড়েছিলাম আমরা। ঘেরা খাঁড়িতে সব আবহাওয়ার উপযোগী একটা অ্যাঙ্কোরেজ আছে ওখানে। পামগাছের মাঝখানে জেলেরা একটা কুয়া তৈরি করে রেখেছে, লবণাক্ত হলেও তার পানি খাওয়া যায়। অ্যাঙ্কোরেজে দাঁড়িয়ে চ্যানেলের ওপারে দ্য ওল্ড মেন-এর কাঠামো ঠিক নিরো যেভাবে এঁকেছে সেই রকম দেখতে লাগে। সেজন্যেই দেখা মাত্র চিনতে পেরেছি আমি।

আধঘন্টা যেতে না যেতেই গোটা দল এসে হাজির। ট্যাক্সির মাথায় রশি দিয়ে বাঁধা এবং সবুজ ক্যানভাস দিয়ে মোড়া মোটাসোটা কিছু, হয়ত কোন ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছে। এটাকে

বয়ে আনার জন্যে দ্বীপের দু'জন বেকার যুবককেও ধরে আনতে ভুল করেনি। যার যার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে এদেরকে অনুসরণ করছে ওরা তিনজন।

ধরাধরি করে ফোরডেকে নিয়ে এসে নামিয়ে রাখল ওরা ক্যানভাস মোড়া জিনিসটা। কিছুই জানতে চাইলাম না আমি। প্যানথারের কপালে এবং নাকের পাশে আঁচড়ের কয়েকটা দাগ লক্ষ করলাম। সাদা ক্রীম লেপে সেগুলোকে চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ও। হোটেল হিলটনের মারিয়াকে মারধোর করেছে ও, কথাটা ভুলিনি। মারিয়া আর কিছু না পারুক, নখ দিয়ে ওর মুখ আঁচড়ে দিয়েছে বুঝতে পেরে একটু খুশি লাগল। চোখাচোখি হতে হাসলাম আমি। 'তোমাকে আবার মারল কে হে?'

আমার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে ধীরে ধীরে বসল প্যানথার ফাইটিং চেয়ারে। জবাব দিল না দেখে আবার বললাম, 'যা সুন্দর লাগছে তোমাকে, ইচ্ছা করলেই বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে পার।'

শেষ চুমুক দিয়ে খালি বিয়ারের ক্যানটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে, একটানে পিস্তল বের করে টার্গেট প্র্যাকটিস করল। ফুটো ক্যানটা ছিটকে চলে গেল জলকুমারীর বাইরে, তারপর পানিতে পড়ল। আমার দিকে ফিরে নিঃশব্দে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সে। কথা বলল না।

সারাটা পথ একের পর এক বিয়ার খেল সে, এবং প্রতিটি ক্যানে গুলি লাগাল অব্যর্থভাবে।

দুপুরে নিরোকে হুইল দিয়ে ডেকের নিচে নামলাম। কেবিনেট খুলে জিনের বোতল নিয়ে বসে আছে দেখলাম ব্ল্যাঙ্ক।

'আর কতদূর?' জানতে চাইল সে। হরদম মদ খাচ্ছে বলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনে বসেও ঘামছে। এর জন্যে ভুগতে হবে তাকে।

'আর দেড়-দুই ঘন্টা।'

সুযোগ বুঝে নর্দার্ণ টাইড চ্যানেলের ভিতর দিয়ে যাবার প্রসঙ্গ তুলে আরও তিনশো ডলার খসালাম ওর পকেট থেকে।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদে সামনেটা ঝাপসা। দি ওল্ড মেন-এর মাথা তিনটে কালো ভূতের মুণ্ডুর মত বিচ্ছিন্ন দেখাচ্ছে, চ্যানেলের ওপর ঝুলছে যেন। চোখে বিনকিউলার তুলে চূড়া তিনটে পরীক্ষা করছে নিরো, অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর বিনকিউলার নামাল সে, আমার দিকে ফিরে সানন্দে হাসল। ছুটে ককপিটে নেমে যাবার আগে বলল, 'মিলে গেছে, স্কিপার!'

ফোরডেকের উপর দিয়ে দ্রুত এগোল ওরা, ক্যানভাসে ঢাকা কার্গোটাকে পাশ কাটিয়ে রেলিংয়ের সামনে দাঁড়াল পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে। দ্বীপটার দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে।

উজান স্রোতের অনুকূলে চ্যানেল পেরোচ্ছে জলকুমারী, ঠিক করেছি এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ওল্ড মেনের পুবপ্রান্তে পৌঁছুবার চেষ্টা করব এবং সবচেয়ে কাছের চূড়াটার নিচের সৈকতে বোট ভিড়াব। এই উপকূল ভরাজোয়ারের সময় সতেরো ফুট তলিয়ে যায়, তাই অগভীর পানিতে যেতে নেই। বোকামি করে কেউ যদি যায়, ভাঁটার সময় বোটের নিচ থেকে পানি সরে যাবার পর আবিষ্কার করবে শুকনো জায়গায় উঠে বসে আছে তার বোট।

আমার হ্যাণ্ড-বিয়ারিং কম্পাসটা চেয়ে নিয়ে নিরো সেটা প্যাকেটে ভরল তার চার্ট, পানি ভর্তি থারমস আর এক বোতল সল্ট ট্যাবলেটের সাথে। সন্তর্পণে বীচের দিকে এগোচ্ছি জলকুমারীকে নিয়ে, ওদিকে নিরো আর ব্ল্যাঙ্ক জুতো ও ট্রাউজার খুলে তৈরি হচ্ছে। সাদা বালিতে বোটের কীল ধাক্কা খেতেই চিৎকার করে বললাম, 'ও. কে.-নেমে পড়ো এবার।'

রেলিং টপকাল নিরো। মই বেয়ে নেমে যাচ্ছে সে। তাকে অনুসরণ করছে ব্ল্যাঙ্ক। ওদের বগল পর্যন্ত ডুবে গেল পানিতে।

মাথার উপর হ্যাভারস্যাকটা তুলে নিয়ে বীচের দিকে এগোচ্ছে নিরো।

'দু'ঘন্টা!' হাঁক ছেড়ে জানিয়ে দিলাম ওদেরকে। 'তার বেশি দেরি করলে তীরেই ঘুম দিয়ো। ভাটার সময় তোমাদেরকে তুলতে আসব না আমি।'

হাত নেড়ে হাসল নিরো। জলকুমারীকে সাবধানে পিছিয়ে আনার সময় দেখলাম পায়ে ট্রাউজার গলিয়ে নিয়ে পামগাছের ভিতর দিয়ে হাঁটছে ওরা। একটু পরই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানিতে দশ মিনিট ঘোরাঘুরি করে যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেলাম। পানির তলায় গাঢ় ছায়া মত দেখে জলকুমারীকে দাঁড় করালাম, নিচে নামিয়ে দিলাম একটা হালকা নোঙর।

ভুরু কুঁচকে সারাক্ষণ লক্ষ করছে আমাকে প্যানথার। একটা ফেস প্লেট আর একজোড়া দস্তানা পরে নিলাম। সাথে নিলাম ছোট একটা নেট আর ভারী একটা টায়ার লিভার। রেলিং টপকে মই বেয়ে নেমে গেলাম নিচে। উপর দিকে তাকিয়ে দেখি যা ভেবেছি তাই। রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্যানথার আমার দিকে। 'এ তোমার কম্ম নয়,' বললাম ওকে। পানির চল্লিশ ফুট নিচে একেবারে তলায় দৃষ্টি চলে গেল আমার।

পানিতে ডুব দিয়ে এক দমে জাল ভর্তি ডাব্‌ল-শেল সান ক্ল্যাম তুলে আনতে পেরে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলাম আমি। ফোরডেকে বসে খোলস ছাড়ালাম ওগুলোর, রডরিকের ভয়ে খালি শেলগুলো পানিতে ফেলে দিয়ে ধুয়ে ফেললাম ডেকটা। তারপর কিচেনে গিয়ে মিষ্টি শাঁসগুলো একটা স্টু-পটে ওয়াইন, রসুন, লবণ, কাঁচা মরিচ এবং সামান্য শুকনো মরিচ বাটার সাথে রেখে দিলাম। গ্যাসের চুলোটা জ্বালাই ছিল, আগুন কমিয়ে পটটা

বসিয়ে দিলাম তাতে, এবং ঢাকনি চাপা দিয়ে বেরিয়ে এলাম ডেকে। রেলিংয়ের কাছ থেকে ফিরে এসে আবার নিজের মসনদে বসেছে প্যানথার। সিগারেট ধরিয়েছে একটা, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে মেজাজ ভাল নেই।

'বল, মহারথী, কি অসুবিধে হচ্ছে তোমার?' যেচে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম ওকে। 'খুব বুঝি নিরস লাগছে? লাথি মারার জন্যে ছোট একটা মেয়ে পেলে খুশি হও?'

চোখ কুঁচকে তাকাল ও আমার দিকে, ভাবছে খবরটা পেলাম কিভাবে। 'মুখটা বেশি ফাঁক হয়ে গেছে তোমার, রানা। মনে হচ্ছে সেলাই দরকার।'

এ-ধরনের মিঠেকড়া বুলি বিনিময় চলল আমাদের মধ্যে, তাতে চমৎকারভাবে কেটে গেল সময়টা। একসময় দূর সৈকতে দুটো মূর্তিকে দেখা গেল-চিৎকার করে এবং হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। নোঙর তুলে আবার সন্তর্পণে এগিয়ে নিয়ে চললাম জলকুমারীকে।

বোটে উঠেই প্যানথারকে নিয়ে ফোরডেকে গোপন শলা-পরামর্শে বসল ওরা। তিনজনই মহা উত্তেজিত, কিন্তু নিরো একেবারে টগবগ করে ফুটছে। কথা বলছে চাপা স্বরে, কিন্তু সবেগে হাত ছুঁড়ে আর মাথা ঝাঁকিয়ে চ্যানেলের দিকটা বারবার দেখাচ্ছে সে। এই প্রথম কোন বিষয়ে ওদেরকে আমি একমত হতে দেখলাম।

ওদের বৈঠক যখন শেষ হল, আর মাত্র এক ঘন্টা বাকি সূর্য ডুবতে। আলোচনার ফলাফল আমাকে ওরা জানাল না, আমিও কোনরকম কৌতূহল দেখালাম না। কিন্তু দাবির সুরে ব্ল্যাঙ্ক জানাল আরও কিছুক্ষণ এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে হবে। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলাম তাকে। বললাম, 'রাজি নই আমি। অন্ধকারে ভাটার মধ্যে আটকা পড়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

ব্ল্যাঙ্কের তাকিয়ে থাকাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চ্যানেল

পেরিয়ে খাঁড়ির নিরাপদ অ্যাঙ্কোরেজে নিয়ে এলাম জলকুমারীকে। লাল টকটকে দিগন্তরেখার নিচে সূর্য ডোবার ঠিক আগেভাগে ভারী দুটো নোঙর ফেলে বোটটাকে শান্ত করলাম, নিজেকে বিশ্রাম দেবার জন্যে দিনের শেষ এবং সন্ধ্যার প্রথম স্কচ নিয়ে বসলাম ব্রিজে। নিচের সেলুনে আবার শুরু হয়েছে ওদের আলোচনা। উৎসাহ নেই, তাই আড়ি পেতে শোনার জন্যে ভেন্টিলেটারের কাছে গেলাম না। খাঁড়ি পেরিয়ে মশাদের প্রথম দলটা পৌঁছে যখন কানের কাছে সুর ভাঁজতে শুরু করল, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম আমি, নিচে নেমে কেবিনে পা দিতেই আচমকা সবাই মৌনব্রত অবলম্বন করল।

জুস, পাইন অ্যাপলের সালাড, বেক করা বীফ-এর সাথে স্টু-প্যানের ক্ল্যাম মিশিয়ে পরিবেশন করলাম। চুপচাপ চার বোবায় খাওয়া শেষ করলাম। সবশেষে শুধু নিরো একটা কথা বলল। তার মৃদু কণ্ঠ ব্রাশ ফায়ারের মত বাজল কানে, নিস্তব্ধতা এমনই জমাট বেঁধে গিয়েছিল কেবিনের ভিতর। 'স্কিপার, আমার বোনের চেয়ে কেউ ভাল রাঁধতে পারে এ আমি বিশ্বাস করতাম না-আজ এক ধাপ নেমে গেল সে।'

বঙ্গ ললনাদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে 'আরেকটা দেব' কিনা জিজ্ঞেস করলাম না, তবে নিঃশব্দে হাসলাম। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার বোনের রান্না তো তাহলে এক দিন খেয়ে দেখতে হয়।'

এবার ব্রাশ ফায়ার নয়, কেবিনে বোমা ফাটতে শুরু করল। হা হা করে হাসছে প্যানথার। তার এই হাসির কারণটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমার।

মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠলাম আমি। জলকুমারীর নোঙর চেক করার জন্যে বেরিয়ে এলাম ডেকে। সব ঠিকঠাক আছে দেখে নিয়ে ফিরতে যাব, এই সময় বাধা দিল আমাকে অকাতরে নেমে আসা ধবধবে চাঁদের আলো।

আমার চারদিকে অদ্ভুত এক মহিমায় উদ্ভাসিত রাতকে দেখতে পাচ্ছি। জলকুমারীর গায়ে স্রোতের পরশ লেগে মৃদু কল কল শব্দ উঠছে, আর অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে আউটার রীফের গায়ে বিধ্বস্ত স্রোতের গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের আওয়াজ। খোলা সাগর থেকে বিশাল বিস্তার এবং আকাশচুম্বী আকার নিয়ে উন্মত্ত গতিতে ধেয়ে এসে বজ্রনির্ঘোষে আছাড় খাচ্ছে ঢেউ গানফায়ার রীফের কঠিন প্রবাল প্রাচীরের গায়ে। যে-ই রেখে থাকুক নামটা, অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। তলপেট কাঁপানো বুম-বুম আওয়াজটা অবিরাম কামানের তোপ দাগার মতই শোনাচ্ছে।

চাঁদের আলো ঝলমলে রূপালী করে তুলেছে চ্যানেলটাকে, আর ওল্ড মেন-এর বিশাল গম্বুজগুলোকে হাতির দাঁতের মত ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে। ওগুলোর নিচে, খাঁড়ি থেকে মোচড় আর পাক খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে অশান্ত আত্মার মত রাতের কুয়াশা।

অকস্মাৎ ক্ষীণ একটা শব্দ শুনে বিদ্যুৎবেগে আধ পাক ঘুরে দাঁড়ালাম। দুই হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্যানথার, শিকারী চিতাবাঘের মত নিঃশব্দে আমাকে অনুসরণ করে এসেছে ও। শুধু একজোড়া জকি শর্টস পরে আছে। চাঁদের আলোয় শরীরটাকে পেশীবহুল এবং চকচকে দেখাচ্ছে। লম্বা হাতে ধরা পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ অটোমেটিকটা ওর ডান উরুর পাশে। পরস্পরের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলাম। ধীরে ধীরে ঢিল পড়ল আমার পেশীতে।

'পিছন থেকে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না তুমি,' বললাম ওকে।

'এখনও সময় আসেনি। যখন আসবে, সামনেই দেখতে পাবে আমাকে,' চাপা স্বরে, যেন গোপন পরামর্শ করছে আমার সাথে, বলল ও। অটোমেটিকটা বুকের সামনে তুলল। 'তখন

তোমার আর আমার মাঝখানে থাকবে এই মহাজন।' তারপর নিঃশব্দে হাসল ও। চাঁদের আলো লেগে ঝিক করে উঠল দাঁতগুলো।

ছয়

সূর্য ওঠার আগে ব্রেকফাস্ট সারলাম আমরা। কফি নিয়ে ব্রিজে উঠে এলাম আমি। চ্যানেলের উপর দিয়ে খোলা সাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জলকুমারী। নিচের সেলুনে সাত সকালেই মদ নিয়ে বসেছে ব্ল্যাঙ্ক, আর প্যানথার তার নির্দিষ্ট ঠিকানা ফাইটিং চেয়ারে আশ্রয় নিয়েছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আজকের দিনের প্রোগ্রাম ব্যাখ্যা করছে নিরো।

উত্তেজনায় ছিলা টেনে ধরা ধনুক হয়ে আছে ও, নাকে প্রথম পাখির গন্ধ নেয়া তরুণ শিকারী কুকুরের মত কাঁপছে। ওল্ড মেন-এর চূড়াগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল সে, 'ওগুলোর কোনাকুনি অবস্থান এবং দূরত্ব মাপতে চাই আমি, স্কিপার। আপনার হ্যাণ্ড বিয়ারিং কম্পাসটা ব্যবহার করব। যখন যেদিকে যেতে হবে সাথে সাথে জানাব আপনাকে।'

'তার চেয়ে তোমার বিয়ারিং দাও আমাকে, নিরো। হিসেব কষে আমিই তোমাকে নির্দিষ্ট স্পটে পৌঁছে দেব।'

অপ্রতিভ দেখাল ওকে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে পরামর্শটা প্রত্যাখ্যান করল। বলল, 'কাজটা আমার পদ্ধতিতেই হোক।'

বিরক্তি চেপে বললাম, 'বেশ।'

সাথে সাথে দৌড়ে চলে গেল ও পোর্ট রেইলের কাছে।

কম্পাস লেন্সের মধ্যে দিয়ে চূড়াগুলোকে দেখছে গভীর মনোযোগের সাথে। দশ মিনিট পর আবার কথা বলল ও। 'এখন আমরা পোর্টের দিকে দুই পয়েন্ট ঘুরতে পারি, স্কিপার?'

'পারি বৈকি,' ওর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছি। 'কিন্তু তার ফলে গানফায়ার রীফের শেষ মাথার দিকে আটকা পড়ে যাবে জলকুমারী-এবং ধাক্কা খেয়ে দু'ফাঁক হয়ে যাবে কীল।'

রীফের পেঁচানো গোলকধাঁধায় আরও দু'ঘন্টা চক্কর খেয়ে অবশেষে একটা পথ তৈরি করে বেরিয়ে আসতে পারলাম খোলা সাগরে। ঘুরপথে এখন আবার ফিরে যাচ্ছি পুব দিক থেকে গানফায়ার রীফের কাছে পৌঁছুবার জন্যে।

ঠিক কোথায় পৌঁছুতে চাইছে তা বলছে না নিরো। একটু একটু করে সুতো ছাড়ছে ও। ফলে গোটা সমস্যাটা একসাথে দেখার সুযোগ নেই আমার।

বাইরের দিকে স্রোত এখানে সংগ্রামী জনতার বিশাল মিছিলের মত এগোচ্ছে মেইন ল্যাণ্ডের দিকে। ক্রমশ উঁচু সাগর তলের ঢালে বাধা পেয়ে তা ফুলে-ফেঁপে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। দোল খাচ্ছে জলকুমারী, কিনারা ঘেঁষে আউটার রীফের দিকে এগোচ্ছে সে, বারবার পাক খেয়ে স্রোতের দিকে ফেরার প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠছে তার আচরণে।

প্রবাল প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে স্রোতের ধাবমান মিছিল অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর আক্রোশে বিস্ফোরিত হয়ে অসংখ্য আকাশছোঁয়া স্তম্ভের আকারে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে, উন্মত্ত গতিতে পাঁচিল টপকে ওপারে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে-তার গগনবিদারী আওয়াজ কয়েক মাইল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে বাতাসকে। নিচে চাপা পড়া মিছিলের অংশটা ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, সাদা ফেনার পাহাড়ে পরিণত হয়ে পিছিয়ে আসার সময় মুহূর্তের জন্যে দেখা যাচ্ছে প্রাচীরের বিশাল কালো ফণার বিস্তার। ইতিমধ্যে সাগর তলের ঢালে বাধা পেয়ে ফুলে-ফেঁপে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসতে

শুরু করেছে পরবর্তী স্রোতের মিছিল।

নিরো আমাকে একটানা দক্ষিণ-ঘেঁষা দিক-নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ রীফের কাছাকাছি কোন স্পটের দিকে পৌঁছুতে চাইছে ও। লক্ষণ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছি ওর লক্ষ্যস্থলের খুব কাছে চলে এসেছি আমরা। কম্পাস-লেন্সের ভিতর দিয়ে ব্যগ্রভাবে একবার একটা তারপর আরেকটা চূড়ার দিকে বারবার তাকাচ্ছে নিরো।

'বোট সোজা রাখুন, স্কিপার,' কাঁপা গলায় আবেদন জানাল ও। 'ওই হেডিংয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান।'

ভয়াল প্রবালের দিক থেকে দৃষ্টি ছিঁড়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে সামনে তাকালাম আমি। পিঠ উঁচু করে পরবর্তী স্রোতের মিছিল হামলা চালাতে যাচ্ছে। বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল সেটা-কিন্তু পাঁচশো গজ সামনের একটা সরু পয়েন্টে স্রোতটাকে ভেঙে পড়তে না দেখে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আমার দৃষ্টি। দেখলাম লাফ দিয়ে শূন্যে না চড়ে স্রোতটা অখণ্ডভাবে ছুটছে ল্যাণ্ড-এর দিকে। এর দু'দিকের প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হচ্ছে স্রোত, কিন্তু মাঝখানের এই পয়েন্টে একটা ফাঁক দিয়ে নির্বাধায় প্রবেশ করছে পানির তোড়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রডরিকের একটা বর্ণনার কথা। যেভাবে বলেছিল আমাকে, পরিষ্কার মনে পড়ে গেল আমার, এখনও কানে বাজছে ওর উচ্চারণ ভঙ্গি।

'বুঝলে, মাসুদ, উনিশ বছর বয়সে গানফায়ার ব্রেক-এর গর্ত থেকে আমার প্রথম জু-ফিশ ধরি আমি। সেই থেকে আর কেউ আমার সাথে মাছ ধরতে যেতে সাহস পায় না। দোষ নেই ওদের। গানফায়ার ব্রেকে যাবার মত বোকামি আমি নিজেও আর করব না-এখন বুদ্ধি হয়েছে, ম্যান।'

গানফায়ার ব্রেক! হঠাৎ বুঝতে পারলাম জলকুমারীকে নিয়ে গানফায়ার ব্রেক-এর দিকেই এগোচ্ছি আমরা। রডরিকের সম্পূর্ণ

বক্তব্যটা স্মরণ করার চেষ্টা করছি আমি।

'...জোয়ারের ঘন্টা দুই আগে খোলা সাগরের দিক থেকে এগোচ্ছ তুমি, ফাঁকটার মাঝখান বরাবর সোজা রাখো তোমার বোটের নাক, যতক্ষণ না প্রকাণ্ড একটা প্রবালের মস্ত মাথাকে তোমার স্টারবোর্ডের সাথে সমান্তরাল ভাবে দেখতে পাচ্ছ। দেখলেই চিনতে পারবে ওটা। যতটা পার গা ঘেঁষে পাশ কাটাও ওটাকে, তারপরই বোটের নাক স্টারবোর্ডের দিকে দ্রুতবেগে ঘুরিয়ে নাও-ব্যস! নিজেকে তুমি মেইন রীফের পিছনের গায়ে নিখুঁতভাবে তৈরি বিশাল এক গর্তের ভেতর আবিষ্কার করবে। যতটা গর্তের পিছনের দেয়াল ঘেঁষে থাকবে ততই নিরাপদ তুমি, ম্যান...' স্পষ্ট মনে পড়ছে সব, লর্ড নেলসনের পাবলিক বারে বসে তার এই অভিজ্ঞতার কথা বলছিল রডরিক। সবাই বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তার কথা শুনছিল। সেন্ট মেরী দ্বীপে একমাত্র সে-ই দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়ে গানফায়ার ব্রেক পেরিয়েছে। 'যত ভারী নোঙরই ফেলো তুমি, তোমার বোটকে ওখানে ধরে রাখতে পারবে না। বোটকে ফাঁকটার মধ্যে স্থির রাখার জন্যে স্টীল রডের বৈঠার উপর ঝুঁকে পড়তে হবে তোমাকে–গানফায়ার ব্রেকে গর্তটা গভীর, ম্যান, খুবই গভীর; আর জু-ফিশগুলো ওখানে প্রকাণ্ড। একদিন তো আমি চারটে মাছ ধরলাম, সবচেয়ে ছোটটার ওজন ছিল তিনশো পাউণ্ড। আরও নিতে পারতাম-কিন্তু সময় হয়ে গিয়েছিল। জোয়ারের পর গানফায়ার ব্রেকে তুমি এক ঘন্টার বেশি থাকতে পার না। পানি একবার নামতে শুরু করলে কার বাপের সাধ্যি ওখানে টেকে-সড়াৎ করে টান দেয় সাগর, বিদ্যুৎবেগে সব পানি ব্রেক-এর মধ্যে দিয়ে লাফ মেরে পড়ে তার পেটে। যে পথে ঢুকেছ সেই পথ দিয়েই বেরুতে হবে তোমাকে। শুধু আগের চেয়ে একটু সাবধান হবে তুমি, কারণ ফেরার সময় তোমার বোটে একটন মাছ আর তোমার কীলের নিচে দশ ফুট কম পানি রয়েছে। রীফের পেছন দিকের একটা চ্যানেল ধরে

বেরুবার আরেকটা পথ আছে বটে, কিন্তু ওটার কথা আমি এমন কি আলোচনাও করতে চাই না। মাত্র একবার ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিলাম।'

নিরোর বিয়ারিং জলকুমারীকে এখন স্পষ্টই গানফায়ার ব্রেক-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

'যথেষ্ট হয়েছে, নিরো,' গম্ভীরভাবে বললাম ওকে। 'এর বেশি এগোচ্ছি না আমরা।' থ্রটল খুলে দিলাম, কোর্স বদলে বোটের নাক দিগন্তরেখার দিকে ঘুরিয়ে নিলাম। তারপর ফিরলাম নিরোর দিকে।

'এ আপনি কি করলেন!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল নিরো। 'প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা-আরও একটু যেতে পারতাম না?'

'তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে, নিরো?' ককপিট থেকে হুঙ্কার ছেড়ে জানতে চাইল প্যানথার।

'না, ঠিক আছে সব,' চেঁচিয়ে উত্তর দিল নিরো, তারপর ঝট করে আমার দিকে ফিরে রাগে ফেটে পড়ল। 'এ আপনার অন্যায়, স্কিপার। আপনার সাথে চুক্তি হয়েছে...'

'তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই, নিরো...' চার্ট টেবিলে নিয়ে গেলাম ওকে। অ্যাডমিরালটি চার্টে ব্রেক-এর কাছে পানির গভীরতা উল্লেখ করা হয়েছে ত্রিশ ফ্যাদম, কিন্তু এর কোন নাম বা সেইলিং ইন্সট্রাকশন দেয়া হয়নি। ব্রেক থেকে ওল্ড মেনের সর্বোচ্চ চূড়া দুটোর বিয়ারিঙে পেন্সিলের দাগ টানলাম দ্রুত, তারপর প্রোট্র্যাক্টর (রের্মরটর্ডমর) দিয়ে মাপলাম সদ্য তৈরি কোণটাকে।

'কারেক্ট?' জানতে চাইলাম আমি।

আমার লেখা সংখ্যাটার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে নিরো।

'ঠিক ধরেছি, তাই না?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল নিরো। 'হ্যাঁ,' বলল ও, 'ওখানেই যেতে চাই।'

গানফায়ার ব্রেক-এর কথা বিশেষভাবে জানালাম ওকে।

'কিন্তু ওখানে আমাদেরকে যেতেই হবে,' আমি থামতেই ব্যাকুল কণ্ঠে বলল ও, যেন আমার একটা কথাও কানে ঢোকেনি ওর।

'উপায় নেই, দুঃখিত,' বললাম ওকে। 'সেন্ট মেরী দ্বীপের গ্র্যাণ্ড হারবার ছাড়া আর কোথাও যেতে আগ্রহী নই আমি।' কোর্স বদলে জলকুমারীর নাক সেদিকেই ঘুরিয়ে দিলাম। যতদূর বুঝতে পারছি, চুক্তি বাতিল হয়ে গেল।

মই বেয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেল নিরো। সদলবলে ফিরে এল দুই মিনিটের মধ্যে। ব্ল্যাঙ্ককে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে, আর রাগে ফুঁসছে প্যানথার।

'একবার শুধু হ্যাঁ বলো, ওস্তাদ, তারপর দেখ বানচোতের হাত ছিঁড়ে নিয়ে ভিজে দিকটা দিয়ে পিটিয়ে কেমন লাশ বানিয়ে ফেলি!' শার্টের আস্তিন গুটাচ্ছে প্যানথার।

'ছেলেটা বলছে তুমি নাকি ফিরে যাচ্ছ?' জানতে চাইল ব্ল্যাঙ্ক। 'এ তো ভাল কথা নয়!'

গানফায়ার ব্রেক-এর বিপদটা আবার একবার ব্যাখ্যা করলাম, শুনেই চুপসে গেল ওরা।

'আমাকে আপনি যতটা সম্ভব কাছাকাছি নিয়ে চলুন, বাকিটা আমি সাঁতরে পেরোবো,' আবেদন জানাল নিরো।

ব্ল্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলাম, 'সেক্ষেত্রে ওকে আপনার হারাতে হবে। সে-ঝুঁকি নেবেন আপনি?'

উত্তর দিতে পারল না ব্ল্যাঙ্ক। জানি, নিরো তার কাছে পরশ পাথরের মতই দামি। অন্তত এখনও।

'চেষ্টা করে দেখতে দিন আমাকে,' জেদের সাথে বলল নিরো।

অস্বস্তির সাথে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করল ব্ল্যাঙ্ক।

'ব্রেকে যদি ঢুকতে না পারি, অন্তত স্লেজের সাথে আমাকে

একবার রীফ বরাবর টেনে নিয়ে চলুন,' তখনও বলে চলেছে নিরো। ফোরডেকে সবুজ ক্যানভাস মোড়া জিনিসটা কি এখন বোঝা গেল। 'রীফের সামনের কিনারা বরাবর ব্রেকে ঢোকার মুখ ছাড়িয়ে মাত্র দু'বার টেনে নিয়ে গেলেই চলবে, আমি আর কিছুই চাই না...' করুণ সুরে ভিক্ষা চাইছে এখন নিরো।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ব্ল্যাঙ্ক। আমি জানি, প্রবাল প্রাচীরের গা ঘেঁষে, মাত্র কয়েক গজ দূরে থেকে বোট চালাতে পারব কোন ঝুঁকি না নিয়েই। কিন্তু ঝোপ বুঝে কোপ মারার এই সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া করার ইচ্ছে নেই আমার। চেহারায় উদ্বেগ ফুটিয়ে তুললাম, তারপর বললাম, 'সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে হবে আমাকে,' শ্রাগ করলাম, 'ঠিক আছে, ডেঞ্জার মানি পেলে...'

ডেঞ্জার মানি হিসেবে অগ্রিম দেয়া আরও পাঁচশো ডলার খসিয়ে আনলাম ব্ল্যাঙ্কের পকেট থেকে। আমরা যখন ব্যবসা করছি, ফোরডেকে ক্যানভাসের আবরণ খুলে স্লেজটা বের করতে নিরোকে সাহায্য করছে তখন প্যানথার। ধরাধরি করে ককপিটে নিয়ে এল ওরা সেটাকে।

নোটের বাণ্ডিলটা সরিয়ে রেখে ফিরে এলাম আমি। টানার জন্যে স্লেজটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে।

স্টেনলেস স্টীল আর প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা স্লেজটাকে একনজর দেখেই বুঝলাম যত্ন, মেধা এবং টাকা কোনটাই কম খরচ করা হয়নি এর পিছনে। স্নো রানারের বদলে এর রয়েছে চোখা ফিন কন্ট্রোল, রাডার এবং হাইড্রোফয়েল, এগুলো অপারেট করার জন্যে পাইলট শিল্ডের নিচে ছোট একটা জয়স্টিক দেখা যাচ্ছে।

স্লেজ-এর নাকে একটা আংটা পরানো রয়েছে, দড়ির একটা প্রান্ত বাঁধা হবে ওটায়, অপর প্রান্তটা থাকবে বোটে, স্লেজটাকে টেনে নিয়ে যাবে সে।ট্র্যান্সপারেন্ট শিল্ডের পিছনে চিৎ হয়ে শুয়ে

থাকবে নিরো, স্লেজের চেসিসে তৈরি করা জোড়া ট্যাঙ্ক থেকে অক্সিজেন নেবে ও। ড্যাশবোর্ডে রয়েছে ডেপথ আর প্রেশার গজ, দিক নির্দেশক কম্পাস আর টাইম ইল্যাপস্ ক্লক। জয়স্টিকের সাহায্যে ডাইভের গভীরতা কন্ট্রোল করতে পারবে নিরো। তাছাড়া প্রয়োজনে জলকুমারীকে সোজাসুজি অনুসরণ না করে অনেকটা ডান বা বাম দিকে সরে যেতেও পারবে।

'খুবই সুন্দর জিনিস,' মন্তব্য করলাম।

একটু লজ্জা পেল নিরো। বলল, 'ধন্যবাদ, স্কিপার-আমার নিজের হাতে তৈরি।'

মোটা রাবারের স্যুট পরল নিরো। হুডটা আটকে নিচ্ছে মাথায়। এই সুযোগে ঝুঁকে পড়ে স্লেজের চেসিসে মেজার'স প্লেটটা দেখে নিলাম আমিঃ

Built by Nero's Underwater World
5 Pavillion Arcade
Brighton, Sussex

হুডের ফোকরে নিরোর মুখটা বেরিয়ে আসছে, এই সময় সিধে হয়ে দাঁড়ালাম আমি। একবার দেখেই নাম এবং ঠিকানা মুখস্থ হয়ে গেছে আমার।

'স্লেজ টানার জন্যে ফাইভ নট যথেষ্ট স্পীড, স্কিপার,' বলল ও। 'রীফ থেকে আপনি যদি একশো গজ দূরত্ব বজায় রাখেন, বাইরের দিক থেকে প্রবালের দেহরেখা অনুসরণ করতে পারব আমি।'

'ও. কে।'

'পানির নিচে থেকে আমি যদি হলুদ মার্কার ছাড়ি, গুরুত্ব দেবেন না-পরে ওটার কাছে আবার আমরা ফিরে যাব। কিন্তু আমি যদি লাল মার্কার ছাড়ি, বিপদে পড়তে যাচ্ছি বলে মনে করবেন-সাথে সাথে রীফ থেকে বের করে টেনে তুলে নেবেন আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম, 'তিন ঘন্টা সময় আছে তোমার,' সাবধান করে দিলাম ওকে। 'ব্রেক-এর মধ্যে দিয়ে ভাটার পানি নামতে শুরু করলে সরে যেতে হবে আমাদেরকে।'

'তিন ঘন্টা যথেষ্ট সময়।'

আমি আর প্যানথার ধরাধরি করে বোট থেকে নামালাম স্লেজটাকে, খানিকটা ডুবে গিয়ে পানিতে ভাসছে সেটা। ব্যস্তভাবে নেমে গেল নিরো। স্লেজে উঠে স্ক্রীনের পিছনে পজিশন নিল ও। কন্ট্রোল পরীক্ষা করছে, শেষবারের মত অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে ফেস-প্লেট। তারপর অক্সিজেন ট্যাঙ্কের সাথে যুক্ত মাউথ পীসটা মুখে পুরে নিয়ে বুড়ো আঙুল খাড়া করে সিগন্যাল দিল আমাকে।

দ্রুত ব্রিজে উঠে এসে থ্রটল খুলে দিলাম। বোটে গতি সঞ্চার হল, সেই সাথে স্টার্নে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে মোটা নাইলনের রশি ফেলে দিচ্ছে প্যানথার, ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে স্লেজটা। একশো পঞ্চাশ গজ রশি ফেলার একটু পর টান লেগে ঝাঁকি খেল সেটা, তারপর জলকুমারীকে অনুসরণ করতে শুরু করল স্লেজ।

আমাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল নিরো। ধীরে ধীরে স্পীড বাড়িয়ে ফাইভ নট পর্যন্ত তুললাম আমি। বিশাল একটা বৃত্ত রচনা করে কিনারা ঘেঁষে এগোচ্ছি রীফের দিকে, বিশাল স্রোতের মিছিল জলকুমারীর পেটে গুঁতো মারছে, বিপজ্জনকভাবে একদিকে কাত হয়ে আছে সে।

আরেকবার হাত নাড়ল নিরো। স্লেজের কন্ট্রোল কলাম সামনের দিকে ঠেলে দিল ও। স্লেজের কন্ট্রোল ফিন বরাবর উথলে উঠল পানি, সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে আলোড়নের মধ্যে, তারপর হঠাৎ স্লেজটা নাক নিচু করে ডুব দিল পানির নিচে। দ্রুত এবং ঘন ঘন এদিক ওদিক সরে গিয়ে দিক বদল করছে নাইলনের রশিটা, তারপর স্লেজটা একেবারে নিচে নেমে গেল, রশিটা এখন দ্রুত সরে যাচ্ছে রীফের দিকে।

জোর টান পড়ায় রশিটা সদ্য গাঁথা তীরের মত কাঁপছে থরথর করে, গা ঝাড়া দিয়ে পানি ছিটাচ্ছে। রীফ-এর সাথে সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে জলকুমারী, ক্রমশ কাছে চলে আসছে ব্রেক। প্রবালের দিকে সতর্ক, সমীহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আমি, সংঘর্ষের কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি নিরোকে, পানির অনেক নিচে দিয়ে তলা ঘেঁষে নিঃশব্দে ছুটে আসছে, এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে দ্রুত জলমগ্ন প্রবাল প্রাচীরগুলোকে এড়াবার জন্যে। সন্দেহ নেই, রোমাঞ্চ অনুভব করছে নিরো। একটু ঈর্ষা হল আমার। ঠিক করলাম, সুযোগ পেলে ওই স্লেজে চাপব একবার।

ব্রেক-এর উল্টোদিকে এলাম আমরা, পাশ কাটালাম, এবং ঠিক তখুনি প্যানথারের চিৎকার শুনতে পেলাম আমি। দ্রুত স্টার্নের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখি পিছনে ফেলে আসা বোটের তৈরি মসৃণ পানিপথে বড় একটা হলুদ রঙের বেলুন ভেসে উঠেছে। রশির মাথায় ভাসছে ওটা, শেষ প্রান্তের ভারী সীসাটা তলায় পড়ে আছে।

'পেয়েছে! কিছু পেয়েছে!' চিৎকার করছে প্যানথার।

রীফের সাথে সমান্তরালভাবে আরও সিকি মাইল এগিয়ে এলাম আমরা। এই সময় নাইলনের রশিতে ঢিল পড়ল এবং অশান্ত পানির উপর মাথা তুলে ভেসে উঠল স্লেজটা।

রীফের দিকে পিছন ফিরে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনলাম বোট, তারপর স্লেজটাকে তোলার জন্যে প্যানথারকে সাহায্য করতে নিচে নেমে এলাম।

ককপিটে উঠে এল নিরো। ফেস-প্লেট খুলে ফেলতেই দেখলাম ঠোঁট জোড়া অদম্যভাবে কাঁপছে ওর, চোখ দুটো বিস্ময় এবং আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। ব্ল্যাঙ্কের কব্জি চেপে ধরে নেশাগ্রস্ত মাতালের মত তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল কেবিনের ভিতর। রডরিকের প্রিয় ডেকটাকে সাগরের পানিতে একেবারে নাইয়ে দিল

ও।
আমি আর প্যানথার রশি গুটিয়ে স্লেজটাকে তুলে নিলাম ককপিটে। এরপর ব্রিজে ফিরে এলাম আমি, কোর্স বদলে মন্থর গতিতে ফিরে যাচ্ছি গানফায়ার ব্রেক-এর মুখের দিকে।
ওখানে পৌঁছুবার আগেই ব্ল্যাঙ্ক আর নিরো উঠে এল ব্রিজে। এখন ব্ল্যাঙ্ককেও সাংঘাতিক উত্তেজিত দেখাচ্ছে।
'ছেলেটা এবার একটা উদ্ধার প্রচেষ্টা চালাতে চায়।'
কি উদ্ধার করবে নিরো তা আর আমি জিজ্ঞেস করলাম না। শুধু জানতে চাইলাম, 'সাইজ কি?' তারপর হাতটা চোখের সামনে তুলে রিস্টওয়াচ দেখলাম। ব্রেক থেকে পানি বেরিয়ে আসা শুরু হতে দেড় ঘন্টা বাকি আছে আর।
'খুব বড় নয়...' আশ্বাস দিয়ে বলল নিরো। 'পঞ্চাশ পাউণ্ড, তার বেশি হবে না।'
'ঠিক জানো?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম। 'ওজন বেশি হলে...'
'বেশি নয়, যীশুর কিরে...'
'জিনিসটা যাই হোক, ওটায় তুমি এয়ারব্যাগ বাঁধতে চাও, তাই না?'
'হ্যাঁ। এয়ারব্যাগের সাহায্যে পানির ওপরে তুলতে চাই, তারপর রীফ থেকে টেনে নিয়ে আসা যাবে।'
ব্রেক-এর চোয়ালের কাছে লাফালাফি করছে হলুদ বেলুনটা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বোট নিয়ে এগোচ্ছি ওটার দিকে। 'আর এগোচ্ছি না আমি,' আমার চিৎকার শুনে ককপিট থেকে হাত নেড়ে তাতেই রাজি হল নিরো। রাবারের ফ্লিপার পায়ে গলিয়ে নিয়ে হেঁটে স্টার্নের দিকে এগোচ্ছে সে। কিনারায় দাঁড়িয়ে ইকুইপমেন্টগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে। সাথে দুটো এয়ারব্যাগ এবং স্লেজ ঢাকার সবুজ ক্যানভাসটা নিয়েছে ও, নাইলনের কুণ্ডলী পাকানো রশির একটা প্রান্ত দিয়ে বেঁধে নিয়েছে নিজেকে।

কব্জির সাথে আটকানো কম্পাসের সাহায্যে হলুদ মার্কারের বিয়ারিং নিল ও, আবার একবার ব্রিজের দিকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তারপর স্টার্নের কিনারার দিকে পিছন ফিরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, ঝপাৎ করে পিঠ দিয়ে পড়ল পানিতে, অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নিচে। ওর নিয়মিত নিঃশ্বাস একরাশ সাদা বুদবুদ হয়ে ভেসে উঠল পানির উপর, স্টার্নের নিচে। পানির তলা দিয়ে রীফের দিকে এগোচ্ছে ও, বোঝা যাচ্ছে নতুন বুদবুদগুলোকে সেদিকে এগোতে দেখে। ওর পিছনে নাইলনের বডিলাইন ছেড়ে যাচ্ছে প্যানথার।
ঘন ঘন আগুপিছু করে একই জায়গায় বোটটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করছি আমি। ব্রেক-এর দক্ষিণ প্রান্ত থেকে একশো গজ দূরে রয়েছি আমরা। ধীরে ধীরে নিরোর বুদবুদগুলো হলুদ মার্কারের দিকে এগোচ্ছে। তারপর ওটার পাশে গিয়ে থামল সেগুলো। বেলুনটার নিচে কাজ করছে নিরো। বুঝলাম খালি এয়ারব্যাগের স্ট্র্যাপ দিয়ে সাগর তলায় পাওয়া জিনিসটা বাঁধছে সে। কাজটা কঠিন। স্রোতের তোড়ে মোটাসোটা ব্যাগগুলোকে স্থিরভাবে ধরে রাখা সহজ নয়। স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধার পরও বাকি থাকবে কাজ। স্কুবা বটল থেকে ব্যাগে ভরতে হবে কমপ্রেসড এয়ার। রহস্যময় জিনিসটার আকার এবং ওজন সম্পর্কে নিরোর অনুমান যদি সঠিক হয়, তলা থেকে ওটাকে তুলতে খুব বেশি টানের দরকার হবে না, এবং একবার ওটাকে নিচের ঝামেলা থেকে মুক্ত করে তুলতে পারলে নিরাপদ জায়গায় টেনে নিয়ে এসে বোটে তোলা কোন সমস্যাই নয়।
চল্লিশ মিনিট ধরে জলকুমারীকে একই জায়গায় ধরে রেখেছি, এই সময় একেবারে হঠাৎ করে চকচকে দুটো সবুজ এয়ারব্যাগ বোটের পিছনে ভেসে উঠল পানির গা ফুঁড়ে। পরমুহূর্তে সেগুলোর পাশে দেখা গেল নিরোর হুড পরা মাথা। ডান হাত সোজা ওপর দিকে তুলে সিগন্যাল দিল আমাকে ও।

‘রেডি?’ চিৎকার করে জানতে চাইলাম আমি।

‘রেডি!’ ককপিট থেকে বলল প্যানথার। রশি সামলে নিয়েছে সে।

সাবধানে এবং মন্থর গতিতে জলকুমারীকে নিয়ে রীফের কাছ থেকে সরে আসছি আমরা। পাঁচশো গজ এসে পা দিয়ে লাথি মেরে নিউট্রাল করলাম বোটটাকে, তারপর এগোলাম সাঁতারু আর তার সবুজ এয়ারব্যাগগুলোকে টেনে তুলতে সাহায্য করার জন্যে।

মইয়ের কাছে পৌঁছেচি, এই সময় হুমকি দিয়ে বলল ব্ল্যাঙ্ক, ‘আর এক পা-ও এগিয়ো না!’

শ্রাগ করে হুইলের কাছে ফিরে এলাম আমি। ভাবলাম, জাহান্নামে যাক ব্যাটারা। লম্বা, কালো চুরুট ধরালাম একটা। কিন্তু যত চেষ্টাই করি, কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না কোনমতে। কি তুলে এনেছে নিরো? বোটের কিনারা ধরে এগোচ্ছে ওরা, ঝুলন্ত এয়ারব্যাগ দুটোকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বো-এর দিকে।

বোটে উঠতে সাহায্য করল ওরা নিরোকে। ঝাঁকি দিয়ে ভারী কমপ্রেসড এয়ার বটল দুটো খুলে ডেকে ফেলে দিল ও। তারপর ফেসপ্লেট ঠেলে তুলে দিল কপালে।

ওর তীক্ষ্ণ, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেলাম আমি ব্রিজ থেকে। রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে তাকিয়ে আছি ওদের দিকে।

‘পেয়েছি!’ চেঁচিয়ে উঠল নিরো। ‘ওটা সেই...’

‘অ্যাই, চুপ!’ ঝট করে নিরোর মুখে একটা হাত চাপা দিল ব্ল্যাঙ্ক। পরমুহূর্তে ওরা তিনজন একসাথে মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

‘আমাকে নিয়ে ভেবো না, ভায়েরা,’ নিঃশব্দে হেসে চুরুটটা খুশির সাথে নাড়লাম ওদেরকে উদ্দেশ্য করে।

আমার দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। ফিসফিস করে কথা বলছে এখন নিরো। ‘জেসাস!’ একবার চিৎকার করে উঠল

প্যানথার। ব্ল্যাঙ্কের পিঠে একটা চাপড় মারল সে। তারপর ওরা তিনজনই একসাথে বিস্ময় ধ্বনি ছাড়তে শুরু করল। হাসিতে উদ্ভাসিত সবার মুখ। ঠেলাঠেলি করে রেইলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। এয়ারব্যাগ আর বোঝাটা টেনে তুলছে।

ঝুঁকে পড়ে দেখছি ওদেরকে। আর তলপেটে যেন একটা গর্ত খুঁড়ছে প্রচণ্ড কৌতূহল। কি তুলে এনেছে নিরো? কি এমন সাতরাজার ধন, যা আমাকে দেখতে পর্যন্ত দিতে চাইছে না ওরা?

বোঝাটা দেখে মুহূর্তে হতাশায় ছেয়ে গেল আমার মন। আমার অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক নিরো, সবুজ ক্যানভাসটা দিয়ে সে তার গুপ্তধন মুড়ে রেখেছে আগেই। আনাড়ি হাতে নাইলনের রশি দিয়ে বাঁধা একটা বেঢপ পোঁটলার মত দেখাচ্ছে বোঝাটাকে।

তবে জিনিসটা যাই হোক, খুব ভারী বটে-যেভাবে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ডেকে তা দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু আকারে খুব বড় কিছু নয়, একটা ছোট স্যুটকেসের মত।

ডেকে নামিয়ে সেটাকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা। সবাই পাগলের মত হাসছে। মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল ব্ল্যাঙ্ক। অম্লান হাসিতে উজ্জ্বল তার চেহারা।

‘এসো হে, এক নজর দেখে যাও।’

আমার প্রচণ্ড কৌতূহল টের পেয়েছে সে। আমন্ত্রণ পেয়ে সংযমের বাঁধটা ভেঙে গেল আমার ভিতর। অনুভব করছি জিনিসটা কি তা আমাকে জানতেই হবে। দাঁত দিয়ে চুরুটটা কামড়ে ধরে মই বেয়ে নামতে শুরু করলাম। তারপর বো-এ দাঁড়ানো দলটার দিকে দ্রুত এগোলাম। ফোরডেকের অর্ধেকটা পেরিয়েছি, মাত্র খোলা জায়গায় ফেলেছি প্রথম পা-টা, দেখতে পাচ্ছি এখনও আমার দিকে তাকিয়ে সানন্দে হাসছে ব্ল্যাঙ্ক, এই সময় শান্ত, মৃদু কণ্ঠে বলল সে, ‘হ্যাঁ, মারো!’

সাত

এতক্ষণে টের পেলাম ব্যাপারটা আগে থেকে রিহার্সেল দিয়ে রেখেছে ওরা। আমার মন এবং মাথার ভিতর এমন বিদ্যুৎ গতিতে কাজ শুরু হয়ে গেল যে যা কিছু ঘটছে, মনে হচ্ছে সব যেন ধীর, অলস ভঙ্গিতে স্লো-মোশন সিনেমার মত ঘটছে।

প্যানথারের হাতে কালো চকচকে পিস্তলটা দেখতে পাচ্ছি আমি, ধীরে ধীরে উঠে আমার তলপেট বরাবর স্থির হল সেটা। বাঁ পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে ডেকে রেখেছে সে, বসে আছে সেই পায়েরই গোড়ালির উপর, অপর পা-টাও আধভাঁজ করা, সেটার হাঁটুতে পুরোপুরি লম্বা করে দেয়া পিস্তল ধরা ডান হাতের কনুই ঠেকিয়ে লক্ষ্য স্থির করছে। পিস্তলের ব্যারেল বরাবর চোখ কুঁচকে দেখছে সে, নিঃশব্দে হাসছে।

দেখলাম নিরোর সুদর্শন কচি মুখটা আতঙ্কে নীল হয়ে যাচ্ছে। প্যানথারের পিস্তল ধরা হাতটা ধরার জন্যে এগোল সে, কিন্তু এ ধরনের কিছু একটা ঘটতে পারে আশঙ্কা করে আগে থেকেই তৈরি ছিল ব্ল্যাঙ্ক। নিঃশব্দ হাসিটা এখনও ঝুলছে তার ঠোঁটে, দু'হাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল সে নিরোকে, জলকুমারীর পরবর্তী দোলটা শুরু হতে ভারসাম্য হারিয়ে চার হাত দূরে ছিটকে পড়ল নিরো।

দ্রুত এবং পরিষ্কার চিন্তা করছি এখনও। সেগুলো সাজানো গোছানো কিছু নয়, মনের পর্দা ছুঁয়ে স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে বিদ্যুৎবেগে সরে গেল কিছু অনুভব। ভাবলাম সত্যিই দারুণ নিখুঁত হয়েছে ওদের ফাঁদটা, প্রফেশন্যালদের কাজের গুণই এই।

অনুভব করলাম, নেকড়েদের সাথে জড়িত হয়ে যে ভুল করেছি তার মূল্য এখন আমাকে দিতে হচ্ছে।

টের পেলাম আমাকে খুন হতে দেখার পর ওদের হাত থেকে নিরোরও এখন আর রেহাই নেই। এই কাজটাও আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে ওরা। একটু দুঃখও অনুভব করলাম। ছেলেটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল।

ভাবলাম পয়েন্ট ফরটি-ফাইভের এক্সপ্লোসিভ বুলেট তার টার্গেটকে কিভাবে বিধ্বস্ত করবে। চকিতে মনে পড়ে গেল দুই হাজার ফুট পাউণ্ড হবে ধাক্কাটার ওজন।

প্যানথারের আঙুল পিস্তলের ট্রিগারটা পেঁচিয়ে ধরল। মুখে চুরুট নিয়েই আমার পাশের রেলিংয়ের দিকে লাফ দিলাম আমি। কিন্তু জানি, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

প্যানথারের প্রসারিত হাতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো পিস্তলটা, রোদের মধ্যে মাজলের মুখে ম্লান আগুনের ঝলক দেখলাম। বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর আওয়াজ এবং ভারী সীসার বুলেট একই সাথে আঘাত করল আমাকে। ঝাঁকি খেয়ে মাথাটা পিছন দিকে সরে গেল, মুখ থেকে ছিটকে উপরে উঠে যাবার সময় আগুনের ফুলকির একটা রেখা তৈরি করল চুরুটটা। বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কায় আমার ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেছে, ডেক থেকে শূন্যে উঠে গেছে পা দুটো, পাক খেতে শুরু করে শরীরটা দড়াম করে পিছন দিকের রেলিংয়ের উপর পড়ল।

ব্যথা নয়, বিশাল একটা ধাক্কা সম্পূর্ণ অসাড় করে ফেলছে আমাকে। আঘাতটা বুকে, সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ এবং জানি বুলেটটা নিশ্চয়ই আমাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। আঘাতটা যে চরম, মৃত্যুর জন্যে যথেষ্ট, সে-ব্যাপারেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই আমার, এবং প্রতি মুহূর্তে আশা করছি ঝপ করে অন্ধকার এসে গ্রাস করবে আমাকে।

শিরদাঁড়ার নিচের দিকের শেষ গিঁটটা প্রচণ্ডভাবে ঠুকে গেল

রেলিংয়ের সাথে, দ্রুত আধপাক ডিগবাজি খেয়ে মাথা নিচে আর পা উপর দিকে উঠে গেল আমার, রেলিং টপকে সেই অবস্থায় ঝপাৎ করে পড়লাম সাগরের ঠাণ্ডা আলিঙ্গনের ভেতর।

পানি আমাকে সিধে হতে সাহায্য করল। চোখ মেলে ঝাঁক ঝাঁক রূপালী বুদবুদ আর পানি ভেদ করে ঢুকে পড়া সবুজাভ রোদের আলো দেখতে পেলাম। ফুসফুস দুটো সম্পূর্ণ খালি আমার, উন্মত্তের মত পানি ঠেলে উপরে ভেসে ওঠার সহজাত একটা ঝোঁক চাপল-কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এখনও আমি পরিষ্কারভাবে সবকিছু চিন্তা করতে পারছি। জানি, পানির উপর মাথা তোলা মাত্র খুলিটা উড়িয়ে দেবে মাইক প্যানথার। এক গড়ান দিয়ে নিচের দিকে ডাইভ দিলাম, এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ে ঢুকে গেলাম বোটের নিচে।

দূরত্ব সামান্য কিন্তু ফুসফুস খালি থাকায় মনে হচ্ছে জলকুমারীর মসৃণ সাদা তলপেট ঘন্টার পর ঘন্টা ধীর গতিতে আমার উপর দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে ডুব সাঁতার দিচ্ছি, ভাবছি এখনও পায়ে জোর পাচ্ছি কিভাবে!

আচমকা অন্ধকার ঘেরাও করল আমাকে। কোমল কিন্তু ঘন লাল একটা মেঘের মাঝখানে নিজেকে আবিষ্কার করে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ করে বুঝলাম এটা আমার নিজেরই রক্ত, ক্ষতগুলো থেকে হু হু করে বেরিয়ে এসে লাল করে দিয়েছে পানিকে। গায়ে জেব্রার নকশা নিয়ে খুদে মাছগুলো তীরবেগে ছুটোছুটি করছে লাল মেঘের ভেতর, লোভীর মত হাঁ করে গোগ্রাসে গিলছে সেগুলো। আমার রক্ত ওদের পাগল করে দিয়েছে।

আরেকবার চেষ্টা করেও বাঁ হাতটাকে নাড়াতে পারলাম না। আমার পাশে লম্বা হয়ে রয়েছে সেটা, কোন সাড়া নেই। দুই পা এবং একটা হাতের সাহায্যে জলকুমারীর কীলের নিচ দিয়ে এগোলাম, তারপর শেষপ্রান্তের জলরেখার দিকে উঠতে শুরু

করলাম।

ওঠার সময় বোটের স্টার্ন থেকে নেমে আসা নাইলনের রশিটা দেখতে পেলাম পানিতে। ছোঁ মেরে ধরলাম রশির প্রান্তটা, তারপর ভেসে উঠলাম জলকুমারীর স্টার্নের নিচের পানিতে। বাতাস টানার সময় অনুভব করলাম আহত এবং অসাড় লাগছে ফুসফুস দুটো। পুরানো তামার মত লাগল মুখের ভিতর বতাসের স্বাদ, বমি পেল, কিন্তু একটানে যতটা সম্ভব গিলে নিলাম।

এখনও পরিষ্কার ভাবতে পারছি সব। আমি রয়েছি স্টার্নের নিচে, নেকড়ে জোড়া রয়েছে বো-তে, কারবাইনটা রয়েছে মেইন কেবিনে, ইঞ্জিন হ্যাচের ভিতর।

যতটা পারলাম নিজেকে উঁচু করে ডান কব্জিতে জড়িয়ে নিলাম রশিটা, বুকের কাছে হাঁটু তুলে বোটের গায়ে সরু কাঠের ঘেরের উপর গোড়ালি রেখে উঠে দাঁড়ালাম।

জানি, মাত্র একবার চেষ্টা করার মত শক্তি রয়েছে আমার, তার বেশি নয়। সুতরাং চেষ্টায় কোন খুঁত থাকলে চলবে না। উপরের বো থেকে ভেসে আসা ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি- রাগারাগি, চেঁচামেচি চলছে নিজেদের মধ্যে। এসব থেকে মন সরিয়ে আমার সব শক্তি একত্রিত করলাম, তারপর দুটো পা আর একটা হাতের সাহায্যে লাফ দিলাম উপরের দিকে। ঝাঁকিটা লাগায় দৃষ্টিপথে সর্ষে ফুল ফুটে উঠল, অসাড় বুকে ধাক্কা খেলাম প্রচণ্ডভাবে। পানি থেকে উঠে এসেছি আমি, স্টার্ন রেলিংয়ের ওপর পড়ে অর্ধেক সাগরের দিকে, অর্ধেক বোটের দিকে ঝুলছি কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে খালি চটের বস্তার মত, যেন এইমাত্র রোদে শুকোতে দিয়েছে কেউ।

কয়েক সেকেণ্ড ওভাবে পড়ে থাকলাম। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল। পিচ্ছিল, গরম রক্ত সড়সড় করে কাঁধ, গলা, মাথার পিছনের চুল বেয়ে নামছে-দেখতে পাচ্ছি, ককপিটের মেঝেতে রক্তের পুকুর তৈরি হচ্ছে কয়েকটা। বুঝলাম, মারা যেতে আর

বেশি দেরি নেই আমার।

উন্মত্তের মত ছুঁড়লাম পা দুটো। রেলিং থেকে খসে পড়লাম বোটের দিকে। ককপিটের মেঝেতে সোজা নামল মাথাটা, দড়াম করে আছড়ে পড়ল শরীরটা, ফাইটিং চেয়ারে বাড়ি খেল পায়ের গোড়ালি। ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ, দাঁতে দাঁত চেপে আছি, ঠোঁটের প্রান্ত দুটো দুই কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। পাশ ফিরে শুয়ে আছি, শরীরের উপর ক্রমশ নিচের দিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছি। হড় হড় করে বেরিয়ে আসছে রক্ত, তাতে ভাসছি আমি। সাপের মত বুকে হেঁটে এগোতে শুরু করলাম কেবিনের দিকে, পিছনে রেখে যাচ্ছি রক্তের মোটা ধারা। প্রবেশপথের পাশে কম্বিংয়ের কাছে পৌঁছে আরেকটা অমানুষিক চেষ্টায় উঠে দাঁড়ালাম কোনমতে, পায়ের উপর ভর দিয়ে এক হাতের উপর ঝুলে আছি, কিন্তু বুঝতে পারছি পা দুটো অনুভূতি হারিয়ে ফেলছে, রাবারের মত লাগছে এখনই।

দ্রুত কেবিনের কোণে উঁকি দিয়ে তাকালাম, ফোরডেকের উপর দিয়ে সোজা বো-এ গিয়ে পড়ল আমার দৃষ্টি, যেখানে ওরা তিনজন এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে একসাথে।

পিঠে আবার কমপ্রেশড এয়ার বটলগুলো স্ট্র্যাপ দিয়ে দ্রুত বাঁধার চেষ্টা করছে নিরো। আতঙ্কে এখনও বিস্ফারিত হয়ে আছে তার দুই চোখ। ব্ল্যাঙ্কের উদ্দেশে রাগে চেঁচাচ্ছে সে।

'আপনি পাষণ্ড! আপনি পিশাচ! আপনি খুনী...অবশ্যই ওকে আমি খুঁজতে যাচ্ছি, ওর লাশ আমি-ক্রাইস্ট, হেলপ মি, আপনাদের যাতে ফাঁসি হয়...'

দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছি আমি, এই অবস্থাতেও ছেলেটার সৎ সাহস লক্ষ্য করে খুশি লাগল মনটা। তালিকায় সে-ও আছে তা বোধহয় একবারও ভাবছে না ও।

'খুন, ঠাণ্ডা মাথায় খুন,' পাগলের মত চেঁচাচ্ছে নিরো। রেইলের দিকে ফিরল ও, নাক আর চোখে ঠিকমত বসিয়ে নিচ্ছে

ফেস-প্লেটটা।

পাশে দাঁড়ানো প্যানথারের দিকে তাকাল ব্ল্যাঙ্ক। ওদের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে নিরো। ছোট্ট করে একটু ঝাঁকাল ব্ল্যাঙ্ক মাথাটা।

সাবধান করার জন্যে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, কিন্তু আওয়াজটা মুখের ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ করে থেমে গেল। লম্বা দুই পদক্ষেপে নিরোর ঠিক পিছনে চলে গেল প্যানথার। এবার কোন ভুল করল না সে। মস্ত পয়েন্ট ফরটি ফাইভের মাজল নিরোর মাথার খুলির গোড়ায় ঠেকাল, ডাইভিং স্যুটের রাবার হুডে গর্ত করে ঢুকে গেল এক্সপ্লোসিভ বুলেট।

চৌচির হয়ে গেল নিরোর খুলি। ডাইভিং মাস্কের গ্লাস প্লেট ভেঙে গুঁড়ো কাচের সাথে গুঁড়ো খুলি একটুকরো মেঘের মত বেরিয়ে এল। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে শরীরটা ছিটকে পড়ল বোট থেকে, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'সাথে ওয়েট বেল্ট আছে,' নাকের ডগাটা কড়ে আঙুল দিয়ে চুলকাচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক, শান্তভাবে বলল সে, 'ডুবতে কোন অসুবিধে হবে না ওর। কিন্তু রানাকে খুঁজে বের করা দরকার। বুকে বুলেটের গর্ত নিয়ে লাশটা ভেসে উঠলে বিপদ হতে পারে।'

'বানচোত লাফ দিয়ে সরে গেল,' আমার ওপর রাগে বিকৃত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'আর একটু হলে বেঁচে যেত শালা...'

কানে আর কিছু ঢুকল না আমার। পা দুটো টলে উঠল, ডেকের উপর পড়ে গেলাম আমি। আতঙ্কে সাংঘাতিক অসুস্থ বোধ করছি। বয়স আমার অল্প হলেও অনেক রকম মৃত্যু দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে এরইমধ্যে, কিন্তু নিরোর মৃত্যু ভয়ঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টি করল আমার মনে। আমার নিজের মৃত্যুর আগে মাত্র একটা ইচ্ছা পূরণ করতে চাইলাম আমি। যেমন করে হোক।

ক্রল করে এগোতে শুরু করলাম ইঞ্জিনরূম হ্যাচের দিকে। সাদা ডেকটা আমার সামনে পড়ে রয়েছে দুস্তর সাহারা মরুর

মত। লোহার মত শক্ত একটা হাতের প্রচণ্ড চাপ অনুভব করতে শুরু করেছি কাঁধে, পিছন দিকে টেনে রাখছে আমাকে। মাথার ওপরের ডেকে ওদের পায়ের আওয়াজ শুনেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। মনের ভিতর শেষ ইচ্ছা পূরণের আশাটা দপ করে নিভে গেল। ককপিটে ফিরে আসছে ওরা।

'দশ সেকেণ্ড, খোদা, দশটা সেকেণ্ড!' ফিসফিস করে উঠলাম আমি। 'দশটা সেকেণ্ড...আমার জীবনের শেষ চাওয়া।' কিন্তু মনে মনে জানি, সবই বৃথা। হ্যাচের কাছে আমি পৌঁছুবার আগেই কেবিনে ঢুকে পড়বে ওরা। কিন্তু বৃথা জেনেও মরিয়া হয়ে এগোচ্ছি।

হঠাৎ পায়ের শব্দ থেমে গেল, কিন্তু গলার আওয়াজ এখনও শুনতে পাচ্ছি। কথা বলার জন্যে ডেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা। ইঞ্জিন হ্যাচের কাছে পৌঁছে স্বস্তি এবং আশার পরশ অনুভব করলাম আমি।

কিন্তু হ্যাচের ঢাকনিটা খোলা যাচ্ছে না শত চেষ্টাতেও। কিভাবে যেন শক্তভাবে আটকে গেছে, একচুল নড়াতে পারছি না। অসম্ভব দুর্বলতা বোধ করছি, সেজন্যে রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। আঙুলের ডগা আর নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছি ঢাকনির কিনারা আর গাল দিচ্ছি নিজেকে, 'মর শালা...' হঠাৎ স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে খুলে গেল ঢাকনিটা, আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ল ডেকে, বিকট শব্দ হল কেবিনের ভিতর।

সাথে সাথেই চুপ করে গেল ওরা। শুনছে।

ক্রল করে আরও ক'ইঞ্চি এগোলাম। উপুড় হয়ে শুয়ে আছি, ডেকের নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছি বগল পর্যন্ত ডানহাতটা, আঙুলগুলো কারবাইনের স্টকে গিয়ে ঠেকল।

'কুইক, এদিকে!' উচ্চকিত বিস্ময় ধ্বনি শুনতে পেলাম, ওটা ব্ল্যাঙ্কের কণ্ঠস্বর। পরমুহূর্তে ডেকের উপর ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেলাম। দ্রুত এগিয়ে আসছে ককপিটের দিকে।

কারবাইন ধরে টানছি, কিন্তু উঠে আসছে না সেটা, সম্ভবত সিলিংয়ের সাথে বেকায়দাভাবে আটকে গেছে।

'ক্রাইস্ট! রক্তে ভেসে যাচ্ছে ডেক!' চেঁচিয়ে উঠল ব্ল্যাঙ্ক।

'নিশ্চয়ই রানা!' দ্রুত বলল প্যানথার, 'স্টার্নের দিক থেকে উঠে এসেছে...'

ঠিক তখনই মুক্ত হল কারবাইনটা, এবং আমার হাত থেকে খসে নিচের ইঞ্জিনরুমে পড়ে যেতে চাইল সেটা। প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, পরক্ষণে আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেল নিজে থেকেই, রয়ে গেল স্টকটা মুঠোর ভিতর। গড়িয়ে সরে এলাম আমি। মনে হল প্রায় এক যুগ চেষ্টা করে উঠে বসতে পেরেছি। কোলের ওপর পড়ে রয়েছে কারবাইনটা। হ্যাচ থেকে ওটা তোলার সময় বুকে একটা ঘষা খাওয়ায় টিসু ছিঁড়ে গেছে, প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি সেই থেকে। কিন্তু সেটাকে আমি গ্রাহ্য করছি না। বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে আরেক দিকে সরিয়ে দিলাম সেফটিক্যাচ। চোখে ঘাম আর লবণাক্ত পানির ফোঁটা পড়ছে, কেবিনের দরজার দিকে তাকাতেই ঝাপসা দেখছি সামনেটা। ছুটে কেবিনে ঢুকল ব্ল্যাঙ্ক। আমাকে দেখতে পাবার আগে তিন পা এগিয়ে এল সে। তারপর দাঁড়াল, হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হাঁপাচ্ছে সে, ঘেমে গেছে লাল মুখটা। আমাকে কারবাইন তুলতে দেখে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত দুটো সামনে তুলে মুখ ঢাকতে চেষ্টা করছে, আঙুলের ফাঁকে আতঙ্কে বিস্ফারিত একটা চোখ দেখতে পাচ্ছি। কড়ে আঙুলের ডায়মণ্ডটা ঝিক করে উঠল একবার।

নিঃশব্দে ক্ষীণ একটু হাসলাম আমি। এবং কল্পনায় বুঝলাম, হাসিটাকে ভৌতিক বলে মনে হল ব্ল্যাঙ্কের। একহাতে ধরা কারবাইনটার ওজন ঘাবড়ে দিল আমাকে। ব্ল্যাঙ্কের হাঁটুর কাছে নল তুলে আর দেরি করলাম না, চাপ দিলাম ট্রিগারে।

একটানা গর্জনের সাথে কারবাইন থেকে একটা অবিচ্ছিন্ন রেখার মত বেরিয়ে গেল বুলেটগুলো, পিছু ধাক্কার ফলে ক্রমশ

উঠে যাচ্ছে ব্যারেলটা উপর দিকে। ব্ল্যাঙ্কের তলপেট থেকে গলা পর্যন্ত দু'ফাঁক হয়ে গেল, ধাক্কা খেয়ে কেবিনের দেয়ালে পিঠ সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে এখনও সে, কিন্তু প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেছে আগেই।

জানি, কারবাইনটা খালি করা উচিত নয়, প্যানথারের সাথে বোঝাপড়া বাকি রয়েছে এখনও, কিন্তু তবু আমি ট্রিগার থেকে সরাতে পারছি না আঙুল, ব্ল্যাঙ্কের গলা, থুতনি, দাঁত, নাক, কপাল এবং মাথায় অসংখ্য ফুটো তৈরি করে যাচ্ছে বুলেটগুলো।

তারপর কিভাবে যেন নিস্তেজ হয়ে গেল আঙুলটা, থেমে গেল বুলেট বৃষ্টি। দেয়াল থেকে রক্তের সাথে গড়িয়ে ধীরে ধীরে কেবিনের মেঝেতে পড়ছে বিধ্বস্ত, ছিন্নভিন্ন লাশটা। পোড়া করডাইট আর মিষ্টি রক্তের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে কেবিনের বাতাস।

কেবিনের কম্প্যানিয়নওয়েতে মাথা নিচু করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে প্যানথার, কেবিনের মাঝখানে আমাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুঁড়ল।

ধীরেসুস্থে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করার প্রচুর সময় রয়েছে ওর হাতে, কিন্তু আতঙ্কে ঘাবড়ে গেছে সে। বিস্ফোরণের শব্দ কানের পর্দায় বাড়ি মারল, আর বুলেটটা আমার কাঁধের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। ঝাঁকি খেয়ে পিস্তলের নল উঠে গেছে উপর দিকে, আবার গুলি করার জন্যে প্যানথার সেটাকে নামাতে যাচ্ছে দেখে কারবাইনটা একটু উঁচু করে ধরেই ট্রিগারে আবার চাপ দিলাম আমি।

ব্রীচে একটাই মাত্র গুলি ছিল, তবে একটাতেই কাজ হল। লক্ষ্য স্থির করিনি আমি, ব্যারেল ওর দিকে সোজা করেই ট্রিগারে চাপ দিয়েছি। কনুইয়ের উল্টোদিকে গিয়ে লাগল বুলেটটা, চুরমার করে দিল হাড়ের জয়েন্টটা। পিস্তলটা ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল ডেকে, সেখান থেকে কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে স্টার্নের অগভীর ড্রেনের কিনারায় গিয়ে থামল সেটা।

ধাক্কা খেয়ে একদিকে একটু ঘুরে গেল প্যানথার, ডান হাতের উপরের অংশটা অদ্ভুতভাবে মোচড় খাচ্ছে, কিন্তু ভাঙা জয়েন্টের কাছ থেকে নিচের অংশটা তার শরীরের পাশে মরা সাপের মত ঝুলছে। ঠিক এই সময় কারবাইনের ফায়ারিঙ পিন বাড়ি মারল খালি চেম্বারে।

একই সাথে মুখ তুললাম আমরা, পরস্পরের দিকে তাকালাম। দু'জনেই আহত। কিন্তু পুরানো আক্রোশটা পুরোপুরি রয়েছে আমাদের মধ্যে, একজন আরেকজনকে নির্দ্বিধায় খুন করতে চাই। নিরোর খুলিতে পিস্তল ঠেকাচ্ছে ও...চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যটা, এবং কোথা থেকে শক্তি পেলাম জানি না, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করলাম ওর দিকে। ঠকাস করে হাত থেকে পড়ে গেল খালি কারবাইনটা।

ভাঙা হাতটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল প্যানথার। ছুটল ড্রেনে পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে।

ওকে বাধা দেবার কোন উপায় দেখছি না। ওর আঘাতটা মারাত্মক কিছু নয়, অন্তত ওটা ওকে এখুনি অচল করে দেবে না, এবং সম্ভবত বাঁ হাত দিয়েও অব্যর্থ ভাবে গুলি ছুঁড়তে পারে ও।

ককপিটে বেরিয়ে এসেছি আমি। এখনও এগোচ্ছি প্যানথারের দিকে। ঝুঁকে পড়ে তুলে নিচ্ছে ও পিস্তলটা। হঠাৎ ভিন্নখাতের একটা তুমুল স্রোতের মুখে পড়ে গেল জলকুমারী, বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে বুনো ঘোড়ার মত পিছু হটল সে। তাল হারিয়ে ফেলল প্যানথার, পিস্তলটা পিছলে চলে যাচ্ছে ডেকের উপর দিয়ে তার নাগালের বাইরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সেটাকে অনুসরণ করল ও, কিন্তু আমার রক্তে পা পিছলে দড়াম করে আছাড় খেল একটা। ওর দুর্ভাগ্য, শরীরের নিচে চাপা পড়েছে ভাঙা হাতটা। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল, কিন্তু থামল না, গড়িয়ে উপুড় হয়েই দ্রুত ক্রল করে এগোচ্ছে চকচকে কালো পিস্তলটার দিকে।

ককপিটের বাইরের বাল্কহেডের দিকে তাকিয়ে আছি। র‍্যাকটা

আমার নাগালের মধ্যেই। দশ ফুট লম্বা, মাথায় স্টেনলেস স্টীলের ভয়ঙ্কর হুকসহ লম্বা ফ্লাইং গ্যাফ (কোঁচ)গুলো দেখছি। হুকের পাতগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে ঘসে ক্ষুরের মত ধারালো করে রেখেছে রডরিক। বড় মাছের শরীরে গভীরভাবে বেঁধাবার জন্যে তৈরি এগুলো, লক্ষ্য স্থির করে জতুসইভাবে আঘাত করতে পারলে ধড় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মাছের মাথা, তারপর হুকের সাথে ভারী নাইলনের রশি বেঁধে টেনে বোটে তোলা হয় মাছটাকে।

ধাক্কা দিয়ে র‍্যাকের ক্ল্যাম্প খুলে ফেললাম। একটা কোঁচ নামিয়ে তাকালাম প্যানথারের দিকে।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে উঠে বসেছে প্যানথার। রক্ত ভেজা হাত থেকে পিছলে পড়ে গেল সেটা আবার। আমার দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে, তাই কিছুই বুঝতে পারছে না ও। খপ করে পিস্তলটা ধরল আবার। উল্টোভাবে তুলে নিল। তারপর দ্রুত তালে হাত নেড়ে সেটাকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে তালুর উপর। অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই, সাংঘাতিক ব্যস্ত সে। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসেছি আমি, এক হাত দিয়ে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে কাঁধের উপর তুলেছি কোঁচটা, লক্ষ্য স্থির করছি প্যানথারের ধনুকের মত বাঁকা পিঠের মাঝখানে। থ্যাচ করে পিঠে গাঁথলাম হুকটা, পাঁজরের ফাঁক গলে গভীর ভাবে ঢুকে গেল ভিতরে ধারালো পাতগুলো। মুখ থুবড়ে ডেকের ওপর পড়ে গেছে প্যানথার, আবার ছুটে গেছে পিস্তলটা হাত থেকে। বোটের দোলায় গড়িয়ে চলে গেল সেটা আরেক দিকে।

চিৎকার করছে প্যানথার। শরীরের ভিতর ধারালো ইস্পাত নিয়ে ছটফট করছে সে তীব্র যন্ত্রণায়। আরও জোরে ঠেলে দিচ্ছি আমি কোঁচটা, চকচকে ইস্পাতটা যেখানে চওড়া হয়ে বেঁকে গেছে সেই বাঁক পর্যন্ত ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ওর হার্ট বা ফুসফুস ফাঁক করতে চাইছি আমি। কিন্তু হঠাৎ হুকের গোড়াটা মট করে ভেঙে

গেল। ডেকের উপর দিয়ে গড়িয়ে পিস্তলটার দিকে এগোচ্ছে আবার প্যানথার। কোঁচটা ছেড়ে দিয়ে আমিও হাতড়াতে শুরু করলাম, তারপর হাতে ঠেকতেই তুলে নিলাম দড়িটা।

এরপর আমি আর প্যানথার নিজেদের রক্তে গোটা ডেক জুড়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করলাম। স্রোতের মুখে পড়ে জলকুমারী দুলতে শুরু করলেই হড়কে একদিক থেকে আরেক দিকে চলে যাচ্ছি, দোল থামলে গড়ান দিয়ে ধরতে চাইছি প্যানথারকে। পিস্তলটার যেন নিজস্ব একটা ইচ্ছে গজিয়েছে, যতবার ছুঁতে যাচ্ছে তাকে প্যানথার, ততবার একেবারে শেষ মুহূর্তে ফাঁকি দিয়ে সরে যাচ্ছে সে ওর নাগালের বাইরে। আর আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে আমার হাতের দড়ি আর প্যানথারের গলা। ফাঁস পরাতে প্রতিবার ব্যর্থ হচ্ছি আমি।

সন্তুষ্টির কারণ এটুকুই যে অবশেষে দুর্বল হয়ে পড়ছে প্যানথার। এখন আর সে এমন কি পিস্তলটা ধরারও কোন চেষ্টা করছে না। শরীরে গাঁথা প্রকাণ্ড হুকটার বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশটা বাঁ হাত দিয়ে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে আছে সে, কি উদ্দেশ্যে একমাত্র ও-ই জানে। টেনে ওটাকে বের করার সাধ্য দশজন আহত প্যানথারেরও নেই।

জলকুমারী আবার আমাকে সাহায্য করল। একদিকে কাত হয়ে গিয়ে প্যানথারকে একেবারে আমার সামনে পৌঁছে দিল সে। হাত বাড়িয়ে ফুলের মালার মত পরিয়ে দিলাম ওর গলায় ফাঁসটা, তারপর ফাইটিং চেয়ারের শক্ত পায়ার সাথে দড়িটা আটকে সবটুকু শক্তি দিয়ে টানতে শুরু করলাম।

টানছি, কিন্তু দড়িতে জোর পড়ছে না। জোর ফুরিয়ে গেছে প্যানথারেরও। ফাঁস থেকে গলাটাকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা না করে হুকটা তেমনি খামচে ধরে আছে এখনও সে; যেন সাতরাজার অমূল্য ধন ওটা, আর আমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারপর হঠাৎ ফোঁস করে ভয়ঙ্কর একটা নিঃশ্বাস

ছেড়ে মুখের ভিতর থেকে জিভটা বাইরে বের করে দিল ও, ঢিল পড়ল পেশীতে, বোটের দোলার সাথে তার মাথাটা সামনে পিছনে অদ্ভুত এক ছন্দে দুলতে শুরু করল ।

আমার অজান্তে হাতের মুঠোটা আলগা হয়ে গেল, খসে পড়ল দড়িটা । চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম ডেকের উপর । বিশাল একটা অন্ধকার ঘিরে ফেলল আমাকে ।

জ্ঞান ফেরার পর মনে হল, অ্যাসিড দিয়ে কে যেন পুড়িয়ে দিয়েছে আমার মুখ । ঠোঁট দুটো শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে গেছে, আর প্রচণ্ড পিপাসায় গলার ভিতর যেন আগুন ধরে গেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সূর্যের দিকে মুখ করে একটানা ছয় ঘন্টা শুয়ে থাকলে এর চেয়ে কম আর কি হতে পারে ।

পাশ ফিরতে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম বুকের তীব্র ব্যথায় । শুধু মুখটা হাঁ হল, কোন আওয়াজ বেরুল না । ব্যথাটাকে কমতে দেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে থাকলাম, তারপর আঘাতটার অবস্থা বোঝার জন্যে হাত দিয়ে হাতড়াতে শুরু করলাম আহত জায়গাগুলো । আমার বাঁ হাতের বাইসেপ ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকেছে বুলেট, হাড়টাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে ট্রাইসেপে বিরাট একটা গর্ত করে-বেরিয়েই ঢুকেছে আমার বুকের পাশে ।

আঙুল দিয়ে আঘাতগুলো অনুভব করার সময় ব্যথায় আর ক্লান্তিতে ফোঁপাচ্ছি আমি । একটা পাঁজরের হাড়ের উপর দিয়ে পিছলে এগিয়েছে বুলেটটা, চামড়া আর মাংস হারিয়ে নিরাবরণ হয়ে গেছে হাড়টা, দু'পাশের থেঁতলানো মাংসে হাড় আর সীসার গুঁড়ো রয়ে গেছে, আঙুলে কড়কড়ে লাগছে সেগুলো । পিঠের মোটা পেশীতে ঢুকে গেছে এরপর বুলেটটা, কিন্তু শোল্ডার ব্লেডের নিচে কোন গর্ত নেই অনুভব করে বুঝলাম বেরোননি তিনি, রয়ে গেছেন ভিতরেই ।

ডেকে পিঠ দিয়ে শুয়ে মুখ খুলে হাঁপাচ্ছি, ঢোক গিলে বমির ভাবটাকে দমন করার চেষ্টা করছি বারবার। খোঁচাখুঁচি করায় তাজা রক্ত বেরুচ্ছে আবার ক্ষতগুলো থেকে । বুকের খাঁচার ভিতর বুলেটটা ঢোকেনি, এটুকু অন্তত পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি-যত ক্ষীণ আর নগণ্যই হোক, এখনও একটু আশা আছে আমার। কিন্তু দুর্বলতা আর অসহায় ভাব আমাকে এখনও স্থবির করে রেখেছে ।

বিশ্রামের ফাঁকে পরিবেশটা দেখে নিচ্ছি আধবোজা চোখে । আমার কাপড়-চোপড় আর চুল শক্ত হয়ে গেছে শুকনো রক্তে । ককপিটের মেঝেটা রক্তে লেপা, শুকনো কালচে রক্ত চকচক করছে রোদে । জলকুমারীর দোল খেয়ে আমার দিকে মুখ ঘুরে গেছে প্যানথারের । পিঠে ইস্পাতের হুক আর গলায় দড়ির ফাঁস নিয়ে এখনও বসে আছে সে, অক্লান্তভাবে আগুপিছু দুলছে তার মাথাটা । ফাইটিং চেয়ারের সাথে বাঁধা দড়ির ফাঁসটাই তাকে এখনও টেনে বসিয়ে রেখেছে। পেটের নাড়িভুঁড়ি এরই মধ্যে ফুলেফেঁপে গেছে তার, ভরা মাসের পোয়াতি মেয়েলোকের মত ঢাউস দেখাচ্ছে পেটটা ।

ক্রল করে এগোতে শুরু করলাম । বোটের দোলায় কেবিনের দরজার সামনে সরে এসেছে ব্ল্যাঙ্কের লাশ । তার উপর দিয়ে ক্রল করে ভিতরে ঢুকলাম। বার-এর পিছনে আইস-বক্সটা চোখে পড়তেই আবার ফুঁপিয়ে উঠলাম আমি । তিন ক্যান কোকাকোলা খেলাম, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বিষম খাচ্ছি বারবার, নাক মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসছে ঝাঁঝাল পানীয়, প্রতি ঢোকের পর হাঁপাচ্ছি-ঠাণ্ডা পানিতে ভেসে যাচ্ছে বুক । তারপর আবার শুয়ে পড়লাম । চোখ বুজে ঘুমুতে চাইছি চির জীবনের মত ।

'কোথায় রয়েছি আমরা?' প্রশ্নটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে মুহূর্তে সচেতন করে তুলল আমাকে । বহু কষ্টে দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালাম, বেরিয়ে এলাম জমাট রক্তে মোড়া ককপিটে ।

বোটের নিচে মোজাম্বিক স্রোতের গভীর পারপল ব্লু পানি বয়ে

যাচ্ছে। পরিষ্কার একটা দিগন্তরেখা ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে জলকুমারীকে। কয়েক জায়গায় পুরু মেঘের স্তর দেখা যাচ্ছে, উঠে আসছে গাঢ় নীল আকাশের বিশাল গম্বুজের দিকে। ভাটা আর বাতাসের টানে পুবদিকে বহুদূর চলে এসেছে জলকুমারী। তবে চারধারে নড়াচড়ার যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম এবং তারপর ঘুমে জড়িয়ে এল আমার চোখ। আবার যখন ঘুম ভাঙল, মাথাটা পরিষ্কার এবং হালকা লাগল, কিন্তু অনুভব করলাম সাংঘাতিক শক্ত হয়ে গেছে ক্ষতগুলো। একটু নড়লেই প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাইছে তীব্র ব্যথায়। একটা হাতের কনুই আর হাঁটু দুটোর উপর ভর দিয়ে শরীরটাকে ঘষে ঘষে শাওয়ার রূমে পৌঁছুলাম। ওষুধের বাক্সটা র‍্যাক থেকে নামানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ঝাঁটা দিয়ে গুঁতো মেরে নিচে ফেলতে চেষ্টা করলাম। বেশ ভারী জিনিস। সহজে নাড়ানো যাচ্ছে না। যখন পড়ল, মাথাটা সরিয়ে নিতে দেরি হয়ে যাওয়ায় আমার মাথার ওপরই পড়ল।

শার্ট ছিঁড়ে ক্ষতগুলো লেপে দিলাম অ্যান্টিসেপটিক লোশন দিয়ে। তারপর কোনরকমে সার্জিক্যাল ড্রেসিং গুঁজে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধলাম। কিন্তু এটুকু পরিশ্রমেই আবার জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম আবার। আহত হাতটা একটা স্লিঙে বাঁধার সময় ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠলাম শিশুর মত। আরও কঠিন কাজ অপেক্ষা করছে সামনে। ব্রিজের দিকে রওনা হতেই একসাথে হামলা চালাল বমি ভাব, আচ্ছন্নতা আর তীব্র যন্ত্রণা।

একবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল জলকুমারীর ইঞ্জিন। 'নিয়ে চলো আমাকে ডারলিং,' বিড়বিড় করে বলে অটোমেটিক পাইলটের হাতে ছেড়ে দিলাম ওকে। অনুমানের ওপর নির্ভর করে একটা কোর্স স্থির করে দিয়েছি। ডেকের ওপর বসতে যাব, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম এবং জ্ঞান হারালাম আবার।

জ্ঞান ফিরল সন্ধের ঠিক আগে। জলকুমারীকে অস্বাভাবিক শান্ত দেখে ছ্যাঁত করে উঠল বুক। মোজাম্বিক স্রোতের মধ্যে থাকলে যে দোলা আর গতি হবার কথা, তা নেই। উঠে দাঁড়িয়ে হুইলটা ধরলাম। সাগরের একটা ঘেরা অংশে কখন যেন ঢুকে পড়েছে বোট। সামনে তাকিয়ে শেষ প্রহরের ম্লান আলোয় উঁচু মাটির তীর দেখতে পেলাম। আর একটু দেরি হলে সর্বনাশ ঠেকানো যেত না। থ্রটল বন্ধ করে দিয়ে নিউট্রাল করলাম ইঞ্জিন। তীরের কাঠামোটা হঠাৎ চিনতে পারলাম আমি। বিগ গাল আইল্যাণ্ড ওটা। কোর্স নির্ধারণে একটু ভুল হয়েছিল আমার, গ্র্যাণ্ড হারবারের চ্যানেলকে পাশ কাটিয়ে সেন্ট মেরীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তের খুদে প্রবাল দ্বীপগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছে জলকুমারী।

হুইলের ওপর শরীরের ভর চাপিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছি, এই সময় ফোরডেকে চোখ পড়ল আমার। সবুজ ক্যানভাসে ঢাকা পোঁটলাটা এখনও পড়ে রয়েছে ওখানে। একটা শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীরে। কি আছে ওটার মধ্যে? হঠাৎ মনে হল, যাই থাকুক, বোট থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে ওটাকে। কেন কথাটা মনে হল তা ঠিক জানি না, কিন্তু উপলব্ধি করছি ওই ক্যানভাসের ভেতর মহাবিপদের বীজ সুপ্ত হয়ে আছে। ওটা নিয়ে রোদ ঝলমলে দিনের বেলা গ্র্যাণ্ড হারবারে ফেরা চলবে না। পানি থেকে তুলতে না তুলতে ওটার জন্যে এরই মধ্যে খুন হয়ে গেছে তিনজন লোক-এবং একটা বুলেট এখনও ঢুকে রয়েছে আমার বুকে।

ফোরডেকে পৌঁছুতে পনেরো মিনিট লাগল আমার। এইটুকু দূরত্ব পেরোতে দু'বার অচেতন হয়ে পড়লাম। ক্রল করে সবুজ ক্যানভাসটার কাছে যখন পৌঁছুলাম তখন প্রতিটি নড়াচড়ার সাথে সশব্দে ফোঁপাচ্ছি।

পরবর্তী আধঘন্টা শক্ত ক্যানভাস আর নাইলনের রশি ধরে বৃথাই টানাহ্যাঁচড়া করলাম। একটা মাত্র হাতের দুর্বল, অসাড়

আঙুল দিয়ে পোঁটলাটা খোলা সম্ভব নয়। ভিতরে কি আছে দেখার আশা আপাতত ছেড়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিলাম। তারপর সূর্যের শেষ রশ্মির সাহায্যে দ্বীপটার শেষ মাথার একঝাড় পাম আর উঁচু কয়েকটা ঢিবিকে সরলরেখার মধ্যে রেখে একটা বিয়ারিং নিলাম-জায়গাটাকে অত্যন্ত সাবধানে চিনে রাখলাম।

দশ মিনিট চেষ্টা করে ফোরডেক রেলিংয়ের একটা অংশ খুলে ফেললাম। সূর্য ডুবে গেছে ইতিমধ্যে, তবে এখনও অন্ধকার নামেনি। দুই পা দিয়ে ঠেলা মেরে পোঁটলাটাকে একটু একটু করে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কিনারার দিকে। এক সময় কিনারা থেকে পড়ে গেল সেটা, ঝপাৎ করে শব্দ হল, ছিটকে এসে চোখেমুখে লাগল সাগরের পানি।

নড়াচড়ায় ক্ষতের সবগুলোর মুখ খুলে গেছে আবার। ড্রেসিং চুইয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। ডেকের ওপর দিয়ে ফিরে আসছি, কিন্তু সবটা পেরোনো সম্ভব হল না, ককপিটের কাছাকাছি পৌঁছে শেষবারের মত জ্ঞান হারালাম।

ভোরের উষ্ণ রোদ আর সী-গালের তীক্ষ্ণ চিৎকারে জেগে উঠলাম আমি। কিন্তু চোখ মেলে তাকাতে ঝাপসা লাগল সূর্যটাকে, একটা কালো ছায়া যেন ঢেকে রেখেছে সেটাকে। আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল শরীরে। বুঝতে পারছি, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছি আমি। উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম শক্তি নেই, একচুল নড়তে পারছি না। দুর্বলতা আর যন্ত্রণার কয়েক হাজার টন ওজন চেপে রয়েছে আমার শরীরে। অদ্ভুতভাবে একদিকে কাত হয়ে আছে জলকুমারী, সম্ভবত উঁচু এবং শুকনো কোন সৈকতে উঠে বসে আছে সে।

মাস্তুল আর পাল টাঙাবার দড়িদড়ার দিকে তাকিয়ে আছি নিশ্চলক চোখে। কালো পিঠওয়ালা তিনটে সী-গাল একটা লোহার রডে পাশাপাশি বসে আছে। নিচে আমাকে ভাল করে এবং একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্যে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে

ঘন-ঘন এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাচ্ছে ওরা। পরিষ্কার হলুদ রঙের ঠোঁটগুলো ইস্পাতের মত শক্ত আর মজবুত দেখাচ্ছে। ঠোঁটের ওপরের অংশটা বেঁকে গিয়ে ছুঁচাল হয়ে শেষ হয়েছে, সেটুকুর রঙ লাল। চকচকে কালো চোখ মেলে দেখছে ওরা আমাকে, অসহিষ্ণুভাবে ডানা ঝাপটা দিয়ে পালক খসাচ্ছে বাতাসে।

চিৎকার করে ওদেরকে ভাগাতে চাইছি, কিন্তু জিভ এবং ঠোঁট একচুল নড়াতে পারছি না। সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছি আমি। জানি, এবার ওরা নেমে আসবে আমার পাশে, তারপর শুরু করবে আমার চোখ থেকে। চোখ থেকেই শুরু করে ওরা।

ঠিক যা ভেবেছি। অধৈর্য হয়ে উঠল একটা গাল, শূন্যে ডানা মেলে, গোত্তা খেয়ে নেমে এল আমার কাছাকাছি ডেকে। ডানা দুটো বেশ সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে, যত্নের সাথে ভাঁজ করল সে, তারপর পিঠের পেশী নেড়ে ভাঁজের অবশিষ্ট ত্রুটিগুলো দূর করে খাপে খাপে বসিয়ে নিল। গুনে গুনে দুই পা আরও সামনে এগোল সে। পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে আছি আমরা। আবার আমি চিৎকার করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না। হেলেদুলে আবার দুই পা এগোল গালটা। তারপর লম্বা করে দিল তার গলাটা, নিষ্ঠুর ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে যাচ্ছে-গলার ভিতর থেকে কর্কশ চিৎকার বেরিয়ে আসতে শুরু করল। হঠাৎ আমার আতঙ্কিত চোখের পলক পড়তে দেখে টের পেয়ে গেল সী-গালটা-বেঁচে আছি আমি!

চট করে দু'পা সরে গেল পাখিটা, কর্কশ চিৎকারের সুর বদলে গেল। বাকি দুটো সী-গাল বাতাসে ডানা ঝাপটাচ্ছে। দুঃসাহসী গালটা মাথা নেড়ে অভিশাপ দিল আমাকে, আশাভঙ্গের ক্ষোভে চেঁচামেচি করতে করতে ডানা মেলে উড়ে গেল। তার পাখনার বাতাসের ঝাপটা লাগল আমার মুখে। ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ওদের চিৎকার।

ওরা চলে যাবার পর আর কোন শব্দ নেই। রোদ চড়ছে,

ঘামছি আমি। মাত্র সকাল, সেই সন্ধে পর্যন্ত রোদে সেদ্ধ হব আমি? না, তা সেদ্ধ হব না-অতক্ষণ বেঁচে থাকার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না।

নতুন, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে না, জানি। বোটটা যেদিকে থেমেছে বলে অনুমান করছি সেদিকে দ্বীপবাসীরা ভুলেও কদাচ আসে না, আর নৌকা বা বোট চলাচলের পথ থেকে এটা শুধু অনেক দূরের জায়গা নয়, দৃষ্টিপথের আড়ালেও বটে।

নড়তে না পারলে আমার কি করার আছে! নিজের সাথে তর্ক করছি আমি। এই সময় মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গেল সম্পূর্ণ নতুন একটা শব্দ শুনে। কে যেন বোটের গা আঁচড়াচ্ছে।

প্রথমে মস্ত কালো কামানো মাথাটা ডেক লেভেলের উপর উঠল, তারপর কালো কুচকুচে কপালটা দেখতে পেলাম, সবশেষে দুটো চোখ। ডেকের ওপর একপাক ঘুরে আমার চোখে স্থির হল ওর দৃষ্টি। প্রকাণ্ড মুখটায় সহানুভূতির একবিন্দু ছাপও নেই, রাগে সেটা আরও কদর্য হয়ে উঠেছে। 'বোটটাকে আবার তুমি...মাসুদ, আই হেট ইউ, ম্যান! আই হেট ইউ...' উঠে আসছে ও।

কত কথা বলতে চাইছি, ওকে আমি কসম খেয়ে বলতে চাইছি আর কখনও জলকুমারীকে নোংরা হতে দেব না। বলতে চাইছি, খুশির সাথে দান করে দেব ওকে বোটটা। বলতে চাইছি, ওকে দেখে আমি কত খুশি হয়েছি তা যেন কেউ আমাকে ব্যাখ্যা করতে না বলে, ওটা আমার পক্ষে স্রেফ অসম্ভব একটা কাজ। বলতে চাইছি...কিন্তু হায়, কিছুই বলতে পারছি না আমি।

উঠে এসে আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রডরিক। নিঃশব্দে পানি গড়াচ্ছে আমার চোখ দিয়ে, সেদিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে কয়েক সেকেণ্ড অপলক তাকিয়ে থাকল ও। তরপর ডেকের জমাট বাঁধা রক্তের উপর দ্রুত আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার, কোমরের বেল্ট থেকে লম্বা পাতের ছুরিটা হ্যাঁচকা টানে বের করে নিয়ে এগোল সেলুনের দিকে।

বোটে আর কেউ নেই দেখে একটু পরই ফিরে এল রডরিক। নিঃশব্দে আমার মাথাটা তুলে নিল কোলে। ক্ষতগুলো পরীক্ষা করল ধীরেসুস্থে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'এসে যখন পড়েছি, তখন যে কথাটা কক্ষণো কোনদিন বলিনি তোমাকে, মাসুদ, সেই কথাটা এখন বলেই ফেলি-আই লাভ ইউ, ম্যান। আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসি আমি তোমাকে...' সরল স্বীকারোক্তিটা শেষ করেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে।

আট

তীব্র ব্যথায় ছটফট করছি আমি। হাসপাতালের সব ক'জন নার্স, পাঁচজন, চেপে ধরে আছে আমাকে। চীফ সার্জেন জেমস ডানিয়েল হাস্য রসে আপ্লুত হয়ে উঠল। হা হা করে হাসছে সে। পরমুহূর্তে চোখ রাঙাল, বলল 'অ্যাই! জোয়ান ছেলে, একটুতেই এত কিসের চেঁচামচি? এই বয়সে অমন একটু কেটে-ছিঁড়ে যায়-ই তাতে হয়েছেটা কি?' কথা শেষ করে আবার সে নির্মমভাবে একটা সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ঢুকিয়ে দিল আমার বুকের ক্ষতটায়।

আবার আমি চিৎকার করে উঠলাম। গায়ে যদি একটু জোর থাকত, ওই প্রোবটা আমি ডানিয়েলের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় ঢুকিয়ে দিতাম। 'মরফিন ব্যবহার করতে কেউ শেখায়নি তোমাকে, ডাক্তার? কোত্থেকে পাস করেছ...?'

ঘুরে আমার মুখের সামনে চলে এল সে। বয়স পঞ্চান্ন, গায়ের রঙ তামাটে, জলহস্তীর মত মোটাসোটা শরীর, মুখে এমন দুর্গন্ধ যে তাতেই জ্ঞান হারাবার কথা রোগীদের-এই হল সরকারি হাসপাতালের চীফ সার্জেন জেমস ডানিয়েল। 'রানা, মাই বয়, ওই জিনিসটার ভারী দাম। তুমি কি?' জানতে চাইল সে, 'ফ্রি চিকিৎসা প্রার্থী, নাকি প্রাইভেট পেশেন্ট?'

'প্রাইভেট! প্রাইভেট!' চেঁচিয়ে উঠলাম।

মুখ ফুলিয়ে হাসল ডানিয়েল। 'এতক্ষণ বলনি কেন? খামোকা কষ্ট পেলে!' সিস্টারের দিকে তাকাল সে, বলল, 'যাও তাহলে, মি. মাসুদ রানার জন্যে দামি জিনিসটার এক ফোঁটা নিয়ে এসো।'

মরফিনের অ্যাম্পুল নিয়ে এসে ইঞ্জেকশনটা তৈরি করছে সিস্টার, এই ফাঁকে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করছে ডানিয়েল। বলল, 'একদম মরুভূমি হয়ে গিয়েছিলে, মাই বয়! গতরাতে এক এক করে ছয় পাইন্ট রক্ত চুষে নিয়েছে তোমার শরীর। তবে, বুলেটটা বের করতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলে...'

'কদ্দিনে সেরে উঠব, ডাক্তার?'

'একমাসের বেশি নয়।'

'একমাস!' উঠে বসার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলাম, কিন্তু আরও শক্ত করে চেপে ধরল আমাকে চারজন নার্স। 'অসম্ভব!' হাঁপাতে শুরু করে বললাম আমি। 'মওসুমটা মাঠে মারা যাবে তাহলে। আগামী হপ্তায় নতুন পার্টি আসার কথা...'

সিস্টার ঘ্যাচ করে সিরিঞ্জের সূচ বিঁধিয়ে দিল আমার বাহুতে।

'এই মওসুমের কথা ভুলে যাও, মাই বয়। আগামী বার বেশি করে মাছ ধরে পুষিয়ে নিয়ো। আবার ডানিয়েল মাংসের ভিতর থেকে খুঁজেপেতে হাড়ের টুকরো বের করতে শুরু করল।

মরফিনের প্রভাবে ব্যথাটা কমেছে, কিন্তু হতাশায় মুষড়ে পড়েছি আমি। এমনিতেই এবারের মওসুমে অনেক দেরি করে এসেছে মাছ, অবশিষ্ট ক'টা দিন যদি কাজে লাগাতে না পারি আবার আমি চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়ে যাব।

ধবধবে সাদা নতুন ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ক্ষতগুলো আবার বেঁধে দিল ডানিয়েল। এবং কৌতুক ও আশ্বাসের সুরে পেট থেকে আরও কিছু দুঃসংবাদ খালাস করল। বলল, 'বাঁ হাতটা বেশ কিছুদিন অসহযোগিতা করবে তোমার সাথে, মাই বয়। কাজ করবে, কিন্তু সব কাজ নয়। তাছাড়া, মেয়েদেরকে দেখাবার জন্যে শরীরে সুন্দর কিছু দাগ পাচ্ছ তুমি।' সিস্টারের দিকে তাকাল সে, বলল,

'ছয় ঘন্টা পর পর বদলাতে হবে ড্রেসিং। মাইসিটিন ক্যাপসুলের চলতি ডোজ চারঘন্টা পর পর দিতে থাক। আজ রাতে তিনটে মোগাডোন দেবে। কাল সকালে আবার ওকে দেখব আমি।' তারপর আবার আমার দিকে তাকাল সে, বিশৃঙ্খল গোঁফের নিচে নোংরা হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার, নিঃশব্দে একটু হেসে জানাল, 'এই কেবিনের ঠিক বাইরে গোটা পুলিস বাহিনী অপেক্ষা করছে, এখন তাদেরকে এখানে ঢুকতে না দিয়ে উপায় নেই আমার।' দরজার দিকে এগোল সে, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, 'নাইস শূটিং, রানা বয়। একা দু'জনকে যেভাবে সামলেছ-তুলনা হয় না! কি করেছিল ওরা? তোমার গার্ল ফ্রেণ্ডকে ফুল ছুঁড়ে মেরেছিল নাকি?' হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল সে।

কড়া ভাঁজের ইস্ত্রি করা ইউনিফর্ম পরেছে ইন্সপেক্টর টালি। সন্দেহ নেই, চামড়ার বেল্ট, স্ট্র্যাপ আর মেডেলগুলো আজ আবার পালিশ করেছে সে।

'গুড আফটারনুন, মি. রানা...'

'স্যার...' মনে করিয়ে দিলাম আমি।

আমার দিকে একদৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল টালি, তারপর কি মনে করে দরজার দিকে তাকাল একবার। আমি জানি, ভিতরে ঢোকার অনুমতি নেই বলে বাইরে বসে আছে রডরিক। টালি সম্ভবত তার কথা মনে রেখেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিল।

বলল, 'মি. রানা, স্যার, আপনার একটা জবানবন্দী নিতে এসেছি আমি। আশা করি আপনি এখন যথেষ্ট সুস্থ বোধ করছেন।'

'আপনাকে দেখার পর শুধু সুস্থ নয়, রীতিমত উৎসাহ বোধ করছি, ইন্সপেক্টর।'

সাব ইন্সপেক্টর টমসন প্যাড আর পেন্সিল হাতে কেবিনে ঢুকল, সোজা এগিয়ে এসে বসল আমার বিছানার একপাশে। মৃদু

গলায় বলল, 'আপনি আহত হয়েছেন শুনে খুব দুঃখ পেয়েছি, মি. রানা। এমন একজনও নেই দ্বীপে যে আপনাকে প্রত্যেকদিন দেখার জন্যে আসে না, কিন্তু ঢুকতে দেয়া হয় না বলে রোজ সবাই ফিরে যাচ্ছে...সাংঘাতিক চোট পেয়েছেন, তাই না, মিস্টার রানা?'

'ধন্যবাদ, টমসন। ওদের দু'জনকে যদি দেখতে, এ কথা বলতে না তুমি।'

রডরিকের এগারোজন ভাগ্নের একজন এই টমসন, ওর মা আমার জামা কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে দেয়। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন, কালো এবং অল্পবয়েসী যুবক টমসনই হতে যাচ্ছে সেন্ট মেরীর পরবর্তী পুলিস বাহিনী প্রধান।

'দেখেছি-মাই গড!' চোখ কপালে তুলল টমসন। সহানুভূতিসূচক একটা চুক চুক শব্দ করল, তারপর বলল, 'কার সাথে লাগতে যাচ্ছে তা যদি আগে বুঝতে পারত ওরা...'

'আপনি তৈরি, মিস্টার রানা?' অস্বস্তি বোধ করছে টালি।

'সম্পূর্ণ,' বললাম তাকে। তারপর সুন্দরভাবে গুছানো গল্পটা শোনালাম। সব ভাল গল্পের মত এটাও সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি, কিছু কিছু কথা শুধু উল্লেখ করা হল না। সাগর থেকে নিরোর তোলা সাত রাজার ধন বিগ গাল আইল্যাণ্ডের কাছে আবার আমি ডুবিয়ে দিয়েছি-এ প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ চেপে গেলাম। কোন্ এলাকায় সার্চ করেছি আমরা তাও জানালাম না। কিন্তু বারবার এ প্রসঙ্গে ফিরে আসতে চেষ্টা করছে টালি।

'কি খুঁজছিল ওরা?'

'বলতে পারব না। চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। আমাকে জানতে দেবে না বলে সাংঘাতিক সতর্ক ছিল ওরা।'

'কোথায় ঘটল এসব?' আবার জিজ্ঞেস করল টালি।

'হেরিং বোন রীফ ছাড়িয়ে, রাসতাফা পয়েন্টের দক্ষিণে।' গানফায়ার ব্রেক-এর কাছ থেকে এ-জায়গাটা পঞ্চাশ মাইল দূরে।

'যেখানে ওরা ডাইভ দিয়েছিল, ঠিক চিনতে পারবেন আপনি?'

'মনে হয় না। কয়েক মাইল এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে। আসলে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে ব্যস্ত রেখেছিল ওরা আমাকে। কোনদিকে ভাল করে নজর দেবার সময় পাইনি।'

চিন্তিতভাবে দাঁত দিয়ে গোঁফের রোঁয়া কামড়াচ্ছে টালি। 'আপনি বলছেন, কিছু বুঝতে না দিয়ে ওরা আপনাকে আক্রমণ করে বসে-এখন বলুন, ওরা আপনাকে খুন করতে চাইল কেন?'

'সত্যি কথা বলব?'

'অবশ্যই!'

'ওদেরকে জিজ্ঞেস করিনি আমি,' বললাম টালিকে। 'জিজ্ঞেস করার সময়ই পাইনি।' ভীষণ ক্লান্ত লাগছে আমার তাই বেশি কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছি না-ভুলভাল হয়ে গেলে ফ্যাসাদে পড়ে যাব। 'আমাকে লক্ষ্য করে প্যানথার যখন গুলি ছুঁড়তে শুরু করল, তখন ভুলেই গিয়েছিলাম, পুলিসে রিপোর্ট করার জন্যে কারণটা জেনে নেয়া দরকার...'

'এটা ঠাট্টার বিষয় নয়, মি. রানা!' চোখ রাঙাল ইন্সপেক্টর টালি।

বিছানার পাশের বোতামে চাপ দিয়ে বেল বাজালাম আমি, সাথে সাথে কেবিনে ঢুকল সিস্টার। বললাম, 'আমি অসুস্থ বোধ করছি।'

'এবার যেতে হয়, ইন্সপেক্টর,' বলল সিস্টার। টালিকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগই দিল না সে। পথ দেখিয়ে বাইরে পৌঁছে দিয়ে এল পুলিস দু'জনকে।

সরকারিভাবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারও সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কেবিনের বাইরে রাতদিন চব্বিশ ঘন্টার জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করেছে

ইন্সপেক্টর টালি। হাসপাতালের সবাই জানে খুনের অভিযোগে বিচার হবে আমার।

পরবর্তী তিনদিন নিরুপদ্রব পরিবেশে প্রচুর চিন্তাভাবনা করার অবকাশ পেলাম আমি। কেবিনের জানালা দিয়ে ফুলের বাগান দেখা যায়। অনেক দূরে পাথরের বিশাল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দুর্গ, ব্যাটলমেন্টের উপর বসানো কামান ইত্যাদি চোখে পড়ে। খুব ভাল খাবার দেয় সিস্টার মে, তার সাথে বেগম রডরিকের পাঠানো প্রচুর মাছ, প্রচুর ফলপাকড় যোগ হয়। ল্যাম্পনি একজন নার্সকে ঘুষ দিয়ে একবোতল হুইস্কি পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছে আমার বালিশের নিচে। সিস্টার মে-র মুখে শুনেছি গোটা দ্বীপের সবাই নাকি আমার সুস্থতার জন্যে গির্জায়, মন্দিরে আর মসজিদে প্রতিদিন প্রার্থনা করে। ব্ল্যাঙ্ক আর প্যানথারকে পুরানো গোরস্থানে কবর দেয়া হয়েছে এবং সবাই আশা করছে এক বছরের মধ্যেই গোরস্থানটা সাগরতলে নেমে যাবে।

এই তিনদিন চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, বিগ গাল আইল্যাণ্ডের কাছে যে পোঁটলাটা ডুবিয়ে রেখেছি সেটা আপাতত আরও কিছুদিন ওখানেই থাকবে। অনুমানে বুঝতে পারছি, এখন থেকে অনেকগুলো চোখ আমার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। কেন, বা তারা কারা-এসব কিছুই আমি জানি না। কিন্তু বুঝতে পারছি, যা ঘটেছে তার ফলে আমার জীবন এখন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কোন্‌দিক থেকে বুলেট ছুটে আসবে তা যতক্ষণ জানতে না পারছি, ততক্ষণ দিগন্তরেখার নিচে মাথাটা নামিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ঘুরেফিরে বারবার মনের মধ্যে ফিরে এল নিরো ছেলেটার কথা। চিনি না, আগন্তুক-এইসব বলে নিজেকে প্রবোধ দিতে চাইলাম বটে, কিন্তু কাজ হল না। ওর কথা মনে পড়লেই দুঃখে ফেটে যেতে চায় বুকটা। অথচ এই ধরনের ভাবাবেগকে কোনদিন প্রশ্রয় দিতে অভ্যস্ত নই আমি। আসলে নিরোর সরলতাটুকু ভাল

লেগে গিয়েছিল আমার। তাছাড়া, এমন রোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার শিকার হতে দেখেছি ওকে!

তিনদিন কেটে যাবার পর আগের চেয়ে অনেক সুস্থ লাগছে নিজেকে আমার। কারও সাহায্য ছাড়াই এখন আমি বিছানায় উঠে বসতে পারি।

হাসপাতালে আমার কেবিনেই অনুষ্ঠিত হল বিচার বিভাগীয় তদন্ত। তদন্ত এবং রায় একই সাথে হয়ে যাবে তা আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। কিন্তু আমাকে হতচকিত করে দিয়ে ঠিক তাই ঘটে গেল।

অধিবেশন বসল রুদ্ধদ্বার কক্ষে। এতে অংশগ্রহণ করলেন দেশের প্রধান বিচারপতি, প্রধান প্রশাসক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা।

প্রধান প্রশাসক অর্থাৎ মহামান্য প্রেসিডেন্ট স্বয়ং চিরাচরিত রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে সাদা একটা শার্ট ছাড়া সম্পূর্ণ কালো পোশাক পরে এসেছেন। দীর্ঘদেহী প্রধান বিচারপতি শার্কনেস সাহায্য করছেন তাঁকে। আর নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে হাজির হয়েছে ইন্সপেক্টর টালি।

সবচেয়ে আগে আমার আরাম এবং অসুস্থতা সম্পর্কে প্রচণ্ড উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রেসিডেন্ট। কেন জানি না, তাঁর প্রিয় পাত্রদের মধ্যে আমাকেও তিনি একজন বলে গণ্য করে থাকেন।

‘মিস্টার রানা, সবচেয়ে আগে নিজেকে তুমি সবল করে তোল। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় আবার মাছ ধরতে দেখতে চাই। ব্যস, আমার বলার কথা এটুকুই! কোনও ব্যাপারে দুশ্চিন্তা কর, এ আমি চাই না-এখানে কেউ আমরা তোমার বিপদ বাড়াবার জন্যে আসিনি-রাইট?’ মহামান্য প্রেসিডেন্ট অন্যান্যদের দিকে তাকালেন।

ইন্সপেক্টর টালিকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। এর জন্যে ওকে দোষ দেয়া যায় না। বিচার পর্ব শুরু হবার আগেই সুস্পষ্ট রায় হয়ে

যাওয়ার দৃষ্টান্ত ন্যায় বিচারের ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

গুছানো গল্পটা আবার একবার মুখস্থ বলে গেলাম আমি। ছোট্ট কাহিনী, কিন্তু প্রচুর সময় লাগল শেষ করতে। তার কারণ বারবার আমাকে বাধা দিলেন প্রেসিডেন্ট। ঘটনার মধ্যে আমার প্রতিটি আচরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তিনি, ক্ষতের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে কয়েকবার আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। হাসি মুখে তীব্র ব্যথা হজম করলাম প্রতিবার। আমার বক্তব্য শেষ হতে সবিস্ময়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন নিঃশব্দে, তা প্রায় ঝাড়া আধ মিনিট ধরে।

তারপর বললেন, 'ওই গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে তুমি যা করেছ, মিস্টার রানা, বীরত্বের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মত,' অন্যান্যদের দিকে তাকালেন তিনি, 'রাইট, জেন্টলমেন?'

আন্তরিকতার সাথে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন প্রধান বিচারপতি শার্কনেস। কিন্তু টালি চুপচাপ থাকল।

'এবং সত্যিই গুণ্ডা ওরা,' প্রেসিডেন্ট বলে চলেছেন, 'ওদের হাতের ছাপ লণ্ডনে পাঠানো হয়েছিল, আজ উত্তর এসেছে-ওরা এখানে ছদ্ম পরিচয় নিয়ে এসেছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ওদের নামে ফাইল আছে। গুণ্ডা, কুখ্যাত গুণ্ডা- দু'জনেই।' প্রধান বিচারপতির দিকে তাকালেন তিনি। 'কোন প্রশ্ন, প্রধান বিচারপতি?'

'আমার কোন প্রশ্ন নেই, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'গুড। ভেরি গুড।' খুব খুশি হলেন প্রেসিডেন্ট।

'তোমার ব্যাপারটা কি, ইন্সপেক্টর?'

টালি টাইপ করা একটা প্রশ্নমালা বের করল পকেট থেকে।

'এসব আবার কি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'ও, প্রশ্ন। বেশ, বেশ। কিন্তু ফালতু কোন প্রশ্ন ঢুকে আনোনি তো? ওতে এমন কোন প্রশ্ন নেই তো যার ফলে উত্তর দিতে অসুবিধে হবে মিস্টার রানার, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন?'

টালি ইতস্তত করছে।

প্রেসিডেন্ট কালক্ষেপ না করে বলে বসলেন, 'বেশ। ঝামেলা চুকে গেল। তদন্তে জানা গেল, মিস-অ্যাডভেঞ্চারের পরিণতিতে মৃত্যু হয়েছে ওদের। মিস্টার রানা স্রেফ আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছেন, সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। বেকসুর খালাস পেলেন তিনি।' কেবিনের একধারে বসা স্টেনোগ্রাফারের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'সব লিখে নিয়েছ তো? টাইপ করে একটা কপি আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো, সই করে দেব।' চেয়ার ছেড়ে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। 'এবার গা ঝাড়া দিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠ, মিস্টার রানা। তাড়াতাড়ি আবার গভর্নমেন্ট হাউজের ডিনারে দেখতে চাই তোমাকে আমি। আমার সেক্রেটারি তোমাকে আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাবে। তোমার অসম সাহসিকতার কাহিনীটা আগাগোড়া আরেকবার শুনতে চাই আমি।'

আবার যখন বিচারের সম্মুখীন হব, ভাবলাম, তখনও যেন এইরকম বিবেচনার আনুকূল্য পাই আমি। সরকারি ভাবে আমাকে নিরপরাধ ঘোষণা করা হয়েছে, সুতরাং শুভানুধ্যায়ীরা এবার আমার সাথে দেখা করার অনুমতি পেল।

কেবিনে ঢুকল না রডরিক আর ল্যাম্পনি, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ভিড় সামলাতে ব্যস্ত ওরা। একজন করে লোককে একমিনিট সময়ের জন্যে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে ওরা, সে বেরিয়ে গেলে আরেকজনকে ঠেলে দিচ্ছে কেবিনের ভিতর। সবচেয়ে আগে সুযোগ পেল কালো মাণিকের দল। তারপর মেয়েদেরকে সাথে নিয়ে এল মা এডি। মালভূমি থেকে এসেছে খেত মজুর আর মেয়ে শ্রমিকরা। হিলটনের ম্যানেজার থেকে শুরু করে টেলিফোন অপারেটর মারিয়া, ওরাও দেখতে এল আমাকে। তারপর এল পাকা আপেলের মত এক ষোড়শী, জুডিথ। আমার কানে কানে প্রেম নিবেদন করল সে।-আমাকে নয়, ল্যাম্পনিকে। তাকে কথা দিলাম তার সমস্যার একটা সমাধান অবশ্যই করব

আমি। যাবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করল জুডিথ, ফেঁসে গিয়ে সে কি ভুল করেছে? তাকে বললাম, 'ল্যাম্পনিকে ক্রু হিসেবে পেয়ে আমি গর্বিত। তাকে স্বামী হিসেবে যে পাবে সে তো মহা ভাগ্যবতী।' খুশি মনে বিদায় নিল সে।

সবশেষে কেবিনে ঢুকল রডরিক আর বেগম রডরিক। ওদের বিয়ের জমকালো পোশাক পরে এসেছে ওরা। বেগম রডরিক আমার জন্যে তৈরি করে এনেছে সুস্বাদু ব্যানানা কেক, এর প্রতি আমার দুর্বলতার কথা জানা আছে তার।

আমাকে প্রায় সুস্থ দেখে স্বস্তি আর আনন্দে দেয়ালে ঠুকে মাথাটা শুধু ভেঙে ফেলতে বাকি রাখল রডরিক। তারপরই কর্কশ গলায় গাল পাড়তে শুরু করল আমাকে সে। মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে উল্টে গিয়ে বুলডগের মত দাঁড়াল চেহারাটা।

বলে চলেছে, 'জলকুমারী একদম শেষ হয়ে গেছে। ডেকটাকে আর কোনদিন পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। রক্ত শুষে নিয়েছে, ম্যান। আর তোমার ওই পাজি কারবাইনটা কেবিনের বাল্কহেডটাকে চুরমার করে দিয়েছে। ল্যাম্পনিকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তিনদিন ধরে আঠারো ঘন্টা করে খেটেও আমরা আগের চেহারা ফিরিয়ে আনতে পারিনি-আরও কয়েকটা দিন লাগবে।'

'দুঃখিত, রডরিক। এরপর কাউকে গুলি করার দরকার হলে আগে তাকে বোটের কিনারায় দাঁড়াতে বলব-কথা দিলাম তোমাকে।' আমি জানি, রডরিক আর ল্যাম্পনি মেরামতের কাজ শেষ করার পর একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না বোটে।

'ওসব বুঝি না,' দরজা পেরিয়ে কেবিনে ঢুকল ল্যাম্পনি, 'রডরিক, শালা বসকে জিজ্ঞেস কর, মাছ ধরতে বেরোচ্ছে কবে?'

'কবে?' জিজ্ঞেস করল রডরিক।

'খুব বেশি দেরি হলে আজ থেকে সাতদিন পর।'

'স্ট্রীমে বড় বড় সব মাছ দেখা যাচ্ছে, বস্,' বলল ল্যাম্পনি।

'আমরা নেই বলে সবগুলো নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছে।'

'ওদিকে শুনলাম রামাদীন নাকি তোমার সব পার্টিকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছে যে তুমি সাংঘাতিক অসুস্থ, তোমার বদলে তারা ইচ্ছা করলে মিস্টার ডনম্যানের বোট চার্টার করতে পারে।'

'কী!' মেজাজ বিগড়ে গেল আমার। চিৎকার করে বললাম, 'যাও তো, ল্যাম্পনি, রামাদীনকে এক্ষুনি ধরে নিয়ে এসো!' ধরে আনতে বললে অবশ্যই তাকে বেঁধে নিয়ে আসবে ল্যাম্পনি, তাই পিছন থেকে আবার চিৎকার করে বললাম, 'ধরে নয়, ডেকে নিয়ে আসবে।'

হোটেল হিলটনের সাথে ডিক ডনম্যানের চুক্তি আছে। দুটো বড় আকারের গেইম ফিশিং বোট কিনে ডনম্যানকে ভাড়া দিয়েছে ওরা, ডনম্যান বিদেশ থেকে দু'জন স্কিপার আনিয়ে বোট দুটো চালায়। আন্তরিকতার অভাবে মাছ ওরা ধরতেই পারে না, তাই কপালে চার্টারও জোটে না। বুঝতে পারছি আমার অসুস্থতার সুযোগে ডনম্যানের কাছ থেকে মোটা কমিশন খাবার লোভ ছাড়তে পারেনি রামাদীন।

এতই ব্যস্ত সে, দ্বীপের কোথাও তার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেল না ল্যাম্পনি। খবর পেয়ে পরদিন নিজেই এল হাসপাতালে।

'প্রথমেই বলতে চাই, আমার কোন দোষ নেই,' বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে ঢ্যাঙা রামাদীন শুরু করল, নাকের ডগায় নেমে আসা চশমার ফ্রেমের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। 'ডাক্তার ডানিয়েলের কাছ থেকে জেনেছি এ-মওসুমে আপনার মাছ ধরা লাটে উঠেছে। সেজন্যে আমি তো আর আমার ব্যবসা লাটে তুলতে পারি না। ছয় হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে এসে তারা যদি দেখে আপনি শয্যাশায়ী, ফুস্‌স্ করে পাংচার হয়ে যাবে আমার প্রেস্টিজ আর ব্যবসার গুডউইল। আপনাকে আমি ভয় করি, কিন্তু তবু আমি তা হতে দিতে পারি

না। আমার বেনিয়া বাপ-মারা যাবার আগে রুটি-রুজির প্রশ্নে আপোস করতে নিষেধ করে গেছেন আমাকে।' কথার শেষে ঠোঁটে একটা গোবেচারা টাইপের হাসি টানল সে।

'আপনার ব্যবসার গুডউইল আর নর্দমার দুর্গন্ধ, এদুটো একই জিনিস বলে শুনেছি,' বেশি কিছু বললাম না ওকে, কারণ ওর কথায় যুক্তি আছে।

'তবে কথা হল এই যে,' হাত নেড়ে আশ্বাস দিল আমাকে রামাদীন, 'নিজের ওপর দরদ আছে আমার, তাই আপনাকে আমি পথে বসাব না। দয়া করে সুস্থ হয়ে উঠুন শুধু, সাথে সাথে ডজনখানেক লোভনীয় চার্টারের ব্যবস্থা করে দেব আমি।

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। আবার নাইট ডিউটির লোভ দেখাচ্ছে আমাকে রামাদীন। এতে ওরও প্রচুর লাভ, প্রতি ট্রিপে কম করেও সাড়ে সাতশো ডলার কমিশন পাবে। আর আমার এই শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এ-কাজ অনায়াসে করতে পারব আমি। জলকুমারীকে শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, তার বেশি কিছু নয়। বিপদের ঝুঁকি যে নেই তা নয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বিপদে পড়িনি আমরা। আঁটঘাট বেঁধেই এ-কাজে হাত দেয়া হয়। গোলমাল পাকাতে পারে যারা তাদেরকে সন্তুষ্ট করার কায়দা জানা আছে রামাদীনের।

কিন্তু যতই লোভ দেখাক রামাদীন, আমার মন সায় দিচ্ছে না। লোভ হচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে এ-ও বুঝতে পারছি, বেশি রোজগারের এই সর্পিল পথ আমার জন্যে নয়।

'ভুলে যান কথাটা,' বললাম ওকে। 'আপনাকে এর আগেও বহুবার বলেছি, এখন থেকে শুধু মাছ ধরব আমি।'

'ঠিক আছে,' অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ঢ্যাঙা রামাদীন। তারপর চোখ পিট পিট করে তাকাল আমার দিকে। মুখে অদ্ভুত এক আবেশের ভাব ফুটিয়ে তুলে হাসল সে, বলল, 'আপনার ইচ্ছার ওপর জোর নেই। কিন্তু কথা হল এই যে কয়েকটা পুরানো

মক্কেল আপনার খোঁজে আমাকে জ্বালিয়ে মারছে। আপনার ওপর ওদের খুব ভক্তি।' চোখ দুটো প্রায় বুজে এল রামাদীনের। 'আমার তো বিশ্বাস, ওদেরকে আপনি জাদু করে ছেড়ে দিয়েছেন, তাই আপনার কথা আজও ভুলতে পারছে না। যাই হোক, কি আর করা, নিষেধ করে দিই ওদেরকে...'

চতুর রামাদীনের কৌশল কাজে লেগে গেল, শত চেষ্টা করেও কৌতূহল দমন করতে পারলাম না আমি, জানতে চাইলাম, 'বডি? না, বক্স?'

বডি হল আফ্রিকা মেইনল্যাণ্ড থেকে বা মেইনল্যাণ্ডে গোপনে মনুষ্য পাচার করা। নতুন সরকারের রোষানলে পতিত কোন রাজনীতিক হয়ত দেশ ছেড়ে পালাতে চায় অথবা কোন বিপ্লবী সংগঠনের নির্বাসিত নেতা হয়ত বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার মানসে দেশে ফিরতে চায়। আর বক্স হল আগ্নেয়াস্ত্র পাচার।

এদিক-ওদিক মাথা দোলাল ঢ্যাঙা রামাদীন, সুর করে ছড়া কাটল, 'ফাইভ, সিক্স-পিকআপ স্টিকস।' নার্সারীতে পড়ানো হয় ছড়াটা। এখানে স্টিক বলতে বোঝাচ্ছে আইভরি, হাতির দাঁত। অত্যন্ত সুসংগঠিত একটা দল সুপরিকল্পিত ভাবে পূর্ব আফ্রিকার সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং আদিবাসী এলাকা থেকে অবৈধভাবে হাতির বংশ ধ্বংস করে চলেছে। হাতির দাঁতের মস্ত একটা বাজার রয়েছে দূর প্রাচ্যে। উপকূলবর্তী দ্বীপপুঞ্জের গোলকধাঁধা থেকে এই মূল্যবান কার্গো বয়ে নিয়ে আসার জন্যে দরকার শুধু দ্রুত গতিসম্পন্ন একটা বোট আর দক্ষ একজন স্কিপার। খোলা সাগরে সমুদ্রগামী জাহাজ অপেক্ষা করছে, তাতে কার্গো তুলে দিলেই প্রচুর নগদ নারায়ণ।

'গোখলে রামাদীন,' বললাম ওকে, 'আপনার জননী নিশ্চয়ই আপনার পিতার নাম জানতেন না...'

হে হে করে হাসল নির্লজ্জ লোকটা, বলল, 'কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সিনিয়র মি. রানা অর্থাৎ আপনার কোটিপতি

পিতার সাথে আমার জননীর কখনও পরিচয় হয়নি।' পরমুহূর্তে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল সে। 'এধরনের রসিকতা কাজের প্রতি উৎসাহ বাড়ায়। বিলিভ মি, এসব আমি পছন্দ করি। শুনুন তবে, পার্টিদেরকে আমি জানিয়ে দিয়েছি আগের রেটে আর ডাল গলবে না। মুদ্রাস্ফীতি, তার ওপর ডিজেল ফুয়েলের দাম যেভাবে বাড়ছে...'

'কি রেট দিয়েছেন ওদেরকে?'

'প্রতি ট্রিপে সাত হাজার ডলার,' টপ করে বলল রামাদীন। দু'চোখে প্রত্যাশা নিয়ে লক্ষ করছে সে আমাকে।

সাত হাজার ডলার, খুব বেশি নয়। রামাদীনের পকেটে যাবে শতকরা পনেরো ভাগ, আর চোখ কান বুজে রাখার বিনিময়ে ইন্সপেক্টর টালিও ওই হারে ঘুষ খাবে। এর ওপর, এ ধরনের নাইট ডিউটিতে ডেঞ্জার মানি হিসেবে রডরিক আর ল্যাম্পনি প্রতি ট্রিপে পাঁচশো ডলার করে এক হাজার ডলার পেয়ে আসছে।

'না,' বললাম ওকে। 'মাছ ধরতে চায় এমন দু'একটা পার্টি জোগাড় করুন আমার জন্যে।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভ আমি সামলাতে পারব না তা আমার চেয়ে বোধহয় ভাল জানা আছে লোকটার। একগাল হেসে সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'তা তো জোগাড় করবই। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন, মাছ ধরার পার্টির অভাব হবে না। তার আগে, বলুন প্রথম নাইট ডিউটিতে কবে যাচ্ছেন? ওদেরকে আজ থেকে দশ দিন পর আসতে বলে দিই? ওই সময় সাগরে উঁচু স্রোত আর আকাশে একটা চমৎকার চাঁদ থাকবে।'

ফিসফিস করে বললাম, 'বেশ। আজ থেকে দশ দিন পর।'

সিদ্ধান্ত বদল করতে পারি এই ভয়ে দ্রুত বিদায় নিয়ে কেটে পড়ল রামাদীন। তাড়াহুড়োর সময় আমার জন্যে উপহার হিসেবে নিয়ে আসা ফলের ঝুড়িটা আবার সে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এক হপ্তা পর ঘটনাটাকে সে একটা ভুল হিসেবে চালাতে চেষ্টা করল।

মুখে কিছু না বললেও তা আমি বিশ্বাস করিনি। কারণ নার্সদের কাছে শুনেছি রোগী দেখতে এসে সব সময়েই নাকি উপহারটা ফিরিয়ে নিয়ে যায় ও মনের ভুলে।

নাইট ডিউটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর দেখা গেল আমার ক্ষতগুলো দ্রুতগতিতে সেরে উঠছে। ছয়দিনের দিন বিছানায় বসিয়ে সিস্টার মে আমাকে গোসল করাল। দারুণ সেবা করছে মেয়েটা আমার। তবে কাছে আসার আগে প্রতিবার আমার বেয়াদপ হাত দুটোকে সামলে রাখার জন্যে অনুরোধ করে সে। দেখতে খুব ভাল, তার চেয়ে ভাল ওর সাদা ড্রেস পরা ফিগারটা-ডাঁসা পেয়ারার মত ওকে চিবিয়ে খাবে ওর স্বামী। আমার শারীরিক শক্তির প্রত্যাবর্তন লক্ষ করে একাধারে পুলকিত এবং আতঙ্কিত হল সিস্টার মে। 'মিস্টার রানা, দোহাই, এত জোরে ধরবেন না, কব্জি ভেঙে যাবে আমার।' ওকে ছেড়ে দিলাম আমি, তারপর বলতে শুনলাম, 'লর্ড! এত শক্তি পেলেন কোথায়?'

'যেখানেই পাই, জিনিসটা কি নষ্ট হতে দেয়া উচিত হবে আমাদের?'

দ্রুত প্রচণ্ড ভাবে মাথা নেড়ে নিরাশ করল ও আমাকে।

নয়

সেদিন থেকে আরও উৎসাহের সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। সবুজ ক্যানভাসে মোড়া রহস্যটা সারাক্ষণ খোঁচা মারছে আমাকে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে বিগ গাল আইল্যাণ্ড। ধৈর্য ধরার প্রতিজ্ঞা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে, অনুভব করছি। 'মাত্র এক নজর দেখব জিনিসটা,' নিজেকে বললাম। 'এখুনি নয়, পরিস্থিতি একটু শান্ত হোক...'

প্রতিদিন দু'এক ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করতে দিচ্ছে ওরা আমাকে। কিন্তু আমি সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে কাজ করার শক্তি চাইছি। আমার অস্থিরতা সিস্টার মে চেষ্টা করেও দমন করতে পারছে না।

ম্লান মুখে একদিন সে বলেই ফেলল, 'মেয়েমানুষ-তার চেয়ে বড় নেশা কি হতে পারে?'

'অ্যাডভেঞ্চার,' বললাম আমি। কিন্তু কিছুই বুঝল না সে। সম্ভবত মেয়েমানুষ বলেই বুঝল না প্রকৃতি ওদেরকে মেয়েমানুষ হিসেবেই তৈরি করেছে-পুরুষদেরকে ঘরমুখো করার জন্যে।

ডাক্তার ডানিয়েল তো অবাক। 'ক্ষতের ফাঁকগুলো এত তাড়াতাড়ি জোড়া লাগছে-এমন তো শুনিনি কখনও! বড় জোর আর এক হপ্তা...'

'দূর, দূর!' তার কথা উড়িয়ে দিলাম আমি। সাতদিন পর নাইট ডিউটিতে যাচ্ছি, তার আগেই সেরে উঠতে হবে আমাকে। সব ব্যবস্থা কোন গোলমাল ছাড়াই পাকা করে ফেলেছে রামাদীন। ইতিমধ্যে পকেট খালি হয়ে গেছে আমার। নাইট ডিউটিতে এখন আমাকে যেতেই হবে।

রোজ সন্ধ্যায় দেখা করতে আসে আমার ক্রুরা। ওদের রিপোর্ট থেকে বুঝতে পারি, দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে জলকুমারীর মেরামতের কাজ। আজ সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশ একটু আগে এল ল্যাম্পনি। ওর সবচেয়ে দামি পোশাক আর জুতো পরে এসেছে ও, কিন্তু কেন যেন আজ ওকে আশ্চর্য সুবোধ আর শান্ত দেখাচ্ছে। একা নয়, সাথে আরেকজনকে নিয়ে এসেছে।

ওর সাথে জুডিথকে দেখে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলাম। আমার নাক গলাবার আগেই নিজেদের ব্যাপারে ওরা একটা সমাধানে পৌঁছেচে বুঝতে পেরে খুশি হলাম। দুর্গের কাছে সরকারি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী জুডিথ বয়স্কদের অক্ষর-জ্ঞান দান করে। হাইস্কুল পাস করেছে সবে, দ্বীপে কলেজ থাকলে আরও পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল। মেয়ে হিসেবে সব দিক থেকে ভাল, ছন্নছাড়া ল্যাম্পনিকে কেউ যদি বাঁধতে পারে, ও-ই পারবে।

'হাউ ডু ইউ ডু, মি. রানা,' সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসল সে।

'হ্যালো, জুডিথ। দু'জন একসাথে এসে ভালই করেছ,' তারপর ল্যাম্পনির দিকে তাকালাম, এবং চেপে রাখতে না পেরে নিঃশব্দে হেসে ফেললাম আমি। আমার চোখের দিকে অদ্ভুত এক সঙ্কোচে তাকাতেই পারছে না সে। কি বলবে ভেবে না পেয়ে ঘামছে।

'আ-আমি আর জু-জুডিথ বি-বিয়ে...' অবশেষে তোতলাতে শুরু করল সে, 'বিষয়টা তোমাকে জানানো দরকার বলে মনে করলাম, বস্।'

'ওকে নিজের শাসনে রাখতে পারবে বলে মনে করো, জুডিথ?' হেসে উঠে জানতে চাইলাম।

পটলচেরা চোখে ল্যাম্পনির দিকে তেরছা দৃষ্টি হেনে আমাকে বলল সে, 'নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

'চমৎকার-তোমাদের বিয়ের দিন আমি একটা বক্তৃতা দেব,' নিশ্চয়তা দিয়ে বললাম। 'বিয়ের পর আমার সাথে কাজ করতে দেবে তো ওকে?'

'আপনার কাজ যাতে না ছাড়তে পারে তার জন্যেই তো বিয়ে করছি ওকে!'

তারপর ওরা যখন চলে গেল ক্ষীণ একটু ঈর্ষা বোধ করলাম আমি। আপন করে কাউকে পাওয়া নিশ্চয়ই সুখের অনুভূতিতে ভরে তোলে জীবন। ভাবলাম কোনদিন যদি কখনও মনের মত কাউকে পাই তাহলে বোধহয় চেষ্টা করে দেখব একবার। কিন্তু পরমুহূর্তে বাতিল করে দিলাম ভাবাবেগটাকে, আমার ভেতর একজন পাহারাদার জেগে উঠল। দুনিয়ায় মেয়ে তো অনেকই আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কে আমাকে বুঝবে তা আমি জানব কিভাবে? তাছাড়া নির্বাসিত একজন ছন্নছাড়াকে কষ্ট করে তারা কেউ বুঝতে চেষ্টাই বা করবে কেন?

হাতে দু'দিন থাকতে ডাক্তার ডানিয়েল আমাকে মুক্তি দিল। ইতিমধ্যে প্রায় দশ সের ওজন কমে গেছে আমার, চোখের কোণে

কালি পড়েছে, এবং অসহায় শিশুর মত দুর্বল বোধ করছি। বাঁ হাতটা এখনও স্লিঙে ঝুলছে, ক্ষতগুলোর মুখ এখনও খোলা-তবে নিজেই এখন আমি ড্রেসিং বদল করতে পারি।

পুরানো পিকআপটা নিয়ে এসেছে ল্যাম্পনি। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে সিস্টার মে-র কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি।

'আপনার সান্নিধ্য পেয়ে খুশি হয়েছি আমি, মিস্টার রানা।'

'সময় করে গরিবের বাড়িতে একবার এসো। গ্রিল করা মাছ আর চমৎকার ওয়াইন খাওয়াব। কথা দিচ্ছি, হাত দুটোকে...'

হেসে ফেলে সিস্টার বলল, 'আগামী হপ্তায় কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার। লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছি আমি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ,' বলল সিস্টার। 'বয়-ফ্রেণ্ড অপেক্ষা করছে। বিয়ে করব আমরা। আপনার গল্প শোনাব ওকে।'

'সুখী হও,' মৃদু হেসে বললাম।

গাড়িতে তুলে অ্যাডমিরালটি জেটিতে নিয়ে এল আমাকে ল্যাম্পনি। জলকুমারীতে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল রডরিক। এক ঘন্টা ধরে বোট মেরামতের অগ্রগতি যাচাই করলাম আমরা। ডেকগুলো সাদা তুষারের মত চকচক করছে। সেলুনের সমস্ত কাঠের কাজ বাতিল করে দিয়ে সে-সব জায়গায় নতুন করে ভরা হয়েছে। এত সুন্দর হয়েছে জোড়াতালির কাজ যে আমার চোখে কোথাও সামান্য দাগ পর্যন্ত ধরা পড়ল না।

চ্যানেল ধরে জলকুমারীকে সেই মাটন পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম আমরা। ওর ইঞ্জিনের মিষ্টি শব্দ শুনে আর সারা শরীর জোড়া মৃদু কম্পন অনুভব করে পুলকিত হয়ে উঠলাম আমি। সন্ধ্যা লাগতে ফিরে এলাম নোঙর ফেলার জন্যে, অন্ধকার ব্রিজে বসে ক্যান থেকে চুমুক দিয়ে বিয়ার খাচ্ছি আর নিচু গলায় গল্প করছি। ওদেরকে জানালাম আগামীকাল নাইট ডিউটিতে যাচ্ছি আমরা। ওরা জানতে চাইল কোথায় যাব আর কি ধরনের

কার্গো। ব্যস, এইটুকু-কোন তর্ক উঠল না।

'ফেরার সময় হয়েছে,' অবশেষে বলল ল্যাম্পনি। 'নাইট স্কুল থেকে জুডিথকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।'

ডিঙি নৌকায় চড়ে জেটিতে ফিরলাম আমরা। আমার রঙচটা পিকআপের পাশে পুলিসের একটা ল্যাণ্ড রোভার দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাদেরকে এগোতে দেখে সাব-ইন্সপেক্টর টমসন বেরিয়ে এল সেটা থেকে। তার মামা রডরিকের সাথে কুশল বিনিময়ের পর আমার দিকে ফিরল সে।

'দুঃখিত, মিস্টার রানা,' বলল টমসন। 'ইন্সপেক্টর টালি দুর্গে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। খুব নাকি জরুরি ব্যাপার।'

'আগামীকাল দেখা করলে হয় না?'

'নিজেই আসছিলেন তিনি, তারপর কি মনে করে আমাকে পাঠালেন,' বলল টমসন। 'আপনি না গেলে আমার ওপর চোটপাট করবেন।'

শুধু টমসনের কথা ভেবে যেতে রাজি হলাম আমি। 'ঠিক আছে, তোমার ল্যাণ্ড রোভারকে ফলো করছি আমি, কিন্তু রডরিক আর ল্যাম্পনিকে পৌঁছে দিতে হবে আগে।'

সম্ভবত ঘুষের পরিমাণ নিয়ে দর কষাকষি করতে চায় টালি, ভাবলাম আমি। তাছাড়া আমার সাথে জরুরি আর কি দরকার থাকতে পারে তার?

একটা হাঁটু দিয়ে স্টিয়ারিঙ হুইল চেপে রেখে ভাল হাতটা দিয়ে গিয়ার বদল করছি, ড্র ব্রিজ পেরিয়ে লাল বাতি অনুসরণ করে যাচ্ছি ল্যাণ্ড রোভারের। দুর্গের ভেতর ঢুকে উঠানের একপাশে দাঁড় করালাম পিকআপ।

পাহাড় সমান উঁচু পাথরের দেয়ালগুলো দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য নিয়ে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্রীতদাসদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমের ফসল এগুলো। দেয়ালের চওড়া মাথায় থারটি সিক্স পাউণ্ডারের জোড়া কামান

বসানো রয়েছে, চ্যানেল এবং গ্র্যাণ্ড হারবার পর্যন্ত এগুলোর নাগাল।

দুর্গের একটা শাখা জুড়ে দ্বীপের পুলিস হেডকোয়ার্টার, কারগার এবং অস্ত্রাগার, বাকি অংশে সরকারি অফিস, প্রেসিডেন্ট ভবন এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা।

পুলিস হেডকোয়ার্টারের সামনের সিঁড়ি টপকে উঠলাম আমরা। পথ দেখিয়ে একপাশের দরজা দিয়ে লম্বা করিডরে নিয়ে এল আমাকে টমসন, সেখান থেকে আবার একটা সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে আরেক করিডরে পৌঁছুলাম। তারপর আরও কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি টপকে নেমে এলাম ছোট্ট একটা উঠানে।

এর আগে দুর্গের এত ভেতরে কখনও আসিনি আমি। সম্ভবত সেজন্যেই একটা অস্বস্তি অনুভব করছি। নিরেট পাথরের দেয়ালগুলো এদিকে কম করেও বিশ ফুট চওড়া। উঠান থেকে একটা প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছি। শেষ মাথায় মোটা ওক কাঠের বিশাল দরজা, তাতে লোহার ভারী বার আড়াআড়িভাবে আটকে দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

ভেতরে ঢুকে ইন্সপেক্টর টালিকে দেখলাম। একজন কনস্টেবলকে নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। লক্ষ করলাম, ওরা দু'জনেই সশস্ত্র। একটা টেবিল এবং একটা মাত্র চেয়ার ছাড়া পাথরের ঘরটা সম্পূর্ণ খালি। কামরার পেছন দিকে খিলান আকৃতির একটা দরজার ওদিকে দেখা যাচ্ছে একসার সেলের দরজা। সিলিং থেকে নেমে আসা কালো তারের শেষ মাথায় ঝুলছে একশো পাওয়ারের নগ্ন একটা বালব। কামরাটা ঠিক চারকোনা নয়, পাঁচ কোনা। মেঝে আর দেয়ালে কিম্ভূতকিমাকার ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার এফ-এন কারবাইনটা পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর।

আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়েই পায়চারি থামাল ইন্সপেক্টর টালি, চরকির মত আধপাক ঘুরে তাকাল আমার দিকে। দরজার

ভেতর দিকে ভারী বার-টা ঘটাং করে তুলে দেবার শব্দ হল আমার পেছনে।

দুই পা এগিয়ে এসে কোমরে জড়ানো হোলস্টারের পিস্তলটায় একটা হাত রাখল ইন্সপেক্টর টালি, অপর হাতটা টেবিলের দিকে তুলে বলল, 'মাসুদ রানা, ওটা তোমার ফায়ার আর্ম?' স্যার তো নয়ই, মিস্টার পর্যন্ত উচ্চারণ করল না সে।

'তুমি জানো ওটা কার,' রাগের সাথে বললাম তাকে, 'আসলে মতলবটা কি, ইন্সপেক্টর?'

'রানা, অবৈধ ভাবে একটা ক্যাটাগরি 'এ' ফায়ার আর্ম সাথে রাখার জন্যে তোমাকে আমি গ্রেফতার করছি। তোমার কাছে একটা লাইসেন্স ছাড়া অটোমেটিক রাইফেল, টাইপ ফ্যাবরিক ন্যাশনাল, সিরিয়াল নাম্বার ফোর-ওয়ান সিক্স থ্রি-টু-ওয়ান-ফাইভ পাওয়া গেছে।'

'পাগল হয়ে গেছ!' হেসে উঠলাম আমি।

ভুরু কুঁচকে দেখল আমাকে টালি, হাসিটা পছন্দ হয়নি তার। সাব-ইন্সপেক্টর এবং কনস্টেবলকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত দিল সে। ওদেরকে আগেই বলে রাখা হয়েছে, বিনাবাক্যব্যয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল ওরা। পরমুহূর্তে বাইরের লোহার বারটা আটকাবার শব্দ পেলাম

কামরায় শুধু আমি আর টালি এখন। আমার কাছ থেকে ছয় সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। বোতাম খোলা হোলস্টারে একটা হাত রেখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ইন্সপেক্টর টালি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় আজ। তার মানে অনেক বড় কোন মতলব আছে তার।

'হিজ এক্সেলেন্সি এ-সব জানে, টালি?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

'হিজ এক্সেলেন্সি আজ বিকেল চারটেয় কমনওয়েলথ কনফারেন্সে যোগ দিতে লণ্ডনে গেছেন। দু'হপ্তার আগে ফিরছেন

না দ্বীপে।'
নিজের অজান্তে হাসিটা নিভে গেল মুখ থেকে। শুনেই বুঝলাম মিথ্যে কথা বলছে না টালি। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললাম, 'এবং তিনি চলে যাবার সাথে সাথে তোমার মনে হয়েছে দেশের নিরাপত্তা প্রচণ্ড হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, তাই না?'
এবার হাসল টালি। 'হ্যাঁ। এবং সে হুমকি সৃষ্টি করছ তুমি, মাসুদ রানা। শোনো, আসল কথা পাড়ার আগে আমি বলতে চাই আজ আমাকে তুমি হালকাভাবে নিলে নিজের সর্বনাশ করবে। আমি সিরিয়াস, রিয়েলি সিরিয়াস।'
'তা আমি বুঝতে পেরেছি।'
'দুটো হপ্তা এখানে তোমাকে আমি একা পাচ্ছি, মাসুদ রানা। দেয়ালগুলো মোটা এবং কোথাও একটু ফুটো বা ফাটল নেই-যত ইচ্ছা চেঁচাতে পারবে তুমি।'
'ছাগল!'
গালিটা গায়ে মাখল না টালি, বলল, 'দুটোর যে-কোন একটা পথ বেছে নিতে পার। হয় আমার সাথে আপোস করবে, নয়ত রামাদীন এসে তোমাকে মৃত ঘোষণা না করা পর্যন্ত পচবে।'
'ওই ঢ্যাঙা কবিরাজ আমার লাশ পরীক্ষা করবে? উঁহুঁ, তার চেয়ে আমি বেঁচে থাকাই পছন্দ করব।'
'তোমাকে বলেছি, আমি সিরিয়াস, মাসুদ রানা!' হুঙ্কার ছাড়ল টালি।
আঁতকে ওঠার ভান করে মাথাটা পিছন দিকে সরিয়ে নিলাম দ্রুত। তারপর হেসে বললাম, 'কি বিষয়ে আপোস করতে চাও? তোমার সাথে আমার ঝগড়াটা কিসের?'
'আমি জানতে চাই তোমার চার্টার পার্টি গোলাগুলি শুরু করার আগে ঠিক কোথায়-আই রিপিট-ঠিক কোথায় ডাইভিং অপারেশন চালিয়েছিল।'
'বলিনি তোমাকে? বলেছি, তুমি ভুলে গেছ। রাসতাফা

পয়েন্টের ওদিকে কোথাও। ঠিক কোথায় তা আমি নিজেই জানি না।'
'নির্দিষ্ট জায়গার বিন্দুটি পর্যন্ত জান তুমি,' দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলল টালি। 'সুযোগটা হাতে পেয়ে হারাবার পাত্র তুমি নও। এ-কথা তারাও জানত, সেজন্যেই তোমাকে তারা খুন করার চেষ্টা করেছে,' একটু থেমে হাসল সে। 'আমি জানি সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। তাই ঠিক করেছি একটু ঝাঁকি দেব তোমাকে। ঝাঁকিয়ে হয় প্রাণ নয় সত্য, দুটোর যে-কোন একটা বের করে আনব তোমার ভেতর থেকে।' নিঃশব্দে হাসছে সে এখন।
পাল্টা হেসে আমি তাকে বললাম,' কাকে ভয় দেখাচ্ছ, টালি?'
'রাসতাফা পয়েন্টের প্রশ্নই ওঠে না-অসম্ভব! এখান থেকে উত্তর দিকে কাজ করছিলে তোমরা মেইনল্যাণ্ডের দিকে। লর্ড নেলসনে তোমাকে আমি কি বলেছিলাম মনে আছে? বলেছিলাম, তোমার ওপর নজর রাখব। তোমার মুভমেন্ট সম্পর্কে কিছু রিপোর্ট পেয়েছি আমি।'
'জায়গাটা রাসতাফা পয়েন্ট ছাড়িয়ে কোথাও,' নির্লজ্জ ভাবে বললাম আবার।
'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকাল টালি। 'দেখা যাক কতক্ষণ জেদ বজায় রাখতে পার। শুরু করার আগে শুধু একটা কথা বলতে চাই, অসহ্য যন্ত্রণায় যখন মুখ খুলতে বাধ্য হবে তখন মিথ্যে কথা বলে আমাদের সময় নষ্ট কোরো না। মনে রেখ, সত্য-মিথ্যে পরীক্ষা করার জন্যে দুই হপ্তা সময় রয়েছে আমার হাতে।'
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা। কি এক গোপন পুলকে ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে টালির। লোকমুখে শুনেছি, ও নাকি নিজেই বন্দীদের ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং তা উপভোগ করে। ওর মুখের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে দেখে বুঝলাম আমি একজন উন্মাদ স্যাডিস্টের সামনে দাঁড়িয়ে

আছি।
দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম কামরার চারদিকে।
'না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল টালি, 'কোনরকম চালাকি করলে গুলি খাবে।'
আমার কাছ থেকে পনেরো ফুট দূরে ও। আমি নিরস্ত্র, দুর্বল। আমার পেছনে বন্ধ দরজা, তার ওপাশে দু'জন সশস্ত্র পুলিস। পেশী ঢিল করে দিলাম, কাঁধ দুটো একটু নেমে এল।
'এই তো সুমতি হয়েছে,' আবার বলল টালি। 'হাতকড়া পরিয়ে তোমাকে এখন সেলে ঢোকানো হবে, তারপর তোমার ওপর কাজ শুরু করব-যখন মনে করবে আর সহ্য করতে পারছ না, তখন শুধু বললেই হবে, সাথে সাথে তোমার যাতে আরাম হয় সে ব্যবস্থা করব আমি। ছোট্ট একটা ইলেকট্রিকাল টরচার সেট ব্যবহার করব তোমার ওপর। মাত্র বারো ভোল্টের গাড়ির ব্যাটারির সাহায্যে চালাব। ইস্পাতের কাঁকড়াগুলো তোমার শরীরের কোন্ কোন্ জায়গায় বসাতে হবে তা আমিই বেছে নেব। সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে তা আমি আগেই বেছে রেখেছি...' নিজের পেছন দিকে একটা হাত নিয়ে গিয়ে দেয়াল হাতড়াচ্ছে সে।
এই প্রথম লক্ষ করলাম দেয়ালে একটা ইলেকট্রিক বেলের বোতাম রয়েছে। বোতামে চাপ দিল টালি, বন্ধ দরজার বাইরে বেল বেজে উঠল, ক্ষীণ একটু আওয়াজ ঢুকল কানে।
ঘটাং করে লোহার বার নামিয়ে দরজা খুলে কামরার ভেতর ঢুকল পুলিস দু'জন।
'এই লোক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যে একটা মারাত্মক হুমকি,' ওদেরকে বলল টালি। 'একে সেলের ভেতর নিয়ে যাও।'
কিন্তু পুলিস দু'জন অর্ডার পেয়েও ইতস্তত করছে। আমাকে ওরা চেনে, তাই অভিযোগটার সত্যতা সম্পর্কে চিন্তা করছে।
'সঙ সেজে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কুইক!' ধমক মারল টালি।

দ্রুত আমার দু'পাশে চলে এল পুলিস দু'জন। আমার আহত বাহুর ওপর হালকাভাবে একটা হাত রাখল টমসন। ভাল কাঁধটা মৃদু ঝাঁকিয়ে টালি এবং তার পেছনের সেলের দিকে পা বাড়ালাম। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আধ সেকেণ্ডের একটা মাত্র সুযোগ চাই আমি।
'তোমার মা কেমন আছে, টমসন?' সরল আলাপের সুরে জানতে চাইলাম।
'ভাল আছেন, মিস্টার রানা,' সসঙ্কোচে বিড়বিড় করে বলল টমসন। ইন্সপেক্টরের ব্যবহার দেখে তারই যেন মাথা কাটা যাচ্ছে।
'জন্মদিনে যে উপহারটা পাঠিয়েছিলাম সেটা পেয়েছেন?' টমসনকে অন্যমনস্ক করে তুলতে চাইছি। টালির পাশে চলে এসেছি আমরা, দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। শরীরের পাশে ঝুলছে রুলার ধরা ডান হাতটা।
'হ্যাঁ, পেয়েছেন, মিস্টার রানা,' বলল টমসন।
বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার শরীরে। ধাক্কা খেয়ে একপাশে সরে গেল টমসন এবং টালি কিছু বুঝতে পারার আগেই আমার একটা ভাঁজ করা হাঁটু ওর তলপেটের নিচে প্রচণ্ড গুঁতো মারল। নিখুঁত, সুডৌল একটা গুঁতো-এর জন্যে যতবড় মূল্যই দিতে হোক আমাকে, তৃপ্তির তুলনায় তা নিতান্ত সস্তা বলেই মনে হবে আমার।
মেঝে থেকে পা দুটো পুরোপুরি আঠারো ইঞ্চি শূন্যে উঠে গেল ইংরেজের, দরজা পেরিয়ে সেলগুলোর লোহার রডে গিয়ে ধাক্কা খেল। তারপর পিঠ বাঁকা করে ঝুঁকে পড়ল নিজের পায়ের দিকে, দু'হাত দিয়ে চেপে আছে দুই ঊরুর সংযোগস্থল, চাপা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছে খোলা মুখ থেকে-কেটলির ভেতর পানি ফুটতে শুরু করলে এই ধরনের শব্দ হয়, ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে এগিয়ে গিয়ে আরেকটা হাঁটুর গুঁতো মারতে

চাইলাম, কিন্তু পুলিস দু'জনের বিস্ময়ের ঘোর কেটেছে এতক্ষণে, তারা আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে কামরার মাঝখানে টেনে আনল। এখন আর ওরা সম্মান দেখাচ্ছে না, আমার আহত হাতটা ধরে মোচড় দিচ্ছে।

'কাজটা খারাপ করলেন, মিস্টার রানা!' রেগেমেগ চেঁচাচ্ছে টমসন। 'আপনার কাছ থেকে এ-ধরনের জঘন্য কাজ আশা করিনি আমি...'

আহত হাতটা মুচড়ে ধরেছে টমসন, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করার চেষ্টা করছি। পাল্টা চিৎকার করে বললাম, 'প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আমাকে অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছেন, টমসন! তুমিও তা জান!'

সেলের সামনে বসে পড়েছে টালি। আহত জায়গাটা এখনও চেপে ধরে আছে হাত দিয়ে। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

'এটা আমার বিরুদ্ধে একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র, টমসন।' জানি, দ্রুত সময় বয়ে যাচ্ছে-টালি উঠে দাঁড়াবার শক্তি ফিরে পেলে পরিস্থিতি আমার বিপক্ষে চলে যাবে। ওর হুকুম অমান্য করার সাহস টমসন বা কনস্টেবলটার হবে না।

'ওই সেলের ভেতর আমাকে ভরতে পারলে ও আমাকে খুন করবে, টমসন...'

'শাট আপ!' চেঁচিয়ে উঠল টালি। উঠে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে আসছে এদিকে।

'প্রেসিডেন্ট দেশে নেই বলেই...'

'শাট আপ! শাট আপ!' মাথার ওপর রুলার তুলে আমার সামনে এসে পড়ল টালি।

শিশুর মত অসহায় বোধ করছি আমি। আত্মরক্ষার চেষ্টা করব সে-উপায় নেই আমার। বেকায়দাভাবে ধরে রেখেছে আমাকে ওরা। বেছে বেছে ক্ষতগুলোর উপর রুলারের বাড়ি মারছে টালি। প্রচণ্ড ব্যথায় মোচড় খাচ্ছে আমার শরীর। গলার

ভেতর থেকে কাতর ধ্বনি বেরিয়ে আসছে। ওরা আমাকে ছাড়ছে না।

'শাট আপ!' ব্যথায় এবং ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেছে টালি। 'তোকে আমি খুন করব, বাস্টার্ড।' রুলারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেল সে। হোলস্টার হাতড়ে পিস্তলটা ধরতে চাইছে।

এতক্ষণ যা আশা করছিলাম, এবার তা ঘটল। আমাকে ছেড়ে দিয়ে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল টমসন।

'না!' মাথা নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। ওটা হবে না। টালির দিকে ঝুঁকে পড়ে লম্বা কালো হাতটা দিয়ে টালির কব্জি চেপে ধরল।

'সরো, সরো সামনে থেকে। আমি অর্ডার করছি,' চিৎকার করে বলল টালি। কিন্তু হোলস্টার থেকে তার হাত সরিয়ে দিয়ে পিস্তলটা বের করে নিল টমসন, পিছিয়ে এল।

'এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে,' টমসনকে শাসাচ্ছে টালি। 'তোমার ডিউটি...'

'আমার ডিউটি সম্পর্কে আমি সচেতন, ইন্সপেক্টর,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল টমসন। 'বন্দীকে খুন হতে দেখা আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে না।' এরপর আমার দিকে ফিরল সে। 'মিস্টার রানা, আপনার বোধহয় এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।'

'একজন বন্দীকে পালাতে সাহায্য করছ,' নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষল টালি। 'এর মজাটা তোমাকে টের পাওয়াব আমি...'

'কোন ওয়ারেন্ট দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না,' বাধা দিয়ে বলল টমসন। 'প্রেসিডেন্ট ফিরে এসে একটা ওয়ারেন্টে যদি সই করেন, তখন মিস্টার রানাকে খুঁজে নিয়ে আসা যাবে।'

'ব্যাটা কালো ভূত!' হাঁপাচ্ছে টালি। 'বাস্টার্ড নিগার...'

আমার দিকে তাকাল টমসন। 'যান!' বলল সে, 'পালান!'

দশ

বাড়ি অনেক দূরের পথ, গাড়ির প্রতিটি ঝাঁকুনি বুকের ক্ষতটায় হাতুড়ির বাড়ি মারছে। আজ সন্ধ্যা রাতের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়ে গেছে আমার ধারণাই সত্যি, বিগ গাল আইল্যাণ্ডের পানিতে যে পোঁটলাটা ডুবিয়ে রেখে এসেছি সেটা সাংঘাতিক কিছু একটা না হয়েই যায় না। জিনিসটাকে কেন্দ্র করে আরও কি যে ঘটতে যাচ্ছে, কে জানে! ইন্সপেক্টর টালি সবশেষে যে কাজটা করতে যাচ্ছিল তার পেছনে আমাকে জেরা করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না তার-মরা মানুষকে জেরা করা যায় না। ভাবছি, টালি কি নিজে পরিচালিত হচ্ছে, নাকি তার সাথে আরও কেউ আছে?

বাগানের পাশে পিকআপ থামিয়ে নামলাম। বারান্দায় ওঠার সময় বুকের ব্যথায় কাতরে উঠলাম আবার। আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে বেগম রডরিক বাড়িটার দেখাশোনা করেছে। ডাইনিং রূমে ঢুকেই চোখ পড়ল টেবিলে, ফুলদানীতে তাজা ফুল। আইস-বক্সে পেলাম আরও প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো-ডিম, বীফ, ব্রেড এবং বাটার।

রক্ত ভেজা শার্ট এবং ড্রেসিং খুলে ফেললাম। বুকের ওপর রুলারের লম্বা দাগগুলো লাল হয়ে ফুটে উঠেছে। শাওয়ার সেরে নতুন করে ড্রেস করলাম ক্ষতগুলোয়, তারপর, কাপড়চোপড় পরার ঝামেলা এড়িয়ে স্টোভের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক প্যান ভর্তি ডিম আর বীফ চুলোয় চড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত গাঢ় রঙের আধ গ্লাস হুইস্কিতে ওষুধ ঢেলে খেয়ে নিলাম ঢক ঢক করে।

বিছানায় শুয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজলাম। ভাবছি, এই শরীরে

নির্দিষ্ট সময় নাইট ডিউটিতে যেতে পারব কিনা। পরদিন সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত এটাই ছিল আমার শেষ ভাবনা।

সকালে আবার শাওয়ার সেরে এবং এক গ্লাস ঠাণ্ডা পাইন অ্যাপল জুস-এর সাথে দুটো পেইন-কিলার ট্যাবলেট গিলে নিয়ে আরেক প্যান ভর্তি ডিম দিয়ে ব্রেকফাস্ট পর্ব সমাধা করলাম। ভাল ঘুম হয়েছে, ঝরঝরে লাগছে শরীরটা, সুতরাং প্রশ্নের জবাব মিলে গেছে। আরেকটা ছোট্ট ঘুম দিয়ে উঠে দুপুরে গাড়ি নিয়ে বেরুলাম। শহরে পৌঁছে থামলাম মা এডির দোকানে, গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে পৌঁছুলাম অ্যাডমিরালটিতে।

জেটির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে জলকুমারী। রডরিক আর ল্যাম্পনি পৌঁছে গেছে এরই মধ্যে।

'এক্সট্রা ট্যাঙ্কগুলো ভরে নিয়েছি, মাসুদ,' জানাল রডরিক। 'হাজার মাইলের খোরাক পেয়ে গেছে জলকুমারী।'

'কার্গো নেটগুলো বের করেছ?'

'বের করে মেইন সেইল লকারে রেখে দিয়েছি।'

ডেক ভর্তি, উঁচু আইভরি কার্গো ঢাকার জন্যে নেটগুলো ব্যবহার করব আমরা।

'তোমার সেই পশমের কোটটা নিতে ভুলো না,' বললাম ওকে। 'যা বাতাস দিচ্ছে খুব ঠাণ্ডা পড়বে সাগরে।'

'আমার কথা ছাড়, মাসুদ। নিজের দিকে একটু নজর দাও। দশদিন আগের মত খারাপ দেখাচ্ছে তোমাকে, ম্যান। তুমি অসুস্থ?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ, রডরিক।'

'হ্যাঁ,' নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা বিদঘুটে আওয়াজ ছাড়ল রডরিক, 'ঠিক আমার শাশুড়ীর মত।'

একশো তিন বছর বয়স ওর শাশুড়ীর।

তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করে জানতে চাইল, 'তোমার কারবাইনটার খবর কি, ম্যান?'

‘পুলিসের হেফাজতে রয়েছে।’

‘তার মানে বলতে চাইছ ওটা ছাড়াই রওনা হব আমরা?’

‘আজ পর্যন্ত ওটা কখনও কাজে লাগেনি আমাদের।’

‘প্রথমবার বলে একটা কথা আছে, তাই না?’ প্রকাণ্ড মুখটা গম্ভীর করে তুলে বলল সে। ‘ওটা না থাকলে নিজেকে আমার ন্যাংটো লাগবে।’

আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে বিচিত্র কিছু ভ্রান্তি আছে রডরিকের, মনে পড়লেই হাসি পায় আমার। অনেকবার অনেকভাবে বোঝানো এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো সত্ত্বেও নিজের বিশ্বাস থেকে একচুল নড়াতে পারিনি ওকে আমি। ওর বিশ্বাস, একটা বুলেটের ভেলোসিটি এবং রেঞ্জ নির্ভর করে ট্রিগার টানার ওপর-সেটা যত জোরে টানা হবে ততই দ্রুতগতিতে এবং তত বেশি জোরে ছুটবে বুলেট। এবং ওর দৃঢ় বিশ্বাস, ওর ছোঁড়া বুলেট আর সবার চেয়ে দ্রুত বেশি দূরে যাবে।

গুলি করার সময় গায়ের এত বেশি জোর খাটায় ও যে এফ-এন কারবাইনের চেয়ে একটু হালকা যে-কোন রাইফেল ওর হাতে পড়লে সেটার বারোটা বেজে যাবে। শুধু তাই নয়, ঠিক গুলি করার মুহূর্তটিতে চোখ দুটো খোলা রাখাও ওর পক্ষে সম্ভব হয় না।

দশ ফুট দূর থেকে পনেরো ফুট লম্বা একটা টাইগার শার্ককে লক্ষ্য করে বিশ রাউণ্ডের পুরো একটা ম্যাগাজিন শেষ করতে দেখেছি ওকে আমি, একটা গুলিও লাগাতে পারেনি। তা না পারুক, তাই বলে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি ওর ভালবাসায় কোন ভাটা পড়েনি। আওয়াজ করে এমন যে-কোন ফায়ার আর্মসের দারুণ ভক্ত সে।

‘এটা একটা নির্ঝঞ্ঝাট কাজ, রডরিক। মনে কর আমরা সমুদ্রবিহারে বেরিয়েছি।’

কিন্তু আমার কথা ওর কানে গেছে বলে মনে হল না। ঘষে

মেজে ইতিমধ্যে সোনার মত চকচক করে তোলা বোটের তামার যত কাজ আছে সেগুলো আরেকবার ব্যস্তভাবে পালিশ করতে শুরু করেছে ও। এখন ওকে বিরক্ত করলে রেগে যাবে, তাই কিছু না বলেই বোট থেকে নেমে এলাম আমি।

রামাদীন’স ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিসে ঢুকে দেখি কবিরাজী সেরে এইমাত্র ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরেছে ঢ্যাঙা লোকটা। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে নিঃশব্দে একটা চেয়ার দেখাল সে আমাকে। সেটায় বসলাম। ‘ওর পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন?’ জানতে চাইলাম আমি।

‘কার?’ পরমুহূর্তে বুঝতে পারল কার কথা বলছি। ‘ও, ইন্সপেক্টর টালির কথা বলছেন? হ্যাঁ।’

‘কখন দেখা হয়েছে ওর সাথে আপনার?’ টালির মেজাজের খবর জানতে চাই আমি।

‘আজ সকালে, মিস্টার রানা।’

‘কেমন দেখলেন ওকে?’

‘ভালই তো। কেন বলুন তো?’ ভুরু কুঁচকে চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রামাদীন।

‘দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছেন? হাঁটাহাঁটি করছিল? গুনগুন করে কি গান গাইছিল? নাকি ঘেউ ঘেউ করছিল?’

‘না তো!’ চোখ বড় বড় হয়ে উঠল রামাদীনের। ‘এসব করতে দেখিনি। তবে, খুব দুঃখিত বলে মনে হল। বেশি হাসেনি, বেশি কথা বলেনি। ব্যাপারটা কি, মিস্টার রানা?’

‘দুঃখিত মনে হল বুঝি?’ হেসে উঠলাম আমি। ‘সেটাই স্বাভাবিক। ঘুষটা খেয়েছে তো?’

‘দিতে না দিতেই-গপ্ করে,’ চোখ টিপে হাসল রামাদীন।

‘চুক্তি তাহলে বাতিল করেনি-গুড।’

‘আপনার কথা শুনে একটু কৌতূহল হচ্ছে, হে হে...’

‘এসব ব্যাপারে আপনার নাক গলাবার দরকার নেই,’ বললাম

ওকে। 'প্রোগ্রামটা ব্যাখ্যা করুন তাড়াতাড়ি।'

'সালসা স্ট্রীমের মুখে, স্রোতটা যেখানে প্রধান দুজা মোহনার দক্ষিণ চ্যানেলে ঢুকছে, ওখান থেকে তুলে নিতে হবে কার্গো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জানালাম, ঠিক আছে। চ্যানেলটা পরিচিত এবং ভাল।

'রিকগনিশন সিগন্যাল হিসেবে থাকছে দুটো লণ্ঠন-একটার ওপর আরেকটা, মুখের সবচেয়ে কাছের ঢালের মাথায় দেখা যাবে। দু'বার আলো দেখাবেন আপনি, ত্রিশ সেকেণ্ডের ব্যবধানে। তারপর নিচের লণ্ঠনটা নিভে যেতে দেখবেন আপনি-এরপর নোঙর ফেলবেন। ঠিক আছে সব?'

'কার্গো লোড করার জন্যে...'

'লাইটার থেকে লেবার দেয়া হবে।'

'ওরা জানে তো তিনটের দিকে পানি নামতে শুরু করবে, এবং তার আগেই চ্যানেল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাকে?'

'জানে, মিস্টার রানা,' বলল রামাদীন। 'ওদেরকে বলে দিয়েছি দুটোর আগেই মাল তোলার কাজ শেষ করতে হবে।'

'এদিকটা তাহলে ঠিক আছে,' বললাম ওকে। 'মাল খালাসের ব্যাপারটা বলুন এবার।'

'রাসতাফা পয়েন্টের পঁচিশ মাইল পুবে মাল খালাস করবেন আপনি,' বলল রামাদীন।

'চমৎকার!' রাসতাফায় লাইট হাউজ আছে, আমার বিয়ারিঙ চেক করতে সুবিধে হবে। 'কিসে?'

'বড় একটা স্কুনারে। রিকগনিশন সিগন্যাল ওই একই-মাস্তুলে দুটো লণ্ঠন। ত্রিশ সেকেণ্ডের ব্যবধানে দু'বার আলো দেখাতে হবে। তারপর দেখবেন নিচের লণ্ঠনটা নিভে যাবে। এরপর আপনি মাল খালাস করবেন। এখানেও এরা লেবার দিয়ে সাহায্য করবে আপনাকে। ঠিক আছে সব?'

'শুধু টাকার ব্যাপারটা ছাড়া।'

নিঃশব্দে পকেট থেকে একটা ভারী এনভেলাপ বের করে আমাকে দিল রামাদীন। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ধরে সেটার গায়ে বল পয়েন্ট দিয়ে লেখা হিসেবটা দেখছি আমি।

'বরাবরের মত অর্ধেক পেমেন্ট আছে ওখানে,' বলল রামাদীন। 'বাকিটা ডেলিভারির সময় পাবেন।'

সাড়ে তিন হাজার ডলার থেকে নিজের আর টালির কমিশন বাবদ একুশশো কেটে নিয়েছে রামাদীন। এনভেলাপে আছে চোদ্দশো, এ থেকে রডরিক আর ল্যাম্পনির বোনাস হিসেবে যাবে এক হাজার, আমার জন্যে থাকবে চারশো। বেশি নয়।

'ঠিক আছে সব?' আবার জানতে চাইল ঢ্যাঙা রামাদীন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আবার দেখা হবে।'

শেষ বিকেলে বন্দর ত্যাগ করলাম আমরা। কুলি পিক থেকে চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে কেউ আমাদেরকে লক্ষ করতে পারে ভেবে ধোঁকা দেবার জন্যে চ্যানেল ধরে মাটন পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম জলকুমারীকে, তারপর সন্ধ্যারাতে বোটের নাক ঘুরিয়ে নিলাম। ইনশোর চ্যানেল এবং দ্বীপমালার ভেতর দিয়ে এগোলাম দুজা নদীর মোহনার দিকে।

চাঁদ নেই আকাশে, কিন্তু তারাগুলো খুব উজ্জ্বল আর বড় হয়ে ফুটেছে, এবং ঢেউয়ের মাথার সাদা ফেনারাশি ফসফরাসের মত জ্বলছে। দ্রুত গতিতে ছুটছে বোট, আমাকে পথ চিনতে সাহায্য করছে কোথাও তারার আলো মাখা একটা প্রবাল দ্বীপ, কোথাও রীফের একটা ভাঙা পাঁচিল। পানির প্রবাহ এবং কলকল ছলছল শব্দের তারতম্য আমাকে চ্যানেলের ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে, সাবধান করে দিচ্ছে মগ্নচড়া এবং স্বল্প গভীরতার বিপদ থেকে।

ব্রিজে আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে শরীর জুড়ানো ঠাণ্ডা বাতাস, রডরিক আর ল্যাম্পনি। রেইল ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি

আমরা। নিচে নেমে গিয়ে খানিক পর পর ধূমায়িত কালো কফি নিয়ে আসছে রডরিক। কাপে চুমুক দিচ্ছি আর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছি রাতের দিকে, দেখতে চেষ্টা করছি কোথাও ম্লান আলো ঝিক করে ওঠে কিনা। পানিতে তারার আলোর লম্বা আঁচড় আর একটা প্রেট্রল বোটের গায়ে সেই আলোর প্রতিবিম্ব আনাড়ি লোকের দৃষ্টিতে একই রকম মনে হতে পারে, কিন্তু পার্থক্যটা দেখামাত্র ধরা পড়বে আমাদের চোখে।

একবার শুধু নিস্তব্ধতা ভাঙল রডরিক। 'টমসন বলছিল দুর্গে নাকি গোলমাল হয়েছে তোমার সাথে, মাসুদ?'

'সামান্য।'

'পরে টমসন ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।'

'টমসনের চাকুরি আছে এখনও?'

'কোনমতে ঝুলছে। টালি ওকে সেলে ভরতে চায়, কিন্তু অসুবিধে হল টমসনের গায়ে ওর চেয়ে বেশি জোর।'

আলোচনায় যোগ দিল ল্যাম্পনি। 'লাঞ্চের সময় স্কুল বইয়ের একটা চালান এসেছে কিনা দেখার জন্যে এয়ারপোর্টে গিয়েছিল জুডিথ, মেইনল্যাণ্ডগামী একটা প্লেনে চড়তে দেখেছে তাকে ও।'

'কাকে?' ভুরু কুঁচকে উঠল আমার।

'ইন্সপেক্টর টালিকে।'

'আগে কেন বলনি আমাকে?'

'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি, বস্।'

'না,' একমত হয়ে বললাম, 'গুরুত্বপূর্ণ হয়ত নয় ব্যাপারটা।'

অমন একশো একটা কারণে মেইনল্যাণ্ডে যেতে পারে টালি, আমার তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। তবু কেন যেন খুঁত খুঁত করতে শুরু করল মনটা। যখন একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমি, ঠিক তখন আমার একজন শত্রু অজ্ঞাতস্থানের দিকে রওনা দেবে-ব্যাপারটা ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছি না।

'কারবাইনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, ম্যান,' বলল রডরিক।

আমিও ভাবছি, ওটা সাথে থাকলে ভাল হত। কিন্তু কোন মন্তব্য করলাম না।

দুজার দক্ষিণ চ্যানেল-এর প্রবেশপথে সাধারণত যে ব্যাপক আলোড়ন দেখা যায় জোয়ারের তীব্র স্রোতের তোড় তা দাবিয়ে সমান করে দিয়েছে। অন্ধকারে অন্ধের মত খুঁজছি সেটাকে আমরা। দু'পাশের মাটির ঢালের কিনারায় আদিবাসী নিগ্রো জেলেরা মাছ ধরার ফাঁদ পেতে রেখেছে সারি সারি, শেষ পর্যন্ত এই ফাঁদগুলোই সাহায্য করল প্রবেশপথটাকে খুঁজে বের করতে।

চিনতে ভুল করিনি বুঝতে পেরে দুটো ইঞ্জিন অফ করে দিলাম আমি। জোয়ারের গায়ে চড়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে জলকুমারী। তিন জোড়া সজাগ কান গভীর ধ্যানমগ্নতার সাথে শুনতে চেষ্টা করছে প্রেট্রল বোটের ক্ষীণতম স্পন্দন। কিন্তু রাতজাগা হিরণ পাখির চিৎকার আর অল্প পানিতে মুলিট মাছের লেজ ঝাপটানর শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমরা।

ভূতের মত নিঃশব্দে চ্যানেলের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে জলকুমারী। দু'পাশে দৈত্যের মত ম্যানগ্রোভ গাছের কালো ছায়া। অন্ধকার পানিতে তারার আলো টুকরো টুকরো হয়ে নাচানাচি করছে। অকস্মাৎ বোটের গা ঘেঁষে দ্রুত চলে গেল লম্বা, সরু একটা জেলে নৌকো। দু'জন জেলের সাথে নিমেষের জন্যে চোখাচোখি হল আমাদের, মুখ থেকে ফিরছে ওরা। আমাদেরকে দেখে একটু থামল, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী হাঁক ছেড়ে কুশলাদি জানতে না চেয়েই কেটে পড়ল দ্রুত।

'লক্ষণটা ভাল নয়,' বলল ল্যাম্পনি।

'কিন্তু উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু নয়,' বললাম ওকে। 'নিজেদের আস্তানায় ফিরে যেতে অনেক সময় লাগবে ওদের। বিশ্রাম নেবার পর মনমেজাজ যদি ভাল থাকে তবেই খবরটা কাউকে দেবার জন্যে রওনা হবে। সঠিক লোক খুঁজে বের করতে হবে ওদেরকে, যে খবরটা পৌঁছে দেবে উপকূল রক্ষীদের কানে। তারা যদি

খবরটা বিশ্বাস করে...ততক্ষণে লর্ড নেলসনে ফিরে গিয়ে বিয়ার খাচ্ছি আমরা।' তাছাড়া, জানি আমি, এই উপকূলের প্রায় সমস্ত জেলেই কোন না কোন অবৈধ তৎপরতার সাথে জড়িত-কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করার ঝুঁকি কেউ নেবে না।

সামনে তাকিয়ে দেখি প্রথম বাঁকটা এগিয়ে আসছে। স্রোতের ধাক্কায় জলকুমারী ওপাশের তীরের দিকে সরে যেতে শুরু করেছে। স্টার্টার বাটন অন করে ইঞ্জিন দুটো চালু করলাম আবার, গভীর পানিতে ফিরিয়ে আনছি বোট।

সর্পিল চ্যানেল ধরে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছি। অবশেষে প্রশস্ত পানির ওপর বেরিয়ে এলাম। দু'পাশে এখন ম্যানগ্রোভের ছায়া দেখা যাচ্ছে না, ক্রমশ নগ্ন, শক্ত মাটির ঢাল উঠে গেছে ওপর দিকে। মাইলখানেক দূরে, ঢালের মাঝখানে গভীর একটা ফাটলের মত, সালসা নদী তার এক শাখার সাথে মিলিত হয়েছে ওখানে। উঁচু ঝোপের ঝাঁকড়া মাথাগুলো প্রায় আড়াল করে রেখেছে জায়গাটা। আরও পেছনে জোড়া লণ্ঠনের নরম হলুদ আলো দেখা যাচ্ছে, একটার ওপর আরেকটা।

'বলিনি, রডরিক, এটা একটা নির্ঝঞ্ঝাট কাজ?'

'এখনও আমরা গ্র্যাণ্ড হারবারে ফিরিনি, ম্যান,' বলল সে গম্ভীর কণ্ঠে।

'বোতে চলে যাও, ল্যাম্পনি। কখন নোঙর ফেলতে হবে বলব তোমাকে আমি।'

'থ্রি, ফোর, নক অ্যাট দ্য ডোর,' ছড়াটা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার, 'ফাইভ, সিক্স, পিক আপ দ্য স্টিকস।' হুইল লক করে রেইলের নিচের লকার খুলে হ্যাণ্ড স্পটলাইটটা বের করলাম। একটা অপরাধ বোধ ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ সেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল আমার ভেতর। যত যুক্তিই দাঁড় করাই না কেন, আজকের এই নাইট ডিউটিতে আসার পেছনে আসলে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই।

ইনফরমেশন পাবার জন্যে নাইট ডিউটি করা আলাদা কথা, আর স্রেফ নগদ নারায়ণের লোভে এ-পথে পা বাড়ানো মারাত্মক অন্যায়। এমন কি, ফিরে যেতেও ইচ্ছা হল একবার। কিন্তু এত কাছে চলে এসে ফিরে যাওয়া যায় না। তাতে সংশ্লিষ্টদের মনে শুধু সন্দেহই জাগিয়ে তোলা হবে। তাছাড়া, ফিরে গেলে খাব কি? ক্রুদের বেতন দেব কোথেকে? ফুয়েলের বিল কে দেবে? কে দেবে মা এডির পাওনা টাকা? আর অর্থ-পিশাচ ঢ্যাঙা রামাদীনকেই বা কি বলব? না, ফিরে যাওয়া যায় না। স্পটলাইটটা মুখের সামনে তুলে তাক করে ধরলাম উজানের জ্বলন্ত জোড়া লণ্ঠনের দিকে।

দু'বার নয়, ত্রিশ সেকেণ্ড পর পর তিনবার সিগন্যাল দিলাম আমি। কিন্তু লণ্ঠন জোড়ার সাথে সমান্তরাল রেখায় বোট না পৌঁছানো পর্যন্ত নিচের বাতিটা নিভল না।

'নোঙর ফেল, ল্যাম্পনি,' ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বললাম।

ভারী হুকটা ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে। দ্রুত, ঘড় ঘড় শব্দ করে নেমে যাচ্ছে চেইনটা। মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে নোঙরের টানে ঘুরে যাচ্ছে জলকুমারী। যে-পথে এসেছি সেদিকে মুখ করে স্থির হল সে।

নিস্তব্ধ রাত। শব্দ নেই কোথাও। নেটগুলো বের করার জন্যে কেবিনে গিয়ে ঢুকল রডরিক। রেইলের কাছে দাঁড়িয়ে আছি আমি, পানির ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে সিগন্যাল বাতিটার দিকে। সালসা নদীর ঝোপ-ঝাড় ঢাকা ঢালে ব্যাঙ ডাকছে, তাছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যে কিছু একটা শুনতে পাচ্ছি। শোনার চেয়ে বোধহয় অনুভব করলাম বলাই ভাল। ঠিক কান দিয়ে নয়, বরং পায়ের জুতোর সোল-এর মধ্যে দিয়ে শব্দটা বা কম্পনটা টের পেলাম। প্রকাণ্ড এক দানবের হৃৎকম্পনের মত।

এক সেকেণ্ড পর নিঃসন্দেহে বুঝলাম একটা অ্যালিসন মোরন

ডিজেল ইঞ্জিনের অলস শব্দ ওটা। জিনবালা ক্রাশবোটে এই ইঞ্জিনই ব্যবহার করছে ওরা।

'ল্যাম্পনি!' সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে চাপা কণ্ঠে দ্রুত বললাম। 'চেইন ফেল! কুইক, ফর গডস সেক, কুইক!'

ঠিক এই ধরনের বিপদের জন্যে চেইনে একটা শ্যাকল পিন আটকে রেখেছি আমরা। ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার সময় শুনতে পাচ্ছি পিনটা বের করার জন্যে চার পাউণ্ড ওজনের হ্যামার ঠুকছে ল্যাম্পনি। তিনবার হ্যামার ঠুকল সে, শুনতে পেলাম চেইনের শেষ প্রান্ত বোট থেকে আছাড় খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল সেটা।

'নেমে গেছে, বস্!'

থ্রটল খুলে দিয়েছি আমি। রাগে গরগর করছে জলকুমারী, সাদা ফেনা তুলে লাফ দিল সামনের দিকে। ভাটির দিকে মুখ করে আছি আমরা, কিন্তু বোটের মুখে চাপ দিয়ে রেখেছে ফাইভ নটের তীব্র স্রোত, তাই লাফটা তেমন জোরাল এবং দ্রুত হল না।

আমাদের ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়েও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি অ্যালিসনের স্পষ্ট আওয়াজ। ঝোপে ঢাকা সালসা নদীর মুখের কাছে লম্বা একটা বোটের কাঠামো ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। তারার ম্লান আলোতেও ওটার চওড়া বো চিনতে পারছি। কোমরটা চিকন, গ্রে-হাউণ্ডের মত, পিছনটা চারকোনা বাক্সের মত। এটা একটা রয়্যাল নেভির ক্রাশবোট, যৌবনকালটা কেটেছে ইংলিশ চ্যানেলে, আর শেষ বয়সে এই অভিশপ্ত উপকূলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এক লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রতিযোগিতায় নামলে সাহসের সাথে পাল্লা দেবে জলকুমারী, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কিছুই করার উপায় নেই তার। দ্রুত গতি এবং সবটুকু শক্তি নিয়ে চ্যানেলে ঢুকে পড়েছে তার প্রতিপক্ষ, ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে পথরোধ করে ফেলছে। বোটটার ব্যাটল লাইটের আলো কঠিন একটা পদার্থের মত ধাক্কা মারল

আমাদেরকে। দুটো উজ্জ্বল আলোর মোটাতাজা বীম চোখ ধাঁধিয়ে দিল। নিজের অজান্তেই হাত দুটো উঠে গেল কপালের কাছে।

চ্যানেল জুড়ে একেবারে সামনে চলে এসেছে বোটটা। ফোরডেকে উঁচু মঞ্চে বসানো থ্রি পাউণ্ডার কামানটাকে ঘিরে কয়েকটা ছায়ামূর্তি দ্রুত ঘোরাফেরা করছে। কামানের মাজলটা ঠিক যেন আমার নাকের বাঁ দিকের ফুটোয় তাকিয়ে আছে সরাসরি। ক্ষোভ এবং হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা।

'নিখুঁত একটা অ্যামবুশ, সন্দেহ নেই। মরিয়া হয়ে ভাবলাম, দেব নাকি একটা ধাক্কা? প্লাই উডের শরীর ওটার, সম্ভবত পচন ধরেছে এখানে সেখানে, জলকুমারীর ফাইবার গ্লাসের বো ধাক্কাটা হয়ত সামলে নিতে পারবে। কিন্তু মুশকিল হল জলকুমারীর গতি বড় মন্থর এখনও, স্রোত ঠেলে তেমন এগোতে পারছে না সে।

এই সময় বিদ্যুৎ চালিত একটা বুলহর্নের যান্ত্রিক শব্দ পেলাম। চোখ ধাঁধানো ব্যাটল লাইটের পিছনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেউ একজন হুকুম করছে।

'ইঞ্জিন বন্ধ করুন, মি. রানা। তা নাহলে কামান দাগতে বাধ্য হব।'

জলকুমারীর সলিল সমাধির জন্যে থ্রি-পাউণ্ডারের একটা শেলই যথেষ্ট। এত কাছ থেকে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করবে ওরা তাকে। শ্রাগ করলাম, তারপর অফ করে দিলাম ইঞ্জিন।

'বুদ্ধিমানের কাজ করলেন, মি. রানা,' বুলহর্ন থেকে প্রশংসা করা হল আমার, 'এবার দয়া করে যেখানে আছেন সেখানেই নোঙর ফেলুন।'

'তাই কর, ল্যাম্পনি!'

আমার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে অতিরিক্ত নোঙরটা পানিতে ফেলল ল্যাম্পনি। অকস্মাৎ আবার আহত হাতটায় তীব্র হয়ে উঠল ব্যথা, গত কয়েক ঘন্টা ধরে ভুলেই ছিলাম ওটার কথা।

‘হায় কারবাইন!’ আমার পাশ থেকে বিড়বিড় করে উঠল রডরিক।

‘বাজে বকো না!’ ধমকে উঠলাম আমি। ‘ওই কামানের মুখে কি কাজে আসত কারবাইন?’

আনাড়ি ভঙ্গিতে জলকুমারীর পাশে এসে ভিড়ল ক্রাশবোট। কামান এবং আলো এখনও আমাদের দিকে মুখ করে আছে। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ‘বিদায় জলকুমারী,’ মনে মনে বললাম আমি। ‘আজ দু’জনের দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেল বেঁকে!’

আমার ভাবনার মধ্যে ঠাট্টার ভাব থাকলেও বোটটা হারাতে যাচ্ছি ভেবে হতাশায় একেবারে মুষড়ে পড়লাম। জলকুমারী আছে, তাই সবার কাছে আমি মিস্টার রানা। ওটা যখন থাকবে না তখন আমি দ্বীপের আর দশজন মানুষের মত একজন হয়ে যাব। আমার নির্বাসিত জীবনের সমস্ত দুঃখ আর অভিমান ভুলিয়ে রেখেছে জলকুমারী। ওকে হারালে আমার আর থাকবে কি? তার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

ক্রাশবোটের রেইল নামিয়ে ফেলা হল। ছয়জন সশস্ত্র লোক লাফ দিয়ে চলে এল জলকুমারীর ডেকে।

‘মাদারলেস বাস্টার্ডস্!’ পাইকারিভাবে ওদের নাম রাখল রডরিক।

নিজেদের মধ্যে অনর্গল কথা বলছে ওরা। সবার পরনে নীল রঙের ইউনিফর্ম। হাতে লম্বা এ-কে পয়েন্ট ফরটিসেভেন অটোমেটিক রাইফেল। আমাদেরকে কিল ঘুসি এবং রাইফেলের কুঁদো দিয়ে গুঁতো মারার সুযোগ খোঁজার জন্যে হুড়োহুড়ি শুরু করেছে ওরা। ঠেলা মেরে সেলুনে ঢোকাল তিনজনকে, কাঁধে রাইফেলের বাড়ি মেরে ফরওয়ার্ড বাল্কহেডের গায়ে লাগানো বেঞ্চে বসিয়ে দিল। দু’জন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে সামনে, আমাদের নাকের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে দেখতে পাচ্ছি সাব

মেশিনগানের ব্যারেল।

‘শালা বস্! বোনাসের পাঁচশো ডলার কেন দাও আজ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি!’ আমাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে রসিকতার আশ্রয় নিল ল্যাম্পনি। কিন্তু হুঙ্কার ছেড়ে অটোমেটিকের বাঁট দিয়ে ওর মুখে প্রচণ্ড একটা ঘা মারল একজন গার্ড। ঠোঁটের কোণে বেরিয়ে আসা রক্ত মুছে আড়চোখে আমার দিকে তাকাল ল্যাম্পনি। ওর হাতে চাপ দিয়ে ওকে আমি সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু এরপর আমরা কেউ আর কোন রসিকতা করার চেষ্টা করলাম না।

অন্যান্য সশস্ত্র লোকেরা জলকুমারীকে নির্দয়ভাবে ভেঙেচুরে ফেলছে। ভাবলাম কিছু হয়ত খুঁজছে ওরা। একটু পর বুঝলাম খুঁজছে বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু নয়। খোলা লকার ভাঙল ওরা, কুঠারের ঘা মেরে প্যানেলিঙে গর্ত করল। একজন আবিষ্কার করল পানীয় রাখার কেবিনেটটা। মাত্র একটা কি দুটো মদের বোতল পেয়েই আনন্দ-উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। কে কার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এক ঢোক গিলবে তারই প্রতিযোগিতা বাধিয়ে দিল। যতটা না পেটে গেল তার চেয়ে বেশি শুষে নিল ওদের কাপড়-চোপড়। তারপর ওরা লুট করতে গেল ফুড স্টোরগুলো।

চারজন ক্রুকে সাথে নিয়ে ছয় ইঞ্চি দূরত্ব পেরিয়ে ক্রাশবোট থেকে জলকুমারীতে এল এরপর একজন কমাণ্ডিং অফিসার। অন্যান্যরা তখনও কাচ আর কাঠ ভাঙছে, চেঁচামেচি করছে আর গলা ছেড়ে হাসছে।

জলকুমারী একটু দুলছে, পায়ের ভারী আওয়াজের সাথে একটা কম্পন অনুভব করছি আমরা। ভুরু কুঁচকে রডরিকের দিকে তাকালাম আমি। তার চেহারাতেও বিস্ময় ফুটে উঠেছে। কার পায়ের আওয়াজ এটা? কে সে, যার পায়ের চাপে দুলে ওঠে জলকুমারী?

সেলুনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে বুঝলাম, না,

বন্ধ হয়নি। বিশাল একটা শরীর এইমাত্র হাজির হয়েছে ওখানে, সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে প্রবেশ পথটা। ক্রাশবোটের কমাণ্ডার একটু দম নেবার ফাঁকে সম্ভবত ভেতরে প্রবেশ করার কৌশল সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করছে।

এগারো

সম্ভবত সাত ফুটের বেশি লম্বা লোকটা, পেটটা প্রকাণ্ড একটা ড্রামের মত। দুই কাঁধে ছ'মাসের দুই শিশুকে শুইয়ে দিলে হাত পা ছুঁড়ে খেলবে তারা, পড়ে যাবার কোন ভয় নেই। প্রকাণ্ডদেহী রডরিককে ওর সামনে ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। কমাণ্ডিং অফিসার ব্যঙ্গ মেশানো কৌতুক এবং তাচ্ছিল্যের সাথে ওকে দেখল একবার। আপনা থেকেই মাথা হেঁট হয়ে গেল রডরিকের, বিনা বাক্যে অফিসারের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিল ও।

সাদা ইউনিফর্ম জ্যাকেট পরে আছে লোকটা। পিরিচের মত বড় বড় বোতাম রয়েছে তাতে, দীর্ঘদিন ব্যবহার করায় বোতামগুলোর চারপাশে কালচে দাগ ফুটেছে, বগলের কাছ থেকে বেশ কিছু অংশ সম্পূর্ণ ভিজে গেছে ঘামে। বুকের ওপর স্টার আর মেডেলের ব্যাপক সমারোহ দেখতে পাচ্ছি। ভিড়ের মধ্যে আমেরিকান ন্যাভাল ক্রস আর ভিকট্রি স্টার, এই দুটো চিনতে পারলাম। পঞ্চাশজন মেহমানের রান্না চড়বে এতবড় একটা তামার ডেকচির মত মাথা লোকটার, পালিশ করা কালো লোহার মত রঙ সেটার। তাতে এঁটে বসে আছে একটা ন্যাভাল ক্যাপ, সোনালি ফিতে দিয়ে কিনারা মোড়া। চকচকে ঘামের নদী বয়ে যাচ্ছে তার মুখে। বাটারফ্লাই রঙের একটা তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছছে সে, আর দুগ্ধবতী গরুর মত শব্দ করে বাতাস ছাড়ছে নাক দিয়ে।

ধীরে ধীরে শরীরটা তার আরও ফুলে উঠতে শুরু করল বিশাল একটা ব্যাঙের মত-ফেটে যাবে সেই ভয়ে সতর্ক হয়ে

উঠলাম আমি। কালচে-গোলাপী রঙের ট্র্যাক্টর টায়ারের মত মোটা ঠোঁটের জোড়া ফাঁক হয়ে গেল, এবং উজ্জ্বল বেগুনি রঙের মুখ-গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর জোরাল একটা আওয়াজ।

'শাট আপ!'

নিমেষে পাথর হয়ে গেল ক্রুরা, এবং পিনপতন নিস্তব্ধতা নামল। বিশাল একটা পাহাড় হেঁটে চলে এল সেলুনের ভিতর, আমার দিকে তাকাল সে এবং ধীরে ধীরে তার মুখে ফুটে উঠল বন্ধুসুলভ উজ্জ্বল হাসি। চোখ দুটো কালো চামড়ার পুরু ভাঁজের ভেতর প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে।

'মি. রানা, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না আজ আমি কত খুশি,' কণ্ঠস্বরটা গম্ভীর, সুরটা প্রীতিমাখা, পরিশীলিত ব্রিটিশ উচ্চারণ-ওর ইংরেজি আমার চেয়ে ভাল। 'কবে আপনার সাথে পরিচয় হবে এই আশায় অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করছি। আমি ভাগ্যবান, আজ আমার আশা পূর্ণ হল।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' বললাম তাকে ওই ইউনিফর্ম আর পদক দেখে আন্দাজ করেছি অ্যাডমিরালের চেয়ে নিচের র‍্যাঙ্ক হতে পারে না এই লোকের।

'অ্যাডমিরাল!' আনন্দে উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ। 'চমৎকার, কানে যেন মধুবর্ষণ করল। কিন্তু, মি. রানা, আমি একজন স্রেফ সাদামাঠা লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার।'

'এ অন্যায়। তার মানে আপনার সাথে বৈষম্য করা হয়েছে।'

'পদে কিছু এসে যায় না,' তোয়ালে দিয়ে প্রকাণ্ড মুখ থেকে ঘাম মোছার জন্যে বিরতি নিল সে। 'কর্তৃত্বের কোন অভাব নেই আমার। মি. রানা, আমি একজন ক্ষমতাবান পুরুষ-বিশ্বাস করুন, জীবন এবং মৃত্যু আমার মুঠোয় ধরা আছে। তবে বিশেষ প্রয়োজন না হলে এই ভয়ানক শক্তিটা আমি ব্যবহার করি না।'

'বিশ্বাস করি, কমাণ্ডার,' কণ্ঠে ব্যগ্রতা এনে বললাম। 'দয়া করে আমাদের ওপর আপনার ওই শক্তিটা ব্যবহার করবেন না-

দোহাই লাগে।'

হো হো বা হা হা নয়, তার অট্টহাসির শব্দটা হো হা শোনাচ্ছে, অদ্ভুত ছন্দবিরতির সাথে দমকা বাতাস বেরিয়ে আসছে তার মুখের ভেতর থেকে। 'বিলিভ মি, আপনাকে আমার দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। রসিকতা পছন্দ করি আমি। ফর গডস সেক, বোঝা যাচ্ছে, আপনি আর আমি খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারব।'

আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে এ ব্যাপারে, কিন্তু আমি তা প্রকাশ করলাম না।

'আমার বদান্যতার একটুকরো নমুনা হিসেবে আমি প্রস্তাব করছি,' সহাস্যে বলল কমাণ্ডার, 'আপনি আমাকে আমার নাম ধরে সম্বোধন করবেন। প্রসঙ্গক্রমে জানাচ্ছি, এই নাম শুনলে বাঘে-মোষে এক সাথে পানি খায়...'

'এবং সবার বুক কেঁপে ওঠে,' ফস করে বলল রডরিক, 'ভয়ে।'

'একেবারে খাঁটি কথা,' কমাণ্ডার প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল রডরিকের দিকে। 'তোমার সাইজ দেখে মনে হচ্ছে আমার পূর্বপুরুষদের কারও সাথে তোমার দাদী বা নানীর পরিচয় ছিল। সে যাক,' আমার দিকে তাকাল সে। 'আমাকে আপনি হুমায়ুন দাদা বলে ডাকবেন।'

'ধন্যবাদ, হুমায়ুন দাদা,' বললাম। 'আমি মাসুদ রানা।'

'অ্যাই, কে আছ, এক ড্রাম ওয়াইন নিয়ে এস!' হুঙ্কার ছাড়ল হুমায়ুন দাদা। এক পা পিছিয়ে গিয়ে চামড়া মোড়া প্রকাণ্ড সিটে বসল সে। সেটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে মনে করে ভীত হয়ে উঠলাম আমি।

এই সময় আরেকজন লোক ঢুকল সেলুনে। পরনে পুলিস ইউনিফর্মের পরিবর্তে লাইট ওয়েট সিল্ক স্যুট এবং লেবু রঙা সিল্ক শার্ট, তার সাথে মানানসই টাই এবং পায়ে গো-সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো। হালকা সোনালি চুলগুলো পরিপাটি করে

ব্যাকব্রাশ করা, গোঁফটা সুন্দর করে ছাঁটা। কিন্তু হাঁটার ভঙ্গিতে একটা আড়ষ্ট ভাব রয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলাম আমি।

নরম সুরে জানতে চাইলাম, 'তোমার বল ব্যাগটার কি অবস্থা এখন, টালি?'

উত্তর না দিয়ে হুমায়ুন দাদার পাশের সিটে বসল টালি। হুমায়ুন দাদা তার আরেক পাশের সিটটা দেখিয়ে আমাকে বলল, 'আমার পাশে এসে বসো, ফ্রেণ্ড।'

একটু পর তিন বোতল হুইস্কি এল আমাদের সামনের টেবিলে। দেখেই বুঝলাম আমাদের স্টোররূম থেকে বাক্স ভেঙে নিয়ে আসা হয়েছে। যাই হোক, তিনটে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল হুমায়ুন দাদা, আমাকে এবং টালিকে একটা করে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা শূন্যে তুলে উদাত্ত গলায় বলল, 'স্থায়ী বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সমৃদ্ধি কামনা করে...' আমার গ্লাসের সাথে নিজেরটা ঠুকে নিল সে, তারপর এক চুমুকে শেষ করল সেটা।

আমি আর টালি সাবধানে গলা ভেজাচ্ছি, আর মনের আনন্দে ঢক ঢক করে গিলেই চলেছে দাদা। একসময় তার মাথাটা পিছন দিকে হেলান দিল এবং বুজে এল চোখ দুটো। এই সুযোগটা গ্রহণ করতে চাইল ক্রুদের একজন। এক পা সামনে এগিয়ে টেবিলের ওপর থেকে তার বোতলটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে।

বিদ্যুৎ বেগে নড়ে উঠতে দেখলাম হুমায়ুন দাদার বিশাল কালো একটা হাতকে। উল্টো পিঠ দিয়ে লোকটার কপালে মারল সে। স্যাঁৎ করে মাথাটা পেছন দিকে সরে গেল তার, ছিটকে গিয়ে পড়ল শরীরটা সেলুনের দেয়ালে, সেখান থেকে হাঁটু ভেঙে নেমে এল মেঝের ওপর। মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়ছে সে, সম্ভবত অন্ধকার দেখছে চোখে।

টের পেলাম শরীরে মেদের বিপুল সমাবেশ সত্ত্বেও অসুরের

শক্তি রয়েছে হুমায়ুন দাদার গায়ে। ঢুলু ঢুলু চোখে আমার দিকে তাকাল সে। মুখের চামড়া ভাঁজ খেয়ে প্রায় উল্টে যাচ্ছে দেখে বুঝতে পারলাম হাসছে সে। বলল, 'রানা, যতদূর জানি, ইন্সপেক্টর টালির সাথে একটা ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনার সময় তোমাদেরকে বাধা দেয়া হয়, যার ফলে সেটা পণ্ড হয়ে যায়। সেই আলোচনাটা এখন শুরু করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এখানে আমাদেরকে বাধা দেবার মত কেউ নেই।'

নিঃশব্দে শ্রাগ করলাম।

'এখানে আমরা সবাই যুক্তিবাদী মানুষ, সে-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই,' বলল হুমায়ুন দাদা।

কোন মন্তব্য না করে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছি হাতে ধরা গ্লাসের হুইস্কির দিকে।

'নিজের পজিশনটা বোঝার চেষ্টা কর, রানা,' পণ্ডিত মশায়ের মত জ্ঞানদান করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে হুমায়ুন দাদা। মুখভর্তি হুইস্কি নিয়ে সেটা পেটে চালান করার আগে শব্দ করে কুলি করল। 'এই অবস্থায় যদি কথা না শোন তোমার পরিণতি কি হতে পারে, এসো, কল্পনা করে দেখা যাক।'

ভিজে সপসপে তোয়ালেটা নিঙড়ে দিল একজন ক্রু। সেটা দিয়ে আবার ঘাম মুছল হুমায়ুন দাদা। 'সবচেয়ে আগে, একজন বেয়াদপ লোকের শাস্তি হতে পারে,' অমায়িক হেসে বলল সে, 'একজন একজন করে তার ক্রুকে বাইরে নিয়ে গিয়ে কতল করা। ভাল কথা, এ ধরনের কাজে এদিকে আমরা কাঠ ফাড়ার কুঠার ব্যবহার করি, তা তোমার জানা আছে?'

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম।

'অবশ্য ইন্সপেক্টর টালি আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে কাউকে কতল করার দরকার হবে না। তোমার মনটা নাকি ডিমের কুসুমের মত নরম, ক্রুদেরকে নিজের চোখের দুটো মণির মত ভালবাস,' ঠোঁট ওল্টাল সে। 'সত্যি মিথ্যে তুমিই জানো।'

রডরিক আর ল্যাম্পনি অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল।

'তারপর ধর,' খোশ আলাপের সুরে বলে চলেছে হুমায়ুন দাদা, 'তোমার সাধের জলকুমারীকে জিনবালা বে-তে নিয়ে যাওয়া হবে। তার মানে, ইহজীবনে ওটার আর চেহারা দেখতে পাবে না তুমি। সংশ্লিষ্ট সরকার ওটাকে বাজেয়াপ্ত করবেন। তারপর ধর, নিজেকে তুমি আবিষ্কার করবে জিনবালা জেলে।'

জিনবালা কারাগারটাকে সিংহের খাঁচা বলা হয়। সবাই জানে ওখান থেকে মাত্র দু'ভাবে ছাড়া পায় বন্দীরা। এক, মৃত অবস্থায়। দুই, পঙ্গু অবস্থায়। 'হুমায়ুন দাদা,' মৃদু কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আপনার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই।'

'তা আমি জানি,' হো হা করে হাসল সে। 'তাহলে আর দেরি না করে ভাটার আগেই যদি রওনা দিই মাঝরাতের কাছাকাছি সময়ে ইনশোর চ্যানেল থেকে বেরিয়ে যেতে পারব, কি বল?'

'তা পারব।'

'তারপর তুমি আমাদেরকে নিয়ে যাবে সেই জায়গায়, যেখানে তোমার চার্টার পার্টিরা ডাইভ দিয়েছিল, কি বল?'

'অবশ্যই।'

'ওখানে পৌঁছে জায়গাটা আমরা পরীক্ষা করব। যখন বুঝব যে, হ্যাঁ, তুমি আমাদেরকে সত্যিই ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছ-ব্যস, ক্রু এবং বোটসহ মুক্তি নিয়ে ফিরে যাবে তুমি। আগামীকাল রাতে নিজের বিছানায় আরাম করে ঘুমাতে পারবে।'

'আপনি মহান, আপনি মহৎ,' বললাম তাকে। কিন্তু মনে মনে বললাম, ব্ল্যাঙ্ক আর প্যানথারের চেয়েও নীচ এবং লোভী তুমি, শালা। বিছানায় নয়, তুমি আমাদেরকে সাগরের তলায় ঘুম পাড়িয়ে রাখার মতলব এঁটেছ।

এই প্রথম কথা বলল টালি, 'একটা কথা, রানা। তুমি গুলি খাবার আগের দিনের ঘটনা। একজন জেলে ওল্ড মেন আর গানফায়ার ব্রেক-এর দিক থেকে চ্যানেলের ওপারের একটা

খাঁড়িতে নোঙর ফেলা অবস্থায় দেখেছে জলকুমারীকে। আমরা আশা করছি ওদিকেই আমাদেরকে নিয়ে যাবে তুমি।'

'যদি যেতে চাও, কেন নিয়ে যাব না।'

'রানা, আমার সাথে ইয়ার্কি মারবে না...'

'ভাল কথা,' টালিকে জিজ্ঞেস করলাম। 'এবারের ঘুষের টাকাটা রামাদীনের মাধ্যমে আমাকে ফেরত দেবে তো?'

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল টালি। 'এত বড় স্পর্ধা তোমার...'

'প্লীজ, প্লীজ,' মাথার ওপর দু'হাত তুলে যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানাল হুমায়ুন দাদা। 'আমরা শান্তি চাই, বিরোধ নয়। এসো, আরেক গ্লাস করে গলায় ঢালা যাক। তারপর প্রিয় বন্ধু, মাসুদ রানা, তুমি আমাদেরকে নিয়ে চল সমৃদ্ধির পথে।' তিনজনের গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে, তারপর আবার বলল, 'একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি একটু সাবধান করে দিতে চাই, রানা, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড। উন্মত্ত পানি আমি পছন্দ করি না। সাগর আমার বন্ধু হলে কি হবে, ওর বেয়াদপি আমার ধাতে সয় না। তুমি যদি আমাকে উন্মত্ত পানিতে নিয়ে যাও, মনে রেখ, ভীষণ রাগ করব আমি। আমার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছ তো, নাকি আরও সহজ ভাষায় বলব?'

'শুধু তোমার জন্যে, হুমায়ুন দাদা, সাগরকে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলব,' তাকে অভয় দিয়ে বললাম।

মৃদু মাথা নাড়ল সে, যেন এর চেয়ে কম কিছু আশা করে না।

ভোর যেন সাগরের কোল থেকে আড়মোড়া ভেঙে পূর্ণ যুবতী এক সাগর কন্যা উঠে দাঁড়াচ্ছে। শ্যামলা রঙের আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে মুক্তোর শুভ্রতা, বাতাসে ভাসছে এলোমেলো চুলের মত ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, সূর্যের প্রথম কিরণ লেগে সোনালি রঙ ধরেছে। ইনশোর চ্যানেলের প্রশান্ত পানি আঁকড়ে উত্তর দিকে

ছুটছি আমরা। সিদ্ধান্ত হয়েছে জলকুমারী পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নেবে, পেছনে থাকবে ক্রাশবোট। আধ মাইল পেছনে দোদুল্যমান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে তাকে। ওল্ড মেন আর গানফায়ার ব্রেকের দিকে এগোচ্ছি আমরা।

খোলা ব্রিজে আমাদের মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক পেছনে রয়েছে টালি। অটোমেটিক রাইফেল হাতে ক্রাশবোটের একজন ক্রু রয়েছে ওর সাথে।

বন্দী দশার প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে গেছে। এখন আমি ঠাণ্ডা মাথায় ফাঁদ কেটে বেরুবার কথা ভাবছি।

জানি, টালি এবং দাদাকে গানফায়ার রীফের ব্রেক দেখানো বা না দেখানো সমান বিপদের কথা। দেখালে অবশ্যই সন্ধান চালাবে ওরা, এবং হয়ত কিছুই পাবে না। কে জানে, নিরো যেটা তুলেছিল অর্থাৎ এখন যেটা বিগ গাল আইল্যাণ্ডের জলসীমায় ডুবে আছে, একমাত্র সেটাই তোলার জন্যে ব্ল্যাঙ্ক এসেছিল কিনা? তা যদি হয়, গানফায়ার ব্রেকে কিছুই নেই আর।

অথবা আছে, এবং টালি এবং দাদা তা খুঁজেও পাবে।

দুটোর একটা যাই ঘটুক না কেন, আমার অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না তাতে। কিছু যদি না পায়, কথা বলাবার জন্যে আমার ওপর ইলেকট্রিক টরচার সেটটা ব্যবহার করবে টালি। আর কিছু যদি পায়, তা গোপন রাখার স্বার্থে, আমাকে আর আমার ক্রুদেরকে খুন না করে উপায় নেই ওদের।

অথচ পালাবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

ক্রাশবোটটা আধমাইল পেছনে বটে, কিন্তু ফোরডেকের থ্রি পাউণ্ডার কামান জলকুমারীকে আওতা এবং লক্ষ্যের মধ্যে রেখেছে সব সময়। বোটে টালি এবং তার বডিগার্ড ছাড়াও সেলুনে রয়েছে আরও তিনজন সশস্ত্র গার্ড, পাহারা দিচ্ছে রডরিক আর ল্যাম্পনিকে।

বোটের সব রসদ শুধু লুট করা হয়নি, রাতের মধ্যে তা খেয়ে

সাবাড় করে ফেলাও হয়েছে। সকালে তাই আজ ব্রেকফাস্ট জোটেনি কারও ভাগ্যে, এক কাপ কফি পর্যন্ত নয়।

দিনের প্রথম চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া খাচ্ছি, হঠাৎ মাথার ভেতর ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা বুদ্ধি। নিরাশার অন্ধকারে ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখতে পেলাম আমি। বিষয়টা নিয়ে আর একটু চিন্তা-ভাবনা করলাম। হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু তার আগে রডরিকের পরামর্শ দরকার।

'টালি,' কাঁধের ওপর দিয়ে বললাম ওকে, 'হুইলের দায়িত্ব নেবার জন্যে রডরিককে পাঠিয়ে দাও এখানে। আমাকে একবার নিচে যেতে হবে।'

'কেন?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল টালি। 'নিচে তোমার কি দরকার?'

'প্রত্যেকদিন সকালে যে দরকার থাকে মানুষের, যে কাজ আমার হয়ে আর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমাকে দিয়ে এর চেয়ে বেশি বলাতে চাইলে লজ্জা পাব।'

'এত নাটক জানো!' ব্যঙ্গের সুরে বলল সে। 'থিয়েটারে নাম লেখালে ভাল করতে।'

'তা যা বলেছ! কিন্তু তাহলে ওল্ড মেন আর গানফায়ার ব্রেকে কে নিয়ে যেত তোমাকে?'

উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না টালি। সেলুন থেকে রডরিককে নিয়ে আসার জন্যে গার্ডটাকে পাঠাল সে।

হুইলটা রডরিককে ছেড়ে দেবার সময় ফিসফিস করে বললাম, 'হুইল ধরে থাক, পরে তোমার সাথে কথা বলব।' তারপর ককপিটে নেমে গেলাম আমি।

সেলুনে আমাকে ঢুকতে দেখে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ল্যাম্পনির, তার সেই নিঃশব্দ ঝলমলে হাসিটা ফুটে উঠতে যাচ্ছিল মুখে, কিন্তু সশস্ত্র গার্ড তিনজন আধপাক ঘুরে আমার বুকে রাইফেল ধরতেই শুকিয়ে গেল তার চেহারা। আঁতকে উঠে

দ্রুত মাথার ওপর হাত তুললাম।

'কোন ক্ষতি করতে আসিনি,' বলে শান্ত করলাম ওদেরকে, তারপর পাশ কাটিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নামতে শুরু করলাম। দু'জন গার্ড অনুসরণ করছে আমাকে। বাথরুমে ঢোকার সময় দেখা গেল ওরাও আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে ভেতরে ঢুকতে চায়। বললাম, 'ঢুকতে চাও, ঢোক-কিন্তু রাইফেল দুটো বাইরে রেখে যেতে হবে। রাইফেলের মুখে সব কাজ করা সম্ভব নয়।'

বোঝা গেল রাইফেল হাতছাড়া করতে রাজি নয় ওরা, তার চেয়ে বাইরে অপেক্ষা করবে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম আমি। আবার যখন দরজা খুললাম, দেখি, সেই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আফ্রিকান নিগ্রো দু'জন। চুপি-চুপি আমাকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিয়ে বড়সড় মাস্টার কেবিনে চলে এলাম। নিঃশব্দে, কিন্তু উৎসাহের সাথে আমার সাথে এল ওরা।

প্রকাণ্ড জোড়া বাঙ্কের নিচে প্রচুর সময় আর খাটনি দিয়ে তৈরি করেছি একটা গোপন লকার। কফিনের মত সাইজ সেটার, ভেন্টিলেটার আছে। নাইট ডিউটিতে যখন কার্গো হিসেবে বডি নিতাম তখন বোট সার্চ করার আশঙ্কা দেখা দিলে এর ভেতর লুকিয়ে ফেলা হত লোকটাকে। আজকাল লকারটাকে ব্যবহার করি মূল্যবান এবং গোপন জিনিস রাখার জন্যে। এখন এর ভেতরে এফ-এন কারবাইনের পাঁচশো রাউণ্ড গুলি, এক বাক্স হ্যাণ্ড গ্রেনেড এবং দুই কেস ভর্তি স্কচ হুইস্কি রয়েছে।

উল্লাস-ধ্বনি ছেড়ে রাইফেল দুটো নিজেদের কাঁধের স্ট্র্যাপে আটকে নিল গার্ড দু'জন, তারপর নিজেরাই হুইস্কির কেস দুটো টেনে বের করে নিল। পরমুহূর্তে আমার অস্তিত্বের কথা ভুলে গেল ওরা। ওদেরকে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম।

ব্রিজে ফিরে এসে রডরিকের পাশে দাঁড়ালাম, কিন্তু ওর কাছ থেকে হুইলের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছে করে দেরি করছি।

'এত দেরি করলে কেন?' পেছন থেকে অসন্তুষ্ট সুরে জানতে

চাইল টালি।
'ভাল কাজে তাড়াহুড়ো করি না কখনও,' ব্যাখ্যা দিলাম ওকে। উৎসাহ হারিয়ে ফেলল সে, এগিয়ে গিয়ে পেছন দিকের রেইলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, অনুসরণকারী গানবোটটাকে দেখছে।
'রডরিক,' ফিসফিস করে বললাম। 'গানফায়ার ব্রেক। তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে তীরের দিক থেকে রীফ পেরোবার একটা প্যাসেজ আছে ওখানে।'
'ফোলা-ফাঁপা জোয়ারের সময়, একটা হোয়েল বোট এবং শক্ত নার্ভের একজন দক্ষ নাবিকের জন্যে শুধু,' স্বীকার করল রডরিক। 'অল্পবয়েসী পাগল ছিলাম তখন, ভয়ডর ছিল না, তাই ওই মরণের পথে পা বাড়িয়েছিলাম।'
'আর তিন ঘন্টা পর জোয়ার আসবে। জলকুমারীকে নিয়ে যেতে পারব আমি?' জানতে চাইলাম।
চোখ কপালে উঠে গেল রডরিকের। ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড বোকার মত তাকিয়ে থাকল আমার মুখের দিকে। 'জেসাস!' চাপা স্বরে বলল সে।
'পারব বলে মনে কর?' ধৈর্য হারিয়ে জানতে চাইলাম।
আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকাল রডরিক, চিন্তিতভাবে ঠোঁটের নিচে কালো মোটা আঙুল ঘষছে, কুঁচকে আছে ভুরুজোড়া। তারপর ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকাল ও। দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'জানি না, মাসুদ। পারবে এমন কাউকে চিনি না আমি। তুমি...শুধু তুমি হয়ত পারতে পার...কিন্তু আমি শিওর নই, ম্যান।'
'বিয়ারিঙ দাও, রডরিক-কুইক!'
'অনেক দিন আগের কথা, কিন্তু...' এগোবার রাস্তা এবং ব্রেক-এর প্যাসেজটার ছবির মত বর্ণনা দিল ও। 'তিনটে বাঁক আছে প্যাসেজে-বাম, ডান তারপর আবার বাম, তারপর পাবে

সরু একটা গলা, দু'দিকেই প্রবালের উঁচু মাথা। জলকুমারী ভেতর দিয়ে যেতে পারবে কি না জানি না আমি, যদিও বা যেতে পারে, কিছু রঙ পেছনে রেখে যেতে হবে ওকে। এরপর মেইন রীফের পেছনে বড় একটা পুলে পৌঁছাবে তুমি। ওখানে বোট ঘোরাবার জায়গা আছে, অপেক্ষা করে যখন দেখবে সাগরের মতিগতি এর চেয়ে ভাল আশা করা যায় না তখন বিসমিল্লাহ বলে ফাঁকের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে আসবে খোলা সাগরে।'
'ধন্যবাদ, রডরিক,' নিচু গলায় বললাম ওকে। 'এবার তুমি নিচে গিয়ে অপেক্ষা কর। গার্ডদেরকে কয়েক বোতল হুইস্কি দিয়ে এসেছি। ব্রেক-এর কাছে পৌঁছুবার আগেই বদ্ধ মাতাল হয়ে পড়বে ওরা। ডেকে তিনবার পা ঠুকে সিগন্যাল দেব আমি, এরপর তুমি আর ল্যাম্পনি যেভাবে পার রাইফেল দুটো কেড়ে নিয়ে বেঁধে ফেলবে ওদেরকে।'
'সে-ব্যাপারে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, ম্যান!' চাপা একটু হেসে বিদায় নিল রডরিক।
বেশ অনেকটা ওপরে উঠে এল সূর্য, ওল্ড-মেন-এর তিন চূড়া সামনে মাত্র কয়েক মাইল দূরে কালো মেঘের মত দেখা যাচ্ছে, এই সময় প্রথম নিচে থেকে ভেসে এল হাসি চিৎকার আর ফার্নিচার ভাঙার শব্দ। ব্যাপারটা খেয়াল করল না টালি। এখন ইনশোর চ্যানেলের শান্ত পানির ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে এগোচ্ছি আমরা গানফায়ার রীফ-এর উল্টো দিক লক্ষ্য করে। রীফ-এর উঁচু-নিচু সারি এখন দেখতে পাচ্ছি আমি, প্রাচীন একটা হাঙ্গরের কালো দাঁতের মত। পেছনে উঁচু সাদা সামুদ্রিক ফেনার ঝলক দেখা যাচ্ছে, আরও পেছনে পড়ে আছে খোলা সাগর।
সামান্য একটু ফাঁক করলাম থ্রটলঃ ইঞ্জিনের শব্দ বদলে গেল একটু, কিন্তু টালির কানে পার্থক্যটা ধরা পড়ল না। রেইলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। দাড়ি কামানো হয়নি, খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট, সম্ভবত বিরক্তি বোধ করছে নিজের ওপর। এখন

আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি প্রবালের গায়ে ধেয়ে আসা ফেনার পাহাড় আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়ার গুরুগম্ভীর আওয়াজ। এবং নিচে থেকে অবিরাম ভেসে আসছে মাতালদের উল্লাস, এটা সেটা ভাঙার শব্দ। অবশেষে টনক নড়ল টালির। ব্যাপারটা কি জানার জন্যে গার্ডটাকে নিচে পাঠিয়ে দিল সে। অত্যন্ত উৎসাহের সাথে নিচে নেমে গেল লোকটা। গেল তো গেলই, আর ফিরল না।

পেছন দিকে তাকালাম। জলকুমারীর স্পীড বেড়ে যাওয়ায় দুই বোটের মধ্যবর্তী ফাঁকটা ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করেছে, ক্রমশ একনাগাড়ে রীফের দিকে এগোচ্ছি আমরা।

সামনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে রডরিকের দেয়া বিয়ারিং আর চিহ্নগুলো খুঁজতে শুরু করেছি। হালকাভাবে ধরে আরেকটু ফাঁক করলাম থ্রটল দুটো। আরেকটু পিছিয়ে পড়ল ক্রাশবোট।

অকস্মাৎ মাত্র একহাজার গজ সামনে গানফায়ার ব্রেক-এর প্রবেশ পথটা দেখতে পেলাম, প্রকৃতির অত্যাচার সওয়া বুড়ো দুই প্রবাল পাথরের মাথা চিহ্নিত করছে সেটাকে। প্রবাল প্রাচীরের ফাঁকটা দিয়ে ঢুকছে বিশাল সাগর প্রবাহ, স্বচ্ছ পানির হালকা রঙের তফাৎ দৃষ্টি এড়াল না আমার।

নিচ থেকে উন্মত্ত হাসির শব্দ ভেসে এল, সেইসাথে সেলুন থেকে গড়িয়ে ককপিটে বেরিয়ে এল একজন নেশাগ্রস্ত ক্রু। রেইলের সাথে ধাক্কা খেল সে, সেটা ধরে কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে, অঁক অঁক শব্দ পাচ্ছি বমি করার। পারমুহূর্তে হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল সে। পড়েই রইল ডেকের উপর।

চেঁচিয়ে উঠে খ্যাপা ষাঁড়ের মত মইয়ের দিকে ছুটল টালি। নিচে নেমে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সে। এই সুযোগে আরও দুই ডিগ্রী খুলে দিলাম থ্রটল দুটো। ক্রাশবোটের কাছ থেকে যথাসম্ভব এগিয়ে থাকতে হবে আমাকে। থ্রি পাউণ্ডার কামানের কাছ থেকে আধ ইঞ্চি বেশি দূরে থাকারও জীবন-মরণ গুরুত্ব আছে এখন।

ঠিক করেছি তির্যক ভাবে না এগিয়ে চ্যানেলের মুখের সাথে সমান্তরাল রেখায় নিয়ে যাব বোট, তারপর সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে ডাইভ দেব চ্যানেলের ভেতর। এতে অবশ্য প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে। কোনাকোনিভাবে এঁকেবেঁকে এগোলে প্রবালের ডুবন্ত চওড়া ফণার সাথে জলকুমারীর কীল-এর ঘষা খাওয়ার আশঙ্কা কম, কিন্তু এর ফলে হুমায়ুন দাদার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করা হবে। চালাকি করতে যাচ্ছি বুঝতে পারলেই কামান দাগবে সে। এই ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।

আধমাইল লম্বা, অত্যন্ত সরু চ্যানেলটা। অগ্নিপরীক্ষা শুরু হবে ওটার ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে। তারপরই খোলা সাগর। চ্যানেলে ঢোকার পর বেশিরভাগ সময়ই প্রবালের মাথা-উঁচু স্তম্ভের আড়ালে থাকবে জলকুমারী, এবং আঁকাবাঁকা পথে আমরা যখন ছুটব সামনের থ্রি পাউণ্ডারের গানাররা লক্ষ্যস্থির করে গোলা ছুঁড়তে বাধার সম্মুখীন হতে থাকবে। আরও আশা করছি ফাঁকটা দিয়ে তেড়ে আসা ঢেউগুলো জলকুমারীকে নাগরদোলায় চড়িয়ে কখনও উঁচুতে তুলবে কখনও নিচে নামাবে-দূর থেকে গানাররা ঢেউয়ের উচ্চতা এবং ধরন-ধারন কিছুই টের পাবে না, ফলে জলকুমারীর আচরণ সম্পর্কেও আগে থেকে কিছু অনুমান করা সম্ভব হবে না ওদের পক্ষে।

এবং একটা ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত আমি, লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার হুমায়ুন দাদা চ্যানেলে ঢুকে আমাদেরকে ধাওয়া করার ঝুঁকি নেবে না। ফলে ক্রাশবোটের সাথে আমাদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়বেই, গানারদের জন্যে এটাও একটা অসুবিধে সৃষ্টি করবে।

নিচের হৈ-হট্টগোলে কান না দিয়ে একনাগাড়ে এগিয়ে আসা চ্যানেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সিদ্ধান্তটা নিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি কিনা জানি না, ভাবছি, সামনে পেছনের এতগুলো দুর্লঙঘ্য বাধা শেষ পর্যন্ত টপকাতে পারব তো?

মই বেয়ে তর তর করে উঠে এল টালি। রাগে কাঁপছে সে।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'ওদেরকে তুমি মদ খেতে দিয়েছ, রানা! এর জন্যে তোমাকে আমি...'

'আমি?' অবাক হয়ে বললাম। 'আরে না, ভুল করছ তুমি। আমি কেন দেব, ওরাই তো চাইল আমার কাছে।'

দাঁতে দাঁত ঘষল টালি। তারপর হঠাৎ তাকাল বোটের পেছন দিকে। ক্রাশবোট এখন এক মাইল পেছনে এবং দূরত্ব আরও বেড়েই চলেছে।

'তুমি কোন মতলব এঁটেছ!' চেঁচিয়ে উঠে সিল্ক জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল টালি।

ঠিক সেই সময় চ্যানেলের মুখের সাথে সমান্তরাল রেখায় পৌঁছুল জলকুমারী। দুটো থ্রটলই সম্পূর্ণ খুলে দিলাম আমি। ছুটন্ত অবস্থা থেকে লাফ দিল বোট, আরও জোরে ছুটতে শুরু করল।

পকেট হাতড়াচ্ছে টালি, এই সময় টলে উঠল সে। ধাক্কাটা সামলাতে গিয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা, অশ্রাব্য গালিগালাজ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

বন বন করে ডানদিকে সবটুকু ঘুরিয়ে লক করে দিলাম হুইল। ব্যালে নর্তকীর মত বিন্‌ন্‌ করে ঘুরে গেল জলকুমারী। পিছু হটছে টালি, বোটের সাথে সে-ও দিক বদল করল। অকস্মাৎ ছিটকে পড়ল সে, ডেক পেরিয়ে দড়াম করে গিয়ে পড়ল হুইলের ওপর। বাঁক নেয়া মাত্র শেষ করবে বোট, কাত হয়ে গেছে একদিকে। পকেট থেকে ছোট্ট একটা পয়েন্ট টু-ফাইভ অ্যাস্ট্রা পিস্তল বের করেছে টালি, কিন্তু শরীরের নিচে চাপা পড়ে গেছে পিস্তল ধরা হাতটা।

এক মুহূর্তের জন্যে বোটের হুইল ছেড়ে এগোলাম আমি। ঝুঁকে পড়লাম, একহাতে ধরলাম টালির গর্দান। অপর হাতটা হাঁটুর পেছনে রেখে শূন্যে তুলে নিলাম ওকে। আমার গলা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল ও। 'ঝামেলা বিদায় হও এবার,' বললাম ওকে।

কোনরকম সুযোগ না দিয়ে রেইলের ওদিকে ছুঁড়ে দিলাম ওকে।

বারো ফুট নেমে গেল টালি, লোয়ার ডেকের রেইলে প্রচণ্ডভাবে বাড়ি খেল মাথাটা, তারপর অগোছাল ভঙ্গিতে ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে।

তিন লাফে ফিরে এলাম হুইলের কাছে। এক ঝটকায় লক খুলে বন বন করে ঘোরাতে শুরু করলাম হুইলটা। সিধে হয়ে গেল জলকুমারী। পরমুহূর্তে তিনবার পা ঠুকলাম আমি ডেকের ওপর।

বারো

সোজা প্রবেশপথের দিকে তাক করলাম বোট। নিচে থেকে ধস্তাধস্তির আর চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে, তারপরই টেনে কাপড় ছেঁড়ার মত ফড় ফড় শব্দে গর্জে উঠল সাব-মেশিনগান, আমার পেছনের ডেক ফুটো করে উঠে এল বুলেটগুলো। ছাদে গুলি করেছে ওরা, সম্ভবত রডরিক এবং ল্যাম্পনি আহত হয়নি।

দুই সারি প্রবালের মাঝখানে ঢুকতে যাচ্ছি আমরা, ঠিক আগেরমুহূর্তে আরেকবার পেছন দিকে তাকালাম। ক্রাশবোট এখনও এক মাইল দূরে। আর ঢেউয়ের দোলায় দুলছে টালির মাথাটা। বোট, নাকি হাঙ্গর, কে ওর কাছে আগে পৌঁছবে বলা মুশকিল।

এরপর সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত করে নিলাম মনটাকে। চ্যানেলের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে জলকুমারী। যে কাজ করতে যাচ্ছি, সেটার চেহারা সামনে চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি।

ঝুঁকে হাত বাড়ালেই দু'দিকের বেঁটে প্রবাল স্তম্ভ ছুঁতে পারি। সামনের অল্প পানির নিচে দেখতে পাচ্ছি কদাকার চেহারার প্রবালের ফণা নানান বিচিত্র ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। চ্যানেল ধরে লম্বা আঁকাবাঁকা পথ পাড়ি দিয়ে তেজ এবং কুবুদ্ধি খসে গেছে

পানির স্বভাব থেকে, কিন্তু যতই ভেতরে ঢুকছি আমরা ততই আবিষ্কার করছি তার উন্মত্ত চেহারা। সেই সাথে ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে জলকুমারীর ভবিষ্যৎ, আমার নির্দেশে সাড়া না দেবার প্রবণতা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তার আচরণে। কন্ট্রোল সিস্টেম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

চ্যানেলের প্রথম বাঁকটা দেখতে পাচ্ছি সামনে। সেদিকে নিয়ে যাচ্ছি জলকুমারীকে। যতটা না আমার নির্দেশে, তার চেয়ে বরং নিজের ইচ্ছায় ঘুরে যাচ্ছে সে, আত্মহত্যাপ্রবণ ঝোঁকের বশে একদিকের গা পানি থেকে শূন্যে তুলে ডানদিকের ভয়ালদর্শন প্রবাল স্তম্ভে ধাক্কা খেতে যাচ্ছে। সবিস্ময়ে আঁতকে উঠলাম আমি। পরমুহূর্তে কথা শুনল জলকুমারী, স্তম্ভটাকে ছুঁয়েও ছুঁলো না সে। বাঁকের পর সামনে দেখতে পাচ্ছি সরল চ্যানেল। ঠিক এই সময় মই কাঁপিয়ে ওপরে উঠে এল রডরিক। তার কপালে ভুরুর ওপর ছোট একটা ক্ষত, সেটা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

'নিচে সব ঠিক আছে, ম্যান,' শান্তভাবে বলল সে। 'ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে ল্যাম্পনি। সাহেব পুলিসটা কোথায় গেল?'

'একটু সাঁতার কাটতে গেছে,' চ্যানেল থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বললাম ওকে। 'ক্রাশবোটটা কোথায়? কি করছে ওরা?'

'একই অবস্থা। এখনও ডোবেনি। এক মিনিট, ম্যান...' কণ্ঠস্বর বদলে গেল রডরিকের, '...হ্যাঁ, ভয়ের ব্যাপার। ডেক গানটার কাছে লোকজন দেখতে পাচ্ছি। গোলা ছুঁড়তে যাচ্ছে।'

চ্যানেল ধরে দ্রুত এগোচ্ছি আমরা, পেছন দিকে একনজর তাকাবার ঝুঁকি নিলাম আমি। সেই মুহূর্তে দেখলাম সাদা করডাইট ধোঁয়া বেরিয়ে এল থ্রি-পাউণ্ডার থেকে। তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে মাথার অনেক ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা শেল, প্রায় একই সাথে শোনা গেল কামান দাগার আওয়াজটা।

'তৈরি হও, ম্যান। বাঁ দিকের বাঁকটা এগিয়ে আসছে।'

কিভাবে কি ঘটছে এখন আর সেদিকে খেয়াল নেই আমার।

বাঁকটা নেবার সময় একাধিক ভয়ঙ্কর বিপদ দেখতে পেলাম জলকুমারীর দু'পাশে এবং সামনে, কিন্তু একটু পরই আবিষ্কার করলাম বাঁক নেয়া শেষ করেছি আমরা। ঠিক এই সময় আমাদের রীফের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা প্রবাল স্তম্ভের মাথা চুরমার হয়ে গেল পরবর্তী গোলায়, নীল ধোঁয়ার মেঘে ঢাকা পড়ে গেল ওদিকটা।

বাঁক নিয়ে পঞ্চাশ গজও এগোইনি, তৃতীয় শেলটা ছুটে এল আমাদের দিকে।

'আসছে, ম্যান!'

রডরিকের চিৎকার শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। তাকাবার সাহস হল না আমার। হঠাৎ সামনের সাদা পানি বিশাল একটা স্তম্ভের আকার নিয়ে খাড়া হয়ে গেল, উচ্চতায় আমাদের ব্রিজটাকে ছাড়িয়ে গেল সেটা, তারপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী ঝম ঝম বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম আমরা।

এর মধ্যে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছি। একের পর এক আমাদের দিকে তেড়ে আসছে ঢেউ, কোনটাই ছয় ফুটের কম উঁচু নয়। প্রবাল প্রাচীরে বাধা পেয়ে সেগুলো আরও বন্য, আরও উন্মত্ত হয়ে উঠছে।

ক্রাশবোটের গোলন্দাজরা লক্ষ্যভেদ করার ব্যাপারে যে আনাড়িপনার পরিচয় দিচ্ছে তাতে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। একটা শেল বিস্ফোরিত হল বোটের পাঁচশো গজ পেছনে, তার পরেরটাই ছুটে গেল আমার আর রডরিকের মাঝখান দিয়ে, অগ্নিগোলকটার হাওয়া লাগল আমার গালের পাশে এবং হাতে, বাতাসের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেলাম ডেকের ওপর। অবশ্য সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আবার।

'এইবার গলাটা আসছে!' কাঁপা, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল রডরিক।

সামনে তাকিয়ে দেখি ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে চ্যানেলটা,

এত সরু দেখে কলজে শুকিয়ে গেল আমার। ব্রিজ সমান উঁচু দুটো প্রবালের ভয়ালদর্শন মাথা পাহারা দিচ্ছে অপ্রশস্ত প্যাসেজটাকে। এর ভেতর জলকুমারী ঢুকবে কিভাবে ভেবেই পাচ্ছি না।

'ভুল-ত্রুটি করে থাকলে মাফ করে দিয়ো, রানা!'

রানা! রডরিকের মুখে এই প্রথম শুনলাম।

থ্রটল দুটো এখনও পুরো খোলা, সেই অবস্থায় সরু প্যাসেজের দিকে তাক করলাম বোট। দু'হাতে রেলিংটা আঁকড়ে ধরে আছে রডরিক, ওর মুঠোর চাপে স্টেনলেস স্টীল বেঁকে যাচ্ছে কিনা সন্দেহ হল আমার।

সরু প্যাসেজ অর্ধেক পেরিয়ে এসে ধাক্কাটা খেলাম আমরা। বোটের ধাতব শরীরের সাথে প্রবালের একটানা ঘষা কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হল, কর্কশ আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তারপর প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল জলকুমারী, প্রায় স্থির হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে, ইতস্তত করছে।

এই সময় আরেকটা শেল বিস্ফোরিত হল বোটের পাশে। প্রবাল আর ইস্পাতের টুকরো এসে পড়ল ব্রিজে।

প্রবাল পাঁচিলের গায়ের সাথে স্টারবোর্ড সাইড প্রচণ্ড ঘষা খাচ্ছে, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে আবার ছুটতে শুরু করেছে জলকুমারী। কিন্তু এর একটু পরই আবার প্রায় স্থির হয়ে গেল বোট, এবার বোধহয় নিরুপায় ভাবে আটকে গেছে।

তারপর আরেকটা বড়সড় সবুজ ঢেউ ছুটে এসে প্রবালের দাঁত থেকে মুক্ত করে তুলে ধরল জলকুমারীকে, ঢেউটার মাথা থেকে ডাইভ দিয়ে পড়ল সে, এবং প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

'নিচে যাও, রডরিক,' চিৎকার করে বললাম। 'খোলে গর্ত হয়েছে কিনা দেখ।'

ভুরু থেকে রক্ত মুছে মইয়ের দিকে ছুটল রডরিক।

সামনে খানিকটা খোলামেলা পানি দেখে চট করে ক্রাশবোটের দিকে তাকালাম আরেকবার। প্রবালের আড়ালে পড়ে গেছে সেটা, মুহূর্তের জন্যে আংশিক দেখতে পেলাম সেটাকে কিন্তু এখনও অবিরাম ফায়ার করে যাচ্ছে। চ্যানেলের মুখে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হল, সম্ভবত পানিতে টালিকে খুঁজছে অথবা তাকে তোলার চেষ্টা করছে। যাই হোক, এখন আর হুমায়ুন দাদা আমাদেরকে অনুসরণ করবে না, জানি আমি। ওল্ড মেন-এর পেছন দিক থেকে মেইন চ্যানেল ঘুরে আসতে চার ঘন্টা সময় লাগবে তার।

চ্যানেলের সর্বশেষ বাঁকটা দেখতে পাচ্ছি এখন সামনে। জলকুমারীর কীলের সাথে আবার ঘষা লাগল প্রবালের, কর্কশ শব্দটা আমার কলজেতে গিয়ে লাগছে। তারপর অকস্মাৎ বেরিয়ে এলাম আমরা মেইন রীফ-এর পেছন দিকের গভীর পুলে।

গোল একটা বৃত্তের মত পুলটা, তিনশো গজ চওড়া, প্রায় সবটা ঘিরে রেখেছে প্রবাল পাঁচিল-শুধু গানফায়ার ব্রেক-এর ফাঁকটা খোলা, ভারত মহাসাগরের বিক্ষুব্ধ, উত্তাল সবুজ ঢেউয়ের নির্বিঘ্ন প্রবেশ পথ ওটা।

ফিরে এসে আমার কাঁধের কাছে দাঁড়িয়েছে রডরিক। 'ইঁদুরের কানের মত নিশ্ছিদ্র, ম্যান। একটা ফোঁটাও নিচ্ছে না জলকুমারী।'

নিঃশব্দে প্রিয়তমার প্রশংসা করলাম আমি।

ওদিকে রীফের আধমাইল পেছন থেকে এই প্রথম ক্রাশবোটের গোলন্দাজরা পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছে আমাদেরকে। এটাই তাদের শেষ সুযোগ বুঝতে পেরে দ্রুত একের পর এক কামান দাগতে শুরু করেছে।

বোটের চারধারে ঘন ঘন লাফিয়ে উঠছে পানি-এত কাছাকাছি এসে পড়ছে প্রতিটি শেল এবং কিছু করার উপায় নেই দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ছি আমি। ঘোরের মধ্যেই ঘুরিয়ে নিলাম বোট,

সরু ব্রেক-এর দিকে তাক করে গানফায়ার রীফ-এর ফাঁকটার দিকে ছুটিয়ে দিলাম তাকে।

যাই ঘটুক, ফেরার উপায় নেই আর, বুঝতে পেরে কুঁকড়ে উঠল আমার তলপেটের ভেতরটা। ফাঁকটার ভেতর দিয়ে খোলা সাগরের দিকে তাকাতেই শিউরে উঠলাম আতঙ্কে। আমার সামনে গোটা সাগর যেন পিছু হটে বিশাল বিকট মূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে-ছোট্ট বোটটাকে আক্রমণের তার এই দানবীয় আয়োজনটা দেখে ভয়ে এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

'দেখছ, রডরিক!' গলার ভেতর থেকে নিজের অজান্তেই ফাঁপা আওয়াজটা বেরিয়ে এল।

রডরিকের বিস্ফারিত দুই চোখে পলক নেই, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, সাগরের আলোড়ন সম্মোহিত করে ফেলেছে ওকে। আমার কথা কানে যায়নি ওর।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই অকুতোভয় জলকুমারীর। অসম সাহসের সাথে ছুটে যাচ্ছে সে সর্বগ্রাসী উত্তাল সাগরের সাথে বোঝাপড়ার জন্যে।

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে এইবার যেন আক্রমণের জন্যে ধেয়ে আসছে সাগর।

আক্রোশে অন্ধ একটা দানব কাঁধ তুলছে যেন, মাথা চাড়া দিয়ে প্রতি মুহূর্তে উঠে যাচ্ছে ওপরে, আরও ওপরে-সবুজ রঙের দুর্গ প্রাচীরের মত বিশাল একটা ঢেউ সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুনিয়াটাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি তার এগিয়ে আসার রোমহর্ষক শব্দ-দাবানলে আক্রান্ত বনভূমির আর্তনাদের মত শোনাচ্ছে অনেকটা।

আরেকটা শেল মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল, কিন্তু সেটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না। ইতিমধ্যে মাথা তুলতে শুরু করেছে জলকুমারী, পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউটার গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে সে চূড়ার দিকে।

উঁচু মাথাতে পানির রঙ হালকা হয়ে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে-এবং জলকুমারী যেন একটা এলিভেটর, আমাদেরকে নিয়ে দিব্যি উঠে যাচ্ছে টপফ্লোরে। খাড়া হয়ে যাচ্ছে ডেক, বুকের সাথে রেইল চেপে ধরে অসহায় ভাবে ঝুলছি আমরা।

'পেছন দিকে উল্টে যাচ্ছে বোট,' আর্তনাদ বেরিয়ে এল রডরিকের গলা থেকে। 'ডু সামথিং, ম্যান! ফর গডস সেক, ডু সামথিং...'

পাগলের প্রলাপ বকছে রডরিক। ও নিজেও তা জানে।

লেজের ওপর দাঁড়াতে শুরু করেছে জলকুমারী। 'ঢেউ ফুঁড়ে বেরিয়ে যা!' ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল আমার। দাঁতে দাঁত চেপে আছি। 'সবুজ কেটে বেরিয়ে যা।' আমার কথা যেন শুনতে পেল জলকুমারী। ঢেউয়ের বিশাল ফণাটা বোটের গায়ে বিধ্বস্ত হবার এক সেকেণ্ড আগে সেটার ভেতর ধারাল বো ঢুকিয়ে দিল সে।

সগর্জনে নেমে এল সবুজ ঢেউয়ের মাথাটা বোটে, বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত ডুবে গেল ছয় ফুট পানির নিচে, প্রচণ্ড ধাক্কায় একদিকে কাত হয়ে গেল জলকুমারী। তারপর হঠাৎ ঢেউয়ের পেছনের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে এলাম আমরা শূন্যে-নিচে, অনেক নিচে একটা অন্ধকার পাতাল দেখা যাচ্ছে। নাক নিচু করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেদিকে বোট, পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি উল্টেপাল্টে যাচ্ছে আমাদের।

নিচে পড়ার সাথে সাথেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম আমরা, আমি আর রডরিক ছিটকে পড়লাম রেইলের কাছ থেকে ডেকের ওপর। মুহূর্তের জন্যে অচল হয়ে পড়ল জলকুমারী, কিন্তু আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই গা ঝাড়া দিয়ে কয়েক টন পানি ফেলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল সে, দুদ্দাড় গতিতে ছুটতে শুরু করেছে পরবর্তী ঢেউটার সাথে বোঝাপড়া করতে।

আগেরটার চেয়ে ছোট এটা, ফণাটাকে তোয়াক্কা না করে সেটার মাথায় চড়ে উল্লাসে একটু দুলে নিল পাগলি। 'দ্যাটস মাই

ডারলিং!’ চিৎকার করে উৎসাহ দিলাম আমি। গতি ফিরে পাচ্ছে সে, তৃতীয় ঢেউটাকেও গায়ে চড়তে না দিয়ে নিজেই চড়াও হল তার ওপর, সাবলীল ভঙ্গিতে নেমে এল আবার নিচে।

কাছাকাছি কোথাও আবার একটা থ্রি-পাউণ্ড শেল কড়াক করে বিস্ফোরিত হল, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা বেরিয়ে এসেছি গানফায়ার ব্রেক থেকে, আকাশের নিচে লম্বা দিগন্তরেখার দিকে ছুটছি। আর কোন শেলের আওয়াজ আমি পাইনি।

মদ খেয়ে ককপিটে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল যে গার্ডটা, তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না বোটে। আমরা ধরে নিলাম বড় ঢেউটা তাকে টেনে নিয়ে গেছে সাগরে। বাকি তিনজনকে আমরা সেন্ট মেরী ত্রিশ মাইল দূরে থাকতেই ছোট্ট একটা দ্বীপে নামিয়ে রেখে এলাম। ওখানে একটা কুয়া আছে এবং মেইনল্যাণ্ডের জেলেরা প্রায়ই পানি খেতে যায়।

ঝোড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে জলকুমারী যখন গ্র্যাণ্ড হারবারে ঢুকল তখন রাত হয়ে গেছে। জেটির কাছ থেকে অনেক দূরে নোঙর ফেললাম আমি। বোটের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দ্বীপবাসীদের আলোচনার খোরাক হয়ে উঠুক তা চাই না। ডিঙি নৌকো নিয়ে তীরে গেল রডরিক আর ল্যাম্পনি। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে মাস্টার কেবিনের জোড়া বাঙ্কে শুয়ে পড়লাম এবং প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও তখুনি ঘুম এসে গেল।

পরদিন সকাল ন'টায় আমার ঘুম ভাঙাল জুডিথ। মাছের কেক আর বীফ স্টেক দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে ল্যাম্পনি।

‘বোট মেরামতের জন্যে যা যা লাগবে কিনতে গেছে ওরা মা এডির দোকানে,’ বলল সে।

গোগ্রাসে ব্রেকফাস্ট সেরে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালাম, দাড়ি কামালাম, তারপর ফিরে এসে দেখি তখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে জুডিথ। বুঝলাম, কিছু বলতে চায়।

আনাড়ি হাতে ক্ষতগুলো নতুন করে ড্রেসিং করছি দেখে মৃদু

তিরস্কার করল আমাকে, তারপর নিজেই শুরু করল কাজটা।

‘মিস্টার রানা।’

‘ইয়েস, মিসাস ল্যাম্পনি,’ সহাস্যে বললাম।

কিন্তু হাসছে না জুডিথ। মুখটা ম্লান। ‘একটা কথা।’

‘মাত্র?’

তবু হাসল না জুডিথ। ‘আপনি চান, মিস্টার রানা, আমার ল্যাম্পনি খুন হোক বা সারা জীবন জেল খেটে মরুক? আপনারা যদি এভাবে চলতে থাকেন, যেভাবে হোক তীরে আটকে রাখব ওকে আমি।’

‘ভারি মজার কথা, জুডিথ,’ ওর উদ্বেগ দেখে হাসলাম আমি। ‘তা এক কাজ করলেই তো হয়, তিন বছরের জন্যে ওকে রায়ানো দ্বীপে পাঠিয়ে দিলেই তো পার। আমার বিশ্বাস তিনটে বছর নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে তুমি।’

‘আপনি নিষ্ঠুরের মত কথা বলছেন, মিস্টার রানা।’

‘জীবনটাই বড় নিষ্ঠুর, জুডিথ,’ আরও নরম সুরে বললাম ওকে। ‘ভুলে যাচ্ছ কেন, ল্যাম্পনি আর আমি যা কিছু করছি জীবিকার জন্যেই করছি। বোটটাকে পানির ওপর ভাসিয়ে রাখার জন্যে কিছু কিছু ঝুঁকি আমাকে নিতেই হয়। কোন কোন সময় ল্যাম্পনি আমার সাথে থাকে। গির্জার কাছে একটা বাড়ি কেনার মত টাকা জমিয়েছে ও, এই টাকার প্রতিটি পয়সা ও এই বোটের মাধ্যমে খেটে রোজগার করেছে।’

চুপচাপ ড্রেসিং শেষ করল জুডিথ। বিদায় নিয়ে যখন ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে, ওর হাত ধরে কাছে টানলাম। কিন্তু আমার চোখে তাকাল না ও। ওর চিবুক ধরে মুখটা তুললাম ওপর দিকে। সুন্দর, নিটোল একটা মুখ। দেখে মায়া লাগে। ‘খামোকা ভয় পেয়ো না, জুডিথ। ও আমার ছোট ভাইয়ের মত। ওর দিকে আমার নজর আছে। থাকবে।’

অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জুডিথ।

'অন্তর থেকে বলছেন আপনি, তাই না, মিস্টার রানা?'

'অন্তরের অন্তস্তল থেকে, জুডিথ।'

'বিশ্বাস করলাম,' অবশেষে বলল সে, তারপর ঝিক করে হাসল। 'আর ভয় করব না।'

ও যখন দরজার কাছে, পেছন থেকে চিৎকার করে বললাম, 'আমার নামে তোমাদের একটা বাচ্চার নাম রেখ, বুঝেছ!'

'প্রথম বাচ্চার, মিস্টার রানা,' দৌড় শুরু করে চেঁচিয়ে উঠল সে-ও। 'কথা দিলাম!'

'কথায় বলে, ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে সাথে সাথে আবার তার ওপর চড়তে হয়-তাতে ভয়টাকে হার মানানো যায়, মিস্টার রানা,' বলল ঢ্যাঙা রামাদীন।

ওর ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিসে বসে আছি আমি। ইন্সপেক্টর পিটার টালির আচরণ সম্পর্কে এইমাত্র আলোচনা শেষ করেছি আমরা। অবশ্য, টালি যাই করে থাকুক, তাতে রামাদীনের এতটুকু স্বার্থহানি হয়নি। নিজের কমিশন তো সে আগেই পকেটস্থ করে নিয়েছে। এখন আমরা আলোচনা করছি পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে।

বললাম, 'বডি, বক্স, স্টিক-সব কিছুতে রাজি আমি, মি. রামাদীন। মোটকথা, পার্টি চাই আমি। তবে জীবনের দাম বেড়ে গেছে কিনা, তাই প্রতি নাইট-ডিউটির জন্যে দশ হাজার ডলারের কম নেব না-এবং সবটা অ্যাডভান্স চাই।'

'এমন কি ওই মজুরিতেও আপনাকে আমি কাজ পাইয়ে দেব।'

বুঝলাম, এতদিন আমাকে ঠকাচ্ছিল রামাদীন। 'তাড়াতাড়ি।'

'খুব তাড়াতাড়ি,' রাজি হল সে। 'আপনি ভাগ্যবান। ইন্সপেক্টর টালি সেন্ট মেরী দ্বীপে আর কখনও ফিরে আসবে বলে মনে করি না। ওকে যে কমিশনটা দিতেন, সেটা আপনার লাভের

ঘরে জমা হবে।'

'এটুকু দয়া তার কাছে পাওনা হয়েছে আমার।'

পরবর্তী ছয় হপ্তায় তিনবার নাইট ডিউটিতে গেলাম আমরা। দুটো বডি, একটা বক্স-সবগুলো মোজাম্বিক জলসীমার মধ্যে, নদীগুলোর ভেতর দিকে পি. সি. আই. হালকা কিছু কাজ মাঝেমাঝেই দিত আমাকে, বডি পাচার করার ওই দুটো কাজও রামাদীনের মাধ্যমে ঢাকা অফিস দিল আমাকে। এ ব্যাপারে রামাদীনের অবশ্য কিছুই জানার কথা নয়।

বিদেশী শাসিত দুই আফ্রিকান রাষ্ট্রের দু'জন জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন ওঁরা, স্বাধীনতা আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার জন্যে কাজ করছিলেন, কিন্তু বিদেশী প্রভুরা তাঁদের তৎপরতা পছন্দ করেনি। ওঁদেরকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়। অগত্যা দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয় ওঁদেরকে। দেশের বাইরে থেকে সংগঠনের কাজ করার সুযোগ চাইছিলেন ওঁরা। পি. সি. আই-এর ঢাকা অফিস ওদেরকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আর বক্সে ছিল গোলা বারুদ। তাও মুক্তি পাগল আফ্রিকান নিগ্রোদের সাহায্যেই পাঠানো হচ্ছিল।

তিনটে নাইট ডিউটি থেকে আঠারো হাজার ডলার আয় করি আমরা, ব্যর্থ মওসুমের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার জন্যে যথেষ্ট। তারচেয়ে বড় কথা, কাজের মাঝখানে প্রচুর অবসর আর বিশ্রাম পাওয়ায় আমার ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেল, এবং আগের শক্তি ফিরে এল শরীরে। প্রথম দিকে বাড়ির সামনে পাম গাছের ছায়ায় অলসভাবে শুয়ে বসে বই পড়ে সময় কাটালাম। তারপর শক্তি ফিরে আসার সাথে সাথে রোদ পোহাতে শুরু করলাম, সাঁতার কাটলাম, মাছ ধরলাম।

তবে, ডাক্তার ডানিয়েলের কথাই ঠিক। বাঁ হাতের ওপর দিকটা তখনও কিছুটা দুর্বল আর আড়ষ্ট হয়ে আছে আমার। কাঁধ পর্যন্ত উঁচুতে তুলতে পারি, তার বেশি তুলতে চেষ্টা করলে ব্যথা

পাই। এই দুর্বলতাটার জন্যেই লর্ড নেলসনে রডরিকের সাথে বক্সিংয়ে হেরে গিয়ে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার টাইটেলটা হারাই আমি। যাই হোক, আশা করছি সাঁতার এবং নিয়মিত এক্সারসাইজ করলে আবার ঠিক হয়ে যাবে হাতটা।

শক্তি ফিরে পেয়ে আবার ধীরে ধীরে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা দানা বাঁধতে শুরু করল। ধীরে ধীরে পাগল হয়ে উঠলাম। বিগ গাল আইল্যাণ্ডের পানিতে ডুবে থাকা ক্যানভাসে মোড়া প্যাকেটটা রোজ রাতে স্বপ্নে দেখি। বুঝতে পারি, পানি থেকে তুলে জিনিসটা কি না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাব না আমি।

ইতিমধ্যে হঠাৎ বাতাসের মোড় ঘুরে গেল, চ্যানেলে পানির উত্তাপ নেমে গেল চার ডিগ্রী, এবং রাতারাতি চলে গেল সব মাছ- বিদায় নিল আরেকটা মওসুম।

মাছ ধরার যাবতীয় সরঞ্জাম পরিষ্কার করে সেগুলোয় হলুদ গ্রিজ মাখিয়ে তুলে রাখলাম পরবর্তী মওসুমের জন্যে। জলকুমারীকে ফুয়েলিং বেসিনের কাছাকাছি ডক ইয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে মেরামতের কাজে হাত দিলাম আমরা। খোল এবং কীল মেরামত শেষ করে বোটের ওপরের অংশের ক্রুটি সারালাম। রি শোল্ডারিঙ, স্যাণ্ড পেপারিঙ, রি বার্নিশিঙ-হাজারটা কাজ, প্রত্যেকটা গভীর মমতা আর কঠোর পরিশ্রম দিয়ে শেষ করলাম আমরা।

কোন তাড়াহুড়ো নেই। আমার পরবর্তী চার্টার পার্টি আসবে তিন হপ্তা পর। ক্যানাডিয়ান এক ইউনিভার্সিটির একদল মেরিন বায়োলজিস্ট।

দিনগুলো ঠাণ্ডা, আরামে কেটে যাচ্ছে। শরীরে ফিরে এসেছে পূর্ণ শক্তি, সুস্থ থাকার আগের সেই পুলক অনুভব করছি মনে। গভর্নমেন্ট হাউজে প্রায়ই ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ পাচ্ছি, কখনও কখনও হপ্তায় দু'বারও যেতে হয়। এবং প্রতিবার সবাইকে ব্ল্যাঙ্ক এবং প্যানথারের সাথে আমার লড়াইয়ের গল্পটা আবার নতুন

করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শোনাতে হয়। প্রেসিডেন্ট গডফ্রে পিডলের অন্তরে খোদাই হয়ে গেছে গল্পটা, কবিতা আবৃত্তির মত করে পুরোটা মুখস্থ বলতে পারেন তিনি। বলার সময় ছোট্ট কোন ঘটনার এতটুকু অংশ যদি বাদ পড়ে, অমনি তিনি ক্রুটিটা শুধরে দেন আমার। গল্পের শেষে প্রতিবার উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন প্রেসিডেন্ট, 'তোমার ক্ষতের দাগটা ওদেরকে দেখাও, মিস্টার রানা।' অগত্যা বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সামনে শার্ট খুলতে হয় আমাকে।

নিরুপদ্রব দিনগুলো শান্তিতে কেটে যাচ্ছে। ইন্সপেক্টর টালি সেন্ট মেরীতে ফিরে আসেনি আর এবং ছয় হপ্তার শেষ দিকে সাব ইন্সপেক্টর টমসনকে ইন্সপেক্টর এবং কমাণ্ডিং অফিসারের পদে বরণ করে নেয়া হয়। নতুন দায়িত্ব পেয়ে তার প্রথম কাজগুলোর একটা ছিল এফ এন কারবাইনটা আমাকে ফেরত দেয়া।

বিগ গাল আইল্যাণ্ডে কবে যাব ভাবনাচিন্তা করছি, এই সময় এক শুক্রবার সন্ধ্যায় একটা আশ্চর্য খবর পেলাম।

ক্রুদেরকে সাথে নিয়ে লর্ড নেলসনে সাপ্তাহিক উৎসব করছি তখন আমরা। একটা করে বোতল মাত্র শেষ করেছি, তখনও টেবিলে ল্যাম্পনি তার বেইট নাইফটা গাঁথেনি, এই সময় বারে ঢুকল হিলটন হোটেলের মারিয়া। হিলটনের সুইচবোর্ডে কাজ করে ও। মাইক প্যানথার এই মেয়েটার গায়েই হাত তুলেছিল।

একটা কোরাস গাইছি আমি আর রডরিক। আজ রডরিকের চেয়ে এগিয়ে আছি আমি, শেষ পদটা গাওয়া শেষ করে লক্ষ করছি রডরিক তখনও হেঁড়ে গলায় ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে, আর সেই সাথে তার শরীর বাঁকানো কসরৎ তো আছেই। মারিয়া আমার অপর পাশের সিটে এসে বসল।

'এক ভদ্রমহিলা আপনার খোঁজ চেয়েছেন, মিস্টার রানা।'

'ভদ্রমহিলা? কে? কোথায়?'

'হোটেলে,' বলল মারিয়া। 'একজন বোর্ডার আজ সকালের

প্লেনে এসেছেন। আপনার নাম ইত্যাদি সব জানেন তিনি। আপনার সাথে দেখা করতে চান। আজ রাতে দেখা করে খবরটা দেব আপনাকে, বলে এসেছি তাঁকে।'

'দেখতে কেমন?'

'সুন্দরী। এবং ভদ্রমহিলা, মিস্টার রানা।'

আমার কেলাসেরই মনে হচ্ছে। মারিয়ার জন্যে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলাম।

'যাবেন এখন দেখা করতে?'

'তুমি যতক্ষণ আমার পাশে আছ, মারিয়া, দুনিয়ার সমস্ত সুন্দরী মেয়েকে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে,' হাসতে হাসতে বললাম ওকে। আমার আরও একটু কাছে সরে এল ও। 'একান্ত যদি যেতেই হয়, আগামীকাল দেখা যাবে।'

বলল, 'মিস্টার রানা। আপনি সত্যিকার একজন ডেভিল,' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল সে।

'মাসুদ,' আমার আরেক পাশের সিট থেকে বলল রডরিক। 'বলব বলব করে যে কথাটা কক্ষণো কোনদিন বলা হয়নি তোমাকে,' দুই ঢোকে গ্লাস ভর্তি হুইস্কি শেষ করল সে, 'সেই কথাটা এখন তোমাকে বলতে যাচ্ছি আমি,' চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে তার, ভাবাবেগে কাঁদছে ও। 'ইউ আর এ গুড বয়, মাসুদ। আই লাভ ইউ, ম্যান। আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসি আমি তোমাকে।'

'আমিও।'

কুক্কুরুকু! রাতের শেষ প্রহর, মোরগ ডাকছে। মুখের কাছে হাত তুলে একটা হাই তুলল রানা। ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইছে চোখের পাতা। 'আজ এই পর্যন্ত থাক, কেমন?'

বেচারা! রানার অবস্থা দেখে মায়া লাগল সোহানার। সারারাত জেগে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেছে, কিন্তু আর পারছে না ও। ওর এই কষ্ট সহ্য করা যায় না। অপর দিকে গল্পের মাত্র প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে ইন্টারেস্টিং ঘটনাগুলো এই বার একে একে ঘটতে শুরু করবে এই অবস্থায় সে-ই বা ধৈর্য ধরে কিভাবে!

'বুঝতে পারছি কষ্ট হচ্ছে তোমার, কিন্তু গল্পের বাকি অংশটার কি হবে?' জানতে চাইল সোহানা। 'ফাঁদ পেতে আবার কবে তোমাকে ধরতে পারব...অফিস থেকে ছুটি নিয়ে হয়ত পালিয়েই যাবে আমাকে গল্প শোনাবার ভয়ে-তখন কি হবে আমার?'

'দূর, পালাব কেন!' হেসে উঠে বলল রানা। 'একবার যখন শুরু করেছি, শেষ করবই। তবে অনেক বড় গল্প তো, একরাতে শেষ হবার নয়। আগামী শনিবার আবার বলব, কেমন?'

সোহানা প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। 'এ অন্যায়, রানা, গল্পের এই জায়গায় এসে...'

'রাত ফুরিয়ে গেলে আমার কি দোষ, বল? আরও সংক্ষেপে বললে কি ভাল হত? তুমি চাইলে অবশ্য পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শেষ করে দিতে পারি বাকিটুকু। তাই করব?'

'এই, না...প্লীজ! আমি সব শুনতে চাই,' রানার একটা হাত ধীরে ধীরে ওর ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরছে দেখে সভয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল সোহানা। 'এই...কী হচ্ছে! কথা ছিল গল্প শেষ হলে...'

'প্রথম পর্ব তো শেষ,' হাসল রানা। 'নগদ পেমেন্ট পছন্দ করি আমি। অন্তত ওয়ান থার্ড পাওনা চুকিয়ে দাও। কথা দিচ্ছি তার বেশি এগোব না।' হ্যাঁচকা টানে রানার বুকের সাথে সেঁটে এল সোহানা।

পাঁচ মিনিটেই লালচে হয়ে উঠল সোহানার ফর্সা মুখটা। আশ্চর্য একটা ক্ষুধার্ত আকুতি ফুটে উঠল চোখে-মুখে। কাঁপা শ্বাস। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে পিষে মারতে চাইছে রানাকে বুকের সাথে। ঢোক গিলল।

‘উহ্! রানা...চুলোয় যাক শর্ত। প্লীজ! এখন থামলে পাগল হয়ে যাব!’

‘বেশ, তুমি যখন এত করে বলছ...ঠিক আছে...’

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমে ঢলে পড়ল দু’জন বিছানায়।

মাসুদ রানা

আই লাভ ইউ, ম্যান-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

পরের শনিবার।

ঢাকা।

মাসুদ রানার বাংলো।

অনেক কাজ ছিল-দ্রুত সব শেষ করে, কোনটা জাহেদ কোনটা গিলটি মিয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দুটোর মধ্যে ঘরে ফিরে এসেছে রানা। রাঙার মা ছুটিতে, তাই ড্রাইভারকে দিয়ে লাঞ্চ পাঠিয়ে দিয়েছে সোহানা। পুঁই শাক, ঢেড়শ ভাজি, পটলের দোলমা, মুগের ডালের চচ্চড়ি, রুইয়ের কোর্মা, নারকেল চিংড়ি, সর্ষে ইলিশ ইত্যাদি সহযোগে ভরপেট ভাত খেয়ে, একটা সিগারেট ধ্বংস করে পিচ্চি একটা ঘুম দেয়ার জন্যে উঠে পড়েছে বিছানায়। রাত জাগতে হবে। সোহানা আসবে আজ গল্প শুনতে।

এদিকে বিকেল চারটেতেই ঢাকার বুকে নেমে এসেছে সন্ধ্যার কালিমা। ঘন কালো বৈশাখী মেঘে ঢাকা পড়েছে গোটা আকাশ। কিছুক্ষণের মধ্যে বার কয়েক বাতাসের ঝাপটা দিয়েই শুরু হয়ে গেল ঝম ঝম মুষলধারে বৃষ্টি।

ঘুমাচ্ছে রানা। অসময়ের উসখুস ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বর্গে, সেই অপূর্ব সুন্দর সেন্ট মেরী দ্বীপে চলে গেছে ও।

...স্বর্ণ হৃদয় দু’জন মানুষ-রডরিক আর ল্যাম্পনি, প্রিয় বোট জলকুমারী, সাগর-তীরে পঁচিশ একর জমি নিয়ে শান্তির নীড়, বিগ গাল আইল্যাণ্ডের কাছে ডুবিয়ে রাখা সবুজ ক্যানভাস মোড়া

রহস্য, এবং অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলার আকস্মিক আবির্ভাব-স্বপ্নের মধ্যে এদের স্পষ্ট ছবি দেখতে পাচ্ছে ও। দেখতে পাচ্ছে সরল হাসিতে উদ্ভাসিত তরুণ নিরোর মুখটা, শুনতে পাচ্ছে চলমান পাহাড় বিশালদেহী হুমায়ুন দাদার অট্টনাদ। তারপর হঠাৎ মুখোমুখি হল সেই আশ্চর্য ধূর্ত সিডনি শেরিডানের। অমনি চট করে ভেঙে গেল ঘুমটা।

চোখ মেলার আগেই একটানা রিমঝিম বৃষ্টির মিষ্টি সুর কানে এল, ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ এল নাকে। অদ্ভুত এক পুলকে শিরশির করে উঠল শরীর-মন। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল ও। জানালার শার্সি ভেদ করে দৃষ্টি চলে গেল বাইরে। ম্লান আলোয় রূপালী বর্শার ঝাঁক মনে হচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে। বাগানে আটকে গেল চোখ। উজ্জ্বল লালে ছেয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়া, ডালগুলো দোল খাচ্ছে বাতাসে, থর থর কাঁপছে ফুলগুলো বৃষ্টির আঘাতে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে জাগরণের মধ্যেই সদ্য দেখা স্বপ্নের চরিত্রগুলো ফিরে এল চোখের সামনে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে। আশ্চর্য একটা অস্থিরতা অনুভব করছে ও। কেউ যেন ভারী একটা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে ওর বুকের ওপর। সব কথা কাউকে বলে হালকা হতে হবে ওকে। অতি আপন, অতি প্রিয়, সহানুভূতিশীল শ্রোতা চাই একজন।

সোহানার কথাই মনে পড়ল। ওকে পেলে এখুনি শুরু করা যেত আবার।

ভাবতে না ভাবতেই সোহানা হাজির। আঁটসাঁট করে পরেছে লাল পেড়ে হলুদ সুতির শাড়ি, অনিন্দ্যসুন্দর মুখে অপূর্ব মিষ্টি হাসি, দু'হাতে ধরে আছে বড়সড় একটা ট্রে। ট্রে-র ওপর রয়েছে একটা অ্যালুমিনিয়ামের গামলা-তাতে কাঁচা সরষের তেল, পেঁয়াজ, আদা আর বেশি করে কাঁচা মরিচ দিয়ে মাখানো গরম মুড়ি, দু'গ্লাস পানি আর দু'কাপ ধূমায়িত চা।

'তুমি!' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল রানার চোখ। 'তোমার কথাই ভাবছিলাম। কখন এলে?'

'আকাশের অবস্থা দেখেই চলে এলাম। দেখি ঘুমাচ্ছ। বৃষ্টির ছিটে আসছিল, জানালাটা লাগিয়ে দিয়েই ভাবলাম তোমাকে ঘুম থেকে তুলতে হলে একটা কিছু ছুতো দরকার।'

উঠে বসল রানা। ঝাল-মুড়ির দিকে চেয়েই জল এসে গেল জিভে। খুশি হয়ে বলল, 'দারুণ ছুতো তৈরি করেছ, মাইরি!' হাত বাড়াল বিছানার ওপর নামিয়ে রাখা গামলার দিকে। 'উফ! থ্যাঙ্ক ইউ, সোহানা! মেজাজটা খুশি থাকতে থাকতেই চট্ করে বলে ফেল মতলব। গ্র্যান্ট হয়ে যেতে পারে।'

'সেই গল্পটা...' হাসল সোহানা। বিছানায় উঠে বালিশে হেলান দিয়ে বসল আরাম করে। হাত চালাল গামলায়। 'নাও, শুরু করো।'

জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলল রানা। তুমুল ঝড়বৃষ্টি চলছে বাইরে। হ্যাঁ, এখনই গল্পের সময়। মেঘের মত সে-ও ভারমুক্ত হতে চাইছে। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'কোথায় যেন থেমেছিলাম, মনে আছে?'

'তোমরা লর্ড নেলসনের প্রাইভেট বারে বসে রয়েছ,' বলল সোহানা। 'হোটেল হিলটনের সুইচবোর্ড অপারেটর মারিয়া এসে খবর দিল সকালের প্লেনে একজন অপরিচিতা ভদ্রমহিলা এসেছেন, তোমার সাথে দেখা করতে চান।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'মনে পড়েছে।'

কাঁচা মরিচ চিবিয়ে ঝাল লেগে গেছে সোহানার-পানি খেয়ে, শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিল সে। নড়েচড়ে বসল। তারপর রানার দিকে তাকাল।

শুরু করল রানা।

দুই

পরদিন দুপুরের একটু আগে হিলটনে গেলাম। আমাকে দেখে সুইচবোর্ডের কাছ থেকে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল মারিয়া, কান থেকে গলায় নামিয়ে নিল এয়ারফোন দুটো।

'ভদ্রমহিলা সুইমিং পুলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, মিস্টার রানা,' বলল সে।

'পানিতে নামতে হবে নাকি?'

হেসে ফেলল মারিয়া। 'নামতে বললে সুযোগটা ছাড়বেন না,' বলল সে। 'প্রকাণ্ড একটা লাল আমব্রেলার ছায়ায় পাবেন ওকে। স্বর্ণকেশী, পরনে হলুদ বিকিনি।'

সান কাউচে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা, একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। পেছন থেকে তার একরাশ সোনালি চুল দেখতে পাচ্ছি, সিংহের ঝুঁটির মত, সরু আর লম্বা করে কিছুটা বাঁধা, তারপর ঢেউ খেলানো অসংখ্য ফিতের মত ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপর।

সুইমিং পুলে লোকজন নেই বললেই চলে। পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, চোখ থেকে সানগ্লাসটা ঠেলে তুলে দিল একেবারে চাঁদির মাঝখান পর্যন্ত, তারপর শরীরটাকে অদ্ভুত এক মোচড় দিয়ে একটা মাত্র ঝাঁকিতে দু'পায়ের ওপর সটান সিধে হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা ছোটখাট, আমার বুক পর্যন্ত উঠেছে মাথাটা। পরনের বিকিনিটাও খুব ছোট, গভীর একটা নাভি এবং মসৃণ, সমতল তলপেট, মৃদু রোদে পোড়া সুগঠিত কাঁধ, ছোট ছোট বুক, আর চিকন একটা কোমর-সবই চোখে পড়ছে। পা দুটো মেদহীন, পাতা দুটো খোলা একজোড়া স্যাণ্ডেলে ঢোকানো-

আঙুলের নখের সাথে মিল রেখে পায়ের নখগুলোও পরিষ্কার লাল নেইল পলিশে রাঙানো। কাঁধ থেকে চুল সরাবার সময় তার হাসি এবং সুগঠিত ছোট দুটো হাত লক্ষ করলাম।

খুব বেশি মেকআপ ব্যবহার করেছে মেয়েটা, কিন্তু ব্যবহারের দুর্লভ নৈপুণ্যে তা কোথাও ছোপ-ছোপ দাগ রাখেনি, বরং মুক্তোর মত কোমল ঝকঝকে হয়ে উঠেছে চামড়া এবং রঙ, যেন গাঢ় আগুনের মত জ্বলছে দুই গালে, ঠোঁট জোড়ায়। চোখে দীর্ঘ, কালো আই-ল্যাশ টেনেছে ও, এবং চোখের পাতা দুটোয় বেগুনির সাথে সোনালী রঙ মিশিয়ে লেপেছে।

'পালাও রানা!' মনের ভেতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিল আমাকে। এ-ধরনের মেয়ে আগেও দেখেছি আমি। চেহারাটা ছোট হলে কি হবে, ছুঁচালো দাঁত আর ধারালো নখর বিশিষ্ট হিংস্র বিড়ালের মত এরা-এদের তৈরি বেশ কিছু দাগ রয়েছে আমার শরীরে ও মনে। কিন্তু পিছু হটলাম না।

সাহসের সাথে এগিয়ে গেলাম আমি, মুখের ভেতর জিভ নেড়ে আর চোখ দুটো টান টান করে ভুবনভোলানো হাসিটা ছাড়লাম, জানি এই হাসিতেই ঘায়েল হয় এরা, ডিনামাইটের মত বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে।

'হ্যালো,' বললাম ওকে। 'আমি মাসুদ রানা।'

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চির সর্বত্র মেয়েটার বিলোল কটাক্ষ অনুভব করলাম। মাথা থেকে আমার চোখে নেমে এসে স্থির হল ওর দৃষ্টি। নিচের ঠোঁটটা সামান্য একটু চুষে নিল ও, তারপর বলল, 'হ্যালো,' কণ্ঠের সুরটা কৃত্রিম লাগল কানে, যেন ঠিক এই ভঙ্গিতে উচ্চারণ করার জন্যে রিহার্সেল দিয়ে রেখেছে, এবং একই নিঃশ্বাসে বলল, 'রাফেলা বার্ড-নিরোর বোন।'

'বার্ড? বিবাহিতা...?'

'না,' বলল মেয়েটা। 'বার্ড আমাদের পৈত্রিক উপাধি। কিন্তু

বাবার সাথে রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে উপাধিটা ত্যাগ করেছিল নিরো।'

অস্তগামী সূর্যের রশ্মি পামগাছের মাথার ওপর দাবানলের লালিমা ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার বাড়ির বারান্দায় বসেছি আমরা, আদি মাতা সাগরের একটানা তর্জন-গর্জন শুনছি আর নিঝুম গোধূলি উপভোগ করছি। ফলের রস আর বরফের সাথে হালকা শ্যাম্পেন খেতে দিয়েছি ওকে। চিঠিটা দিয়ে উঠে গেছে ও, আমার দিকে পেছন ফিরে বারান্দার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙে ভর দিয়ে। কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো স্বচ্ছ নাইলনের একটা ফ্রক পরে রয়েছে ও, হাঁটুর অর্ধেকটা কোনমতে ঢাকা পড়েছে তাতে, পুরো বুক প্রায় সবটা খোলা। ফ্রকের নিচে আর কিছু পরেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।

চিঠিটা সম্ভবত নিজের পরিচয়পত্র হিসেবে দেখতে দিয়েছে আমাকে ও। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বোনের কাছে লেখা নিরোর চিঠি এটা। হাতের লেখাটা পরিষ্কার চিনতে পারছি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক তরুণ অ্যাডভেঞ্চারিস্টের উচ্ছ্বাসে ভরা চিঠি। পড়তে পড়তে নিরোর বোনের অস্তিত্ব ভুলে গেলাম আমি। লিখেছে বোনকে, কিন্তু ভঙ্গিটা প্রিয় বন্ধুকে লেখার মত। বোঝা যায় অত্যন্ত মধুর এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল রাফেলার সাথে তার। চিঠিটা বেশ বড়। অভিযানের অনেক খবর রয়েছে এর মধ্যে, কিন্তু সবই আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছে নিরো, কোথাও রহস্য পরিষ্কার করেনি। এক জায়গায় লিখেছে অভিযান সফল হলে টাকা-পয়সার কোন অভাব থাকবে না তাদের এবং জীবন হয়ে উঠবে সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দে ভরপুর।

বোনকে নিয়ে সুখ এবং সমৃদ্ধি চেয়েছিল যে ছেলেটি সে আজ সাগরের অতলতলে ঘুমিয়ে আছে ভাবতে গিয়ে বুকটা টনটন করে উঠল আমার। তার মৃত্যুটা ব্যক্তিগত ক্ষতির মত লেগেছিল আমার কাছে। যাই হোক, হঠাৎ চিঠিতে আমার নামটা লাফ দিয়ে

উঠল। '...ভদ্রলোককে পছন্দ না করে পারবে না তুমি, রাফেলা। পাষাণের মত কাঠিন্য আছে চেহারায়, সাগরের গভীরতা আছে ব্যক্তিত্বে, আমাদের গলিতে রোজ রাতে যে ছোকরা বিড়ালটা বেরিয়ে আসে মারামারি করার জন্যে, ঠিক তার মত জেদী এবং ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু এসবের নিচে অদ্ভুত কোমল একটা মন আছে ভদ্রলোকের, আশ্চর্য সুন্দর একটা মন। মনে হয় আমাকে তার ভাল লেগেছে। জানো, কি করলে ভাল হবে সে বিষয়ে উপদেশ দেয় আমাকে...'

তাড়াতাড়ি হুইস্কির গ্লাসটা এক ঢোকে নিঃশেষ করলাম আমি। চিঠির অক্ষরগুলো ঝাপসা লাগছে। দ্রুত শেষ করে ভাঁজ করলাম চিঠিটা।

ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে রাফেলা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। চিঠিটা তার হাতে দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে গেলাম রেলিঙের সামনে। সাগরের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম ধীরে ধীরে। দিগন্তরেখার নিচে টুপ করে নেমে গেল সূর্য। হঠাৎ ঠাণ্ডা এবং সন্ধ্যা নামল হারবারে।

ফিরে এসে ল্যাম্পটা জ্বাললাম, দু'জনের মাথার বেশ একটু ওপরে রাখলাম সেটা যাতে কারও চোখে আলোটা না পড়ে। রেইলের কাছ থেকে নিঃশব্দে লক্ষ করছে আমাকে রাফেলা।

গ্লাসে আরেকটু হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বেতের চেয়ারে হেলান দিলাম।

'বুঝলাম,' ওকে বললাম আমি, 'নিরোর বোন তুমি। সেন্ট মেরীতে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ। কেন?'

'ওকে তোমার ভাল লেগেছিল, তাই না?' জানতে চাইল ও। এগিয়ে এসে বসল আমার পাশের চেয়ারটায়।

'অনেক লোককেই ভাল লাগে আমার। এটা আমার একটা দুর্বলতা।'

'ওর মৃত্যুটা কি...মানে, খবরের কাগজে যা লিখেছে,

ব্যাপারটা কি ঠিক সেইরকমই?'
'হ্যাঁ।'
'এখানে কি করতে এসেছিল সে-সম্পর্কে ও কিছু বলেছিল তোমাকে?'
মাথা নাড়লাম। 'সাংঘাতিক সতর্ক ছিল ওরা। তাছাড়া আমি কোন প্রশ্ন করিনি ওদেরকে।'
গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে নিচের ঠোঁটটা জিভের ডগা দিয়ে চেটে নিল রাফেলা। 'তোমাকে একটা গল্প শোনাতে চাই আমি,' চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। 'কাউকে বিশ্বাস হলেই শুধু এ গল্প শোনানো চলে। নিরো তোমার প্রশংসা করেছে, সুতরাং তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু..' মত পাল্টাল রাফেলা, '...না, ব্যাপারটা তাও নয়-আসলে কাউকে বিশ্বাস হলেও তাকে এ গল্প শোনানো চলে না, যদি না সে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক কিছু জেনে ফেলে।'
'আরও সহজ এবং সংক্ষেপে বলতে পার।'
'আসলে তিনটে কারণে গল্পটা তোমাকে শোনাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' বলল রাফেলা। 'এক, আমার ভাইয়ের বিশ্লেষণ মেনে নিয়ে তোমাকে একজন সৎ লোক বলে গ্রহণ করেছি। দুই, যতটুকু জানো বলে স্বীকার করছ তার চেয়ে বেশি জানো তুমি, অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি। তিন, তোমার সাহায্য দরকার আমার। এবার বলি গল্পটা, কেমন?'
'গল্প শুনতে কার না ভাল লাগে।'
'পোগো স্টিক-এর নাম শুনেছ কখনও তুমি?' জানতে চাইল ও।
'কেন শুনব না, বাচ্চাদের একটা খেলনার নাম ওটা।'
'হ্যাঁ, বাচ্চাদের একটা খেলনার নাম। কিন্তু এটা আবার মার্কিন নৌ-বাহিনীর পরীক্ষামূলক একটা ফাইটার এয়ারক্রাফটের কোড নেমও বটে, তাই না? যে-কোন আবহাওয়ায় খাড়াভাবে

টারমাক ত্যাগ করে আকাশে উঠে যাবে এমন একটা ফাইটার এয়ারক্রাফট নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে ওরা।'
'ও, হ্যাঁ-মনে পড়ছে। এ সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম বটে। সিনেটে প্রশ্ন উঠেছিল। বিশদ কিছু মনে নেই।'
'এয়ারক্রাফটটার মান বাড়াবার জন্যে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সিনেট এর বিরোধিতা করে।'
'হ্যাঁ, মনে পড়ছে।'
'দু'বছর আগে আগস্ট মাসে পোগো স্টিক-এর একটা প্রোটোটাইপ ভারত মহাসাগরের রায়ানো এয়ারফোর্স বেস থেকে টেক-অফ করে। এতে ছিল ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য চারটে "কিলার হোয়েল" মিসাইল, প্রতিটি ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার ওঅরহেডে সজ্জিত...'
'ভীতিকর একটা প্যাকেট, সন্দেহ নেই।'
'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রাফেলা। 'সম্পূর্ণ নতুন ধারণার ওপর ভিত্তি করে "কিলার হোয়েল" মিসাইলের ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে। এটা একটা অ্যান্টি-সাবমেরিন ডিভাইস, যার কাজ পানির ওপর ভাসমান বা ডুবো-নৌযান খুঁজে বের করা এবং ধাওয়া করা। আকাশ থেকে নেমে এসে একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে ধ্বংস করতে পারে, আবার প্রয়োজনে পানিতে এক হাজার ফ্যাদম পর্যন্ত নেমে গিয়ে আঘাত করতে পারে শত্রু সাবমেরিনকে।'
'সাংঘাতিক,' আরও দু'ঢোক হুইস্কি খেলাম আমি। গুরুতর বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছি এখন আমরা।
'সে-বছরের ষোলই আগস্টের কথা মনে আছে তোমার-এদিকে ছিলে তখন?'
'ছিলাম, কিন্তু তারপর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। তুমি বরং

মনে করিয়ে দাও সব।'

ছোট্ট দুটো শব্দ উচ্চারণ করল রাফেলা, 'সাইক্লোন সিনথিয়া।'

'গড, অফ কোর্স-সে কি ভোলার কথা!' দ্বীপটাকে প্রচণ্ড এক নাড়া দিয়ে গিয়েছিল সাইক্লোনটা সেবার। ঘন্টায় দেড়শো মাইল ছিল বাতাসের গতিবেগ। আমার এ-বাড়ির চাল উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর গ্র্যাণ্ড হারবার থেকে প্রায় নোঙর ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছিল জলকুমারীকে। ভারত মহাসাগরের এদিকটায় এ ধরনের সাইক্লোন প্রায়ই আঘাত হানে।

'টাইফুনটা হামলা চালাবার কয়েক মিনিট আগে "পোগো স্টিক" রায়ানো এয়ারফোর্স বেস থেকে আকাশে ওঠে। টেক অফ-এর বারো মিনিট পর সিট ইজেক্ট করে বেরিয়ে আসে পাইলট, এবং চারটে নিউক্লিয়ার মিসাইল সহ সাগরে গিয়ে পড়ে প্লেনটা। প্লেনের ফ্লাইট রেকর্ডার প্লেনেই রয়ে যায়। রায়ানো বেস-এর রাডার টাইফুনের হামলায় অচল হয়ে পড়ে, তারা অনুসরণ করছিল না।'

শেষ পর্যন্ত একটা আকার নিচ্ছে বিষয়টা।

'কিন্তু এসবের সাথে নিরোর কি সম্পর্ক?'

হাত নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল রাফেলা। 'থামো,' বলল সে, তারপর আবার নিজের বক্তব্য শুরু করল। 'খোলা বাজারে ওই কার্গোর দাম কি হতে পারে সে-সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে?'

একটু চিন্তা করে বললাম, 'পঁচিশ-ত্রিশ লাখ ডলার হতে পারে।' মুখ থেকে আনুমানিক দামটা বেরিয়ে যাবার পর টনক নড়ল আমার। মাই গড! এ তো মোটা টাকার ব্যাপার স্যাপার! পুরোদমে এক্সারসাইজ চালিয়ে যাচ্ছি, প্রতিদিন আরও শক্তি বাড়ছে শরীরে-সুতরাং সচেতন এবং উৎসাহী হয়ে উঠলাম আমি। 'তারপর?'

আমার উৎসাহ লক্ষ করে একটু হাসল রাফেলা, কিন্তু সেটা বিজয়িনীর হাসি তা চিনতে ভুল হল না আমার।

'ওগুলোর মোট দাম খোলাবাজারে আরও অনেক বেশি,' বলল সে। 'যাই হোক, প্রসঙ্গে ফিরে আসি।'

'সিগারেট?' প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

ওরটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরালাম আমি।

'পোগো স্টিকের টেস্ট পাইলট ইউ. এস. নেভির একজন কমাণ্ডার ছিল, তার নাম উইলিয়াম ব্রাসি। প্লেনটা পঞ্চাশ হাজার ফুট ওপরে থাকতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়, টাইফুনের সীমানা ছাড়িয়ে উঠে যাবার ঠিক আগে। প্লেনটা পড়তে শুরু করলেও সিট ইজেক্ট করেনি উইলিয়াম ব্রাসি। অত্যন্ত দক্ষ এবং বিচক্ষণ পাইলট সে, প্লেনটাকে বাঁচাবার জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু সাগর থেকে পাঁচশো ফুট ওপরে থাকতে সে বুঝতে পারে তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। অগত্যা ইজেক্ট করে সে, এবং প্লেনটাকে পানিতে ডুবে যেতে দেখে।'

আশ্চর্য সতর্কতার সাথে কথা বলছে রাফেলা। প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার এবং নিখুঁতভাবে উচ্চারণ করছে-ওর মুখে যদিও কেমন বেমানান লাগছে শব্দগুলো। মেয়েদের মুখে এ-ধরনের টেকনিক্যাল শব্দ একটু বিদঘুটেই লাগে। কোথাও থেকে শিখেছে এগুলো ও, এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। কার কাছ থেকে? নিরো? নাকি অন্য কেউ?

শোন, রানা, শুনে যাও-নিজেকে বললাম আমি-শোন এবং শেখ। ভবিষ্যতে কাজে দেবে।

'টাইফুন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তিনদিন ভেসে ছিল ব্রাসি, তারপর তাকে একটা উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার দেখতে পেয়ে রাবারের ভেলা থেকে তুলে নেয়। এর মধ্যে চিন্তাভাবনা করার যথেষ্ট সময় পেয়েছিল সে। কার্গোর মূল্য সম্পর্কেও মাথা ঘামায় সে-এবং

একজন কমাণ্ডার হিসেবে তার বেতনের সাথে ওই মূল্যমানের তুলনা করে মন খারাপ হয়ে যায় ওর। ভালভাবে বেঁচে থাকতে হলে প্রচুর টাকা দরকার, সিদ্ধান্ত নেয় সে এবং ঠিক করে কপালগুণে যে সুযোগ সে পেয়েছে সেটাকে কোনমতে হাতছাড়া করবে না। তাই তদন্ত কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় কয়েকটা মূল্যবান তথ্য, যা শুধুমাত্র সে-ই জানত, চেপে যায় সে। তার মধ্যে একটা তথ্য হল, তীরের কোথাও থেকে দেখা যায় সাগরের এমন এক এলাকায় পোগো স্টিক ডুবেছে, এবং প্যারাশ্যুট নিয়ে সাগরে পড়ার আগে নির্দিষ্ট কিছু চিহ্ন দেখে এলাকাটা চিনে রেখেছিল সে।'

রাফেলার গল্পে কোথাও খুঁত বা অসামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছি না। শুনতেও দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে।

'তদন্ত কমিশন দুর্ঘটনাটাকে "পাইলটের গাফিলতি" বলে রায় দেয়, ফলে চাকরি থেকে পদত্যাগ করে ব্রাসি। এই রায়ের ফলে তার ক্যারিয়ার খতম হয়ে যায়। সে সিদ্ধান্ত নেয়, অবসর গ্রহণ করলে যে মোটা টাকা তার প্রাপ্য হত সেটা সে সরকারের কাছ থেকে আদায় করবে এবং তার বিরুদ্ধে গাফিলতির যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেটাও সে মিথ্যে প্রমাণিত করবে। ইউ. এস. নেভিকে তাদের হারানো "কিলার হোয়েল" মিসাইল নগদ টাকা দিয়ে কিনে ফিরিয়ে নিতে এবং ফ্লাইট রেকর্ডারের এভিডেন্স গ্রহণ করতে বাধ্য করবে।'

একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এবারও হাত নেড়ে চুপ করিয়ে দিল আমাকে রাফেলা।

'ইউ. এস. নেভির একটা কাজ করছিল নিরো, তাদের একটা ক্যারিয়ারের খোল ইন্সপেকশন-এইসময় ব্রাসির সাথে পরিচয় হয় তার। পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়, এবং নিরোর সাথে দেখা করার জন্যে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে ব্রাসি। পোগো স্টিক উদ্ধার অভিযানে যে পরিমাণ টাকার দরকার

তা ওদের কাছে ছিল না। তাই একজন আর্থিক সাহায্যকারী খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। কিন্তু এ-ধরনের ব্যাপারে তো আর তাড়াহুড়ো করে কিছু হয় না, কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়াও চলে না। তাই বেশ সময় লাগছিল কাজটায়। এই সময় এম-ফোর-এর হিথরো টার্ন অফের কাছে নিজের থাণ্ডারবার্ড অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যায় ব্রাসি।'

'গোটা ব্যাপারটাই যেন অভিশপ্ত।'

'তুমি ভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস রাখ, রানা?' ভুরু কুঁচকে বিড়ালের মত জ্বলজ্বলে চোখে আমাকে দেখছে রাফেলা।

'একেবারে উড়িয়েও দিই না,' জানালাম ওকে। ওপর-নিচে মাথা দোলাল রাফেলা, যেন তথ্যটা মনে গেঁথে নিল।

এবং তারপর আবার শুরু করল সে, 'ব্রাসি মারা যাবার পর প্রজেক্টটা একা হাতে নেয় নিরো। একজন অংশীদারও জোগাড় করে ফেলে সে। তারা কে, কি পরিচয়-এসব কিছুই আমাকে বলতে চায়নি, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চায় তারা। তাদের সাথেই এখানে এসেছিল নিরো-বাকিটা তুমি জানো।'

'জানি,' মেনে নিলাম আমি, সিল্কের শার্টের ওপর দিয়ে শুকনো অমসৃণ ক্ষতচিহ্নটায় আঙুল বুলালাম, 'শুধু পোগো স্টিক কোথায় ডুবেছে সেটা ছাড়া।'

পরস্পরের দিকে পাঁচ সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম আমরা।

'তোমাকে বলেনি নিরো?' অবশেষে জানতে চাইলাম।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রাফেলা।

'যাই হোক, গল্পটা ইন্টারেস্টিং,' নিঃশব্দে হাসলাম ওর দিকে চেয়ে। 'দুঃখ এইটুকু, যে সত্য-মিথ্যে জানার জন্যে চেক করার কোন উপায় নেই আমাদের।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রাফেলা, দুপদাপ পা ফেলে বারান্দার

রেইলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাত দুটো শক্ত করে বুকের সাথে আড়াআড়িভাবে বেঁধে নিল। এতই রেগে গেছে যে আমার মনে হল লেজ থাকলে ক্রুদ্ধ সিংহীর মত ঝাপটাত সেটাকে।

ও শান্ত হবার অপেক্ষায় আছি আমি। এক সময় কাঁধ ঝাঁকাতে দেখলাম ওকে। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ক্ষীণ একটু হাসল।

'আমার কপালে নেই, কি আর করা! ভেবেছিলাম পুরস্কারের কিছুটা আমারও পাওয়া উচিত। নিরো আমার ভাই-এবং সে তোমাকে বিশ্বাস করেছিল বলেই অনেক আশা নিয়ে অনেক দূরের পথ পেরিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম দু'জন মিলে খেটেপিটে উদ্ধার করব জিনিসটা-কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, পুরো জিনিসটা তুমি একাই যদি ভোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক, কিছুই করার নেই আমার।'

মাথা নেড়ে চুলগুলো পিঠে ছড়িয়ে দিল রাফেলা, ল্যাম্পের আলোয় চক চক করছে সোনা রঙ। উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'চল, তোমাকে পৌঁছে দিই,' বললাম ওকে, ওর কাঁধে হাত রাখলাম একটা।

দুই হাত তুলে দিল রাফেলা আমার ঘাড়ে, আঙুলের খাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে ঘাড়ের পিছনের চুলগুলো আটকে নিল। 'অনেক দূরের ঠিকানা আমার, রানা,' ফিসফিস করে বলল সে। পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে নিচের দিকে টানছে আমার মাথা।

ওর ঠোঁট দুটো ভিজে ভিজে আর খুব নরম, জিভটা অস্থির এবং তৃষ্ণার্ত। একটু পর পিছিয়ে গেল সে, চোখে চোখ রেখে হাসল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠেছে, ঘন ঘন ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে।

'এটা তোমার সম্পূর্ণ ব্যর্থ অভিযান তা নাইবা মনে করলে?' দু'হাত দিয়ে ধরলাম ওকে। শূন্যে তুলে নিতে যাচ্ছি, তার আগেই শরীর ঢিল করে দিল ও। বাচ্চা মেয়ের মত হালকা লাগছে ওকে দু'হাতের ওপর। নিজেকে বঞ্চিত করতে নেই, এ শিক্ষা অনেক

আগেই পেয়েছি আমি, কবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তা কেউ বলতে পারে না।

ভোরের ম্লান আলোয় ওকে দেখে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল আমার। মশারির ভেতর প্রকাণ্ড ডাব্‌ল বেডে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ও। মুখে লেপ্টে গিয়ে বিশ্রী দেখাচ্ছে মেকআপ। মুখ খুলে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু নাক ডাকছে মৃদু। ঝকঝকে সোনালি চুলগুলো বেয়াড়াভাবে ছড়ানো বুনো ঝোপের মত লাগছে। আজ সকালে সাংঘাতিক অশুদ্ধ লাগছে ওকে আমার, তার কারণ সম্ভবত এই যে রাতে আমি জানতে পেরেছি সত্যি সত্যি ছুঁচালো দাঁত আর ধারাল নখর আছে মিস রাফেলার এবং সেগুলো ব্যবহার করার উগ্র একটা উন্মাদনাও আবিষ্কার করেছি তার মধ্যে-সে একটা স্যাডিস্ট, কামার্ত বাঘিনীর চেয়েও স্যাডিস্ট।

নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। তারপর কি মনে করে ঝুঁকে পড়লাম ওর মুখের ওপর। জেমস নিরোর চেহারার সাথে বৃথাই মিল খুঁজছি আমি। নাক, চোখ, কপাল, ঠোঁট, চিবুক-কোথাও কোন মিল নেই। নিঃশব্দে সিধে হয়ে দাঁড়ালাম, পোশাক পরার ঝামেলায় না গিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি ছেড়ে, হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে এলাম সৈকতে।

জোয়ারে ফেঁপে উঠেছে সাগর, ডাইভ দিয়ে ঠাণ্ডা পানির ভেতর দিয়ে অনেক দূর চলে এসে মাথা তুললাম, তারপর অস্ট্রেলিয়ান ক্রল-এর ভঙ্গিতে দ্রুত সাঁতার কেটে এগোতে শুরু করলাম বে-র মুখের দিকে।

আজ সকালে ভাগ্যবান মনে হল নিজেকে, পুরানো দোস্তরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে রীফ-এর ওপারে। বোতলের মত নাক, প্রকাণ্ড শরীর, একদল ডলফিন ওরা। ছুটে আসছে এদিকে, তার মানে দেখতে পেয়েছে আমাকে। স্রোতের ওপর পিঠ তুলে, লম্বা ফিন দিয়ে পানির গাঢ় শরীর চিরে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসছে আমার দিকে।

আমাকে ঘিরে চক্কর মারছে ওরা, শিস দিচ্ছে আর নাক দিয়ে পানি ছুঁড়ছে ফোয়ারার মত। মাথার ওপর এয়ারহোলগুলো খুদে মুখের মত দ্রুত খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, বিশাল মুখে স্থির হয়ে রয়েছে উপচে পড়া আনন্দের বোকা বোকা নিঃশব্দ হাসি।

দশ মিনিট আমার সাথে খুনসুটি করল ওরা, তারপর বিশালদেহী একটা মদ্দা ডলফিন এগিয়ে এসে তার ডরসাল ফিনটা ধরার অনুমতি দিল আমাকে, এবং পিঠে তুলে বেড়াতে নিয়ে চলল। স্লেজে চড়ার মত, কিন্তু আরও উপভোগ্য একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, যা কোনদিন ভোলার নয়। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছে আমার বুক আর মাথায়। অফ-শোর থেকে আধ মাইল দূর পর্যন্ত নিয়ে গেল আমাকে সে, তারপর পানির প্রচণ্ড টানে তার পিঠ থেকে খসে পড়লাম আমি।

লম্বা সাঁতার কেটে অনেক দূর পাড়ি দিয়ে ফিরে আসছি। বুল ডলফিনটা আমাকে মাঝখানে রেখে বৃত্ত রচনা করে ঘুরছে, মাঝেমধ্যে বন্ধুত্বসূচক গুঁতো মারছে কোমরে, আরেকবার বেড়াতে যাবার জন্যে পিঠে চড়তে বলছে। রীফ-এর কাছে শিস দিয়ে বিদায় জানাল ওরা, গর্বিত ভঙ্গিতে দল বেঁধে ফিরে গেল গভীর সাগরে। তীরে পৌঁছে আশ্চর্য সুখী আর স্বাধীন বলে মনে হল নিজেকে। কোথা থেকে যেন অপার একটা আনন্দ এসে ভরিয়ে দিয়েছে আমার অস্তিত্ব। হাতটা একটু ব্যথা করছে, কিন্তু নিরাময় আর শক্তি ফিরে আসার শুভ লক্ষণ এটা।

ফিরে এসে বিছানাটা খালি এবং বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখলাম। সম্ভবত আমার দাড়ি কামাবার রেজার দিয়ে বগলের তলা কামাচ্ছে ও, ভাবলাম আমি। একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, কেননা ব্যক্তিগতভাবে স্বাভাবিক নিয়মের বিচ্যুতি আমার সহ্য হয় না। বাধ্য হয়ে অতিথিদের জন্যে নির্ধারিত শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে গায়ের লবণ ধুয়ে ফেললাম। দাড়ি কামানো হয়নি বলে পরিচ্ছন্ন ভাবটা পুরোপুরি উপভোগ করছি না, এই অবস্থায়

রাক্ষসের খিদে নিয়ে ঢুকলাম কিচেনে। রেফ্রিজারেটর থেকে কচি ভেড়ার মাংস, মাখন, মেইনল্যাণ্ড থেকে আমদানি করা বড় জাতের আম ইত্যাদি বের করলাম। এখনও দেখা নেই রাফেলার। পাইন অ্যাপলের সাথে মাংস ভাজা শেষ করে রুটিতে মাখন লাগাচ্ছি, এই সময় কিচেনে এল ও।

এখন আবার ওকে মোহিনী দেখাচ্ছে। হাতব্যাগে সম্ভবত গোটা একটা কসমেটিক স্টোর ভরে নিয়ে এসেছে ও। চুলের সোনা রঙে চকচকে ভাবও ফিরে এসেছে আবার। হাসিটা উজ্জ্বল, মুক্তোর মত ঝকঝকে। 'গুড মর্নিং, লাভার,' বিলোল কটাক্ষ হেনে এগিয়ে এল সে, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চুমু খেল আমার বন্ধ চোখের পাতার ওপর। বন্ধু ডলফিনদের সান্নিধ্যে পরম তৃপ্তি পেয়েছি আমি এবং মেজাজটা তারপর থেকে প্রসন্ন হয়ে আছে, কিভাবে যেন সেটা ঠিক বুঝে নিয়ে ব্রেকফাস্টের সময় নানান বিচিত্র কিন্তু অশ্লীল রসিকতা করে খুব একচোট হাসাল আমাকে রাফেলা। কফির পট নিয়ে বারান্দায় চলে এলাম আমরা।

'পোগো স্টিক। কখন ওগুলো উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমরা?' হঠাৎ জানতে চাইল রাফেলা।

উত্তর না দিয়ে কড়া কালো আরেক কাপ কফি ঢেলে নিলাম পট থেকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমাকে এক রাত সঙ্গ দিয়ে রাফেলা বার্ড ধরে নিয়েছে আমি তার সারা জীবনের কেনা গোলাম বনে গেছি। শুধু তাই নয়, চারটে কিলার হোয়েল মিসাইল এবং গোপন একটা ফাইটার এয়ারক্রাফটের ফ্লাইট রেকর্ডারের মোট মূল্যের চেয়ে আমার কাছে ওর নিজের মূল্য অনেক বেশি বলে ধরে নিয়েছে।

'হ্যাঁ,' উত্তরে বললাম ওকে, 'পোগো স্টিক। অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে। কখন? কোথায় আছে বলো-এখুনি গিয়ে নিয়ে আসছি আমি।'

হাত বাড়িয়ে আমার কব্জি চেপে ধরল ও। বিড়ালের চোখ দুটো হঠাৎ বড় বড় আর সজীব হয়ে উঠেছে। 'গতরাতের ঘটনাটা একটা পেরেক,' নিচু কণ্ঠস্বর হিস হিস করে উঠল ওর, 'আমাদের দু'জনকে গেঁথে ফেলেছে। বুঝতে পারছি, রানা, মাই ডারলিং, ভবিষ্যৎটা খুব জমবে আমাদের। তুমি আর আমি,' নিচের ঠোঁট জিভের ডগা দিয়ে ভিজাল ও, 'খুব মজা হবে।'

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম আমি, সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি চিন্তাভাবনা করেই। বিগ গাল আইল্যাণ্ডের পানিতে ডোবা সবুজ ক্যানভাস মোড়া প্যাকেটে আর যাই থাক, নিশ্চয়ই গোটা প্লেনটা নেই। হয়ত প্লেনের কোন পার্টস আছে, যা দেখে প্লেনটার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যাবে। প্যাকেটে ফ্লাইট রেকর্ডার বা মিসাইলগুলোর কোন একটা থাকতে পারে না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকলেও ফিউজিলাজ থেকে রেকর্ডারটা সরাতে প্রচুর সময়ের দরকার, অতটা সময় পানির নিচে ছিল না নিরো। এবং প্যাকেটের আকার এবং আকৃতি দেখে বোঝা যায় ওতে কোন মিসাইলও থাকতে পারে না। প্যাকেটটা লম্বা আকৃতির নয়, বরং কিছুটা গোল মত।

জিনিসটা যাই হোক, ওটার ফেস ভ্যালু খুব বেশি হবার সম্ভাবনা কম। ওটা উদ্ধারের জন্যে সাথে করে যদি রাফেলা বার্ডকে নিয়ে যাই, তেমন কোন ক্ষতি দেখি না। আসল রহস্য, আদৌ যদি কোন রহস্য থাকে, গানফায়ার রীফ-এর কাছে রয়েছে-সে-জায়গায় তো আর নিয়ে যাচ্ছি না ওকে।

প্যাকেটটা উদ্ধার করার পর রাফেলা বার্ড ধরে নেবে এখানেই, এই বিগ গাল আইল্যাণ্ডের পানিতেই বিধ্বস্ত হয়েছে প্লেনটা। তখন ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার বিষয় হবে। এটুকুই আমার লাভ।

'রানা, ডারলিং,' আবার ফিসফিস করে বলল ও, ঝুঁকে পড়ল আমার গায়ে, 'প্লীজ। দোহাই, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর। জীবনে

কখনও এতটা উতলা বোধ করিনি। তোমাকে দেখার মুহূর্তেই ফেঁসে গেছি আমি, বুঝতে পেরেছি এতদিন যাকে খুঁজছি তুমিই সেই আদর্শ পুরুষ...'

'ডারলিং...' আবেগে গলা বুজে এল আমার। 'আমিও...' এর বেশি কিছু বলতে হল না। জানতাম, এইটুকুতেই কাজ হবে। নিজের চেয়ার ছেড়ে আমার কোলে চলে এল ও।

'তু-তুমিও? আমাকে দেখার প্রথম মুহূর্তেই? আমারই মত উতলা বোধ করছ?'

দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলাম ওকে। 'ঘরে চল, বিছানায় যাই-তারপর বুঝবে কি বোধ করছি।'

'ডারলিং,' ব্যস্তভাবে প্রতিবাদ করল ও, 'এখন নয়।'

'কেন নয়?'

'এখন আমাদের হাতে অনেক কাজ। পরে অনেক সময় পাব-তখন বিছানা ছেড়ে না উঠলেও কিছু এসে যাবে না।'

চেহারায় হতাশার ভাব ফুটিয়ে কোল থেকে উঠে যেতে দিলাম ওকে। তারপর চুপিসারে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়লাম। প্রচুর ভেড়ার মাংস আর তিন কাপ কফি খাবার পর নিজেকে বন-বিড়ালের হাতে ছেড়ে দিলে হার্টের কিছুটা ক্ষতি তো হতই।

তিন

দুপুরের খানিক পর গ্র্যাণ্ড হারবার ত্যাগ করলাম, দক্ষিণ এবং পুব দিকে যাচ্ছি। মাছ ধরব না, একথা জানিয়ে আমার ক্রুদেরকে একটা দিন ডাঙায় কাটাতে বলেছি।

ককপিট ডেকে পা ফাঁক করে দাঁড়ানো হলুদ বিকিনি পরা রাফেলা বার্ডকে ভুরু কুঁচকে দেখেছে রডরিক, মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে বুলডগের মত চেহারা হয়েছে, কিন্তু কোন মন্তব্য না করেই নেমে গেছে সে। কিন্তু কোটরের ভেতর চোখের মণি দুটোকে চরকির মত পাক খাইয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসেছে ল্যাম্পনি,

তারপর সবজান্তার ঢংয়ে মাথা নেড়ে বলেছে, ‘আনন্দ বিহারে যাওয়া হচ্ছে বুঝি? ভাল, ভাল।’

‘খুব নোংরা মন তোমার,’ চাপা স্বরে বললাম ওকে।

শুনেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাসল সে, যেন প্রচণ্ড প্রশংসা করেছি ওর। জেটি ধরে যখন চলে যাচ্ছে, তখনও শোনা গেছে ওর সেই হাসি।

রীফের ছড়া এবং দ্বীপমালিকার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে জলকুমারী। তিনটের পর লিটল গাল আইল্যাণ্ড এবং বিগ গাল আইল্যাণ্ডের মাঝখানে গভীর পানি-পথে পৌঁছুলাম। প্যাসেজটা ধরে ঘুরে চলে এলাম আমরা বিগ গালের পুব তীর আর মোজাম্বিকের নীল স্রোতের মাঝখানে অগভীর খোলা পানিতে।

প্রচুর জোরাল বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে আছে দিনটা, সাগরের গা থেকে ছোঁ মেরে ছাল তুলে নিয়ে সাদা ফেনায় ভরিয়ে তুলছে চারদিক।

ধীর গতিতে সাবধানে এগোচ্ছি, বিগ গালের দিকে চোখ রেখে সেদিকে সোজা করে রেখেছি বোট। নির্দিষ্ট চিহ্ন মিলে যাবার পরও আর একটু এগিয়ে গেলাম জলকুমারীকে নিয়ে, কেননা বাতাসের ধাক্কায় একটু পিছিয়ে আসবে সে। এরপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দ্রুত ফোরডেকে চলে এলাম নোঙর ফেলার জন্যে।

ঘুরে গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত স্থির হল জলকুমারী।

‘এই জায়গায়?’ বিড়ালের জ্বলজ্বলে চোখে এতক্ষণ আমার প্রতিটি কাজ নিঃশব্দে লক্ষ্য করেছে রাফেলা।

‘হ্যাঁ, এই সেই জায়গা,’ বললাম ওকে, তারপর অন্ধ প্রেমের নমুনা হিসেবে বিয়ারিঙ মার্কগুলো দেখিয়ে দিলাম। বললাম, ‘ওটা বিগ গাল আইল্যাণ্ড। দুটো পাম গাছ দেখতে পাচ্ছ? একটা ঝুঁকে পড়েছে, আর দ্বিতীয়টা ডান দিকে, সোজা দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তরেখার ওপর, দেখতে পাচ্ছ?’

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ও।

‘ওই দুটোর মাঝখানের সরলরেখায় রয়েছি এখন আমরা।’

এবারও কোন কথা বলল না রাফেলা। চোখে অদ্ভুত একটা অন্যমনস্ক কিন্তু স্থির দৃষ্টি, যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে গেঁথে নিচ্ছে তথ্যগুলো।

‘এখন কি করব আমরা?’ হঠাৎ জানতে চাইল ও।

‘ঠিক এইখানে ডাইভ দিয়েছিল নিরো,’ ব্যাখ্যা করছি আমি। ‘পানি থেকে বোটে উঠে এল সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে। ব্ল্যাঙ্ক আর প্যানথারের সাথে চুপিচুপি কথা বলল, সঙ্গে সঙ্গে ওরাও উত্তেজিত হয়ে উঠল। একটা ক্যানভাস আর দড়ি নিয়ে আবার পানিতে নামল নিরো। এবার অনেকক্ষণ পানির নিচে থাকল ও। তারপর যখন উঠে এল, শুরু হল ব্যাপারটা-আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল প্যানথার।’

‘বুঝেছি,’ ব্যস্তভাবে বলল রাফেলা, ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর বিবরণ এতটুকু বিচলিত করছে না ওকে। ‘তাড়াতাড়ি ফিরে যাই চল। এখানে কেউ দেখে ফেলবে আমাদেরকে।’

‘চলে যাব?’ অবাক হলাম আমি। ‘কি বলছ তুমি? কথা ছিল পানিতে নেমে দেখব...’

নিজের ভুলটা বুঝতে পারল রাফেলা। তাড়াতাড়ি বলল, ‘তার আগে ব্যাপারটা সুচারুভাবে গুছিয়ে নেয়া দরকার, রানা। তৈরি হয়ে আবার ফিরে আসব আমরা। জিনিসটা তোলার আর পরিবহনের ভাল বন্দোবস্ত না করে শুধু শুধু পানিতে নেমে লাভ নেই। চল।’

‘কিন্তু,’ নিঃশব্দে হাসছি আমি, ‘এক নজর না দেখে চলে যাবার জন্যে তো এতদূর আসিনি!’

‘শোন, রানা-কাজটা উচিত হচ্ছে না তোমার,’ পেছন থেকে বলল রাফেলা। কিন্তু ইতিমধ্যে ইঞ্জিনরূমের হ্যাচ খুলতে শুরু করে দিয়েছি আমি।

'বলছি তো আরেকবার আসা যাবে,' বুঝতে পারছি অতি কষ্টে রাগ চেপে রেখে শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছে ও আমাকে। 'সবুরে মেওয়া ফলে, জানো না? সবই তো তোমার আর আমার-প্লীজ, একটু ধৈর্য ধর...,' চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছে না ও।

কথাগুলো কান পেতে শুনছি, কিন্তু মানছি না। মই বেয়ে র‍্যাকের কাছে নেমে গেলাম, একজোড়া এয়ার-বটল তুলে নিলাম সেখান থেকে। ব্রিদিং ভালভ ফিট করে নিয়ে রাবারের মাউথ-পীসে মুখ ঠেকিয়ে বাতাস টেনে পরীক্ষা করলাম সিলটা। হ্যাচের ওপর দিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম নিচের দিকে তাকিয়ে নেই ও, তারপর হ্যাচের গায়ের গোপন কুঠরীর দরজা খুলে লুকানো বোতামটা টিপে দিলাম। বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আমি ছাড়া আর কারও পক্ষে এখন আর জলকুমারীর ইঞ্জিন স্টার্ট করা সম্ভব নয়।

ডাইভিং বোর্ডটা ঠেলে স্টার্নের কাছে বোটের বাইরে বের করে দিলাম, পানির ওপর ঝুলে থাকল সেটা। তারপর ককপিটে দাঁড়িয়ে পোশাক পরে নিলাম। ওয়েট স্যুট আর হুড, ওয়েট বেল্ট আর নাইফ, ফেস প্লেট আর ফিন। পিঠে এয়ার বটল জোড়া বেঁধে নিয়ে এক কয়েল হালকা নাইলন রোপ বেল্টের হুকে লটকে নিলাম।

'তুমি ফিরে না আসলে কি হবে?' গম্ভীরভাবে জানতে চাইল রাফেলা। 'মানে, আমার কি হবে?'

'সম্ভবত মৃত্যু হবে,' বলে ডাইভিং বোর্ডের ওপর দিয়ে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে গেলাম, লাফ দিয়ে পড়লাম পানিতে।

স্বচ্ছ কাঁচের মত পানি, কোথাও বাধা না পেয়ে একেবারে নিচে পর্যন্ত পৌঁছেচে আলো। পঞ্চাশ ফুট নিচে তলাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

অপূর্ব সুন্দর একটা প্রবালের জগৎ এটা। চোখ জুড়ানো নানান বিচিত্র রঙের ওপর স্পটলাইটের মত আলো পড়ে ঝলমল

করছে চারদিক। ভাস্কর্য শিল্পীর বিচিত্র শিল্পকর্মের আশ্চর্য আকার এবং আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রবাল খণ্ডগুলো, সেগুলোর ওপর কুয়াশা রঙের গাঢ় শ্যাওলা জমেছে, গায়ে ঝলমলে নকশা আর অলঙ্কার নিয়ে ঝাঁক ঝাঁক ট্রপিক্যাল মাছ চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গভীর খাদ এবং অনেক উঁচু আর একেবারে খাড়া প্রবালের স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছি, মাঝখানে রয়েছে সাপের মত লম্বা ঘাসে ঢাকা মাঠ, চোখ ধাঁধানো সাদা প্রবাল বালির বিস্তৃতি।

রক্ত ঝরে গিয়ে শরীর দুর্বল এবং দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিয়ারিঙ চিহ্নগুলো নিখুঁতভাবেই নিতে পেরেছিলাম আমি, আজ তার প্রমাণ পেলাম সবুজ ক্যানভাসে মোড়া প্যাকেটটার একেবারে গা ঘেঁষে নোঙরটা ফেলতে পেরেছি দেখে। উন্মুক্ত প্রবাল বালির ছোট্ট একটা বিস্তৃতির মাঝখানে পড়ে রয়েছে সেটা, সবুজ আর বেঢপ, ভয়ালদর্শন একটা সামুদ্রিক জন্তু যেন, অক্টোপাসের শুঁড়ের মত পানিতে ভাসছে খোলা দড়িগুলো।

হাঁটু গেড়ে ওটার পাশে বসলাম আমি। সোনালি আর কালো জেব্রার টানা দাগ গায়ে নিয়ে খুদে মাছের ঝাঁক মৌমাছির মত চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল আমাকে, কাজে হাত লাগাবার আগে বুদ বুদ ছুঁড়ে ভাগিয়ে দিলাম ওদেরকে।

বেল্ট থেকে নাইলনের রশিটা নামালাম। একটা প্রান্ত দিয়ে প্যাকেটটাকে শক্ত করে বেঁধে রশি ছাড়তে ছাড়তে উঠতে শুরু করলাম ওপর দিকে। জলকুমারীর পেছন দিকে ত্রিশ ফুট দূরে পানির ওপর মাথা তুললাম আমি, সাঁতরে মইয়ের কাছে পৌঁছুলাম, তারপর উঠে পড়লাম ককপিটে। রশির দ্বিতীয় প্রান্তটা বাঁধলাম ফাইটিং চেয়ারের একটা পায়ার সাথে।

'কি পেয়েছ তুমি?' ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইল রাফেলা।

'এখনও জানি না,' বললাম ওকে। পানির নিচে প্যাকেটটা খুলে ভেতরে কি আছে দেখার প্রচণ্ড একটা কৌতূহল হয়েছিল আমার, কিন্তু অতি কষ্টে সেটাকে দমন করেছি। ক্যানভাস খোলার

পর রাফেলার প্রতিক্রিয়াটা পরখ করতে চাই আমি।

ডাইভিং গিয়ার খুলে নির্মল পানি দিয়ে সেগুলো ধুচ্ছি আমি। ধোয়ামোছার পর যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে দিলাম। এভাবে সময় কাটাবার একটাই কারণ, আমি চাইছি উদ্বেগ আর উত্তেজনা আর একটু ক্ষতবিক্ষত করুক রাফেলাকে।

'দুত্তোরি ছাই! কি পেয়েছ তুমি? আগে ওটা তুলতে কি হয়েছে?' অবশেষে রাগে ফেটে পড়ল ও।

মনে পড়ল পাহাড়ের মত ভারী লেগেছিল প্যাকেটটা, একটু নাড়তেই হিমশিম খেতে হয়েছিল আমাকে-তবে তখন শরীরে শক্তি বলতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এখন আমি গানেল আলিঙ্গন করে রশি টেনে তোলার সময় জিনিসটার ওজন অনুভব করছি-ভারী বটে কিন্তু টেনে তুলতে পারছি। উঠে আসা ভিজে রশি কজি খেলিয়ে কাঁধে ফেলে নিয়ে সাজিয়ে রাখছি কয়েল করে।

বোটের পাশে পানির ওপর উঠে এল সবুজ ক্যানভাস, ঝুঁকে পড়ে রশির গিঁটটা শক্ত করে ধরলাম, তারপর এক টানে বোটের ওপর তুলে এনে ছেড়ে দিলাম ককপিটের ডেকে। কাঠের ওপর ভারী ধাতব বস্তু পতনের ঘটাং আওয়াজ হল।

'খোলো এবার,' অস্থির কণ্ঠে হুকুম করল রাফেলা।

'আজ্ঞে, মাদামোয়াজেল, এক্ষুনি খুলছি,' নিঃশব্দে হেসে বেল্টের খোপ থেকে আমার বেইট-নাইফটা টেনে নিলাম। ক্ষুরের মত ধারালো এটার ফলা, একটা করে পোঁচ দিয়ে প্রতিটি রশি কেটে দিলাম।

ব্যগ্রভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে রাফেলা। আমি যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি সেদিকে পর্যন্ত খেয়াল নেই ওর। সবুজ ক্যানভাসটা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু চোখ ফেরাচ্ছি না ওর মুখের ওপর থেকে। স্বভাবতই আমার চেয়ে আগে দেখতে পেল জিনিসটা ও। সেটাকে চিনতে পেরেই লোভে চকচক করে

উঠল চোখ দুটো, অদ্ভুত এক তৃপ্তিতে দ্রুত ঢোক গিলল পর পর দু'বার-পরিষ্কার বুঝলাম, জিনিসটা যাই হোক, এটা দেখতে পাবার আশাতেই উন্মুখ হয়ে ছিল ও। কিন্তু দু'সেকেণ্ড পরই চোখ আর মুখে দ্রুত একটা হতাশার ভাব ফুটিয়ে তুলল।

অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে বদলে ফেলেছে রাফেলা তার মুখের ভাব, মনে মনে স্বীকার করলাম, দুর্লভ অভিনয় ক্ষমতার অধিকারিণী সে। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে না থাকলে আবেগের এই এক পলকের খেলা থেকে বঞ্চিত হতাম আমি।

চোখ নামিয়ে জিনিসটার দিকে তাকালাম। পরমুহূর্তে বিস্ময়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম, সেই সাথে হতাশায় ছেয়ে গেল মন। যা আশা করেছিলাম তার ধারে কাছের কিছুই নয় জিনিসটা। স্তম্ভিত হয়ে ভাবছি, কি আশ্চর্য, এই নিরীহ দর্শন ঘন্টার জন্যে এতগুলো লোক খুন হয়েছে!

প্লেনের কোন পার্টস নয়, জিনিসটা একটা জাহাজের ঘন্টা। ব্রোঞ্জের তৈরি, গায়ে গভীরভাবে খোদাই করা কারুকাজ, কিন্তু শরীরের অর্ধেকটার ছাল কিসে যেন কুরে খেয়ে ফেলেছে। ওপরের অর্ধেকটা যাকে তাই আছে, তবে সবুজ মরচের মোটা স্তর জমেছে গায়ে। চেইনের গিঁটগুলোয় এবং মাথার ওপরের মুকুটে খোদাই করা অলংকৃত নকশা মরচের নিচে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে-লতাপাতা এবং ফুলের আকৃতি নিয়ে আঁকাবাঁকা খোদাই করা লিপিমালা, সেগুলো অনিয়মিত রেখা ধরে কুরে নেয়া হয়েছে, নিচে দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল ধাতু। ওপরের দিকটা গম্বুজের মত, তার ওপর মুকুটটা। নিচের দিকটা ছড়ানো, চওড়া। একশো পাউণ্ডের কম হবে না বেলটার ওজন।

গড়িয়ে উল্টো করে দিলাম ওটাকে। প্রকাণ্ড জিভটায় শক্ত মরচে ধরেছে, এবং নানা জাতের শেলফিশ নোংরা করে গেছে গম্বুজের ভেতর দিকটা। বাইরের দিকের ক্ষয় এবং কুরে খাওয়ার ভঙ্গি দেখে অস্বস্তি বোধ করছি, এই সময় হঠাৎ রহস্যটা বুঝতে

পারলাম। দীর্ঘদিন পানিতে ডোবা ধাতব বস্তু এর আগেও দেখেছি আমি। পানির নিচে বালির তলায় বেল-এর অর্ধেকটা গেঁথে ছিল, তাই অক্ষত আছে ব্রোঞ্জ, শুধু মরচে ধরেছে গায়ে। বাকি অর্ধেকটা ছিল বালির ওপর-গানফায়ার ব্রেক-এর তীব্র স্রোতের তোড় এবং সূক্ষ্ম প্রবাল কণার অবিরাম বিদ্যুৎগতি আক্রমণে ব্রোঞ্জের এক ইঞ্চির সিকি ভাগ ছাল ক্ষয়ে গেছে। যাই হোক, বালির নিচে ঢুকে যাওয়া অংশটা অক্ষত আছে, কয়েকটা অক্ষর পড়াও যাচ্ছে পরিষ্কার। মন দিয়ে লক্ষ করছি সেগুলো।

গগূী

প্রথম অক্ষর দুটো গ, নাকি ভাঙা একটা ঘ-ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এর পাশেই রয়েছে নিখুঁত একটা ূ-তারপর একটু ফাঁক রেখে গোটা ী অক্ষরটা দেখতে পাচ্ছি। পরবর্তী সমস্ত অক্ষর ক্ষয়ে গেছে, চেনার কোন উপায় নেই।

ব্যারেলের উল্টোদিকের ধাতব শরীরে খোদাই করা প্রতীক চিহ্নটা অত্যন্ত জটিল একটা ডিজাইন, কালের আঁচড়ে তাও ঝাপসা হয়ে গেছে। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো হিংস্র পশু-সম্ভবত সিংহ-সামনের দুটো পা ব্যবহার করছে হাতের মত, তা দিয়ে ধরে রয়েছে একটা শিল্ড এবং একটা মেইল্ড হেড।

আবছাভাবে মনে হচ্ছে এর আগে কোথায় যেন দেখেছি এই প্রতীক চিহ্নটা, কিন্তু স্মরণ করতে পারছি না।

ইতিমধ্যে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে রাফেলা। আমিও দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তাকালাম। 'মজার ব্যাপার, তাই না?' নিঃশব্দে হাসছি। একটা জেট প্লেনের নাকে ঝুলছে মস্ত একটা ব্রোঞ্জের ঘন্টা-দৃশ্যটা কল্পনা করতে পার?'

'এর আমি কিছুই বুঝছি না,' বলল ও।

'আমিও কি ছাই কিছু বুঝতে পারছি?' সেলুনে ঢুকে একটা চুরুট নিয়ে ফিরে এলাম আবার, সেটা ধরিয়ে বসলাম ফাইটিং

চেয়ারে।

'তবু-এর বিষয়ে তোমার ধারণাটা কি জানতে চাই আমি।'

'কিসের ধারণা, রানা? কিছুই বুঝছি না আমি। বিশ্বাস করো।'

'এসো, অনুমান করা যাক,' প্রস্তাব দিলাম ওকে। 'আমিই শুরু করছি প্রথমে।'

মুখ ফিরিয়ে নিল রাফেলা, রেইলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চমৎকার নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে তুলেছে চেহারায়।

'তুমি ভুল করেছ। পাইলট ব্রাসি কোন ফাইটার প্লেন চালাচ্ছিল না,' হেসে উঠলাম আমি, 'চালাচ্ছিল একটা ডানাওয়ালা পেঁপে। মন্তব্য করো?'

আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল রাফেলা। 'রানা, আমি সুস্থ বোধ করছি না। হঠাৎ মাথাব্যথা শুরু হয়েছে, বমি বমি ভাব...'

'কি করব তাহলে এখন আমরা?'

'চল, ফিরে যাই।'

'আরেকটা ডাইভ দেব কিনা ভাবছি-ঘুরেফিরে দেখি আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

'না,' দ্রুত বলল ও। 'প্লীজ, এখন নয়। বিশ্বাস করো, একটুও উৎসাহ লাগছে না। চল, ফেরা যাক। দরকার হলে ফিরে আসতে পারব আবার।'

'ঠিক আছে!' রাজি হলাম ওর কথায়। আরেকবার ডাইভ দিয়ে লাভ নেই কোন-কিন্তু তা শুধু আমি জানি। 'চল, ফিরে যাই। তারপর বাড়িতে বসে এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে।'

চেয়ার ছেড়ে বেলটাকে আবার ক্যানভাস দিয়ে মুড়তে শুরু করলাম।

'এ কি! কি করছ আবার?' উদ্বিগ্নস্বরে জানতে চাইল ও।

'আর যাই করি, সেন্ট মেরীর বাজারে এটাকে নিয়ে গিয়ে লোক হাসাতে রাজি নই আমি। তুমিই তো বললে ইচ্ছে হলেই

ফিরে আসতে পারব এখানে আবার। তাই সাগরের কাছেই জমা রেখে যাচ্ছি এটাকে।'

'তা ঠিক,' একমত হল রাফেলা আমার সাথে। 'ঠিক বলেছ তুমি।'

ঘন্টাটা পানিতে ফেলে দিয়ে নোঙর তুলতে গেলাম আমি।

গ্র্যাণ্ড হারবারে ফেরার সময় ব্রিজে রাফেলার উপস্থিতি অস্বস্তিকর লাগছে আমার। একাকী গভীরভাবে চিন্তা করতে চাইছি আমি। কিভাবে ওকে নিচে পাঠানো যায় তাই ভাবছি।

একটু পর বললাম, 'কফি হলে মন্দ হত না। পারবে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হল ও। এবং বিদায় নিল।

কিন্তু দু'মিনিট পরই আবার ফিরে এল ব্রিজে। বলল, 'স্টোভ জ্বলছে না।'

'আগে মেইন গ্যাস সিলিণ্ডার খুলতে হবে তোমাকে,' ট্যাপগুলো কোথায় বলে দিলাম ওকে। 'কাজ শেষ করে ওগুলো বন্ধ করতে ভুলো না যেন আবার, তা নাহলে গোটা বোট একটা গ্যাস বোমা হয়ে যাবে।'

ওর তৈরি কফি বিস্বাদ লাগল মুখে।

গ্র্যাণ্ড হারবারে ফিরতে সন্ধ্যা উতরে গেল। জেটি থেকে অনেকটা দূরে নোঙর ফেললাম জলকুমারীর। ডিঙি নৌকায় চড়ে ফিরে এলাম জেটিতে। রাফেলাকে পিকআপে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিলাম হিলটনের গেট পর্যন্ত। ভেবেছিলাম গলা ভেজাবার জন্যে নিজের কামরায় নিয়ে যাবে আমাকে, কিন্তু ওর তরফ থেকে কোন অনুরোধ এল না। তবে আমার ঠোঁট ভিজিয়ে দিল চুমু খেয়ে। 'ডারলিং, আজ রাতটা একা থাকতে দাও আমাকে। ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছি। এখন গিয়ে বিছানায় উঠব। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে দাও আমাকে, তারপর যখন সুস্থ বোধ করব দু'জন মিলে গুছিয়ে প্ল্যান-প্রোগাম করা যাবে।'

'এখান থেকে তুলে নেব তোমাকে-কখন, বলো?'

'না,' বলল ও। 'বোটে দেখা করব তোমার সাথে আমি। সকালে। আটটার সময়। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তুমি বোটে। একা। শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়-কেমন?'

'আটটার সময় জেটিতে নিয়ে আসব জলকুমারীকে,' জানালাম ওকে।

ফেরার পথে গলা ভেজাবার তাগিদ অনুভব করলাম। লর্ড নেলসনের সামনে পিকআপ থামিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

সমবয়েসী একদল ছেলেমেয়েকে নিয়ে ল্যাম্পনি আর জুডিথ মহা শোরগোল জুড়ে দিয়েছে একটা বুথে। 'শালা বস্! এদিকে পায়ের ধুলো ফেলতে মর্জি হোক!' চেঁচিয়ে উঠল ল্যাম্পনি। আর জুডিথ তার চুলের বেণী দুলিয়ে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল দু'হাত দিয়ে। 'মিস্টার রানা, আজ আমরা আপনাকে খুব খাতির করব! কেন, তা একটু পরই জানতে পারবেন।'

বুথের ভেতর টেনে নিয়ে গিয়ে ল্যাম্পনির পাশে বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল সে আমাকে, কিন্তু বাদ সাধল ল্যাম্পনি। 'শালা বসকে মেয়েদের মাঝখানে বসাও।'

দুই দ্বীপবাসিনী মেয়ের মাঝখানে বসলাম আমি। সবার জন্যে এক পাইন্ট করে পানীয় আনালাম। 'কি ব্যাপার, জুডিথ?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে জুডিথ নয়, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ল্যাম্পনি। 'হেই স্কিপার, পিকআপটা আজ রাতে তোমার লাগছে নাকি?'

'লাগছে,' বললাম আমি। 'ও-ই তো আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।' কি বলতে যাচ্ছে ল্যাম্পনি, পরিষ্কার অনুমান করতে পারছি। ও সব-সময় এমন ভাব দেখায় যেন গাড়িটায় ওর ভাগ আছে।

'সাউথ পয়েন্টে আজ রাতে বিরাট উৎসব আছে, বস্,' হঠাৎ বসের আগে শালাটাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে ল্যাম্পনি, অত্যন্ত সম্মানের সাথে স্কিপার, বস্, স্যার ইত্যাদি সম্বোধন উচ্চারণ

করছে সে। 'টার্টেল বে-র কাছে তোমাকে যদি পৌঁছে দিই, অনায়াসে রাতের জন্যে ট্রাকটা ব্যবহার করতে পারি আমরা, স্যার। প্রতিজ্ঞা করছি কাল সকালে বাড়ি থেকে তুলে নেব তোমাকে, বস্।'

গ্লাসে শেষ চুমুক দিলাম আমি। ওরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'বিরাট একটা পার্টি, মিস্টার রানা,' বলল জুডিথ। 'যেতে না পারলে আফসোস থেকে যাবে,' আবেদনের প্রলম্বিত স্বরে বলল সে, 'প্লী-ই-জ!'

'সকাল সাতটায় তুলে নেবে আমাকে, শুনতে পাচ্ছ, ল্যাম্পনি?'

একসাথে হেসে উঠল ওরা সবাই। তারপর আমাকে এক পাইন্ট খাওয়াবার জন্যে চাঁদা তুলতে শুরু করল।

ভাল ঘুম হল না রাতে। কয়েকবার জেগে উঠলাম, ঘুমের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা অস্থিরতা অনুভব করলাম এবং স্বপ্ন দেখলাম বার দুয়েক। আমি যেন পানিতে ডুব দিয়ে তুলে নিয়ে এসেছি সবুজ ক্যানভাসে মোড়া প্যাকেটটা, সেটা খুলতেই বেরিয়ে এল রাফেলা, সে আমাকে একটা জেট ফাইটার এয়ারক্রাফট দিল, কিন্তু হাতে নিতেই প্লেনটা একটা সবুজ পেঁপে হয়ে গেল। পেঁপের গায়ে তামাটে আঁচড়ের দাগ, ভাল করে লক্ষ করতেই অক্ষরগুলো চিনতে পারলাম আমিঃ

গগ্ী

মাঝরাতের পর তুমুল বৃষ্টি এল, সেই সাথে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। বিদ্যুতের আলোয় বৃষ্টির পর্দার ওপারে পাম গাছের মাথা আর সৈকত দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। ভোরে যখন সৈকতে এলাম তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বড় বড় ফোঁটাগুলো উদোম শরীরে লেগে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ম্লান আলোয়

কালো দেখাচ্ছে সাগরটাকে, তাকিয়ে দেখি সেই দূর দিগন্তরেখা পর্যন্ত ঝরছে বৃষ্টির ধারা। সাগরকে আলিঙ্গন করে অনেক দূর পর্যন্ত গেলাম আমি-একা। রীফ ছাড়িয়ে আরও বহু দূর পর্যন্ত সাঁতার কাটলাম, তারপর ফিরে এলাম ধীরে ধীরে। অন্যান্যদিন এই পরিশ্রমের ফলে শরীর তাজা হয়ে ওঠে, আশ্চর্য একটা স্ফূর্তি আর উদ্যম অনুভব করি-আজ তা হল না। নীল হয়ে গেছে শরীর, ঠাণ্ডায় কাঁপছি। অস্বস্তি এবং অনিশ্চয়তার একটা ভারী চাপ দমিয়ে রেখেছে আমাকে।

ব্রেকফাস্ট শেষ করেছি, এই সময় কাদা ছড়াতে ছড়াতে এসে পৌঁছুল পিক-আপটা। এখনও জ্বলছে হেডলাইট দুটো। 'হেই, শালা বস্, তুমি রেডি?' গাড়ির ভেতর থেকে হাঁক ছাড়ল ল্যাম্পনি।

তালপাতার টোপা মাথায় দিয়ে বৃষ্টিতে নামলাম, গাড়িতে উঠে সেটাকে ঝুলিয়ে দিলাম বাগানের গেটের গায়ে। ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে ল্যাম্পনির মুখ থেকে, অকারণে হাসছে সে, চোখ দুটো এখনও একটু ঝাপসা।

'আমি চালাব,' ওকে বললাম।

দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দিকে যাবার পথে গতরাতের পার্টি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিতে শুরু করল ল্যাম্পনি। ও যা বলল তার পঞ্চাশ ভাগও যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে নয় মাস পর সেন্ট মেরী দ্বীপে মহামারির আকারে সদ্যোজাত শিশুর প্রকোপ দেখা দেবে।

অন্যমনস্কভাবে শুনছি ওর কথা। অদ্ভুত সেই অস্বস্তি আর খুঁতখুঁতে ভাবটা শহরে ঢুকে আরও যেন বেড়ে গেছে আমার মধ্যে।

'হেই, বস্, ছেলেমেয়েরা পিকআপ ধার দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিতে বলেছে তোমাকে...'

'ঠিক আছে, ল্যাম্পনি।'

‘জুডিথকে আমি জলকুমারীতে পাঠিয়ে দিয়েছি, বস্। সব গোছগাছ করে রাখবে ও। তোমার জন্যে কফিও তৈরি করে রাখবে।’

‘তার কি দরকার ছিল?’

‘ও নিজেই আগ্রহ দেখাল। গাড়িটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছিল কিনা। বলল, তোমার বসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দরকার।’

‘ও খুব ভাল মেয়ে,’ অন্তর থেকে বললাম আমি।

‘ভালবাসি, খুব ভালবাসি ওকে,’ বলেই গান ধরল ল্যাম্পনি, ‘আই লাভ দ্যাট গার্ল...’

পাহাড় সারি পেরিয়ে উপত্যকায় নামার সময় হঠাৎ প্রচণ্ড একটা কৌতূহলে আক্রান্ত হলাম আমি। সোজা ফ্রবিশার স্ট্রীটে নেমে বন্দরের দিকে যাবার কথা, কিন্তু তা না গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে পাক খেয়ে উঠে যাওয়া রাস্তাটা ধরলাম। দুর্গ আর হাসপাতাল ছাড়িয়ে পাহাড় ঘেরা চৌরাস্তায় পৌঁছুলাম, ওখান থেকে হিলটনের দিকে। গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে রিসেপশনে ঢুকলাম। এত সকালে কেউ নেই কোথাও, কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে তাকালাম টেলিফোনরূমে। সুইচবোর্ডের সামনে বসে আছে মারিয়া।

আমাকে দেখে হাসল ও। এয়ারফোন দুটো কান থেকে নামিয়ে দ্রুত চলে এল কাউন্টারের সামনে। ‘হ্যালো, মিস্টার রানা।’

‘হ্যালো মারিয়া, মিস রাফেলা তার কামরায় আছেন কিনা জানো?’

মুখের ভাব বদলে গেল মারিয়ার। ‘উনি তো এক ঘন্টা আগে চলে গেছেন, মিস্টার রানা।’

‘চলে গেছেন?’ মারিয়ার মুখের ওপর স্থির হয়ে গেল আমার দৃষ্টি।

‘হ্যাঁ। হোটেলের বাস ওকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে এয়ারপোর্টে। সাড়ে সাতটার প্লেন ধরার কথা ওর।’ সস্তা দামের জাপানী রিস্টওয়াচটা চোখের সামনে তুলল মারিয়া। ‘দশ মিনিট আগে টেক-অফ করেছে প্লেন।’

হতভম্ব হয়ে গেছি। এভাবে চলে যাবে রাফেলা তা আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এর কোন অর্থই বুঝলাম না, তারপর হঠাৎ করেই ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার বুক। ভয়ে কুঁকড়ে উঠল কলজেটা।

‘ওহ্, মাই গড!’ নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলাম আমি। ‘জুডিথ!’ মারিয়ার হতভম্ব চেহারার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এলাম হোটেলের বাইরে।

আমাকে দেখেই গান থেমে গেল ল্যাম্পনির কণ্ঠে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। গাড়ির খোলা দরজার দিকে লাফ দিলাম আমি, ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিলাম ইঞ্জিনে। পা দিয়ে পেডাল চেপে রেখে বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে বাঁক নিলাম।

‘কি ব্যাপার, বস্?’ তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে আমাকে ল্যাম্পনি।

‘জুডিথ?’ জানতে চাইলাম গম্ভীরভাবে। ‘কখন ওকে বোটে পাঠিয়েছ-কতক্ষণ আগে?’

‘ওকে বোটে যাবার কথা বলে তোমাকে তুলে আনতে গিয়েছিলাম। কেন, বস্?’

‘তুমি চলে আসার পরপরই কি রওনা হবার কথা ওর?’

‘না। গোসল করে তারপর রওনা হবার কথা।’ কিছুই চেপে রাখছে না ল্যাম্পনি। রাতে একসাথে শুয়েছে ওরা, অন্য সময় হলে এ-খবরটা আমার কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করত। পরিস্থিতিটা গুরুত্বপূর্ণ, এটুকু বুঝতে পারছে ও। ‘ফার্ম থেকে রওনা দিয়ে উপত্যকা পেরোবার জন্যে হাঁটতে হবে।’ ঝর্নার ধারে একটা গৃহস্থ পরিবারে লজিং থাকে ল্যাম্পনি। ঝর্না থেকে বন্দর

হাঁটা পথে তিন মাইল।

'খোদা, সময় থাকতে যেন পৌঁছুতে পারি!' ফিসফিস করে বললাম। রাস্তা ধরে ঝড়ের বেগে উঠে যাচ্ছে পিকআপ। চৌরাস্তার কাছে বাঁক নেবার সময় এক দিকে সাংঘাতিক কাত হয়ে পড়ল গাড়ি, মুহূর্তের জন্যে মনে হল উল্টে যাচ্ছি আমরা।

'হয়েছেটা কি, বস্?' আরেকবার জানতে চাইল ল্যাম্পনি।

বাঁক নেয়া শেষ করে সিধে করলাম গাড়ি। শহরের মাথার ওপর থেকে গোল চক্কর খাওয়া রাস্তা ধরে সগর্জনে ধেয়ে নামার সময় ওকে বললাম, 'জুডিথ বোটে উঠলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। যেভাবে হোক বাধা দিতে হবে ওকে।'

আর কোন প্রশ্ন তুলে আমার মনোযোগ নষ্ট করল না ল্যাম্পনি। দীর্ঘদিন আমার সাথে থেকে কখন চুপ করে থাকতে হয় এবং কখন আমার নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হয় সে-বুদ্ধি অর্জন করেছে ও।

দুর্গ ছাড়িয়ে এসে গ্র্যাণ্ড হারবারের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি আমরা। দূর ব্যবধানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দ্বীপের অন্যান্য বোটের মাঝখানে এখনও নোঙর ফেলা অবস্থায় ভাসছে জলকুমারী। এবং জেটির মাথা থেকে ডিঙি নৌকো নিয়ে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে জুডিথ। এতদূর থেকেও নৌকোর গলুইয়ে বসা নারী মূর্তিটাকে পরিষ্কার চিনতে পারছি আমি। দৃঢ় এবং ছন্দবদ্ধভাবে বৈঠা চালাচ্ছে জুডিথ। দ্বীপের মেয়ে সে, একজন পুরুষ মানুষের মতই বৈঠা বায়।

'ফেরানো যাবে না ওকে,' বলল ল্যাম্পনি। 'আমরা জেটিতে পৌঁছুবার আগেই বোটে উঠে যাবে ও।'

ফ্রবিশার স্ট্রীটের মাথায় পৌঁছে হর্নের বোতামে বাঁ হাতের তালু চেপে ধরলাম। কিন্তু যতই হর্ন বাজাই, রাস্তা পরিষ্কার করা অসম্ভব। আজ শনিবার, অর্থাৎ হাটবার। গ্রামবাসীরা গরুর গাড়ি আর ঠেলাগাড়ি নিয়ে নেমে এসেছে রাস্তায়। ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে

দিতে জটলার মধ্যে দিয়ে ধীর গতিতে এগোচ্ছি। জেটি পর্যন্ত আধমাইল পেরোতে মূল্যবান তিনটে মিনিট খোয়ালাম আমরা।

জলকুমারীর গায়ে নৌকো বেঁধেছে জুডিথ। মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে সে। পরনে ওর এমারেল্ড গ্রীন রঙের শার্ট আর আঁটো ডেনিম প্যান্ট। সদ্য স্নান করেছে ও, ভিজে কালো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে পিঠে। অকস্মাৎ ব্রেক কষে পাইন অ্যাপল শেডের পাশে দাঁড় করালাম গাড়ি। তারপর আমি আর ল্যাম্পনি প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম জেটির দিকে।

'জুডিথ!' চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, নিজের গলার স্বরে আতঙ্কের রেশ অনুভব করে গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল আমার। কিন্তু চিৎকারটা বন্দরের ওপার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল না।

পেছন দিকে না তাকিয়ে জলকুমারীর সেলুনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল জুডিথ। উন্মাদের মত চিৎকার করছি আমরা, প্রাণপণে দৌড়ে পৌঁছে গেছি জেটির শেষ মাথায়। বাতাস ঝাপটা মারছে আমাদের মুখে, চিৎকারের আওয়াজ উল্টোমুখো বাতাসে বাধা পেয়ে পাঁচশো গজ দূরের জলকুমারী পর্যন্ত পৌঁচাচ্ছে না।

'ওখানে একটা নৌকো!' আমার কাঁধ খামচে ধরে টান মারল ল্যাম্পনি।

পাথরের বাঁধের গায়ে একটা রিঙের সাথে চেইন দিয়ে বাঁধা ডিঙি নৌকোটার দিকে ছুটলাম আমরা। আট ফুট উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম গলুইয়ের ওপর দুটো ভারী বস্তার মত। চেইনটার দিকে ডাইভ দিলাম আমি। কাঠের উঁচু-নিচু পাটাতনের সাথে ঘষা খেয়ে বুকের ছাল উঠে গেল খানিকটা। সিকি ইঞ্চি মোটা স্টীলের চেইন, রিঙের সাথে ভারী একটা তালা দিয়ে আটকানো।

চেইনটা দুই প্যাঁচ জড়িয়ে নিলাম কব্জিতে, বাঁধের গায়ে পা রাখলাম একটা তারপর সবটুকু শক্তি দিয়ে হ্যাঁচকা টান মারলাম। তালাটা ভেঙে যেতেই পেছন দিকে ডিঙির তলায় পড়ে গেলাম।

রো-লকে ইতিমধ্যে বৈঠা ঢুকিয়ে দিয়েছে ল্যাম্পনি।

‘বাও!’ গলার রগগুলো চামড়ার ওপর ফুলে উঠল আমার, বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে বললাম ওকে, ‘যত জোরে পার বৈঠা বাও, ল্যাম্পনি!’ জলকুমারীর দিকে তাকালাম, কালো মেঘের নিচে ভীতিকর দুঃস্বপ্নের মত লাগছে ওটাকে।

বো-তে দাঁড়িয়ে হাত দুটোকে চোঙের মত করে মুখের সামনে তুলে ধরেছি আমি, নাম ধরে ডাকছি জুডিথকে, চেষ্টা করছি বাতাসের বাধা ভেদ করে চিৎকারটাকে জলকুমারী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।

একাগ্রচিত্তে পাগলের মত বৈঠা চালাচ্ছে ল্যাম্পনি। ঝপাৎ করে পড়ছে বৈঠা পানিতে, পানি কাটার সময় গলুইয়ের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ছে সে, পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত উঠে বসে ঝুঁকে পড়ছে সামনের দিকে। হাপরের মত শব্দ করে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে তার নাক দিয়ে প্রতিবার বৈঠা ফেলার সময়।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছি, এইসময় ঘিরে ফেলল আমাদেরকে আরেক দফা তুমুল বৃষ্টি। মুখে আঘাত করছে বড় বড় ফোঁটা, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছি জলকুমারীর দিকে।

ধূসর বৃষ্টির ঝালর প্রায় ঢেকে রেখেছে সামনেটা, সাগরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে জলকুমারীর দেহরেখা। তবে দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব। আশা করতে শুরু করেছি গ্যালিতে ঢুকে গ্যাসের চুলোয় আগুন ধরাবার আগে নিশ্চয়ই জুডিথ ঝাড়া-মোছা আর গোছগাছের কাজ সারবে। ভাবছি, আমার আশঙ্কা যেন মিথ্যে হয়। রাফেলা আমার জন্যে একটা বিদায় উপহার রেখে গেছে, আমার এই ধারণা যেন ভুল হয়।

তবু গত সন্ধ্যায় রাফেলাকে বলা আমার কথাগুলো স্পষ্ট বাজছে কানে। ‘আগে মেইন গ্যাস সিলিণ্ডারটা খুলতে হবে তোমাকে। কাজ শেষ করে ওগুলো বন্ধ করতে ভুলো না যেন আবার, তা নাহলে গোটা বোট একটা গ্যাস বোমা হয়ে যাবে।’

জলকুমারীর আরও কাছে চলে এসেছি, কিন্তু এখনও ঝাপসা

দেখাচ্ছে তাকে, বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর শেষ মাথায় ঝুলছে যেন, পাক খেয়ে নেমে আসা কুয়াশার ভেতর কি এক অচেনা অপার্থিব সাদা বস্তু।

‘জুডিথ!’ এখন আমার চিৎকার শুনতে পাবার কথা জুডিথের, এতটা কাছে চলে এসেছি আমরা। পঞ্চাশ পাউণ্ডের দুটো গ্যাস সিলিণ্ডার রয়েছে বোটে, বড়সড় একটা ইঁট-সিমেন্টের তৈরি বাড়ি ধূলিসাৎ করার জন্যে যথেষ্ট। বাতাসের চেয়ে বেশি ভারী গ্যাস, একবার যদি বেরিয়ে আসতে পারে, নিচে নেমে স্থির হয়ে চুপচাপ জমে থাকবে। গ্যাস আর বাতাসে ভরাট হয়ে সাংঘাতিক বিস্ফোরকে পরিণত হবে বোটের পুরো খোলটা। দরকার শুধু আগুনের একটা কণা।

‘জুডি...’

অকস্মাৎ জলকুমারী এবং তার সাথে আমার মাথার ভেতরটা বিস্ফোরিত হল।

এটা একটা আগ্নেয় বিস্ফোরণ, বোট থেকে লাফ দিয়ে উঠল গাঢ় নীল আগুনের লকলকে প্রকাণ্ড জিভ। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল খোলটা, বিকট কড়াক শব্দে দু’ফাঁক হয়ে গেল সুপারস্ট্রাকচার, খোলের ওপর মস্ত এক ঢাকনির মত খুলে যাচ্ছে সেটা।

মরণ-আঘাতে ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে জলকুমারী। ঝড়ো বাতাসের মত ধাক্কা মারল আমাদের চোখেমুখে আগুনের আঁচ। বজ্রাঘাতে লোহা আর পাথর পোড়ার কটু গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস।

আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি অসহায়ভাবে অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগে মারা যাচ্ছে জলকুমারী। ছিন্নভিন্ন, প্রাণহীন খোলটা ধসে পড়েছে, ঠাণ্ডা পানি কলকল করে ঢুকে যাচ্ছে তার ভেতরে। ভারী ইঞ্জিন দুটো দ্রুত তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল পানির নিচে। এইমাত্র ছিল, কিন্তু এখন আর নেই সে, গ্র্যাণ্ড হারবারের ধূসর

পানি গ্রাস করেছে তাকে।

বেসামালভাবে দুলছে ডিঙি নৌকোটা, আমি আর ল্যাম্পনি আতঙ্কে পাথর হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে আছি পাটাতনের ওপর, বিস্ফারিত চোখে বিধ্বস্ত বোটের ছেঁড়াভাঙা টুকরো আলোড়িত পানিতে ভাসতে দেখছি-প্রিয় একটা বোট এবং অপরূপ এক যুবতীর এইটুকুই যা অবশিষ্ট। বিশাল এবং প্রচণ্ড ভারী একটা রিক্ততা চেপে বসেছে আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে-ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে, ঘৃণায় দুনিয়া কাঁপিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করল আমার, কিন্তু শরীরের প্রতিটি পেশী পঙ্গু হয়ে গেছে, চিৎকার করা তো দূরের কথা একচুল নড়তে পারলাম না আমি।

তীব্র একটা ঝাঁকি খেল ল্যাম্পনি, যেন এতক্ষণে বিস্ফোরণের ধাক্কাটা লাগল তাকে। লাফ দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল সে, আহত পশুর মত কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। উদভ্রান্তের মত ছুটে পানিতে পড়তে যাচ্ছে সে, দেখেই বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার শরীরে। ওকে ধরে ফেললাম, নিজের বুকের সাথে পিষে ধরে রাখলাম।

'ছাড়ো আমাকে,' পাগলের মত আমার কপালে মাথা ঠুকছে ল্যাম্পনি। ধাক্কা লেগে মাথার ভেতর মগজ পর্যন্ত নড়ে উঠল আমার। 'আমি ওর কাছে যাব...আমাকে ওর কাছে যেতে দাও!'

'না,' টালমাটাল নৌকোর ওপর ধস্তাধস্তি করছি আমরা। 'কোন লাভ নেই, ল্যাম্পনি।'

চল্লিশ ফুট পানির নিচে জলকুমারীর বিধ্বস্ত খোল পড়ে আছে এখন, সেখানে যদি পৌঁছুতেও পারে ল্যাম্পনি, যা দেখতে পাবে তাতে পাগল না হয়ে উপায় থাকবে না ওর। বিস্ফোরণের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ছিল জুডিথ, আগ্নেয় বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কা এবং ভয়ঙ্কর উত্তাপের শিকার হয়েছে সে।

'ছাড়ো আমাকে, ওর কাছে যাব আমি!' একটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমার মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল ল্যাম্পনি। আঘাতটা

আসছে দেখতে পেয়ে দ্রুত একপাশে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম মাথাটা। নাকের পাশে লেগে পিছলে গেল ঘুসিটা। বুঝতে পারছি, এখুনি ওকে শান্ত করতে না পারলে বিপদ হবে। ল্যাম্পনিকে মরতে বা পাগল হতে দিতে পারি না আমি।

যে-কোন মুহূর্তে উল্টে যাবে নৌকোটা। আমার চেয়ে চল্লিশ পাউণ্ড হালকা হলে কি হবে, বুনো ষাঁড়ের মত শক্তি এসে গেছে ওর শরীরে, পারছি না আমি ওর সাথে। জুডিথের নাম ধরে ডাকছে এখন ও।

'জুডিথ! আসছি, অপেক্ষা করো...জুডিথ।' ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের করে দিয়ে চিৎকার করছে ল্যাম্পনি। ওর কাঁধ খামচে ধরা ডান হাতটা তুলে নিলাম, অপর হাত দিয়ে বুকে ধাক্কা মেরে সামনে থেকে ওকে সরিয়ে দিলাম একটু, তারপর ওর বাঁ কানের নিচে মারলাম ঘুসিটা। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল সে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ধরে ফেললাম ওকে। ধীরে ধীরে নামালাম শরীরটা পাটাতনের ওপর। তারপর সুষ্ঠু ভঙ্গিতে শুইয়ে দিলাম। পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে বৈঠা চালিয়ে ফিরে এলাম জেটিতে। সম্পূর্ণ অথর্ব আর নিঃস্ব লাগছে নিজেকে আমার।

ল্যাম্পনিকে কাঁধে ফেলে নিয়ে জেটির শেষ মাথায় পৌঁছুলাম। ওর কোন ওজনই অনুভব করছি না আমি। ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পৌঁছুলাম হাসপাতালে। ডিউটিতে পেলাম ডাক্তার ডানিয়েলকে, কিন্তু সে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিল।

'এই শেষবার বলছি,' তাকে জানালাম আমি, 'এমন একটা ওষুধ দাও ল্যাম্পনিকে যাতে চব্বিশ ঘন্টার আগে ঘুম না ভাঙে ওর। কেন, সে-কথা জানতে চেয়ো না।'

'দেখ, মিস্টার রানা...' আবার শুরু করল সে, '...আমি একজন সরকারী ডাক্তার, নিয়ম মেনে চলতে হয় আমাকে...'

এক পা এগোলাম ডানিয়েলের দিকে। 'বেশ, এসো, তোমাকেই তাহলে ঘুম পাড়িয়ে দিই...'

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সামনে দু'হাত তুলে পিছিয়ে গেল সে, কাঁপা গলায় ডিউটি সিস্টারকে ডেকে ইঞ্জেকশন আনতে পাঠিয়ে দিল।

চার

ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেছে রডরিক, এই সময় ওর বাড়িতে পৌঁছুলাম আমি। সব কথা ব্যাখ্যা করতে মাত্র এক মিনিট লাগল। পিকআপে চড়ে দুর্গে এলাম আমরা, এবং পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত সাড়া দিল ইন্সপেক্টর টমসন। আমার বিবৃতি ফাইল করল সে, অন্যান্য পুলিসী কাজগুলো সেরে নিল। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ট্রাকে তুলে দিল পুলিস বিভাগের ডাইভিং ইকুইপমেন্ট। আবার যখন বন্দরে ফিরে এলাম, দেখলাম, ইতিমধ্যে শহর উজাড় করে সব লোকজন জেটির কাছে চলে এসেছে, শোকাভিভূত নিশ্চল একটা ভিড় দাঁড়িয়ে আছে জেটির দু'পাশে। কেউ কেউ দৃশ্যটা চাক্ষুষ করেছে, কিন্তু বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছে সবাই।

নৌকোয় ডাইভিং সরঞ্জামগুলো তুলছি আমরা। সহানুভূতিসূচক মন্তব্য করছে অনেকে। 'গোখলে রামাদীনকে খবর দাও কেউ,' ওদেরকে বললাম আমি। 'একটা ব্যাগ আর একটা বাস্কেট নিয়ে এখানে আসতে বলো তাকে।'

আমি থামতেই অসংখ্য প্রশ্ন উঠল ভিড়ের মধ্যে থেকে।

'হেই, মিস্টার রানা, বোটে কেউ ছিল নাকি?'

'রামাদীনকে শুধু খবরটা পৌঁছে দাও,' বললাম ওদেরকে।

নৌকো নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছুলাম আমরা। ইন্সপেক্টর টমসন নৌকোটাকে আমাদের ওপর স্থির করে রাখল, বন্দরের পানির নিচে নামলাম রডরিক আর আমি।

পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা হয়ে শুয়ে আছে জলকুমারী, ডোবার সময় উল্টে গেছে সে। ওর ভেতরে ঢোকার ব্যাপারে কোন সমস্যায় পড়তে হল না আমাদেরকে, তার কারণ কীল-এর এক

প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দু'ফাঁক হয়ে খুলে গেছে খোলটা। আবার তাকে পানির ওপর ভাসাবার সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেছে।

খোলের গর্ত-মুখে অপেক্ষা করছে রডরিক, আমি ভেতরে ঢুকলাম। গ্যালিতে যাও বা কিছু অবশিষ্ট আছে, সব ঢাকা পড়ে গেছে ঝাঁক ঝাঁক বুভুক্ষু মাছের ভিড়ে। গোগ্রাসে খাচ্ছে ওরা। এবং কি খাচ্ছে দেখতে পেয়ে স্কুবা মাউথপীসের ভেতর দম আটকে এল আমার, কোনমতে বমি ভাবটাকে দমন করতে পারলাম।

মাংসের কণার সাথে সবুজ কাপড় না থাকলে বুঝতেই পারতাম না মাছগুলো জুডিথের দেহাবশেষ খাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন বড় তিনটে টুকরোয় বের করে আনলাম আমরা জুডিথকে, রামাদীনের ক্যানভাস ব্যাগে ভরা হল সেগুলো।

সাথে সাথে আবার ডাইভ দিলাম আমি, উন্মুক্ত খোলের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে গ্যালির নিচের কমপার্টমেন্টে পৌঁছুলাম। নিজেদের বিছানায় এখনও বোল্টের সাথে আটকানো রয়েছে লম্বা গ্যাস সিলিণ্ডার দুটো। দুটো ট্যাপই খোলা, শুধু তাই নয়, স্বচ্ছন্দে গ্যাস যাতে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্যে কে যেন হোস-এর সংযোগ খুলে দিয়েছে।

অনুভব করছি, প্রচণ্ড রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আমার। সব হারাবার ফলে যে নিঃস্ব বোধ আর শোকানুভূতি আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে চেপে বসেছিল, নিমেষের মধ্যে সেই চাপ থেকে মুক্তি পেলাম আমি, তার জায়গায় অনুভব করছি শুধু অদ্ভুত একটা আক্রোশ। জলকুমারী নেই-সে ছিল আমার অর্ধেক জীবন।

ট্যাপগুলো বন্ধ করলাম আমি। গ্যাস হোস-এর বিচ্ছিন্ন সংযোগ আবার জোড়া লাগালাম। সরাসরি আমার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে-আমি ব্যক্তিগতভাবে এর প্রতিশোধ নেব।

জেটি ধরে পিকআপের দিকে হাঁটার সময় স্বস্তির সাথে ভাবছি, তবু জলকুমারীর বীমা করা আছে বলে রক্ষে। আরেকটা বোট কিনতে পারব আমি। জলকুমারীর মত অত সুন্দর বা অত প্রিয় হয়ত হবে না সেটা, তবু একটা বোট তো বটে!

পিকআপের কাছে দ্বীপবাসীরা এখনও ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। 'নৌকোটা কার?' জানতে চাইলাম আমি। পাথরের বাঁধের সঙ্গে একটাই নৌকো ছিল, ওটাই ব্যবহার করেছি এতক্ষণ আমরা।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল প্রৌঢ় জেলে নরডিক। ঘামে ভেজা চকচকে কালো মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

'নরডিক,' জানতে চাইলাম, 'গত রাতে কাউকে তুমি জলকুমারীতে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'না, স্যার, মিস্টার রানা।'

'মনে করে দেখ। কাউকে নিয়ে যাওনি?'

'শুধু আপনার মেহমানকে নিয়ে গিয়েছিলাম, মিস্টার রানা। জলকুমারীর কেবিনে রিস্টওয়াচটা ফেলে রেখে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা।'

'ভদ্রমহিলা?'

'হ্যাঁ। হলুদ চুল আছে তাঁর, আপনার মেহমান...'

'কখন, নরডিক?'

'রাত ন'টার দিকে-আমি কি কোন অন্যায় করেছি, মিস্টার রানা?'

'না, নরডিক। ঠিক আছে। ভুলে যাও ব্যাপারটা।'

পরদিন দুপুরের আগে কবর দিলাম আমরা জুডিথকে। একটু চেষ্টা করতেই ওর মা-বাবার পাশের প্লটটা ওর জন্যে ব্যবস্থা করা গেল। এতে খুশি হল ল্যাম্পনি। বলল, পাহাড়ের ওপর জুডিথ একা থাকলে খারাপ লাগত তার। ওষুধের প্রভাব থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্ত নয় ল্যাম্পনি, কবরের পাশে শান্তভাবে আধবোজা

চোখে দাঁড়িয়ে থাকল ও।

পরদিন সকালে আমরা তিনজন উদ্ধার কাজে হাত লাগালাম। দশটা দিন হাড় ভাঙা খাটনি দিলাম, জলকুমারীর অবশিষ্ট মূল্যবান যা কিছু ছিল সব তুললাম এক এক করে। বিগ গেম ফিশিং রীল, এফ-এন কারবাইন, জোড়া ব্রোঞ্জ প্রপেলার থেকে শুরু করে ছোরা, কোঁচ, দড়ি, এমন কি নাট-বল্টু পর্যন্ত কিছুই বাদ দিলাম না। কিন্তু খোল আর সুপার-স্ট্রাকচার এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে যে ওখান থেকে কিছুই আমরা তুলতে পারলাম না।
এই দশ দিনের শেষ দিকে প্রিয় জলকুমারী শুধু একটা স্মৃতিতে পরিণত হল। অনেক মেয়ের সান্নিধ্য পেয়েছি আমি, আজ যখন কোন একটা গানের সুর কানে বাজে বা নির্দিষ্ট কোন একটা সুগন্ধ নাকে পাই তখন শুধু মধুময় স্মৃতি হয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ফিরে আসে তারা আমার মনে। তাদেরই মত ইতিমধ্যে পিছু হটে অতীতের কোলে আশ্রয় নিয়েছে আমার জলকুমারী।

দশদিন পর ঢ্যাঙা রামাদীনের সাথে দেখা করতে গেলাম আমি।

অফিসে ঢোকার মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, কোথাও একটা সাঙঘাতিক কিছু ঘটেছে। ঘামে পিচ্ছিল আর চকচকে হয়ে আছে তামাটে মুখটা, স্টীল রিমের পেছনে কোটরে ঢোকা চোখ দুটো অস্থিরভাবে ঘুরছে, হাত দুটো দ্রুত কচলাচ্ছে, আমাকে দেখেই আঁতকে উঠল সে, কেঁপে উঠল তার হাড়সর্বস্ব দুই কাঁধ। ও জানে জলকুমারীর বীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি আমি।

হাত কচলান থামিয়ে ডেস্কটা পরিষ্কার করতে শুরু করল সে, তার মানে গোছানো ডেস্কটা অগোছাল করে তুলছে। কিন্তু কাজটা অসমাপ্ত রেখে টাইয়ের নটটা ঠিক করতে শুরু করল, সেটাও শেষ না করে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এমন নার্ভাস হতে কাউকে কখনও দেখিনি আমি।

‘ভগবানের দোহাই, মিস্টার রানা, স্যার-উত্তেজিত হবেন না!’ দ্রুত কণ্ঠে উপদেশ দিল আমাকে সে। ওর জানা নেই, এ কথা কেউ বললেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠি আমি।

‘ব্যাপার কি, রামাদীন?’ কেউ আমাকে রাগিয়ে তুললে তার প্রাপ্য সম্মানের চেয়ে বেশি সম্মান দেখাতে অভ্যস্ত নই আমি। সম্মানসূচক মিস্টার সম্বোধনটা অপব্যয় করলাম না তাই। ‘তাড়াতাড়ি বল! কুইক!’ দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলাম ডেস্কের ওপর।

আবার আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল ঢ্যাঙা রামাদীন। স্টীল রিমের চশমাটা নেমে এল নাকের ডগায়। ‘মিস্টার রানা, স্যার, প্লীজ...’

‘এই হাতুড়ে, তাড়াতাড়ি বল্ কি হয়েছে...’

‘মিস্টার রানা, স্যার, জলকুমারীর প্রিমিয়াম সম্পর্কে একটা ভুল...’

বন করে ঘুরে গেল মাথাটা। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি।

‘আপনি স্যার, কখনও তো কোন ক্লেইম করেননি... মানে,...তাই আমি ভেবেছিলাম প্রিমিয়ামের টাকাটা অপচয় করার কি দরকার...’

বাকশক্তি ফিরে পেলাম আমি। ‘প্রিমিয়ামের সব টাকা মেরে দিয়েছ তুমি, জমা দাওনি?’ অস্ফুটে বললাম। ‘তারমানে...তার মানে বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেবে না...’

‘আপনি স্যার, বুদ্ধিমান লোক, ঠিক ধরেছেন ব্যাপারটা,’ মাথা ঝাঁকাল ঢ্যাঙা রামদীন। ‘আমি জানতাম, বুঝবেন আপনি।’

সোজা এগোলাম সময় বাঁচাবার জন্যে, সামনে ডেস্ক রয়েছে তা আমার নজরেই পড়ল না। বাধা পেয়ে সংবিৎ ফিরল, ডেস্কের ওপর উঠে পড়েছি এখন, লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়েছি প্রতিশোধের হাতটাকে। ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে পিছু হটল ঢ্যাঙা রামাদীন, নাকি সুরে কাতর ধ্বনি ছাড়ল একটা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ভীত-

সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ছুটে বেরিয়ে গেল পেছনের দরজা দিয়ে। ওপাশে গিয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিল সে, কী-হোলে আগে থেকে ঢুকিয়ে রাখা চাবিটা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল তালাটা।

ডেস্ক থেকে লাফ দিয়ে মেঝেতে, মেঝে থেকে আরেক লাফে দরজার গায়ে গিয়ে পড়লাম। তালা ভেঙে উন্মুক্ত হয়ে গেল কবাট দুটো প্রচণ্ড ধাক্কায়, দু'পাশের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে আবার সে-দুটো ফিরে আসার আগেই প্যাসেজের অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এলাম আমি। শেষ মাথায় ছোট্ট একটা কংক্রিটের উঠন। উঠনের একধারে বাইরের গলিতে বেরিয়ে যাবার বড় একটা দরজা। দরজার দু'পাশে শুঁটকি মাছের বড় বড় কাঠের বাক্স একটার ওপর একটা থাক দিয়ে রাখা। দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার আগেই ওর কাছে আমি পৌঁছে যাব বুঝতে পেরে সেই বাক্সগুলো আঁকড়ে ধরে ওপর দিকে দ্রুত উঠে যাচ্ছে ঢ্যাঙা রামাদীন, আহত পশুর মত গোঙাচ্ছে সে।

নিচে দাঁড়িয়ে ওর দুটো পা ধরে ফেললাম আমি। হ্যাঁচকা টান মেরে নামিয়ে আনলাম কংক্রিটের মেঝেতে। পায়ে জোর পাচ্ছে না রামাদীন, হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে চাইছে। আমার দিকে ওকে ঘুরিয়ে নেবার সময় দেখলাম ওর দুই পায়ের মাঝখানে মেঝেতে হলদেটে পানির একটা ছোট পুকুর তৈরি হচ্ছে, ওর দুই ঊরুর সংযোগস্থলটা এই পুকুরের উৎস, সাদা প্যান্ট বেয়ে নামছে দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ। সম্ভবত এটা ওর একটা কৌশল, যাতে ঘৃণায় ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাই আমি। কিন্তু ওকে ছেড়ে দেবার কথা একবারও মনে হচ্ছে না আমার।

এক হাত দিয়ে শক্ত করে ধরলাম ওর সরু গলাটা। শূন্যে তুলে ফেললাম ওকে। আরেক হাত দিয়ে বুকে চাপ দিয়ে রেখেছি, যাতে পিঠটা পেছনের কাঠের বাক্সগুলোর সাথে সেঁটে থাকে।

চশমাটা পড়ে গেছে ওর নাক থেকে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে ও। বন্ধ

চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি বেরিয়ে আসছে।

'বুঝতে পারছ আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি?' অস্ফুটে বললাম ওকে।

দুর্বোধ্য আওয়াজ করে গুঙিয়ে উঠল রামাদীন। মেঝে থেকে ছয় ইঞ্চি ওপরে নাচছে ওর দুই পা।

ডান হাতটা মুক্ত করলাম আমি, শরীরের সবটুকু শক্তি একত্রিত করে ঘুসি পাকালাম একটা। বুঝতে পারছি, এই ঘুসির জোর স্তম্ভিত করে দিতে যাচ্ছে স্বয়ং আমাকেই। রামাদীনের ধড় থেকে নিশ্চয়ই এটা আলাদা করে দিতে পারবে মুণ্ডুটাকে। তা আমি করতে পারি না-কিন্তু কোথাও না কোথাও একটা আঘাত আমাকে করতেই হবে। নিজেকে দমন করতে পারছি না। ওর ডান কানের পাশে বাক্সটায় মারলাম ঘুসিটা। শক্ত কাঠের গায়ে গর্ত করে বাক্সের ভেতর প্রায় কনুই পর্যন্ত ঢুকে গেল হাতটা। পপ সঙ্গীতের আসরে ভাবাবেগের উন্মাদনায় মেয়েরা যেমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে তেমনি একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল রামাদীনের গলার ভেতর থেকে। ছেড়ে দিলাম ওকে আমি, হলদেটে প্রস্রাবের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

আতঙ্কে তোতলাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, কাঁদছে-এই অবস্থায় ওকে ফেলে রেখে দরজা খুলে গলিতে, সেখান থেকে মেইন রোডে বেরিয়ে এলাম। সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গেছি আমি। কাপড়চোপড় পরে আছি, কিছু টাকাও আছে আমার কাছে, কিন্তু উলঙ্গ, রিক্ত আর নিঃস্ব লাগছে নিজেকে আমার। নরকের একটা কীট ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে আমাকে, মিস্টার রানা থেকে এক ধাক্কায় নেমে এসেছি রানাতে।

বাস্তবকে মেনে নিতে কষ্ট হল। কিন্তু সময় নষ্ট করলাম না। লর্ড নেলসনে পৌঁছুবার আগেই রোজগারের অসংখ্য উপায় আবিষ্কার করে ফেললাম আমি। করতে চাইলে কাজের কোন অভাব হয় না মানুষের। পকেট কাটা, মাটি কাটা, ফল-পাকড়

মাথায় নিয়ে ফেরি করা, শামুক কুড়ানো, মোট বওয়া, পাথর ভাঙা, দড়ি পাকানো-এই রকম হাজার হাজার কাজ গিজ গিজ করছে মাথার ভেতর।

মাত্র বিকেল হয়েছে, লর্ড নেলসনের পাবলিক বারে তাই রডরিক আর ল্যাম্পনি ছাড়া কেউ এসে পৌঁছায়নি এখনও। চুপচাপ শুনল ওরা, কোন মন্তব্য করল না। বলার আছেই বা কি!

প্রথম দফার মদটা নিঃশব্দে শেষ করলাম আমরা। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম রডরিককে, 'কি করবে তুমি এখন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রডরিক।

'পুরানো হোয়েলবোটটা এখনও তো আছে আমার...'

অ্যাডমিরালটি ডিজাইনের হোয়েলবোটটা বিশ ফুট লম্বা, ডেকটা খোলা, কিন্তু সাগরকে বশে রাখতে তার কোন অসুবিধে হয় না।

'...আবার আমি সেই ক্রাইফিশ ধরে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে নিতে পারব।' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কথা শেষ করল রডরিক। জলকুমারীকে নিয়ে দ্বীপে আমি আসার আগে এই কাজই করত সে।

'নতুন ইঞ্জিন দরকার হবে তোমার,' বললাম ওকে। 'পুরানো সী-গাল দুটো প্রায় অচল হয়ে গেছে।' দ্বিতীয় দফা মদ এল, এই ফাঁকে আমার পুঁজির হিসেব করছি মনে মনে-দুত্তোরি ছাই, ভাবলাম আমি, দু'হাজার ডলারে কি আর উন্নতি অবনতি ঘটবে আমার এই অবস্থায়। 'দুটো নতুন বিশ ঘোড়ার ইঞ্জিন কিনে দেব তোমাকে আমি, রডরিক,' বললাম ওকে।

'তা তোমাকে কিনতে দিচ্ছি না,' প্রচণ্ড জোরে মাথা দোলাল রডরিক। 'মিসাস বেশ কিছু টাকা জমিয়েছে, এখন চাইলে দেবে।'

কিছুক্ষণ তর্ক হল আমাদের মধ্যে। জমা টাকায় হাত দিতে নিষেধ করলাম ওকে। বিপদ-আপদের কথা কিছু বলা যায় না,

তখন পাবে কোথায়? কিন্তু জেদ ধরে বসে থাকল রডরিক, আমার কাছ থেকে দান নিতে রাজি নয় সে।

'তুমি কি করবে বলে ভাবছ, ল্যাম্পনি?' জানতে চাইলাম আমি।

'মনে হচ্ছে তিন বছরের চুক্তিতে রায়ানো দ্বীপেই কাজ করতে যেতে হবে আমাকে,' ম্লান মুখে বলল ল্যাম্পনি।

'না,' মুখ ভেঙচে ধারণাটাকে বাতিল করে দিল রডরিক। 'হোয়েলবোটের জন্যে ক্রু দরকার হবে আমার।'

ওদের দু'জনেরই তাহলে একরকম ব্যবস্থা হল। স্বস্তি বোধ করলাম আমি। ওদের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে, সেটা আমি কখনও এড়িয়ে যাবার কথা ভাবতেও পারি না। বিশেষভাবে খুশি হলাম এই কথা ভেবে যে ল্যাম্পনির ওপর নজর রাখার জন্যে রডরিক রইল। জুডিথের মৃত্যুটাকে খুব খারাপ ভাবে নিয়েছে ছেলেটা। গুম মেরে গেছে ও, গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে- আগের সেই আনন্দোচ্ছল ছটফটে রোমিও মরে গেছে। উদ্ধারের কাজে কাঠোরভাবে খাটিয়েছি ওকে, আঘাতটা সামলে ওঠার ব্যাপারে সাহায্যে লেগেছে সেটা।

তবু হরদম মদ খেতে শুরু করেছে ও। এভাবে চলতে দিলে মারা যাবে ও কিছুদিনের মধ্যেই। যাক, রডরিক অন্তত ওকে বাধা দেবার জন্যে থাকছে।

কিন্তু পরিবেশটা আরও যেন ভারী হয়ে উঠল। ছোট্ট আলোচনাটার পর এখন আর তিনজনের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, এবং আগামীকাল থেকেই কখনও আর একসাথে হাঁটব না আমরা।

চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছে রডরিকের, কিন্তু দুর্বলতাটা প্রকাশ করে পরিবেশটাকে আরও আড়ষ্ট করতে চাইছে না সে। দু'হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দ্রুত চোখ ঘষছে। 'কি যে ছাই পড়ল চোখে!'

সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত গুমোট ভাবটা রয়েই গেল। তারপর নেশায় ধরল আমাদেরকে। শুরু হল গান। ল্যাম্পনি মাতলামো করার মধ্যে অংশগ্রহণ করল না। নেশায় বুঁদ হয়ে চুপচাপ বসে ঢুলছে সে। অবশ্য মাঝেমধ্যে হয় আমি নয়ত রডরিক তার মাথাটা টেবিল থেকে তুলে দিচ্ছি, এবং একবার তুলে দিলে আবার দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে নিশ্চিন্ত, সিধে হয়ে বসে নিয়মিত দোল খেতে শুরু করছে সে।

রাত নটার পর এক কাণ্ডই ঘটে গেল।

বন্দরে আজ সন্ধ্যায় একটা সাউথ আফ্রিকান ট্রলার এসেছে, খুচরো মেরামতের কাজ সারবে আর বিশুদ্ধ পানি নেবে। অবশেষে ল্যাম্পনি যখন চেতনা হারাল, নিজেদের মধ্যে একটা আপোস করে নিয়ে আমি আর রডরিক কেউ কারও আগে পরে নয়, একযোগে গান ধরলাম-কিন্তু একটু পরই ট্রলারের ছয়জন ক্রু এসে ঢুকল বারে, এবং আমরা নাকি গাধার মত চেঁচাচ্ছি বলে বিদ্রূপ করল।

এ ধরনের অপমান মুখ বুজে সহ্য করার সাধ্য আমার বা রডরিকের নেই। তাই আমরা সবাই ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করার জন্যে লর্ড নেলসনের পেছন দিকের উঠনে চলে এলাম। ঠিক হল, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা মীমাংসা করা হবে।

উঠনে পৌঁছুবার দশ সেকেণ্ড পরই ভঙ্গ হল শান্তি। এর জন্যে একা কারও ওপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই, আমি এবং রডরিক দু'জনেই দায়ী, আমাদের দু'জনের হাতই কিছু একটা করার জন্যে নিশপিশ করছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার মীমাংসা হল অত্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে। দাঙ্গাদমনকারী স্কোয়াড নিয়ে ইন্সপেক্টর টমসন হুইসেল বাজাতে বাজাতে হাজির। সে আমাদের সবাইকে তো গ্রেফতার করলই, কাছেপিঠে যাকে দেখতে পেল তারই কোমরে দড়ি পরাল।

‘আমার নিজের রক্তমাংস...,’ পুলিস হেডকোয়ার্টারের সেলের ভেতর আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছে রডরিক, আর বিলাপ করছে, ‘...আমার নিজের রক্তমাংস আমারই সাথে বেঈমানী করল! নিজের আপন মামাকে তুই কয়েদ করলি! মাসুদ, দুনিয়ার চালচলন বদলে গেছে, বুঝলে? আপনজন আর আপন নেই। আমার নিজের বোনের ছেলে, সে আজ আমার কোমরে দড়ি দিল, কয়েদে আটক করল...’

বন্দীত্বের অভিশাপ খানিকটা সহনীয় করার জেন্য যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিল ইন্সপেক্টর টমসন। আমরা বিদ্রোহ করব হুমকি দিতেই লর্ড নেলসনে একজন লোককে পাঠাল সে। এবং একটু পরই আমি আর রডরিক পাশের সেলের বন্দী ট্রলারম্যানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললাম। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ মদের বোতলটা এক সেল থেকে আরেক সেলে দ্রুত এবং ঘন ঘন আসা যাওয়া করতে শুরু করল।

পরদিন সকালে আমাদেরকে সম্ভবতঃ উৎকট আপদ জ্ঞান করেই মুক্তি দিয়ে বাঁচল ইন্সপেক্টর টমসন। আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতেও অস্বীকৃতি জানাল সে।

সরাসরি টার্টল বে থেকে ফিরে এসে বাড়িটাকে শেষবারের মত গুছাতে শুরু করলাম আমি। তৈজসপত্র ধুয়ে-মুছে তুলে রাখলাম সব। আলমিরা আর ওয়ারড্রোবে কয়েকটা করে ন্যাপথালিন গুলি রাখলাম যাতে পোকা মাকড় আস্তানা গাড়তে না পারে। দরজায় অবশ্য তালা মারলাম না। সেন্ট মেরীতে চৌর্যবৃত্তি নামে কোন পেশার অস্তিত্ব নেই।

শেষবারের মত সাঁতার কেটে রীফ ছাড়িয়ে চলে এলাম আমি। আধঘন্টা ধরে প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করলাম আমার সুহৃদদের জন্যে। কিন্তু আজও এল না ওরা। আবার কবে ফিরি কি না ফিরি, অথচ দেখা হল না-মনটা স্বভাবতই খারাপ হয়ে গেল। সাঁতার কেটে ফিরে এলাম বাড়িতে। শাওয়ার নিয়ে

পোশাক পরলাম, তারপর ক্যানভাস আর লেদার ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসে উঠে বসলাম পিকআপে। পাম গাছের ভেতর দিয়ে চলে আসছি, পেছন ফিরে পঁচিশ একর শান্তির নীড়ের দিকে একবারও তাকালাম না। তবে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই পথে আবার একদিন ফিরে আসব আমি।

হোটেল হিলটনের গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চুরুট ধরালাম একটা। শিফটিং ডিউটি শেষ করে দুপুরবেলা বেরিয়ে এল মারিয়া। ফুটপাত ধরে হাঁটছে ও, মিনি স্কার্ট পরে রয়েছে, চমৎকার হাঁটার ছন্দে দুলছে ওর সুগঠিত নিতম্ব। শিস দিতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, এবং আমাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়ে উঠল। দৌড়ে এসে গাড়িতে আমার পাশের সিটে বসল। পরমুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা।

‘মিস্টার রানা, তোমার বোটের জন্যে সত্যি আমি খুব দুঃখ পেয়েছি...’

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর আমি জানতে চাইলাম, ‘আচ্ছা, মারিয়া, তুমি বলতে পারবে হোটেলে থাকার সময় মিস রাফেলা কোথাও কোন টেলিফোন বা টেলিগ্রাম করেছিল কিনা?’

‘মনে করতে পারছি না, মিস্টার রানা, তবে আপনি বললে চেক করে দেখতে পারি আমি।’

‘এখনই?’

‘অবশ্যই।’

‘আরেকটা কথা। মিকি মিস রাফেলার কোন ফটো তুলেছিল কিনা জানতে চাই আমি।’ হিলটনের স্টাফ-ফটোগ্রাফার মিকি, তার অ্যালবামে রাফেলার ফটো থাকার কথা।

প্রায় এক ঘন্টা দেরি করল মারিয়া, কিন্তু ফিরল বিজয়িনীর হাসি নিয়ে। ‘হোটেল ত্যাগ করার আগের রাতে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তিনি,’ টেলিগ্রামের একটা কপি দিল আমাকে মারিয়া। ‘এটা রেখে দিতে পারেন আপনি।’

মেসেজটা পড়ছি আমি।

ঠিকানা দেয়া রয়েছে-সিডনি ফ্ল্যাট, ফাইভ কার্জন স্ট্রীট, নাইনটি সেভেন লণ্ডন ডব্লিউ. আই.

মেসেজে বলা হয়েছে-

কন্ট্রাক্ট সাইনড রিটার্নিং হিথরো বি-ও-এ-সি ফ্লাইট থ্রী-হানড্রেড-সিক্সটিন।

স্যাটারডে।

কোন সই নেই।

'সবগুলো ফাইল আর অ্যালবাম ঘাঁটতে হয়েছে মিকিকে-তবে একটা ফটো পেয়েছে ও।' মারিয়ার হাত থেকে সিক্স-বাই-ফোর গ্লসি প্রিন্টটা নিলাম আমি। সানগ্লাস আর বিকিনি পরা অবস্থায় তোলা ফটোটা, সান কাউচে ডুবে আছে রাফেলা-তবে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না তাকে।

'ধন্যবাদ, মারিয়া,' পিন দিয়ে ওর ব্রেসিয়ারে একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট গেঁথে দিয়ে বললাম আমি।

'ধনী লাগছে নিজেকে,' মুক্তোর মত সাদা দাঁত বের করে হাসছে মারিয়া। 'পাঁচ পাউণ্ডের বিনিময়ে যা খুশি তাই দাবি করতে পারেন আপনি, মিস্টার রানা।'

'প্লেন ধরতে হবে আমাকে, মারিয়া,' বললাম ওকে। ওর নাকে নাক ঘষলাম, তারপর গাড়ি থেকে যখন নেমে যাচ্ছে, ওর নিতম্বে চাপড় মারলাম একটা।

এয়ারপোর্টে আসার আগেই পৌঁছে গেছে রডরিক আর ল্যাম্পনি। আমার পিকআপের দায়িত্ব এখন থেকে রডরিক নেবে। আমাদের সবার মন খারাপ, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এবং নিঃশব্দে করমর্দন করলাম ডিপারচার গেটের কাছে। বলার আর কার কি আছেই বা। গতরাতেই সব কথা বলা হয়ে গেছে আমাদের।

মেইনল্যাণ্ডের উদ্দেশে আকাশে উঠল প্লেন। পেরিমিটার বেড়ার কাছে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, ওপর থেকে

দেখতে পাচ্ছি আমি।

লণ্ডনগামী বি. ও. এ. সি ফ্লাইট ধরার জন্যে নাইরোবিতে তিন ঘন্টার জন্যে থাকতে হল। একটা বারে বসে সময়টা কাটিয়ে দিলাম। রডরিক, ল্যাম্পনি-এদের কথা ভুলতে পারছি না। কিন্তু নিজেকে হতাশায় ডুবে যেতেও দিলাম না। ইংল্যাণ্ড আমার জন্যে নরকতুল্য, অথচ সেখানেই যাচ্ছি আমি। প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে, তা নাহলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব।

রাফেলা, অপেক্ষা করো। আসছি আমি। তোমার সাথে আমার কথা আছে।

কে যেন বলেছিলেন, যখন তোমার আর্থিক দুর্গতির সীমা নেই তখনই একটা নতুন গাড়ি কেনো, কেনো একশো গিনির স্যুট, চেহারায় সাহস আর সাফল্যের ভাব ফুটিয়ে তোল-দেখবে, লোকজন তোমাকে যথেষ্ট খাতির করছে, তোমাকে সাহায্য করতে চাইছে।

হিথরো এয়ারপোর্টে দাড়ি কামিয়ে পোশাক পাল্টালাম, তারপর হিলম্যান না নিয়ে রেন্ট-এ-কার কোম্পানির কাছ থেকে একটা ক্রাইসলার ভাড়া করলাম। বুটে ব্যাগগুলো ফেলে দামি গাড়িটা হাঁকিয়ে সবচেয়ে কাছের একটা পাবে পৌঁছুলাম।

চিকেন স্যাণ্ডউইচ আর এগ পাই নিয়ে গলাধঃকরণ করলাম এক পাইন্ট কারেজ দিয়ে। এই ফাঁকে রোড ম্যাপটার সাথে এক দফা পরিচয় ঝালিয়ে নেয়া গেল। অনেক দিন পর আবার এসেছি লণ্ডনে, এককালে সব রাস্তাঘাট নখদর্পণে ছিল, দেখলাম ভুলে গেছি অনেক কিছুই।

ব্রাইটনে পৌঁছুতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। লণ্ডনের রোদ ম্লান সোনালি রঙ বিকিরণ করছে, সেন্ট মেরীর রোদের মত উত্তাপ বা উজ্জ্বলতা এর নেই, কিন্তু উপভোগ্য। গ্র্যাণ্ড হোটেলের উল্টোদিকে পার্কিং লটে ক্রাইসলার রেখে গলি উপগলির

গোলকধাঁধায় প্রবেশ করলাম। বসন্তের শেষভাগেও এলাকাটায় ট্যুরিস্টদের ভিড় দেখতে পাচ্ছি।

নিরোর আণ্ডারওয়াটার স্লেজের গায়ে কতদিন আগে দেখেছি ঠিকানাটা, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে আজও। ফাইভ প্যাভিলিয়ন আর্কেড, ব্রাইটন, সাসেক্স। খুঁজে বের করতে এক ঘন্টার ওপর লেগে গেল।

নিরো'স আণ্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ড গলির গায়ে দশ ফুট জায়গা দখল করে রেখেছে। দরজাটা বন্ধ। পাশে একটা মাত্র জানালা, তাও কাঠের খড়খড়ি দিয়ে ঢাকা। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। দরজায় ঘুসি মেরেও কোন লাভ হল না। বোঝা যাচ্ছে, কেউ নেই। ফিরে আসতে যাচ্ছি কি মনে করে আরেকবার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকালাম। ভাগ্যগুণে জানালার ঠিক নিচেই মেঝেতে একটা কার্ডবোর্ড পড়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। জানালার গায়ে আটকানো ছিল এক সময়, সম্ভবত বাতাসে পড়ে গেছে। তবে লেখার দিকটা ওপর দিকে রয়েছে, তাই গোটা গোটা অক্ষরে হাতে লেখা মেসেজটা স্বল্প আলোয় পড়তে অসুবিধে হল না।

"সী-ভিউ, ডোনার্স লেন, ফালমার, সাসেক্স-এ খোঁজ করুন।"

গাড়িতে ফিরে এসে গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে রোড ম্যাপটা আবার বের করলাম আমি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এর মধ্যে বৃষ্টি নামল। গলির ভেতর দু'বার পথ হারিয়ে ফেললাম আমি। অবশেষে লতাঝোপ দিয়ে ঘেরা একটা গেটের সামনে দাঁড় করালাম গাড়ি। গেটের গায়ে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা সী-ভিউ।

গেট পেরিয়ে বাগানের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এগোচ্ছি। লাল ইঁটের দোতলা একটা বাড়ি সামনে। নিচের

তলার একটা কামরায় আলো জ্বলছে।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি রেখে নামলাম আমি। সামনের দরজাটাকে উপেক্ষা করে উঠনে নামলাম। শার্টের কলার সিধে করে ঘাড়টা ঢেকে ছুটলাম কিচেনের দরজা লক্ষ্য করে। কিন্তু দরজা পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই ভিজে গেলাম আমি। দরজায় ধাক্কা দিতেই ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ পেলাম। হুড়কো সরাবার আওয়াজ হল। দরজার ওপরের অংশটা উন্মুক্ত হয়ে গেল চোখের সামনে। একটা মেয়ে-তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

দেখে তেমন কিছু মনে হল না মেয়েটাকে আমার। সৌখিন ফিশারম্যানের ঢোলা জার্সি পরে আছে ও। বেশ লম্বা, এবং কাঁধ দুটো সাঁতারুর। চেহারাটা শুধু সাদামাঠা নয়, বড় বেশি সাধারণ।

কপাল চওড়া ওর, রঙটা নিশ্প্রভ। নাকটা বড়, কিন্তু ছুঁচালো বা হাড়সর্বস্ব নয়। নাকের নিচে ঠোঁট দুটো মিষ্টি। মেকআপের কোন চিহ্ন নেই সেখানে। ঠোঁটের রঙ হালকা গোলাপী, ক্ষীণ একটু বেগুনি রঙের ভাবও যেন আছে।

কপাল এবং গাল থেকে খুঁটিয়ে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চুলগুলোকে পেছন দিকে, লাল সিল্কের একটা ফিতেতে গিঁট বেঁধে আটকানো হয়েছে সেগুলো ঘাড়ের পেছনে। চুলগুলোর রঙ কালো, ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে। ম্লান গায়ের রঙের সাথে মিশে আছে তাজা এবং সজীব একটা লাবণ্যের প্রলেপ, কাছ থেকে বেশ কিছুক্ষণ দেখলে তবেই অদ্ভুত একটা আলোময় উজ্জ্বলতা ধরা পড়বে চোখে। হঠাৎ সেই গভীর আলোটা দেখতে পেলাম আমি, মনে হল ওর চামড়ার নিচে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, পরিষ্কার রক্তের উষ্ণ প্রবাহ উঠে আসছে গলা এবং গালের দু'দিকে। ফিতের গিঁটকে ফাঁকি দিয়ে কালো সিল্কের সুতোর মত কয়েক গাছি চুল কপালে এসে পড়েছে, আলতোভাবে সেগুলো আঙুল দিয়ে ছুঁলো ও। ভঙ্গিটার মধ্যে অদ্ভুত একটা মাধুর্য ফুটে উঠল। দুধ-সাদা জমিনের ওপর কালো রঙের চোখের মণি দুটো

শান্ত-সেদিকে তাকিয়ে ওর নার্ভাসনেস টের পাবার কোন উপায় নেই।

তারপর ল্যাম্পের আলো লেগে ঝিক্ করে উঠল চোখের মণি দুটো, সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম ও-দুটো কালো নয়, দুপুরের কড়ারোদ সরাসরি মোজাম্বিক স্রোতে পড়লে তার রঙ যেমন গাঢ় নীল হয়ে ওঠে, চোখের মণি দুটো ঠিক সেই রকম। চোখের ওপর কালো ধনুকের মত বাঁকা এবং স্পষ্ট ভুরু।

আচমকা উপলব্ধি করলাম অসাধারণ সুন্দরী একটা মেয়ে নয়, পূর্ণ যুবতী এক নারীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। হঠাৎ যেন নতুন চেতনা ফিরে পেয়েছি, বুঝতে পারছি, ওকে অতি সাধারণ মনে করে কি সাংঘাতিক ঠকাই না ঠকতে যাচ্ছিলাম আমি। অদ্ভুত একটা সমর্থ আর পরিণত ভাব রয়েছে ওর মধ্যে, ঠায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে গভীর প্রশান্তি সুপ্ত হয়ে রয়েছে-অনুভব করতে পেরে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম আমি।

দেখামাত্র সবটুকু চিনতে পারি এমন মেয়েদের সান্নিধ্য পেতে অভ্যস্ত আমি। যারা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের অধিকারিণী তাদের কাছে ঘেঁষার সৌভাগ্য এর আগে কখনও হয়নি আমার। পরিবেশটা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে বুঝতে পেরে নিজের সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হলাম আমি।

পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছি আমরা। কেউ কথা বলছি না, বা নড়ছি না।

'তুমি মাসুদ রানা,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল ও। ওর কণ্ঠস্বর মৃদু, কোমল, সুরেলা। বিদূষী নারীর পরিশীলিত কণ্ঠস্বর।

চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল আমার। 'আমাকে তুমি চিনলে কিভাবে?' জানতে চাইলাম আমি।

'ভেতরে এসো,' চেইন খুলে দরজার নিচের অংশটা উন্মুক্ত করল ও।

মনে একরাশ প্রশ্ন, কিন্তু নিঃশব্দে পালন করলাম ওর নির্দেশ।

কিচেনের ভেতরটা গরম, ভাল খাবারের সুগন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

পাঁচ

'তুমি আমার নাম জানলে কিভাবে?' প্রশ্ন করলাম।

'খবরের কাগজে তোমার ছবি বেরিয়েছিল-নিরোর সাথে,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

আবার চুপ করে গেলাম আমরা। পরস্পরকে লক্ষ করছি।

প্রথমে যতটুকু মনে হয়েছিল তার চেয়েও বেশি লম্বা ও, আমার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছেচে। গাঢ়-নীল রঙের প্যান্ট পরে আছে ও, পায়ে কালো চামড়ার বুট। এখন ওর সরু কোমর, এবং মোটা জার্সির নিচে সুডৌল, সুউন্নত বুকের আভাস পাচ্ছি।

প্রথমে সাদামাঠা মনে হবার দশ সেকেণ্ড পর ভেবেছিলাম অসাধারণ সুন্দরী ও, কিন্তু এখন আমার স্থির বিশ্বাস দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের মধ্যে ও একজন। অনুভূতি এবং উপলব্ধির এই বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়াটা পুরো হজম করতে সময় লাগছে আমার।

'একটা অসুবিধের মধ্যে ফেলে রেখেছ তুমি আমাকে,' একসময় বললাম ওকে। 'আমি তোমার নাম জানি না।'

'আমি রাফেলা বার্ড,' উত্তরে বলল ও।

ধাক্কাটা ভালভাবেই খেলাম। পনেরো সেকেণ্ড বোকার মত তাকিয়ে থাকলাম নিঃশব্দে। আরেকজন রাফেলা বার্ডকে চিনি আমি, তার সাথে এর কোন মিলই নেই।

'এই নামের গোটা একটা দল আছে, তা কি তুমি জানো?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

মৃদু ভুরু কুঁচকে তাকাল ও আমার দিকে। 'বুঝিয়ে বলবে?' কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হয়নি, কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠেছে পুরোমাত্রায়।

'বড় গল্প। বলতে প্রচুর সময় লাগবে।'

‘দুঃখিত,’ হঠাৎ খেয়াল হয়েছে ওর, কিচেনের মাঝখানে অনেকক্ষণ ধরে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছি আমরা, এবং আমাকে বসতে বলেনি। ‘বসবে না তুমি? একটা বিয়ার দেব?’

কাবার্ড থেকে এক জোড়া বিয়ারের ক্যান তুলে নিল ও, আমার উল্টো দিকে কিচেন টেবিলের ওধারে বসল।

‘তাই? বড় গল্প?’ ক্যান দুটো খুলল ও, হাত বাড়িয়ে একটা রাখল আমার সামনে। তারপর মুখ তুলল, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

নিরো সেন্ট মেরীতে পা দেবার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে তার একটা সম্পাদিত বিবরণ ওকে দিতে শুরু করলাম আমি। খুব সহজে কথা বলা যায় ওর সাথে, যেন একজন উৎসাহী এবং অতি পরিচিত আপনজন শুনছে আমার কথাগুলো। এবং হঠাৎ হল কি, ওকে সমস্ত সত্য বলে ফেলার অদ্ভুত একটা তাড়না অনুভব করলাম নিজের ভেতর। বারবার মনে হচ্ছে, একেবারে শুরুতেই কোন রকম রাখঢাক না করে সততার সাথে সব জানানো দরকার ওকে। মনে হচ্ছে, ওর কাছে সত্য প্রকাশ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্পূর্ণ অপরিচিতা ও, অথচ যতটা নিজেকে বিশ্বাস করি ততটাই বিশ্বাস করলাম ওকে। যা কিছু ঘটেছে সব নির্দ্বিধায় জানালাম।

রাত আর একটু বাড়তে আমাকে ও খাওয়াল। ওর চেহারা সংক্রান্ত ব্যাপারটার সাথে পরিবেশিত খাবারের অদ্ভুত একটা মিল দেখতে পাচ্ছি। বাড়িতে হাতে তৈরি রুটি, ফার্মের মাখন, সুপ, মাটন চপ ইত্যাদি খাবারগুলো অতি সাধারণ, কিন্তু স্বাদে গন্ধে প্রতিটি অতুলনীয়। এখনও আমি বকবক করে যাচ্ছি, কিন্তু এখন আর সেন্ট মেরীর সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলছি না। নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে ও। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে আজ যেন আমি একজনকে পেয়েছি যাকে অবাধে মন খুলে বলা যায়

নিজের সব কথা।

আমি যে একজন স্পাই, একথাটা ছাড়া নিজের আর সব কথাই ফাঁস করে দিলাম বিনা দ্বিধায়। এমন কি জলকুমারী কেনার টাকা কোত্থেকে পেয়েছিলাম সে-কথাও বলতে বাধল না আমার।

মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর অবশেষে মুখ খুলল ও। বলল, ‘নিজের সম্পর্কে এত খারাপ কথা, তা যদি সত্যি হয়ও, কেউ বলে কি? যাই হোক, তোমার সব কথা বিশ্বাস করতে পারছি, এমন নয়। তোমাকে ওরকম মনে হয় না-মনে হয়...,’ শব্দ নির্বাচন করার জন্যে কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল ও, ‘...তুমি একজন ভাল মানুষ।’ ভাল শব্দটা উচ্চারণ করল বটে, কিন্তু ঠিক এই শব্দটাই বলতে চেয়েছে কিনা সন্দেহ হল আমার।

‘ভাল মানুষ বলতে ঠিক যা বোঝায় আমি তা নই,’ সরল স্বীকারোক্তি দিলাম আমি। ‘তবে তা হবার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছি আমি, আজও করছি। তুমি হয়ত বুঝবে, আসলে ভাল একজন মানুষ হওয়ার চেষ্টার মত কঠিন কাজ নেই আর। জানো, অনেক সময় ভাল-মন্দের বিচার করার সময় ইচ্ছে করে অন্ধ সাজি আমি। তখন আমি আর ভাল মানুষ থাকি না। আমাকে দেখে তোমার মনে হয়...’ হঠাৎ হাসলাম আমি, ‘আসলে চেহারা সব সময় সত্যি কথা বলে না।’

‘হ্যাঁ, তা ঠিক,’ ওর বলার ভঙ্গিতে আশ্চর্য একটা তাৎপর্য ফুটে উঠল। যেন প্রচ্ছন্নভাবে সতর্ক করে দিল ও আমাকে। তারপর বলল, ‘কিন্তু এতসব কথা আমাকে কেন শোনালে তুমি? কাজটা খুব বুদ্ধিমানের মত হল না, যাই বল।’

‘ঠিক তোমাকে শোনাতে চেয়েছি, ব্যাপারটা তা নয়। এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমার সব কথা তোমার মত কাউকে জানাবার জন্যে ছটফট করছিলাম ভেতর ভেতর। তুমি নির্বাচিত হওয়ায় আমি দুঃখিত।’

হাসল ও। বলল, ‘আজ রাতটা নিরোর কামরায় কাটাতে পার

তুমি। বাইরে বেরিয়ে আর কাউকে এসব বলবে, সে ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

গত রাতে ঘুমাইনি আমি, হঠাৎ ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করলাম। কিন্তু আরও একটা কথা বলা বাকি আছে আমার। 'সেন্ট মেরীতে কেন গিয়েছিল নিরো?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে। 'কি খুঁজছিল ও? তুমি জানো, কাদের সাথে কাজ করছিল ও, কি তাদের পরিচয়?'

'আমি জানি না,' মৃদু মাথা নেড়ে বলল ও। বুঝলাম, সত্যি কথা বলছে। ওকে আমি এতটা বিশ্বাস করছি, এরপর আমাকে মিথ্যে কথা বলতে পারে না।

'আমি জানতে চাই,' ওকে জানালাম। 'তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'

'হ্যাঁ, করব,' কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল ও। 'নিরো কেন গিয়েছিল, কাদের সাথে গিয়েছিল এসব আমিও জানতে চাই। কাল সকালে আবার আমরা কথা বলব, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

নিরোর কামরাটা দোতলায়। ফটোগ্রাফ আর বুক শেলফ দখল করে রেখেছে সবগুলো দেয়াল। একটা ছোট শো-কেসে রয়েছে রূপোর অনেকগুলো ট্রফি। ছাত্রজীবনে খেলাধুলোয় ভাল ছিল সে।

ক্রাইসলার থেকে আমার ব্যাগগুলো নিয়ে এলাম আমি, ইতিমধ্যে উঁচু আর নরম বিছানায় নতুন চাদর বিছিয়ে দিয়েছে রাফেলা। বাথরুমটা কোনদিকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল ও।

বৃষ্টির রিমঝিম শুনছি, এরমধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। তারপর কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পাচ্ছি নিস্তব্ধ বাড়ির কোথাও যেন ফিসফিস করে কথা বলছে কে। একটু পরই বুঝলাম অস্ফুট কণ্ঠস্বরটা রাফেলার।

আণ্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় এবং খালি পায়ে বেডরুমের দরজাটা নিঃশব্দে খুললাম। পা টিপে টিপে প্যাসেজের শেষ

মাথায় সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। নিচে হলের মাঝখানে একটা ল্যাম্প জ্বলতে দেখছি, এবং দেয়ালে ঝোলানো একটা টেলিফোনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাফেলা। রিসিভারের মাউথপীসটা দু'হাত দিয়ে আড়াল করে ধরে অস্ফুট স্বরে কথা বলছে ও, শব্দগুলো বুঝতে পারছি না। আলোটা ওর পেছনে, স্বচ্ছ ফ্রকটা তাই ভাল দেখা যাচ্ছে না, নগ্ন দেখাচ্ছে ওকে।

পিপিংটমের মত তাকিয়ে আছি ওর দিকে। ওর শরীরের চামড়ায় চকচক করছে ল্যাম্পের আলো। ট্র্যান্সপারেন্ট কাপড়ের ভেতর রহস্যময় খাদ, বাঁক আর ছায়া দেখে উত্তেজনা বোধ করছি।

চোখ ফিরিয়ে নিতে কষ্ট হল একটু। আবার পা টিপে ফিরে এলাম বেডরুমে। ভাবছি, এত রাতে কাকে টেলিফোন করছে ও?

অশান্তি লাগছে। কিন্তু ঘুম এসে মুক্তি দিল আমাকে।

ভোরের দিকে থেমেছে বৃষ্টি। তাজা বাতাসের লোভে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি রাস্তাঘাট কাদায় থকথক করছে, খানাখন্দ ভরাট হয়ে গেছে পানিতে।

ব্রেকফাস্টের সময় রাতের চেয়ে আরও সহজ লাগছে রাফেলাকে। হালকা কথা এবং মৃদু হাসির মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা।

একসময় বলল, 'কথা দিয়েছি সাহায্য করব। কিন্তু কি করতে পারি আমি, বলো?'

'কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো।'

'যদি জানা থাকে। জিজ্ঞেস করো।'

কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করছিল নিরো, সে যে সেন্ট মেরী দ্বীপে যাচ্ছে তা নিজের চেয়ে এক বছরের বড় বোনকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। রাফেলা প্রশ্ন করতে তাকে জানিয়েছিল, পর্তুগীজ মোজাম্বিকে কাবোরা-বাসা ড্যামে এক প্রস্থ

ইলেকট্রনিক আণ্ডারওয়াটার ইকুইপমেন্ট বসাবার একটা কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছে সে। সরঞ্জাম নিয়ে রওনা হয় নিরো, রাফেলা তাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়। যতদূর জানা আছে ওর, নিরো একাই যাচ্ছিল। ব্রাইটনের কারখানায় এসে পুলিস খবর দিয়ে যায় নিরো খুন হয়েছে। খবরের কাগজে ছাপা রিপোর্টও পড়েছে ও। এর বেশি কিছুই জানা নেই ওর।

'নিরোর কোন চিঠি পাওনি তুমি?'

'একটা চিঠি বা একটা খবর-কিচ্ছু পাইনি।'

বুঝলাম নেকড়ে-জোড়া নিরোর চিঠিপত্র মাঝপথে কোথাও থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা রেখেছিল। নকল রাফেলা যে চিঠিটা দেখিয়েছিল আমাকে সেটা নিরোরই লেখা ছিল।

'গোটা বিষয়টা কেমন যেন ধোঁয়াটে, কিছুই বুঝছি না ভাল করে। কোথাও কি বোকামি করছি আমি?'

'না,' একটা চুরুট বের করে প্রায় ধরিয়ে ফেলেছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হতে তাকালাম ওর দিকে। 'চুরুট ধরালে অসুবিধে হবে তোমার?'

'না,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। চুরুট ফোঁকা ছেড়ে দিতে হবে না ভেবে মনটা সাংঘাতিক খুশি হয়ে উঠল।

'যতদূর বোঝা যাচ্ছে, বড় কিছু একটা আবিষ্কারের আশায় সেন্ট মেরী দ্বীপে গিয়েছিল নিরো,' বললাম ওকে। 'উদ্ধার করার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার হয় ওর, তাই পার্টনার জোগাড় করে, কিন্তু তার এই পার্টনাররা লোক ভাল ছিল না। কোত্থেকে জিনিসটা উদ্ধার করতে হবে তা জানতে পেরেছে মনে করা মাত্র তারা আমাকে এবং নিরোকে খুন করতে চেষ্টা করে। আমি বেঁচে যাই, কিন্তু নিরো মারা যায়। তারপর মারা যায় তারা দু'জনও। কিন্তু তাদের বড়কর্তারা রয়ে গেছে। সেই কর্তারা যখন দেখল প্রতিনিধিরা ব্যর্থ হয়েছে এবং লণ্ডনে তাদের আর কোনদিন ফিরে আসার সম্ভাবনাও নেই তখন তারা একটা মেয়েকে তোমার

পরিচয় দিয়ে পাঠাল সেন্ট মেরীতে। জিনিসটা কোথায় আছে তা জানতে পেরেছে মনে করে এই মেয়েটিও একটা ফাঁদ পেতে আমাকে খুন করার আয়োজন সম্পন্ন করল, এবং ফিরে এল এখানে। ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে, বুঝতে পারছ?'

'বিগ গাল আইল্যাণ্ডে লোক পাঠাবে এবার ওরা।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এবং এবারও সম্পূর্ণ নিরাশ হতে হবে ওদেরকে।'

আমাদের কফির কাপ দুটো আরেকবার ভরে দিল রাফেলা। লক্ষ করছি, আজ সকালে মেকআপ ব্যবহার করেছে ও, কিন্তু তা এতই সামান্য যে ওর স্বচ্ছ গভীর লাবণ্য তাতে ঢাকা না পড়ে আরও যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ওর সৌন্দর্য সম্পর্কে এখন আবার একবার সিদ্ধান্ত বদল করলাম আমি। পৃথিবীতে ওর মত সুন্দরী মেয়ে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। তাও ভোরের ম্লান আলোয় দেখছি ওকে।

কফির কাপের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে ও। ফর্সা, সুগঠিত ওর হাত দুটো টেবিল ক্লথের ওপর আমার হাতের পাশে পড়ে রয়েছে। সেগুলো আমার ধরতে ইচ্ছে করছে।

'উদ্ধার করতে চাইছে ওরা-কি সেটা, রানা? এবং কারা ওরা?'

'চমৎকার দুটো প্রশ্ন। এগুলোর উত্তর পাবার কিছু কিছু সূত্র জানা আছে আমার। প্রথম প্রশ্ন, কি জিনিস উদ্ধার করতে চেয়েছিল নিরো? এর উত্তর জানার পর তার খুনীদের পরিচয় জানতে চেষ্টা করব আমরা।'

'এ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আমার,' মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রাখল ও। 'কি সূত্র পেয়েছ তুমি?'

'জাহাজের বেল। বেলের গায়ে নকশা এবং খোদাই করা অক্ষর।'

'কি অর্থ ওগুলোর?'

'এখনও জানি না, কিন্তু চেষ্টা করলে জানতে পারব।' ঝোঁকটা

সামলাতে না পেরে ওর হাতে হাত রাখলাম আমি। হাতটা গরম, এবং একটা দৃঢ়তা অনুভব করছি। 'সবচেয়ে আগে এখানে নিরোর কামরা আর ব্রাইটনে ওর দোকান ঘরটা চেক করতে চাই আমি। কোন না কোন সূত্র পাবই আমরা।'

হাতটা সরিয়ে নেয়নি ও। বলল, 'বেশ। প্রথমে কি আমরা দোকানে যাব? ইতিমধ্যে পুলিস একবার তল্লাশি চালিয়ে গেছে। তবে ওদের চোখে হয়ত ধরা পড়েনি সূত্রগুলো, আদৌ যদি কিছু থাকে ওখানে।'

'নিশ্চয়ই আছে,' আশা প্রকাশ করলাম আমি। 'চলো, বেরিয়ে পড়ি। আমি তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াব।' মৃদু চাপ দিলাম ওর হাতে। হাতটা আমার মুঠোর ভেতর ঘুরিয়ে সিধে করে নিল ও, তারপর পাল্টা চাপ দিল একটু।

'লাঞ্চ-বেশ, ওটা তোমাকে নিয়ে যাবার পারিশ্রমিক,' হাসল ও।

কিন্তু আমার হাতে ওর হাতের সাড়া পেয়ে এমন বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছি যে কথা বলতে পারছি না। গলা শুকিয়ে গেছে। হার্টবিট সাংঘাতিক বেড়ে গেছে, যেন এইমাত্র এক মাইল দৌড়ে এসেছি। ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও।

'এসো, ব্রেকফাস্টের ডিশগুলো ধুয়ে ফেলি।'

সেন্ট মেরীর মেয়েরা এখন যদি দেখে মিস্টার রানা থালা-বাসন ধুচ্ছে সাথে সাথে পাংচার হয়ে যাবে আমার সব প্রেস্টিজ।

পেছনের দরজা দিয়ে দোকানে নিয়ে গেল আমাকে রাফেলা। উঠনটা ছোট, ডাইভিং সরঞ্জাম আর পানির নিচ থেকে পাওয়া নানা ধরনের জিনিসের সমাবেশ এখানে। অনেকগুলো বাতিল এয়ার বটল, একটা পোর্টেবল কমপ্রেশার, তামার পোর্টহোল ছাড়াও রয়েছে বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে উদ্ধার করা জিনিস, এমন কি সবগুলো দাঁতসহ একটা কিলার হোয়েলের চোয়াল পর্যন্ত দেখতে

পাচ্ছি।

'অনেক দিন আসা হয়নি এদিকে,' দোকানের পেছনের দরজা খোলার সময় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল রাফেলা। 'নিরোই যখন নেই...' কাঁধ ঝাঁকাল ও, 'এসব বিক্রি করে দিয়ে দোকানটা উঠিয়ে দেবার কথা ভাবতে গেলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে। অন্তত লীজটা রি-সেল করা যেতে পারে।'

'শুরু করি আমি, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। আমি বরং স্টোভে বসিয়ে দিই কেটলিটা।'

উঠন থেকে শুরু করলাম। লোহা-লক্কড়ের স্তূপ নাড়াচাড়া করে তাৎপর্যপূর্ণ কিছুই পড়ল না চোখে। এরপর দোকানে ঢুকে সী-শেল আর হাঙ্গরের দাঁতের ভিড়ে হারিয়ে ফেললাম নিজেকে। শো-কেসেও পেলাম না কিছু। ডেস্কের ড্রয়ারগুলো পরীক্ষা করছি, এই সময় কফি নিয়ে ভেতরে ঢুকল রাফেলা। ডেস্কের ধারে আমার কাপটা রেখে তিমির একটা চোয়ালের ওপর বসল ও।

ইনভয়েস, চিঠি, ফাইল-কিছু বাদ না দিয়ে ধৈর্যের সাথে সব পড়ছি এক এক করে। অবশেষে নিরাশ হয়ে মুখ তুললাম।

'কিছুই পেলে না?' জানতে চাইল ও।

'কিছুই পেলাম না,' রিস্টওয়াচ দেখলাম আমি। 'চলো, লাঞ্চের সময় হয়েছে।'

দোকান বন্ধ করে একটা ইংলিশ রেস্তোরাঁয় এলাম আমরা। এক বোতল দামি হুইস্কির সাথে লবস্টারের অর্ডার দিলাম আমি। দাম শুনে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হল, কিন্তু ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর খেতে বসে বাকি সময়টা প্রচুর হাসলাম আমরা, এবং এর পেছনে সবটাই মদের কৃতিত্ব নয়। পরস্পরকে আমরা আরও ভালভাবে জানছি এবং আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছি। প্রথম প্রেমে পড়ছে মাসুদ রানা।

লাঞ্চের পর সী-ভিউয়ে ফিরে এলাম আমরা। কোন রকম

আলস্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে সোজা নিরোর কামরায় ঢুকে পড়লাম আমি। 'এটাই আমাদের শেষ সুযোগ, কিছু পাওয়ার সম্ভাবনাও সবচেয়ে বেশি এখানে। গোপন কিছু যদি আদৌ থাকে, নিজের শোবার কামরাতেই তা রাখার কথা নিরোর।' কিন্তু বুঝতে পারছি, সামনে আমার লম্বা কাজ পড়ে রয়েছে। কয়েকশো বই আর পত্রিকা দেখতে পাচ্ছি কামরার ভেতর। বেশির ভাগই আমেরিকান আরগোসি, ট্রাইডেন্ট, দ্য ডাইভার এবং অন্যান্য ডাইভিং প্রকাশনা। বিছানার পায়ের কাছে ফাইল ঠাসা একটা শেলফও দেখতে পাচ্ছি।

'কাজ করো, তোমাকে আর বিরক্ত করব না,' বলে চলে গেল রাফেলা।

একটা শেলফের যাবতীয় বইপত্র রিডিং টেবিলে নিয়ে এসে কাজে বসলাম। সাথে সাথে টের পেলাম যা ভেবেছি তার চেয়ে শত গুণ কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ কাজ এটা। হাতে পেন্সিল নিয়ে পড়তে বসে যারা, নিরো ছিল তাদেরই দলের একজন। প্রতিটি বই এবং পত্রিকার মার্জিনে নোট লিখেছে সে, লাইনের নিচে দাগ টেনেছে, পাশে মন্তব্য লিখেছে, বিস্ময় এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকেছে। কাজের বোঝা দেখে ভয় পেলাম, কিন্তু পিছু হটলাম না। অসীম ধৈর্যের সাথে পড়ে যাচ্ছি সব, সেন্ট মেরীর সাথে কোথাও সম্পর্ক আছে কিনা খুঁজছি।

রাত আটটায় এক কাপ কফি দিয়ে গেল রাফেলা। আমার করুণ দশা দেখে ভয় পেল সম্ভবত, কোন কথা না বলে চলে গেল নিঃশব্দে। বিছানার পায়ের দিকের শেলফটা থেকে ফাইল নামিয়ে নতুন উদ্যমে কাজে হাত দিয়েছি আমি আবার। প্রথম ফাইলটায় রয়েছে জাহাজ এবং সমুদ্র বিষয়ে পেপারকাটিং। দ্বিতীয় ফাইলটা চামড়া দিয়ে মোড়া, কিন্তু কোন লেবেল সাঁটা নেই গায়ে। দেখেই বুঝলাম, এটা সাধারণ একটা ফাইল নয়, ভেতরে এনভেলাপে ঢোকানো ষোলোটা চিঠি রয়েছে, এনভেলাপের গায়ে স্ট্যাম্পগুলো

সাঁটা রয়েছে এখনও। প্রত্যেকটির গায়ে একই ঠিকানা-মেসার্স পার্কার অ্যাণ্ড উইলটন, ফেনচার্চ স্ট্রীট। প্রত্যেকটা চিঠি আলাদা হস্তাক্ষর বহন করছে, সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে পাঠানো হয়েছে এগুলো-কানাডা, সাউথ আফ্রিকা, ভারত-এবং উনিশ শতকের পোস্টেজ স্ট্যাম্পগুলো সম্ভবত ভাল দামে বিক্রি হবে এখন।

দুটো চিঠি পড়ার পর বুঝলাম মেসার্স পার্কার অ্যাণ্ড উইলটন একটা এজেন্সি, কুইন ভিক্টোরিয়ার অধীনস্থ কর্মচারীরা এদের মক্কেল। চিঠিগুলোয় সম্পত্তি, টাকা, কার্গো এবং বিভিন্ন বিষয়ের নিরাপত্তা বিধান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চিঠিগুলো লেখা হয়েছে আঠারোশো সাতান্ন সালের আগস্ট থেকে আঠারোশো আটান্ন সালের জুলাইয়ের মধ্যে। যাই হোক, দশ নাম্বার চিঠিটা পড়তে শুরু করে এমন কিছু চোখে পড়ল আমার, বুকের ভেতর ছলকে উঠল রক্ত।

চিঠির একজায়গায় দুটো শব্দের নিচে লাল কালির দাগ টানা হয়েছে, এবং চিঠির মার্জিনে একটা নোট রয়েছে। নোটটা নিরোর লেখা, চিনতে পারছি। দুর্বোধ্য লাগছে-B. Mus. E 6914 (8).

তবে শব্দ দুটোই আমাকে নাড়া দিয়েছে। ইংরেজি শব্দ ডন লাইট, বাংলা করলে দাঁড়ায়-ভোরের আলো।

ডন লাইট-শব্দ দুটোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আর ভাবছি এর আগে কোথায় যেন শুনেছি এগুলো। কখন, কোথায়, কার মুখে-কিছুই এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না-তবে শুনেছি।

ভারতের বোম্বে শহর থেকে পাঠানো হয়েছে চিঠিটা। তারিখ দেয়া হয়েছে-১৬ সেপ্টেম্বর, আঠারোশো সাতান্ন সাল। প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলাম চিঠিটা।

প্রিয় উইলটন

অনারেবল কোম্পানির জাহাজ "ভোরের আলো" এ

মাসের পঁচিশ তারিখে এখানকার বন্দর ত্যাগ করছে এবং যথাসময়ে পোর্ট অভ লণ্ডনে কোম্পানির নিজস্ব জেটিতে নোঙর ফেলবে। ভোরের আলোতে পাঁচটা লাগেজ রয়েছে আমার, তোমার নামে এবং তোমার লণ্ডনের ঠিকানায় পাঠাচ্ছি। অত্যন্ত গুরুত্ব এবং যত্নের সাথে এই লাগেজের দায়িত্ব নেবে তুমি এবং তোমার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে নিরাপদ গুদামে রাখার ব্যবস্থা করবে। লাগেজগুলো সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ ঠিকমত বুঝে পেলে কিনা তা পাবার সাথে সাথে জানাবে আমাকে।

তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু,
কর্নেল স্যার রজার গুডচাইল্ড।
অফিসার কমাণ্ডিং একশো একতম রেজিমেন্ট
কুইনস ওউন ইণ্ডিয়া রাইফেলস।

এই চিঠি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছেন হার ম্যাজেস্টির ফ্রিগেট প্যানথারের ক্যাপ্টেন।

কাগজ ধরা আমার হাতটা উত্তেজনায় কাঁপছে। কিভাবে যেন বুঝতে পেরে গেছি আসল সূত্রটা পেয়ে গেছি আমি। এটাই সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি। অত্যন্ত সাবধানে এবং যত্নের সাথে রিডিং টেবিলে রাখলাম চিঠিটা, রূপোর একটা পেপার নাইফ চাপা দিলাম সেটার ওপর। তারপর ধীরে ধীরে, গভীর মনোযোগ দিয়ে আবার পড়তে শুরু করলাম লেখাটা। কিন্তু চট করে মনোযোগ কেড়ে নিল একটা বিঘ্ন। গলি থেকে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসছে। গেট পেরিয়ে উঠনে ঢোকার সময় জানালার গায়ে হেডলাইটের এক ঝলক আলো দেখা গেল। বাঁক নিয়ে বাড়ির এক প্রান্তে থামল সেটা।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে আমার। শুনছি। থেমে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। ঘটাং করে বন্ধ হল গাড়ির দরজা।

তারপর কিছুক্ষণ আর কোন শব্দ নেই।

একটু পর একটা চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তার সাথে বেশ ভারী একটা ধমকানির সুর। পুরুষ কণ্ঠ। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছি আমি।

অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল রাফেলা। নিস্তব্ধ বাড়িতে ওর চিৎকারটা পরিষ্কার এবং ভৌতিক লাগল কানে, বুকের ভেতর গরম ছুরি ঢোকাবার মত একটা অনুভূতি হল আমার। প্রতিরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি এমন প্রচণ্ডভাবে জেগে উঠল আমার ভেতর যে সিঁড়ি ভেঙে হলে নামার পর প্রথম খেয়াল করলাম হাঁটতে শুরু করেছি আমি।

কিচেনের দরজাটা খোলা, ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। দু'জন লোক রাফেলার সাথে। বয়স্ক লোকটার পরনে উটের পশম দিয়ে তৈরি একটা টপকোট এবং মাথায় সুতির একটা ক্যাপ। লোকটার চোখ দুটো কোটরের ভেতরে সেঁধিয়ে আছে, মুখে চর্বির ভাঁজ।

রাফেলার বাঁ হাত মুচড়ে দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখান পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে লোকটা, গ্যাস স্টোভের পাশে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে রেখেছে ওকে।

অপর লোকটা অল্পবয়স্ক রোগা, মাথাটা খালি, খড়ের মত হলদেটে চুল দুই কাঁধ প্রায় ঢেকে রেখেছে। পরনে একটা লেদার জ্যাকেট। অদ্ভুত স্থির একটা হাসি দেখতে পাচ্ছি তার ঠোঁটে। রাফেলার ডান হাতটা শক্ত করে ধরে আছে সে। গ্যাস রিঙের আগুনের দিকে ধীরে ধীরে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটাকে।

মরিয়া হয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে রাফেলা। কিন্তু দু'জনের সাথে পারছে না ও। ধস্তাধস্তিতে চুল খুলে গেল ওর, কাঁধের ওপর দিয়ে নেমে এল নাভির নিচ পর্যন্ত।

'ধীরে, বৎস,' মাথায় ক্যাপ পরা লোকটা ভারী, চাপা গলায় বলল, 'একটু সময় দাও ওকে, চিন্তা করে দেখুক!'

নীল আগুনের শিখাগুলো হিস হিস করছে। ছোকরার মুখের

স্থির হাসিটা একটুও বদলাল না, হঠাৎ চাপ দিয়ে রাফেলার হাতটা নামিয়ে ফেলল সে, আগুনের ওপর কিলবিল করছিল আঙুলগুলো, আঁচ লাগতেই গুটিয়ে একটা মুঠো পাকিয়ে গেল-আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল রাফেলার গলা থেকে।

'চেঁচাও, যত পার চেঁচাও,' মাথার হলুদ চুল নেড়ে ফিসফিস করে বলছে ছোকরা। 'তোমার চিৎকার শোনার জন্যে কেউ নেই আশপাশে।'

'আমি?' চৌকাঠ পেরিয়ে বললাম। ঝট করে দু'জনেই ফিরল ওরা আমার দিকে, চোখেমুখে বিস্ময় এবং কৌতুকের ভাব।

'কে...' রাফেলার হাত ছেড়ে দিয়েই ব্যাক পকেটে হাত ঢোকাতে শুরু করেছে ছোকরাটা।

দুটো ঘুসি মারলাম ওকে, বাঁ দিকের পাঁজরে আর মাথার ডান দিকে। কিন্তু ছোকরার শরীরে মাংস না থাকায় ঘুসি দুটো ঠিক জমল না, বিশেষ তৃপ্তি লাভ করা থেকে বঞ্চিত হলাম আমি, তবে এতেই পড়ে গেল সে। প্রথমে একটা চেয়ারের ওপর তারপর সেটাকে নিয়ে মেঝেতে।

টপকোটের দিকে ফিরলাম দ্রুত।

নিজের সামনে এখনও রাফেলাকে ধরে রেখেছে সে, দু'হাতের প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল ওকে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছে রাফেলাও, এই সময় ওকে ধরে ফেলে দু'জনেরই পতন কোনরকমে ঠেকালাম।

ঘুরল লোকটা, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল কিচেন থেকে।

রাফেলাকে ছেড়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল আমার। দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম উঠনে, ইতিমধ্যে ট্রায়াম্প স্পোর্টস কারের দিকে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছে টপকোট। সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত হঠাৎ এক সেকেণ্ড থেমে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন দিকে তাকাল সে।

পরিষ্কার বুঝে নিলাম, হিসাব কষে নিল লোকটা। গাড়ির

কাছে পৌঁছে সেটাকে গেটের দিকে ঘুরিয়ে নেবার সময় নেই ওর, তার আগেই পৌঁছে যাব আমি। বাঁ দিকে ঘুরে গেল সে, গেট পেরিয়ে গলির অন্ধকার মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গলিতে বেরিয়ে এসে প্রথমে কিছুই দেখতে পেলাম না অন্ধকারে। থকথকে কাদা আর খানাখন্দে জমে ওঠা পানির ওপর দিয়ে ছুটছি, নিজের পায়ের দ্রুত শব্দ ছাড়া আর কিছু কানেও ঢুকছে না। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলাম ওকে সামনে। পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে সামলে নিল শেষ মুহূর্তে। কিন্তু বুঝতে পেরেছে, ওর ঠিক পেছনে চলে এসেছি আমি।

অপ্রত্যাশিতভাবে আধপাক ঘুরে দাঁড়াল সে। খট করে খাপ থেকে ছুরির ফলা বেরিয়ে আসার শব্দ পেলাম। ঘাড়টা নিচু করে ফেলল দ্রুত, ডান হাতে ধরা ছুরিটা শরীরের পাশে চলে গেছে। ছুটে যাচ্ছি আমি এখন। শুধু ছুরিটা সামনে বাড়িয়ে দিলেই হয় ওর। কিন্তু তার দরকার হবে বলে মনে করেনি ও, বুঝতে পারলাম আমি না থামায় ওকে চমকে উঠে মৃদু ঝাঁকি খেতে দেখে।

এটা ওর অভিজ্ঞতার বাইরে। ধারাল ইস্পাতের ঝিলিক দেখে বেশির ভাগ লোক নিশ্চল পাথর হয়ে যায়। ছুরি ধরা হাতটা বিদ্যুৎ গতিতে সামনে বাড়িয়ে দিল সে, কিন্তু তবু এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ দেরি করে ফেলেছে।

শরীরটার চেয়ে আগে পৌঁছুল আমার হাত ওর গায়ে। একহাতে ওর কব্জি ধরে ফেলে, একই সাথে ওর বগলের নিচে ঘুসি মারলাম। ছুরিটা পড়ে গেল ওর হাত থেকে, তারপরই আমার কোমরের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল ও। বৃষ্টিতে নরম কাদা হয়ে গেছে মাটি, তার ওপর পিঠ দিয়ে দড়াম করে পড়ল ভারী শরীরটা। একটা ভাঁজ করা হাঁটু ওর পেটে রেখে শরীরের ভার চাপিয়ে দিলাম। হুশ করে সশব্দে ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে এল ওর। জরায়ুর ভ্রূণের মত কুঁকড়ে গেল ও, বাতাসের

অভাবে খাবি খাচ্ছে। মাথার ক্যাপটা সরিয়ে মুঠো করে ধরলাম চুলগুলো, তারপর হলুদ কাদায় ডুবিয়ে দিতে শুরু করলাম মুখটা।

'মেয়েদের গায়ে কেউ হাত তুললে আমার মাথার ঠিক থাকে না,' আলাপের সুরে বললাম ওকে। ঠিক তখনই আমার পেছনে জ্যান্ত হয়ে উঠল ট্রায়াম্পের ইঞ্জিন।

গেটের উল্টোদিকের দেয়ালে পড়ল হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো। দ্রুত বেরিয়ে এল গাড়িটা, বাঁক নেবার সময় নাকটা ঘষা খেল দেয়ালের সাথে। টপকোটকে ছেড়ে দিয়ে চোখের সামনে হাত তুললাম আমি। ছুটলাম গাড়িটার দিকে। কিন্তু ইতিমধ্যে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সোজা হয়ে গেছে ট্রায়াম্প, সোজা এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

ডাইভ দিয়ে পড়লাম কাদার ওপর, গড়িয়ে খোলা ড্রেনের কিনারা থেকে ঝপ করে নিচে নামলাম। ট্রায়াম্পের একটা চাকা কাদা-পানি ছিটিয়ে সোজা আমার মাথা লক্ষ্য করে ছুটে আসছে দেখে গলির লেভেল থেকে দ্রুত নামিয়ে নিলাম সেটা, প্রায় একই সময়ে ড্রেনের অপর দিকের ইঁটের দেয়ালে গুঁতো মারল গাড়ির নাক। চাকাটা আমার মাথার ওপর বন বন করে ঘুরছে। গাড়ির তোবড়ানো নাক দেয়ালের সাথে ঘষা খেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, দ্রুত সোজা করে নিল হলুদ চুল গাড়িটাকে। মাথা তুলে দেখলাম টপকোটের পাশে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রায়াম্প, দরজাটা খুলে গেছে আগেই। কাদা থেকে মুখ তুলে উঠে বসছে টপকোট।

ড্রেন থেকে উঠে দৌড়ুতে শুরু করেছি, এরই মধ্যে আবার গতি সঞ্চার হল ট্রায়াম্পে। পেছনের চাকা থেকে কাদা-পানি ছিটকে এসে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিল আমার। খানিক দূর ধাওয়া করে নিরাশ হলাম আমি। মাটি ছেড়ে ইঁট-বিছানো রাস্তায় উঠে গেছে ট্রায়াম্প, গতি বেড়ে গেছে তার। দৌড়ে বাড়ির দিকে ফেরার সময় ক্রাইসলারের চাবির জন্যে ভিজে পকেট হাতড়াচ্ছি।

মনে পড়ল, নিরোর কামরায় টেবিলের ওপর রেখে এসেছি সেটা।

খোলা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাফেলা। পোড়া হাতটা বুকের কাছে তুলে অপর হাত দিয়ে ধরে রেখেছে, মুখের দু'পাশে এবং কাঁধে কালো চুল আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বাতাসে। কাঁধের কাছ থেকে কনুই পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে ওর জার্সি।

'চেষ্টা করেছি, রানা,' এখনও হাঁপাচ্ছে ও। 'কিন্তু আটকাতে পারলাম না ওকে।'

'কতটা পুড়েছে?' রাফেলার অবস্থা দেখে গাড়ি নিয়ে ট্রায়াম্পকে ধাওয়া করার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলাম।

'জ্বালা করছে।'

'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে...'

দ্রুত মাথা দোলাল ও। 'না,' হাসল জোর করে। 'অতটা সিরিয়াস কিছু নয়।' কিন্তু ব্যথায় ঠোঁট বেঁকে গেল ওর।

নিরোর কামরায় গিয়ে আমার মেডিসিন কিট থেকে দুটো পেইন কিলার আর একটা ঘুমের ট্যাবলেট এনে দিলাম ওকে। কিন্তু আপত্তি জানাল ও, বলল, 'এমন কিছু হয়নি যে ওষুধ খেতে হবে।'

'নাক চেপে ধরে আঙুল দিয়ে ঠেলে দেব গলার ভেতর, তাই চাও?' প্রশ্নটা শুনে প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়ল ও, হেসে ফেলল, তারপর গিলে নিল ট্যাবলেটগুলো।

'গোসল করবে না?' বলল ও।

হঠাৎ খেয়াল হল, কাদা মেখে ভূত সেজে আছি আমি, এবং ঠাণ্ডায় কাঁপছি। গোসল সেরে বাথরূম থেকে বেরিয়ে কিচেনে ঢুকে দেখি ঘুমের ট্যাবলেট এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে, চোখের পাতা নেতিয়ে পড়তে চাইছে রাফেলার। তবে দু'জনের জন্যে কফি তৈরি করেছে ও। পরস্পরের সামনে বসে খেলাম সেটা আমরা।

‘কি চাইছিল ওরা?’ জানতে চাইলাম। ‘ঠিক কি বলছিল তোমাকে?’

‘ওদের ধারণা নিরো সেন্ট মেরী দ্বীপে কেন গিয়েছিল তা আমি জানি। সেটাই জানতে চাইছিল।’

ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলাম। কোথায় যেন একটা গরমিল রয়েছে, অর্থটা পরিষ্কার নয়। উদ্বিগ্ন হলাম।

‘মনে হয়...’ জড়িয়ে গেল রাফেলার কথা, এবং হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে উঠল ও। ‘এই! কি খাইয়েছ তুমি আমাকে?’

টেবিল ঘুরে এগিয়ে গেলাম আমি। ধরে ফেললাম ওকে। হাঁটু আর গলার পেছনে হাত রেখে শূন্যে তুলে নেবার সময় দুর্বল ভাবে প্রতিবাদ করল ও। বুকে তুলে ওর কামরায় নিয়ে গেলাম ওকে। কামরাটায় মেয়েলি রুচির ছাপ লক্ষ করলাম। দেয়ালগুলো গোলাপ ফুল ছাপা কাগজ দিয়ে ঢাকা। বিছানায় শুইয়ে খুলে দিলাম পায়ের জুতো জোড়া। তারপর চাদর টেনে ঢেকে দিলাম পা থেকে গলা পর্যন্ত।

একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজল ও। ‘হাতের কাছে রাখা দরকার তোমাকে,’ ফিসফিস করে বলল ও, ‘খুব কাজের লোক তুমি।’

প্রশংসায় উৎসাহিত হয়ে বিছানার কিনারায় বসলাম আমি, মাথায় হাত বুলিয়ে চুলগুলো পরিপাটি করলাম, তারপর কপালে মৃদু চাপড় মেরে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি ওকে। ওর কপালের চামড়া উষ্ণ ভেলভেটের মত লাগছে হাতে। এক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। আলো নিবিয়ে দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ সিদ্ধান্ত পাল্টালাম।

নিজের পায়ের জুতো খুলে ফেলে বিছানায় উঠে পড়লাম। তারপর ঢুকে পড়লাম চাদরের নিচে। ঘুমের মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাশ ফিরল ও, আমার দুই হাতের মাঝখানে চলে এল। ঘনিষ্ঠ ভাবে ধরে থাকলাম ওকে।

অদ্ভুত একটা তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমিও। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল আমার। গলার সাথে সেঁটে আছে রাফেলার মুখ, একটা পা আর একটা হাত তুলে দিয়েছে ও আমার ওপর। ওর চুলগুলো নরম লাগছে মুখে, সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

ওকে না জাগিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম, চুমো খেলাম ওর কপালে। পায়ে জুতো গলিয়ে নিঃশব্দে ফিরে এলাম নিরোর কামরায়। এই প্রথম পুরো একটা রাত সুন্দরী এক মেয়ের সাথে এক বিছানায় কাটালাম আমি, যে-রাতে ঘুমানো ছাড়া আর কিছু করিনি। আশ্চর্য এক নির্মলতা অনুভব করলাম, মনে হচ্ছে বাতাস ভরা বেলুনের মত ফুলে উঠেছি আমি, হালকা হয়ে গেছি।

ছয়

নিরোর কামরায় ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম সেভাবেই পেলাম চিঠিটা। বাথরুমে যাবার আগে আরেকবার পড়লাম সেটা। কাগজটার মার্জিনে পেন্সিলের দাগটানা নোটটা বিমূঢ় করে তুলেছে আমাকে। B. Mus. E 6914 (8)-কি অর্থ এটার, দাড়ি কামাতে বসে ভাবছি।

বৃষ্টি থেমে গেছে, প্রায় পরিষ্কার হয়ে এসেছে আকাশ। নিচে নেমে কিচেনে ঢুকে দেখি ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে রাফেলা।

‘হাতের কি অবস্থা?’

‘জ্বালা-পোড়া শুরু হয়েছে আবার,’ স্বীকার করল ও।

‘লণ্ডনে যাবার পথে একজন ডাক্তারকে দেখাতে হবে।’

‘কে বলল তোমাকে লণ্ডন যাচ্ছি আমি?’ টোস্টে মাখন লাগাচ্ছে রাফেলা, খুব সাবধানে প্রশ্নটা করল ও।

‘কেউ বলেনি, দুটো কারণে বুঝতে পারছি যেতে হবে তোমাকে।’

‘যেমন?’

‘এখানে তোমার থাকা উচিত নয়, নেকড়ের দল আবার ফিরে

আসবে,' দ্রুত মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে, কিন্তু কিছু বলল না। 'আরেকটা কারণ, আমাকে তুমি সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছ-এখন সূত্র অনুসরণ করতে হলে লণ্ডনে যেতে হয়।'

'কি সূত্র পেয়েছ তুমি?'

ব্রেকফাস্টে বসে নিরোর ফাইল থেকে পাওয়া চিঠিটা দেখালাম ওকে।

'যোগসূত্রটা কোথায় তা তো বুঝছি না,' মোটেও উৎসাহ দেখাল না ও।

'আমার কাছেও ঠিক পরিষ্কার নয় ব্যাপারটা,' খোলাখুলি স্বীকার করলাম। চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লাম একমুখ, প্রতিক্রিয়া হল জাদুমন্ত্রের মত। 'কিন্তু ভোরের আলো শব্দ দুটো দেখামাত্র চমকে উঠেছি আমি...' হঠাৎ চুপ করে গেলাম। 'মাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম তারপর। 'ইউরেকা! পেয়েছি। ভোরের আলো!'

'মানে?'

কিছু একটা বলল রাফেলা, কিন্তু কি বলল সেদিকে মনোযোগ নেই আমার এই মুহূর্তে। জলকুমারীর ব্রিজে ভেন্টিলেটারের নিচে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে শুনছিলাম নিরো আর ব্ল্যাঙ্কের কথাবার্তা।

'ভোরের আলো পেতে হলে...' নিরোর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, পরিষ্কার বাজছে এখনও কানে।

ব্যস্ততার সাথে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছি ব্যাপারটা, হঠাৎ হেসে উঠল রাফেলা। আমার উত্তেজনার ছোঁয়া ওকেও লেগেছে, কিন্তু তাড়াহুড়োর সাথে কি বলছি তার কিছুই বুঝতে পারছে না ও। 'এই,' প্রতিবাদের সুরে বলল ও, 'ভেবেচিন্তে, ধীরেসুস্থে বুঝিয়ে বলো।'

আবার শুরু করলাম নতুন করে, কিন্তু অর্ধেকটা ব্যাখ্যা করে চুপ করে গেলাম, নিঃশব্দে তাকিয়ে আছি ওর দিকে।

'আবার কি হল?' কিছুটা কৌতুক, কিছুটা হাল ছেড়ে দেয়ার

ভঙ্গিতে জানতে চাইল ও। 'আমাকেও তুমি পাগল করে ছাড়বে দেখছি।'

রুটি কাটার ছুরিটা ছোঁ মেরে তুলে নিলাম টেবিল থেকে। 'ঘন্টাটার কথা মনে আছে তোমার? যেটার কথা বলেছিলাম তোমাকে? গানফায়ার রীফ থেকে যেটা তুলেছিল নিরো?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। ঢং ঢং করে বাজছে নাকি ওটা, শুনতে পাচ্ছ?'

হাসছি না ওর রসিকতায়। বললাম, 'তোমাকে বলেছিলাম বেলটার গায়ে খোদাই করা কিছু অক্ষর আছে, তার বেশির ভাগই খেয়ে ফেলেছে বালি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রাফেলার। এতক্ষণে গুরুত্ব দিচ্ছে আমার কথায়। 'হ্যাঁ। বলে যাও।'

মাখনের বড় টুকরোর গায়ে ছুরি দিয়ে লিখলাম-VVN L-ঠিক ব্রোঞ্জের গায়ে যেভাবে খোদাই করা দেখেছি অক্ষর চারটে।

'আধ-খাওয়া অক্ষরগুলো ঠিক এই রকম দেখতে,' বললাম ওকে। 'তখন এর কোন অর্থ বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন...' দ্রুত বাকি অক্ষরগুলো জায়গা মত বসিয়ে শব্দ দুটো পূরণ করলাম, ফলে শব্দ দুটো দাঁড়াল এই রকম-DAWN LIGHT. মানে, ভোরের আলো।

বিস্মিত দৃষ্টিতে শব্দ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে রাফেলা। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে, মিলটা দেখতে পেয়েছে।

'এই "ভোরের আলো" নামের জাহাজটা সম্পর্কে জানতে হবে আমাদেরকে।'

'কিভাবে তা জানা সম্ভব?'

'সহজেই। এরইমধ্যে জেনেছি আমরা ভোরের আলো একটা ভারতীয় মালবাহী জাহাজ-ঈস্ট ইণ্ডিয়াম্যান-নিশ্চয়ই এর রেকর্ড কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। দ্য বোর্ড অভ ট্রেড, লয়েড'স রেজিস্টার-খোঁজ নিলেই জানা যাবে।'

আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আরেকবার পড়ল ও। 'সৌখিন কর্নেল গুডচাইল্ড সম্ভবতঃ নোংরা মোজা আর পুরানো শার্ট পাঠিয়েছিল জাহাজে করে।' তাচ্ছিল্যের সাথে ঠোঁট বাঁকাল ও, চিঠিটা ফিরিয়ে দিল আমাকে।

'সুখবর,' বললাম ওকে। 'পায়ে দেয়ার জন্যে কিছু মোজা দরকার আমার।'

ভাড়াটে কৃষক লোকটাকে বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে আমার সাথে রওনা হয়ে গেল রাফেলা। হালকা একটা স্যুটকেসে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ক্রাইসলারে ওঠার সময় বলল, 'মজার ব্যাপার কি জানো, কেন যেন মনে হচ্ছে দীর্ঘ একটা যাত্রার সূচনা হল আজ আমার।'

চোখ মটকে বললাম, 'তোমাকে নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা আছে বটে।'

'দেখে তোমাকে যাই মনে হোক,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল ও, 'আসলে লোক তুমি ভাল নও।'

পথে গাড়ি দাঁড় করালাম একটা ডাক্তারখানার সামনে। হাতের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে রাফেলার। সাদা মোটা পানি ভর্তি থলির মত ফোস্কা পড়েছে আঙুলের উল্টো পিঠে। থলিগুলো খালি করে আবার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল ডাক্তার।

'জ্বালা-যন্ত্রণা বেড়ে গেল আরও,' অভিযোগের সুরে একবার বলল রাফেলা। উত্তর দিকে ছুটছে আমাদের গাড়ি। বুঝতে পারছি, ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে ও। কিন্তু কোন শব্দ করছে না আর। ওর এই মৌনতাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম আমি।

শহরে ঢুকে ছোট্ট একটা তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল রাফেলা তার এক নিঃসঙ্গ কাকার বাড়িতে উঠবে। আমি উঠব কাছাকাছি একটা পাবে। একটা টেলিফোন বুদ থেকে ওর কাকাকে ফোন করল ও, গাড়িতে ফিরে এসে বলল, 'কাকা বাড়িতেই আছেন,

আমি এসেছি শুনে খুব খুশি হয়েছেন।'

নদীর কাছে নির্জন একটা রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি। রাফেলার স্যুটকেসটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি। কলিং বেলের বোতামে চাপ দিচ্ছে ও।

এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন, তাঁকে দেখেই কেন যেন সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করলাম আমি। ছোটখাট, হালকা গড়নের মানুষটা, বয়স প্রায় ষাট ছুঁই ছুঁই করছে, খয়েরি রঙের একটা কার্ডিগান পরে আছেন, পায়ে কার্পেট স্লিপার। কিন্তু ঘরোয়া পরিবেশ এবং পোশাকের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান লাগছে তাঁর জং ধরা লোহার মত লালচে মাথার চুল এবং ছোট্ট গোঁফ-দুটোরই অস্বাভাবিক যত্ন নেয়া হয়েছে। গায়ের রঙ পরিষ্কার। কিন্তু চোখের স্থির শ্যেনদৃষ্টি এবং উঁচু কাঁধ সাবধান করে দিল আমাকে। প্রকট নয়, কিন্তু ভদ্রলোক যে আশ্চর্য সচেতন হয়ে আছেন তা ধরা পড়ল আমার চোখে।

'আমার কাকা, রিচার্ড বার্ড,' পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে একপাশে সরে দাঁড়াল রাফেলা, 'আঙ্কেল, ইনি মাসুদ রানা।'

ঝট করে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। 'হুঁ-এর কথাই বলছিলে তুমি?' আঙ্কেল বার্ডের হাতটা শক্ত আর শুকনো, চোখের দৃষ্টি সুচের মত বিঁধছে আমার মুখে। 'এসো। দু'জনেই ভেতরে এসো।'

'আপনাকে আর বিরক্ত করব না, স্যার...,' সেনাবাহিনীতে ছিলাম, তাই কাকে স্যার সম্বোধন করতে হয় তা ভালই জানা আছে আমার। 'তাছাড়া, নিজের জন্যে একটা ঘাঁটি খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।'

রাফেলা এবং আঙ্কেল বার্ড দৃষ্টি বিনিময় করল, এবং প্রায় ধরা যায় না এমনভাবে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে কোন ব্যাপারে যেন আঙ্কেলকে নিষেধ করল রাফেলা। ওদেরকে ছাড়িয়ে চলে গেছে আমার দৃষ্টি। ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্রগুলো সস্তাদরের, মোটেও

আরামদায়ক নয়, এবং সাজাবার ভঙ্গিতে পুরুষালী ছাপ স্পষ্ট। আঙ্কেল বার্ড সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণাটাই দৃঢ় হল আরও। এর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে, পরিষ্কার জানিয়ে রাখলাম নিজেকে।

'লাঞ্চের জন্যে এক ঘন্টা পর তুলে নেব তোমাকে, রাফেলা,' বললাম আমি। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্রাইসলারে এসে উঠলাম।

রাস্তার শেষ মাথায় উইণ্ডসোর আর্মস পাব, রাফেলার কথা মত আঙ্কেল বার্ডের নাম করতেই অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ম্যানেজার পেছন দিকের একটা সুন্দর কামরা দিল আমাকে। কাপড়চোপড় না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি, জানালা দিয়ে আকাশ আর টেলিভিশনের এরিয়াল দেখছি, বার্ড পরিবার এবং তাদের আত্মীয়ের কথা ভাবছি।

একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, এই দুই নাম্বার রাফেলাকে কোনভাবে গায়েব হয়ে যেতে দিচ্ছি না আমি। কিন্তু ওর অনেক ব্যাপার এখনও পরিষ্কার বুঝছি না-মনটা খুঁতখুঁত করছে। পবিত্র এবং সরল চেহারার ভেতর সম্ভবত জটিল একটা চরিত্র ও, থই পাচ্ছি না আমি। তবে, তল্লাশি চালিয়ে জানতে পারলে সেটা ইন্টারেস্টিং কিছু একটা হবে বলেই মনে হচ্ছে।

চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে উঠে বসলাম। লয়েড'স রেজিস্টার অভ শিপিং, ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়ম এবং সবশেষে ইণ্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরিতে তিনটে ফোন করলাম। তারপর হেঁটে ফিরে এলাম আঙ্কেল বার্ডের বাড়িতে। লণ্ডনে গাড়ি ব্যবহারে সুবিধের চেয়ে অসুবিধে বেশি।

পোশাক পাল্টে আমার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল রাফেলা, কলিং বেল টিপতেই বেরিয়ে এল ও।

'আঙ্কেলকে পছন্দ হয়নি তোমার। ঠিক ধরেছি কিনা?' লাঞ্চ টেবিলের ওদিক থেকে চ্যালেঞ্জ করল আমাকে ও।

সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলাম চ্যালেঞ্জটা, বললাম, 'ফোন করে জেনেছি ওয়াটারলুর কাছে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সন্ধান নিতে হবে আমাদেরকে। লাঞ্চ শেষ করে ওখানে যাব আমরা।'

'মেলামেশা করলে বুঝবে আঙ্কেল আসলে খুব ভাল লোক।'

'দেখ, প্রিয় বান্ধবী, উনি তোমার আঙ্কেল, তোমারই থাকুন-আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা কোরো না।'

'কিন্তু কেন, রানা? ওকে ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?' কৌতূহল লাগছে আমার।

'পেশাটা কি ওঁর? স্থল, নাকি নৌ-বাহিনীতে আছেন?'

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রাফেলা আমার মুখের দিকে। তারপর বলল, 'তুমি জানলে কিভাবে?'

'হাজার লোকের ভিড় থেকেও ওদেরকে চিনতে পারি আমি।'

'আর্মিতে ছিলেন, রিটায়ার করেছেন-কিন্তু তাতে কি?'

'কোনটা পছন্দ তোমার?' আবার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি আমি, মেনুটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম ওকে, 'তুমি রোস্টেড বীফ নিলে আমি ডাক নেব।'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল ও, প্রসঙ্গটা তুলল না আর।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পৌঁছে খাতায় সই করে ভিজিটরস কার্ড সংগ্রহ করলাম আমরা। তারপর ক্যাটালগরুম হয়ে মেরিন সেকশনে ঢুকলাম। আমাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল পক্বকেশী বৃদ্ধা লাইব্রেরিয়ান, তাকে আমি অনারেবল কোম্পানির জাহাজ 'ভোরের আলো' খুঁজে বের করে দেবার অনুরোধ জানালাম। বৃদ্ধা আমাদেরকে হতচকিত করে দিয়ে মই বেয়ে উঠে গেল একেবারে সেই সিলিংয়ের কাছে। সার সার ইস্পাতের শেলফ, সেগুলো দেখতে দেখতে বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল সে। নেমে এল মোটাসোটা একটা ফাইল বগলদাবা করে আধঘন্টা পর। কার্ড-বোর্ডের একটা ফোল্ডার দিল আমাকে, বলল, 'এখানে সই করতে হবে। মজার ব্যাপার কি জানো, এক

বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এই নিয়ে দু'বার চাওয়া হল ফাইলটা।'

সবচেয়ে নিচের সইটার দিকে একদৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলাম আমি। এখানে নিরো তার পুরো নাম লিখেছে-জেমস নিরো বার্ড। ওর সইয়ের নিচে 'রয় পিয়ারসন' লেখার সময় ভাবলাম নিরোকে নির্ভুলভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছি আমরা।

নির্জন এক কোণে চলে এলাম আমরা। পাশাপাশি বসলাম টেবিলে। একটা চুরুট ধরিয়ে খুললাম ফাইলটা।

ব্ল্যাকওয়াল ফ্রিগেট নামে পরিচিত টাইপের একটা জাহাজ ছিল ভোরের আলো, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্ডার মোতাবেক সাণ্ডারল্যাণ্ড-এর ব্ল্যাকওয়াল ইয়ার্ডে তৈরি; বহন ক্ষমতা এক হাজার তিনশো ত্রিশ নেট রেজিস্টার টন। পানির ওপর দৈর্ঘ্য ছিল দুইশো ছাব্বিশ ফুট, বীম ছাব্বিশ ফুট। বীম এত সরু যার, তার গতি খুব দ্রুত হওয়ার কথা, কিন্তু বাতাসের ধাক্কা বা বড় ঢেউয়ের আঘাতে বেসামাল হওয়ার সম্ভাবনাও তেমনি বেশি।

আঠারোশো বত্রিশ সালে প্রথমবার পানিতে নামার পর থেকে বারবার বিপদের মধ্যে পড়তে হয় ভোরের আলোকে।

বিভিন্ন ধরনের কোর্ট অভ এনকয়েরীর রিপোর্ট রয়েছে ফাইলটায়। ভোরের আলোর প্রথম ক্যাপ্টেনের নাম হগ। হুগলী নদীতে ডায়মণ্ড হারবারের ব্যাঙ্কে আছাড় খাওয়ায় সে ভোরের আলোকে। কোর্ট অভ এনকয়েরী তাকে বরখাস্ত করে, কারণ দুর্ঘটনার সময় মদ খেয়ে মাতাল সে।

এরপর আঠারোশো চল্লিশ সালে আবার দুর্ঘটনা ঘটে। সাউথ আটলান্টিক পাড়ি দেবার সময় ডগ ওয়াচে ছিল একজন সিনিয়র মেট, তার গাফিলতির জন্যেই ভোরের আলোতে চড়াও হবার সুযোগ পায় উন্মত্ত সাগর। এই হামলায় জাহাজের সমস্ত মাস্তুল ভেঙে পড়ে। অসহায়ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল, এই সময় তাকে

আবিষ্কার করে একটা ডাচ জাহাজ। টেনে নিয়ে আসা হয় টেব্‌ল্ বে-তে। স্যালভেজ কোর্ট বারো হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করে।

আঠারোশো ছেচল্লিশ সালে আরেক দুর্বিপাকের শিকার হয় ভোরের আলো। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ নিউগিনি উপকূলে নোঙর ফেলেছিল সে, তার অর্ধেক ক্রু ছিল তীরে, সেখানে তারা একদল নরখাদক আদিম উপজাতিদের কবলে পড়ে। তেষট্টিজন ক্রুর সবাই তাদের ভোজ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

তারপর আঠারোশো সাতান্ন সালের তেইশে সেপ্টেম্বরে বোম্বে থেকে সেন্ট মেরী, দ্য কেপ অভ গুড হোপ, সেন্ট হেলেনা এবং দ্য পুল অভ লণ্ডনের উদ্দেশে রওনা হয় সে।

তারিখের নিচে আঙুল রাখলাম আমি। 'এই ভয়েজের কথাই তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে কর্নেল গুডচাইল্ড।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল আমাকে রাফেলা।

কিন্তু সেন্ট মেরীতে পৌঁছায়নি ভোরের আলো-মাঝপথে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যায় সে। তিনমাস পর ধরে নেয়া হয় সাগরে হারিয়ে গেছে চিরতরে।

জাহাজটা ছোট হলে কি হবে, প্রচুর কার্গো বহন করছিল সে। মেনিফেস্টে তার একটা হিসেবও রয়েছে।

তিনশো চৌষট্টি কেস চা চারশো চুরানব্বই হাফ-কেস চা	মোট বাহাত্তর টন মেসার্স দানবার অ্যাণ্ড গ্রীনের কার্গো।
একশো এক কেস চা ছয়শো আঠারো কেস চা	মোট পঁয়ষট্টি টন মেসার্স সিম্পসন, এলি অ্যাণ্ড লিভিংস্টনের কার্গো।
পাঁচশো সাতাত্তর বেল সিল্ক	মোট বিরাশি টন মেসার্স এলডার অ্যাণ্ড কোম্পানির কার্গো।
পাঁচ কেস পণ্য	মোট চার টন কর্নেল স্যার রজার গুডচাইল্ডের কার্গো।

ষোলো কেস পণ্য	মোট ছয় টন মেজর জন কটনের কার্গো।
দশ কেস পণ্য	মোট দুই টন লর্ড এলটনের কার্গো।
ছাব্বিশ বাক্স বিভিন্ন মশলা	মোট দুই টন মেসার্স পলসন অ্যাণ্ড কোম্পানির কার্গো।

নিঃশব্দে মেনিফেস্টের চার নাম্বার আইটেমের ওপর আঙুল রাখলাম আমি, আবার মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রাফেলা।

ভোরের আলো অদৃশ্য হয়ে যাবার চারমাস পর অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন একটা মোড় নিল ঘটনা। আঠারোশো আটান্ন সালের এপ্রিল মাসে ঈস্ট ইণ্ডিয়াম্যান ওয়ালমার ক্যাসেল ভোরের আলোর বেঁচে যাওয়া কয়েকজন ক্রু এবং যাত্রীকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছুল।

সংখ্যায় ছয়জন ছিল ওরা। ফার্স্ট মেট এনড্রু বারলো, একজন স্টোরম্যানের মেট, এবং তিনজন পদস্থ নাবিক। এক মেজরের মেয়ে, একুশ বছরের যুবতী মিস শার্লোট কটন প্যাসেঞ্জার হিসেবে দেশে ফিরছিল, বেঁচে যাওয়া দলের সাথে এ-ও ছিল।

কোর্ট অভ এনকয়েরির সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাক্ষ্য দেয় ফার্স্ট মেট বারলো। নীরস ব্যাখ্যা, একঘেয়ে প্রশ্ন এবং সতর্ক উত্তরের ভেতর নিহিত রয়েছে সাগরের উত্তেজনাপূর্ণ এক আশ্চর্য রোমান্টিক গল্প, বাঁচার আকুতি এবং জাহাজ ডুবির মহাকাব্য।

বোম্বে ত্যাগ করার চোদ্দ দিন পর দক্ষিণ-পুব দিক থেকে ধাবিত প্রলয়ঙ্করী একটা ঝড়ের মুখে পড়ে ভোরের আলো। উন্মত্ত ঝড়টা ভোরের আলোকে দাঁতে কামড়ে নিয়ে একনাগাড়ে সাতদিন ছুটে চলে। প্রায় সমস্ত মাস্তুল ভেঙে যায় তার। এবং অবশেষে যখন সামনে তীরভূমির দেখা পাওয়া যায় তখন জাহাজটাকে রক্ষা

করার শেষ আশাটুকুও দপ করে নিভে যায়। তীব্র ঝড় এবং তুখোড় স্রোত তাকে ঠেলে নিয়ে চলে একটা মাথা উঁচু রীফ-এর দিকে, যেখানে পাহাড় সমান উঁচু সফেন ঢেউ বজ্রপাতের বিকট শব্দে আছাড় খেয়ে বিধ্বস্ত হচ্ছে।

রীফের সাথে ধাক্কা খেয়ে কিভাবে যেন আটকে যায় ভোরের আলো। ফার্স্ট মেট বারলো তার বারোজন ক্রুর সাহায্যে একটা বোট নামাতে সমর্থ হয়। মিস শার্লোটসহ চারজন প্যাসেঞ্জার এবং বারোজন ক্রুকে নিয়ে বোটে নামে বারলো। নাবিক হিসেবে তার আশ্চর্য দক্ষতা এবং ভাগ্যের বিস্ময়কর আনুকূল্যের সাহায্যে ফার্স্ট মেট উন্মত্ত সাগর এবং মৃত্যু ফাঁদ-বহুল রীফ-এর মাঝখান দিয়ে একটা পথ করে নিতে সমর্থ হয়, বোট নিয়ে পৌঁছুতে পারে ইনশোর চ্যানেলের অপেক্ষাকৃত শান্ত পানিতে।

অবশেষে তারা একটা দ্বীপে গিয়ে ওঠে। এখানে তারা চারদিন সংগ্রাম করে সাইক্লোনটার সাথে।

সেই দ্বীপে তিনটে পাহাড় চূড়া দেখতে পায় বারলো। তার অসম সাহসের তুলনা পাওয়া ভার। ঝড় উপেক্ষা করে সর্বদক্ষিণ প্রান্তের চূড়ার মাথায় একা ওঠে সে। দ্বীপ, চূড়া এবং চূড়া থেকে রীফ-এর যে বর্ণনা পরে দিয়েছে বারলো তার সাথে হুবহু মিলে যায় ওল্ড মেন এবং গানফায়ার রীফ-এর চেহারা। এই বর্ণনা থেকেই নিরো বুঝতে পারে ঠিক কি খুঁজছে সে-তিন চূড়া বিশিষ্ট একটা দ্বীপ, এবং প্রবাল প্রাচীরের একটা রীফ।

রীফ-এর চোয়ালে আটকে থাকা ভোরের আলোর বিয়ারিং নেয় চূড়া থেকে বারলো। প্রতিটি ঢেউ তাকে প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার করে দিতে চেষ্টা করছিল। দ্বিতীয় দিনে জাহাজের খোল ভেঙে পড়তে শুরু করে। বারলোর চোখের সামনে ভোরের আলোর সামনের অর্ধেকটা ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেঙে যায় এবং স্রোতের টানে রীফ পেরিয়ে প্রবালের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা মুখ খোলা অন্ধকার গহ্বরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্টার্ন ধসে পড়ে,

সাগর তাকে আছাড় মেরে দিয়াশলাই খোলার মত টুকরো টুকরো করে ফেলে।

অবশেষে সাগর শান্ত হয়, বাতাস থমকে দাঁড়ায় এবং মেঘের ঘোমটা থেকে বেরিয়ে আসে ঝকঝকে নীল আকাশ। বারলো হতাশ হয়ে আবিষ্কার করে জাহাজের একশো উনপঞ্চাশ জন আদম সন্তানের মধ্যে তার সতেরো জনের ছোট্ট দলটা ছাড়া আর একজনও বেঁচে নেই, বাকি সবাইকে গ্রাস করেছে সাগর।

পশ্চিম দিকে নিচু তীরভূমি দেখতে পায় বারলো। অনুমানে ধরে নেয় আফ্রিকান মেইনল্যাণ্ড ওটা। আরেকবার সে তার দল নিয়ে বোটে চড়ে, এবং ইনশোর চ্যানেল পাড়ি দেয়। তার অনুমান সত্য হয়-আফ্রিকা মহাদেশেরই তীরচিহ্ন ছিল ওটা। কিন্তু বরাবরের মত আফ্রিকার উপকূল পরম শত্রুর মত নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

সাগরে পথ হারানো সতেরো জন অভাগা বাঁচার তাগিদে ভয়ঙ্কর এক অভিযানে রওনা দেয়। তিনমাস পর চারজন নাবিক, বারলো এবং মিস শার্লোট কটন জাঞ্জিবার পোর্টে পৌঁছায়। জ্বর, হিংস্র জানোয়ার, লোভী মানুষ এবং দুর্ঘটনা এক এক করে কেড়ে নেয় দলের লোকদের। শেষ পর্যন্ত যারা বেঁচে গেল তাদেরকে মানুষ বলে চেনার উপায় ছিল না। কঙ্কালের গায়ে ঝুলছিল হলুদ চামড়া।

কোর্ট অভ এনকয়েরী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ফার্স্ট মেট এনড্রু বারলোর। এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার অসম সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ নগদ পাঁচশো পাউণ্ড দিয়ে তাকে সম্মানিত করে।

পড়া শেষ করে মুখ তুলে তাকালাম রাফেলার দিকে। আমাকে লক্ষ করছিল ও। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, ‘দুঃখজনক, তাই না?’

‘হ্যাঁ,’ একমত হলাম ওর সাথে। তারপর বললাম, ‘বারলোর বর্ণনার সাথে সব মিলে যাচ্ছে, তাই না? তার মানে, রাফেলা, সব

কার্গো আজও পড়ে আছে গানফায়ার রীফ-এর তলায়।’

‘হুঁ,’ একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ওকে।

এরপর আমরা তিনতলায় প্রিন্ট অ্যাণ্ড ড্রয়িংরূমে উঠে এলাম। একজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলতেই সে আমাদেরকে ভোরের আলোর নকশাটা খুঁজে বের করে দিল। এর একটা কপি দরকার আমার।

‘আগামীকাল বিকেলে পাব?’ অ্যাসিস্ট্যান্টকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

‘দিতে চেষ্টা করব,’ কথা দিল লোকটা।

রাফেলাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। মনটা হালকা লাগছে। সূত্র ধরে অনেকদূর এগিয়ে এসেছি আমরা।

সাত

একটা পাবে ঢুকে বসলাম আমরা। সবে বিকেল, কিন্তু এরই মধ্যে তৃষ্ণার্তদের ভিড় জমে উঠেছে। দুটো ভারমুথের অর্ডার দিলাম আমি, এবং যে-যার গ্লাস তুলে ধরে পরস্পরকে স্যালুট করলাম।

‘বুঝলে, রানা, একশো একটা প্ল্যান ছিল নিরোর মাথায়। সাগরতলে পড়ে থাকা গুপ্তধন খোঁজ করার পেছনে জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল-কথাটা মোটেও অতিরঞ্জিত নয়। বহু কষ্টে ওর বলা গল্পগুলো অবিশ্বাস করার একটা অভ্যাস গড়ে নিই আমি। কিন্তু এই ব্যাপারটা...’ ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিল রাফেলা।

‘কতটুকু কি জানি আমরা, এসো, বিবেচনা করে দেখা যাক,’ প্রস্তাব দিলাম ওকে।

‘কিছুই জানো না তুমি-আমার সম্পর্কে,’ হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রাফেলা।

‘তাড়াহুড়ো পছন্দ করি না আমি,’ বললাম। ‘ধীরে ধীরে, কিন্তু তোমার সবটা একদিন ঠিকই জেনে নেব আমি, তুমি দেখে

নিয়ো।'

'সেদিন রাগ কোরো না যেন আমার ওপর,' হাসিটা একটু যেন ম্লান হল রাফেলার।

'কাজের কথায় এসো,' বললাম। 'আমরা জানি, কর্নেল গুডচাইল্ড তার লাগেজ নিরাপদ গুদামে রাখতে বলেছিল। জানি, এই লাগেজ সে ভোরের আলো জাহাজে করে পাঠিয়েছিল ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে, এবং পাঠাবার আগে একজন ক্যাপ্টেন বন্ধুর হাতে চিঠি দিয়ে এজেন্টকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিল। ঠিক?'

'ঠিক।'

'ভোরের আলো গানফায়ার রীফ-এর কাছে ডুবে যায়। ধরে নেয়া যেতে পারে সেই সাথে তার সব কার্গোও ওখানে ডুবে যায়। ডুবে যাওয়ার নির্দিষ্ট জায়গাটাও আমরা চিনি। ভোরের আলোর নাম খোদাই করা বেলটা এ ব্যাপারে সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাচ্ছে। ঠিক?'

'পুরোপুরি ঠিক।'

'আমরা শুধু জানি না ওই পাঁচটা কেসে কি আছে।'

'নোংরা মোজা।'

'মনে রেখো, ওগুলোর ওজন চার টন। এমন কি চার টন নোংরা মোজার দামও খুব কম নয়। যাই হোক, কি আছে ওগুলোয় তা আমরা জানি না। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, নিরো জানত। নেকড়ের দলকে পুঁজি খাটাবার জন্যে শুধু গল্প শুনিয়ে রাজি করানো সম্ভব ছিল না, ওদেরকে কিছু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখাতে হয়েছিল- এবং নিরো তা দেখিয়েওছিল, তা নাহলে গোটা ব্যাপারটা অমন সিরিয়াসলি নিত না নেকড়ের দল।'

'এবং এমনই সিরিয়াসলি নিল যে ওরা নিরোকে পর্যন্ত...' গলা বুজে এল রাফেলার। নিরোর করুণ মৃত্যু কল্পনা করে শিউরে উঠল ও।

চোখ সরিয়ে নিলাম ওর দিক থেকে। পরিবেশটা হালকা

করার স্বার্থে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে টেবিলে রাখলাম সযত্নে ভাঁজ খুলে। আবার যখন তাকালাম ওর দিকে, নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে দেখে শ্রদ্ধা হল ওর আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ওপর।

মার্জিনের নোটটা আবার আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল। 'B. Mus. E 6914 (8),' মৃদু শব্দে পড়লাম আমি। 'কিছু বুঝতে পারছ?'

'ব্যাচেলর অভ মিউজিক।'

'এত থাকতে...' হেসে উঠলাম আমি।

'এর চেয়ে ভাল একটা অর্থ বের করো তো দেখি,' চ্যালেঞ্জ করল ও আমাকে।

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দিলাম যথাস্থানে, তারপর আরেক প্রস্থ অর্ডার দিলাম ভারমুথের। 'এটার কথা আপাতত বাদ দাও,' ওকে বললাম। 'আরেকটা সূত্র আছে আমার কাছে, এসো, সেটা নিয়ে একটু মাথা ঘামানো যাক। শুধু মাথা ঘামানোয় কাজ হবে না, এবার একটু নড়েচড়ে দেখতেও হবে।'

ভুরু কুঁচকে চুপচাপ বসে থেকে উৎসাহিত করল আমাকে ও।

'তোমার ছদ্ম পরিচয়ধারিণী আরেক রাফেলা বার্ডের কথা বলেছি তোমাকে, তাই না?' নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ও। 'দ্বীপ ত্যাগ করার আগের রাতে একটা টেলিগ্রাম পাঠায় সে লণ্ডনে।' মানিব্যাগ থেকে টেলিগ্রামের ডুপ্লিকেট কপিটা বের করে দিলাম ওকে। ও পড়ছে, আবার আমি শুরু করলাম, 'সব ঠিকঠাক মত ঘটছে, এই সার বার্তাটা জানানো হয়েছে সাতানব্বুই নাম্বার কার্জন স্ট্রীটের পাঁচ নাম্বার সিডনি ফ্ল্যাটের মালিককে, তাই না? সিডনি ফ্ল্যাটের এই মালিক লোকটাই হতে পারে পালের গোদা। আমি ঠিক করেছি, এই সিডনিকে একটু দেখে নেব।' গ্লাসের ভারমুথটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করলাম, তারপর ওকে বললাম, 'এখন তোমাকে আমি তোমার আঙ্কেলের কাছে জমা রেখে আসব। কাল আবার বুঝে নেব তার কাছ থেকে।'

‘মাসুদ রানা,’ দৃঢ় স্বরে, কিন্তু সহাস্যে বলল রাফেলা, ‘আমাকে পুতুল মনে করে থাকলে মারাত্মক ভুল করবে তুমি। জড়িয়ে যখন গেছি, তোমার সাথে নরক পর্যন্ত যাব আমি, যদি দরকার হয়।’

‘এমন অলক্ষুণে কথা ফের যদি মুখে আনো তার পরিণতি ভাল হবে না,’ স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম ওকে। ‘আমার সাথে স্বর্গে যাওয়ার দরকার হবে তোমার, নরকে নয়।’

‘তাও বোধহয় যাব, যদি দরকার হয়।’

‘এভাবে কথা বোলো না,’ আবেদনের সুরে বললাম ওকে, ‘মারাত্মক আশাবাদী হয়ে উঠতে লোভ জাগে।’

বার্কলে স্ট্রীটে ট্যাক্সি থেকে নামলাম আমরা। ওখান থেকে পায়ে হেঁটে চলে এলাম কার্জন স্ট্রীটে।

‘আমাকে জড়িয়ে ধর, কুইক!’ ফিসফিস করে বললাম ওকে, উত্তেজিতভাবে ঘাড়ের ওপর দিয়ে দ্রুত একবার পেছন দিকে তাকালাম।

দ্রুত নির্দেশ পালন করল রাফেলা। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পঞ্চাশ গজ এগোবার পর নিচু গলায় জানতে চাইল ও, ‘কেন?’

‘কারণ, তোমার স্পর্শ ভাল্লাগে,’ সহাস্যে বললাম আমি।

‘ওরে পাজী!’ নিজেকে আমার বাহু থেকে ছাড়িয়ে নিতে একটু চেষ্টা করল ও, কিন্তু আমি আরও চেপে ধরতেই ঢিল করে দিল হাত দুটো।

ধীর পায়ে শেফার্ড মার্কেটের দিকে এগোচ্ছি আমরা, মাঝেমধ্যে উইণ্ডো-শপের সামনে দাঁড়াচ্ছি-ঠিক যেন একজোড়া ট্যুরিস্ট।

সাতানব্বুই নাম্বার কার্জন স্ট্রীট ছয়তলা উঁচু অত্যাধুনিক একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি, ব্রোঞ্জ আর কাঁচ দিয়ে তৈরি রাস্তার ধারের দরজার ওপারে সাদা মার্বেল পাথরের উঠন এবং সেন্ট্রি বক্সে একজন উর্দিপরা দারোয়ানকে দেখতে পেলাম আমরা। দরজার

সামনে দাঁড়ালাম না, পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেলাম হোয়াইট এলিফ্যান্ট ক্লাব পর্যন্ত, তারপর রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের পেভমেন্ট ধরে ফিরে আসতে শুরু করলাম আবার।

‘যাব আমি?’ জানতে চাইল রাফেলা। ‘দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করব পাঁচ নাম্বার ফ্লাটে মি. সিডনি থাকেন কিনা?’

‘চমৎকার,’ বললাম। ‘দারোয়ান হ্যাঁ বললে তখন কি করবে তুমি? বলবে মাসুদ রানা শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে?’

‘ভারি বুদ্ধিমান মনে করো নিজেকে তুমি,’ কথাটা বলে আরেকবার নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল রাফেলা, কিন্তু এবার আগের চেয়েও হালকাভাবে।

‘সাতানব্বুয়ের ঠিক উল্টোদিকে ওটা কি দেখতে পাচ্ছ?’ জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

‘একটা রেস্তোরাঁ।’

‘চল, ওখানে ঢুকে জানালার সামনে একটা টেবিলে বসা যাক। কফিও খাব, নজরও রাখব। ভাগ্যে কিছু একটা ছিঁড়তেও পারে।’

জানালার ধারে বসে গল্প জুড়ে দিলাম আমি। ইচ্ছে করেই খুব বড় একটা গল্প ধরেছি, যাতে সময়টা কাটে। আবিষ্কার করলাম আমার কথার মধ্যে প্রচুর হাস্যরস থাকে, অন্তত রাফেলাকে বারবার খিলখিল করে হেসে উঠতে দেখে তাই মনে হল আমার। যাই হোক, ওর হাসিটা যে-কোন শ্রুতিমধুর যন্ত্র-সঙ্গীতের সমতুল্য, শোনার লোভটা ছাড়তে রাজি নই বলে গল্পটা মাঝপথে থামিয়ে দিলাম না। এভাবে একঘন্টার ওপর কেটে গেল। এবং আমি যখন গল্পের মাঝখানে পৌঁছেচি, এই সময় উল্টোদিকের ফ্ল্যাট-বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড রূপালী মাছের মত এসে থামল একটা রোলস রয়েস। ডাভ-গ্রে রঙের উর্দিপরা শোফার নামল সেটা থেকে, দরজা পেরিয়ে মার্বেল পাথরের উঠনে ঢুকল। কথা বলছে দারোয়ানের সঙ্গে।

গল্প থেমে গেছে আমার।

দশ মিনিট পর রাস্তার ওপারে অকস্মাৎ দারুণ তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। ঘন ঘন নামছে আর উঠছে এলিভেটর, প্রতিবার নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি লাগেজ, সেগুলো শোফার এবং দারোয়ান ধরাধরি করে তুলছে রোলসে। এর কোন বিরাম নেই। এক সময় মন্তব্য করল রাফেলা, 'কেউ বোধহয় লম্বা ছুটিতে যাচ্ছে।' সকরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও।

'চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় একটা দ্বীপ, দ্বীপটাকে ঘিরে নীল সাগর, চিকচিক করছে সাদা বালি, পাম গাছের মাঝখানে লাল টালির একটা শান্তির নীড়, হু হু বাতাস...'

'থামো, মরে যাব!' করুণ মিনতির সুরে বলল রাফেলা। 'গরমের দিনে লণ্ডনে বসে এসব কল্পনা করলেও পাগল হয়ে যাব আমি।'

এই সময় আমার চোখে পড়ল এলিভেটরটা আবার নেমে এসেছে, খুলে যাচ্ছে কাঁচের দরজাটা। একপাশে সরে দাঁড়াল দারোয়ান। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক এবং একটা মেয়ে।

আজানুলম্বিত লালচে একটা মিঙ্ক পরে আছে মেয়েটা, তার সোনালি চুল মস্ত একটা চূড়ার মত স্তূপ হয়ে আছে মাথার ওপর। ওকে চিনতে পেরেই রাগের প্রচণ্ড একটা চাবুকে শরীরটা ঝাঁকি খেল আমার।

এক নাম্বার রাফেলা বার্ড ও। যার কল্যাণে জুডিথ এবং জলকুমারী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গ্র্যাণ্ড হারবারের তলায়।

ওর সাথের লোকটা মাঝারি আকারের, মাথায় নরম ব্রাউন রঙের চুল, কানের দু'পাশ দিয়ে লম্বা হয়ে নেমে এসে পাক খেয়ে ছোট ছোট গোল চাকার মত আকৃতি পেয়েছে। পরনে অত্যন্ত দামি স্যুট। ভারী চোয়াল লোকটার, লম্বা এবং মাংসল নাক, চোখ দুটো শান দেয়া ছুরির ফলার মত, মুখের সর্বত্র অদ্ভুত এক ক্ষুধার্ত

ভাব। মুখের এই ভাবটা দেখামাত্র চিনলাম ওকে, তলপেট শিরশির করে উঠল আমার। পরমুহূর্তে আক্রোশে কেঁপে উঠলাম আমি। আমার সমস্ত দুর্দশার জন্যে দায়ী এই লোক।

'শেরিডান!' অনুভব করলাম আমার কণ্ঠস্বর কাঁপছে। 'সিডনি শেরিডান! তুমিই তাহলে!' বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে ছটফট করছিল নিরো, এবং ব্যাপারটা আর কারও চোখে না পড়লেও সিডনি শেরিডানের চোখে ঠিকই পড়ে যায়। লাভের ব্যাপার হাজার মাইল দূর থেকেও দেখতে পায় শেরিডান।

পেভমেন্ট পেরিয়ে রোলসের দিকে এগিয়ে আসছে সে। পেছনের দরজা খুলে স্বর্ণকেশীর পাশে বসল।

'এখানে অপেক্ষা করো,' হঠাৎ খেয়াল হতেই দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম এরই মধ্যে পার্ক লেনের দিকে ছুটতে শুরু করেছে রোলস।

দৌড়ে পেভমেন্টে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সির জন্যে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। নেই। দেরি না করে ছুটলাম রোলসের পিছু পিছু। মরিয়া হয়ে আশা করছি মাথার ওপরের আলো জ্বালা একটা কালো ট্যাক্সি এক্ষুনি দেখতে পাব আমি। কিন্তু আশাটা পূরণ হল না। সামনে দেখতে পাচ্ছি এখনও রোলসটাকে, বাঁক নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অডলি স্ট্রীটে।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম রেস্তোরাঁর সামনে, ইতিমধ্যে পেভমেন্টে বেরিয়ে এসেছে রাফেলাও। ওর কথাই ঠিক, সিডনি শেরিডান এবং তার স্বর্ণকেশী বান্ধবী লম্বা ছুটি কাটাতে চলে গেল। মনে মনে ঠিক করলাম আবার যখন লণ্ডনে এসেছি, ওর বিরুদ্ধে যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ সময়ের অভাবে তখন জোগাড় করতে পারিনি এই সুযোগে সেগুলো জোগাড় করে নিতে হবে আমাকে। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ভুল ভাঙাবার, নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করার এটাই আমার শেষ সুযোগ। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের উত্থান-পতন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এই সুযোগের

সঠিক সদ্ব্যবহার করার ওপর।

'এসবের মানে কি?' একটু জেদের সুরে ব্যাখ্যা দাবি করল রাফেলা।

ওর হাত ধরে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। বার্কলে স্ট্রীটের দিকে এগোচ্ছি আমরা। ব্যাপারটা ভেঙে বললাম ওকে।

'যে লোকটাকে দেখলে, সে-ই সম্ভবত নির্দেশ দিয়েছিল নিরোকে খুন করার। আমার বুকের অর্ধেক উড়িয়ে দেবার পেছনে এ-ই দায়ী। তোমার সুন্দর আঙুলগুলোও এই লোকের নির্দেশেই সেদ্ধ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই লোকই পালের গোদা।'

'ওকে তুমি চেনো?'

'সিডনি শেরিডানের গল্প তোমাকে আগেই শুনিয়েছি। এরই মধ্যে তা ভুলে গেছ? এরই ডায়মণ্ড কেড়ে নিয়েছিলাম আমি।'

'না, ভুলিনি। এ-ই সেই লোক?'

'হ্যাঁ।'

'আর মেয়েটা? এই বুঝি সেন্ট মেরীতে গিয়ে তোমার জলকুমারী আর তোমার ক্রুর ভাবী স্ত্রী জুডিথকে খুন করেছে?'

সেই প্রচণ্ড রাগটা আবার ফিরে এল আমার মধ্যে।

ব্যথায় কাতরে উঠল রাফেলা। 'রানা, ছাড়ো...লাগছে হাতে!'

'দুঃখিত,' হাতটা চোখের সামনে তুলে দেখল রাফেলা, বলল, 'ইস, দাগ বসে গেছে।'

'আশা করি এ-থেকেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছ।'

'তু-তুমি পুলিসের কাছে যাচ্ছ না কেন?'

'সিডনি শেরিডান এবং ওই মেয়েটা আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি করেছে-ওদের ব্যবস্থা আমি ব্যক্তিগতভাবে করতে চাই। তাছাড়া পুলিসের কিছু করার নেই এ ব্যাপারে। কোন প্রমাণ নেই আমার কাছে ওদের বিরুদ্ধে। বরং পুলিসের কাছে কিছু তথ্য-প্রমাণ রয়েছে আমারই বিরুদ্ধে।'

'কি করতে চাও এখন তুমি?'

'একটু চিন্তা করতে চাই।'

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। উইণ্ডসোর আর্মস পর্যন্ত নিঃশব্দে হেঁটে এলাম আমরা। প্রাইভেট বারটা ওক কাঠ দিয়ে ঘেরা। এক কোণে একটা টেবিল পেলাম আমরা।

'কি চিন্তা করলে?'

'ছুটি কাটাতে কোথায় গেল ওরা তা আমি অনুমান করতে পারছি,' বললাম।

'বিগ গাল আইল্যাণ্ড?' জানতে চাইল রাফেলা। আমাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে আবার বলল, 'একটা বোট এবং ডাইভার দরকার হবে ওদের।'

'দুশ্চিন্তা কোরো না, সিডনি ওসব জোগাড় করে নেবে।'

'এখন বল, আমরা কি করব?'

'আমরা?' জানতে চাইলাম।

'কথার কথা বলছি,' দ্রুত নিজেকে সংশোধন করে নিল রাফেলা, 'তুমি কি করবে?'

'দুটো পথ খোলা দেখতে পাচ্ছি সামনে,' বললাম। 'এক, সব ভুলে যেতে পারি। দুই, গানফায়ার রীফে ফিরে গিয়ে জানার চেষ্টা করতে পারি কর্নেল গুডচাইল্ডের পাঁচটা বাক্সে কি আছে।'

'সাজ সরঞ্জাম দরকার হবে তোমার।'

'সেগুলো হয়ত সিডনির মত দামি আর অত আধুনিক হবে না, কিন্তু জোগাড় করতে পারব।'

'পকেটের কি অবস্থা তোমার, নাকি অযাচিত হয়ে গেল প্রশ্নটা?'

'উত্তর ওই একই, জোগাড় করতে পারব।'

'নীল সাগর আর সাদা বালি,' কল্পনা করতে গিয়ে চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠল রাফেলার।

'আর উথালপাথাল ঢেউয়ের মাথায় চড়ে...'

'থামো, রানা!' ককিয়ে উঠল রাফেলা।

‘মোটাতাজা ক্রাইফিশ গনগনে কয়লার আগুনে ঝলসানো হচ্ছে, চাঁদ উঠেছে আকাশে, উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে তোমার পাশে হেঁড়ে গলায় গান গাইছি আমি,’ বললাম।

‘পাষাণ!’

‘এখান থেকে যদি না নড়ো, জানতেই পারবে না ওগুলো সত্যি নোংরা মোজা কিনা।’ ওর একটা হাত ধরলাম আমি।

‘চিঠি লিখে জানিয়ো আমাকে।’

‘না, তা জানাব না।’

‘তাহলে মনে হচ্ছে তোমার সাথে যেতেই হবে আমাকে।’

‘লক্ষ্মী মেয়ে,’ ওর হাতে চাপ দিলাম।

‘কিন্তু, রানা, যাবার খরচ আমারটা আমিই বহন করব, তোমার কেপ্ট হয়ে যেতে রাজি নই।’

বুঝলাম, আমার আর্থিক দীনতার কথা অনুমান করতে পেরেছে ও। ‘তুমি যাতে রাজি নও আমিও তাতে রাজি হতে পারি না,’ খুশি হয়ে বললাম আমি, এবং আমার মানিব্যাগের স্বস্তির নিঃশ্বাসটা প্রায় স্পষ্ট শুনতে পেলাম বলে মনে হল। গানফায়ার রীফ অভিযানের ব্যয়ভার বহন করতে হলে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাবো আমি।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, সুতরাং কথা বলার অনেক বিষয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমাদের মাঝখানে। বার যখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে, হঠাৎ আমার হুঁশ ফিরল। রিস্টওয়াচ দেখলাম। রাত দশটা।

‘রাতের বেলা রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়,’ রাফেলাকে ভয় দেখালাম আমি। ‘ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে বলে মনে করি না। ওপরে দারুণ আরামদায়ক একটা কামরা রয়েছে আমার, জানালা দিয়ে এমন সুন্দর দৃশ্য...’

‘ওঠো, রানা,’ ঝট্ করে চেয়ার ছাড়ল রাফেলা। ‘ভাল চাও তো আমাকে পৌঁছে দাও বাড়িতে, তা নাহলে আমার আঙ্কেলকে

লাগাব তোমার পেছনে। জীবন হেল করে ছেড়ে দেবে।’

আঁতকে ওঠার ভান করে ওর পিছু পিছু বেরিয়ে এলাম বাইরে। অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই ঠিক হল কাল লাঞ্চের সময় আবার আমরা দেখা করব। প্লেনের টিকেট কাটব, এবং ব্যক্তিগত অন্যান্য কিছু কাজ সারব সকালের দিকে আমি, আর রাফেলা ওর পাসপোর্ট রিনিউ করবে, তারপর ভোরের আলোর ফটোস্ট্যাট ড্রয়িংটা সংগ্রহ করবে।

বাড়ির সামনে পরস্পরের মুখোমুখি হলাম। আমরা হঠাৎ দু'জনেই বিষণ্ন হয়ে উঠেছি। কথা না বলে পরস্পরের দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম যে একসময় হেসে ফেললাম আমি। হেসে ফেলল রাফেলাও।

‘গুডনাইট, রানা,’ পরিণত যুবতীর সুনিপুণ ভঙ্গিতে অদ্ভুত একটু হাসল রাফেলা, মুখটা বাড়িয়ে দিল এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ। বুঝলাম, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চুমো খাবার অনুমতি দিচ্ছে ও আমাকে।

আশ্চর্য নরম আর উষ্ণ ওর ঠোঁট। এবং জানি না কতক্ষণ অধরসুধা পান করলাম আমি।

‘ছ-ছাড়!’ ফিসফিস করে বলল ও। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

‘ঠিক জান, সিদ্ধান্ত পাল্টাচ্ছ না? বিশ্বাস কর, কামরাটা খুবই সুন্দর, ঠাণ্ডা এবং গরম পানি, মেঝেতে কার্পেট, টিভি...’

হাসির দমকে শরীরটা ঝাঁকি খাচ্ছে রাফেলার, মৃদু ধাক্কা দিয়ে পিছু হটিয়ে দিল আমাকে ও। ‘গুডনাইট, ডিয়ার রানা,’ আবার বলল, এবং আমাকে একা ফেলে রেখে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

ফেরার সময় ক্লান্ত লাগছে। ভাবছি সারারাত আজ ঘুম এলে হয়। একবার নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে, রাফেলার দেখা পাওয়াতেই যেন ধন্য হয়ে গেছে আমার জীবন; আরেকবার নিজেকে অভাগা মনে হচ্ছে, চাইলেই আমি ওকে পেতে পারি না।

রাস্তাটা জনশূন্য, ফাঁকা। তবে পেভমেন্টের ধারে সার সার

দাঁড়িয়ে আছে পার্ক করা গাড়ি, যতদূর দেখা যায়।

ক্লান্ত কিন্তু বিছানায় গিয়ে ওঠার ব্যস্ততা অনুভব করছি না, বরং মনে হচ্ছে এই পথ দিয়ে খানিক আগে গেছে রাফেলা, তাই যতক্ষণ পারা যায় এই পথ দিয়ে হাঁটি, বাতাস থেকে ওর গায়ের গন্ধ নিই। এ এক আশ্চর্য মেয়ে, এবং যতই ভাবছি ওর কথা ততই ভাবতে ভাল লাগছে, ততই মন এবং শরীরের দিক থেকে সুস্থ হয়ে উঠছি আমি।

রাফেলা বার্ড সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার অনেক কিছু রয়ে গেছে। ওর অনেক ব্যাপার বুঝিনি এখনও, ব্যাখ্যা পাইনি। তবে তবু কেন যেন মনে হচ্ছে এই প্রথম সম্ভবত একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে যা এক রাত, এক হপ্তা অথবা এক মাসের চেয়ে অনেক, অনেক বেশিদিন টেকসই হবে।

হঠাৎ আমার পাশ থেকে একজন বলল, 'রানা!' পুরুষের গলা। অপরিচিত। নিজের অজান্তেই সেদিকে ফিরলাম আমি। এবং সাথে সাথে বুঝলাম, ভুল হয়ে গেল।

পার্ক করা একটা গাড়ির ব্যাক সিটে বসে আছে লোকটা। কালো রঙের রোভার গাড়িটা। জানালাটা খোলা, ভেতরে মুখটা পরিষ্কার নয়, ভৌতিক, অস্পষ্ট।

মরিয়া হয়ে হাত দুটো ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করছি আমি, সেই সাথে যেদিক থেকে আক্রমণটা আসবে বলে জানি সেদিকে ঘুরে যাচ্ছি। ঘোরার মধ্যেই একপাশে সরিয়ে নিলাম মাথাটা এবং মোচড় খেয়ে একটু কাত করে ফেললাম শরীর। কানের পাশ দিয়ে কি যেন নামল বাতাস কেটে, প্রচণ্ড একটা বাড়ি খেয়ে অসাড় হয়ে গেল কাঁধটা।

বিদ্যুৎগতিতে আধপাক ঘোরা শেষ করেই দুই কনুই চালালাম আমি, নরম কিছুর সাথে হল সংঘর্ষটা, সাথে সাথে ব্যথায় কাতরে উঠল কেউ।

হাত দুটো মুক্ত হতেই সিধে হলাম। দ্রুত সরে যাচ্ছি।

এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে দিক বদলাচ্ছি। জানি, বালি ভর্তি ভারী বস্তাটা আবার ব্যবহার করবে ওরা।

ঘন কালো দানবের ছায়া কয়েকটা, এর বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই কালো পোশাক পরে আছে। পথ আগলাবার জন্যে আমার সাথে ছুটোছুটি করছে ওরা অন্ধকারে, বিরাট একটা দল বলে মনে হচ্ছে-অথচ সংখ্যায় ওরা মাত্র চারজন। আর গাড়ির ভেতর রয়েছে আরেকজন।

ওরা সবাই বিশালদেহী। বস্তাটা নিয়ে ছুটে এল আবার একটা ছায়ামূর্তি। ভঙ্গি করলাম একপাশে সরে যাবার, কিন্তু স্যাঁত করে এগিয়ে গেলাম তার দিকেই। হাতের তালু দিয়ে প্রচণ্ড একটা থাবড়া বসিয়ে দিলাম তার নাকের ওপর। মাথাটা পেছন দিকে ছিটকে গেল, অনুমান করলাম ভেঙে গেছে হাড়টা। কংক্রিটের পেভমেন্টে দড়াম করে পড়ল সে।

একটা ভাঁজ করা হাঁটু আমার তলপেটে এসে লাগল, কিন্তু একই সময়ে ঊরুটা ধরে ফেলেছি আমি দুই হাত দিয়ে-মোচড় দিতেই ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই। একটা হাত আমার গলা পেঁচিয়ে ধরল পেছন থেকে। কনুই চালাতে যাব এই সময় ডাইভ দিয়ে পড়ল একজন। হাঁটুর নিচে ধাক্কা খেলাম আমি, ভারসাম্য হারিয়ে পিঠে ঝুলে থাকা লোকটাকে নিয়ে পড়ে গেলাম পেভমেন্টের ওপর।

আমার চেয়ে আগে উঠে দাঁড়াল ওরা। বসতে যাচ্ছি, ঘাড়ে পড়ল দুই হাতের এক মন চাপ।

'স্থির করে রাখো ওকে,' দ্রুত চাপা কণ্ঠে বলল কেউ। 'মাত্র একটা ঘা বসাতে দাও আমাকে।'

দু'জন চেপে ধরেছে আমাকে। পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছি, এই সময় বালির বস্তা নিয়ে এক পা এগোল লোকটা, পরমুহূর্তে মাথার পাশে বাড়িটা খেলাম।

জ্ঞান হারাইনি। কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে গেছি। সদ্যোজাত

শিশুর মত দুর্বল।

'হয়েছে। গাড়ির পেছনে তোলো এবার।'

চ্যাঙদোলা করে তুলল আমাকে ওরা। রোভারের ব্যাকসিটে বসিয়ে দিল, দু'পাশে উঠে বসল দু'জন লোক। সামনের সিটে ড্রাইভারের দু'পাশে উঠে পড়েছে ইতিমধ্যে বাকি দু'জন। খটাং করে দরজা বন্ধ হবার ঝাঁকিতে ঘাড়ের ওপর নড়বড়ে মাথাটা দুলে উঠল আমার। ইঞ্জিন স্টার্ট নিল, তারপরই ছুটতে শুরু করল গাড়ি। মাথাটা কাঁপছে থরথর করে।

কতক্ষণে জানি না, কাঁপুনিটা থেমে গেল মাথার, আঘাতের ধাক্কা সামলে এখন চিন্তাও করতে পারছি, কিন্তু মাথার একটা পাশ, অনুভব করছি, অসাড় হয়ে আছে।

এখনও ওরা হাঁপাচ্ছে। ড্রাইভারের পাশের লোকটা খুব হালকা হাতে নিজের ঘাড় আর চোয়াল ডলছে। আমার বাঁ দিকে বসা লোকটার মুখ থেকে রসুনের তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে ফুঁ দিচ্ছে সে-আসলে আমাকে সার্চ করছে আর হাঁপাচ্ছে।

'ইঁদুর মরে পচে আছে মুখের ভেতর, অ্যাদ্দিনেও ওটা ফেলনি কেন?' মাথার ব্যথা ভুলতে চাই, তাই কিছু একটা বললাম আর কি।

শুনতে না পাবার ভান করে সার্চ করে যাচ্ছে লোকটা। অবশেষে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের জায়গায় গুছিয়ে বসল সে।

পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল। নদীর কিনারা ঘেঁষে হ্যামারস্মিথের দিকে ছুটছে গাড়ি।

ওদের ব্যথা এবং হাঁপানি একটু কমতে নিস্তব্ধতা ভাঙল ড্রাইভার।

'শোনো, মি. শেরিডান কথা বলতে চান তোমার সাথে, কিন্তু বলেছেন সেটা খুব একটা জরুরী কিছু নয়। একটু কৌতূহল আছে তাঁর, এই পর্যন্ত। বলে দিয়েছেন, গোলমাল করলে নদীতে ফেলে

দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে।'

'এমন সহজ সরল লোক হয় না, স্বীকার করি,' বললাম আমি।

'শাট আপ!' বলল ড্রাইভার। 'বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। লক্ষ্মী হয়ে থাকো, কিছুটা হলেও বাড়বে তোমার আয়ু-তাই বা খারাপ কি! শুনেছি, রানা, তুমি নাকি সাংঘাতিক শার্প একজন অপারেটর। দ্বীপে লোরনা তোমাকে ছুঁতে পারেনি জানার পর আমরা ধরেই নিয়েছিলাম তুমি উদয় হবে। কিন্তু স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি চকচকে একটা পেনির মত কার্জন স্ট্রিটের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত গড়াগড়ি খাবে। মি. শেরিডান তো ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে চাননি। তিনি বললেন, "এ লোক মাসুদ রানা হতে পারে না-যদি হয়, মনে করতে হবে, লোকটা বোকা জাতের নরম মেয়েমানুষ হয়ে গেছে। ইস্, মহাপরাক্রমশালীদের পতন কি মর্মান্তিক!"

'কি করুণ!' বলল রসুনের দুর্গন্ধ।

'শাট আপ!' বলল ড্রাইভার। তারপর আবার শুরু করল, 'মি. শেরিডান দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে দুঃখে কাতর হয়ে কেঁদেকেটে বুক ভাসাচ্ছেন-বুঝতেই পারছ।'

'অনায়াসে।'

'শাট আপ!'

রাত দুটোর সময় ব্রিস্টলে ঢুকল গাড়ি। শহরের মাঝখানটাকে পাশ কাটিয়ে এ-ফোর ধরে অ্যাভনমাউথের দিকে যাচ্ছি আমরা।

ইয়ট বেসিনে অন্যান্য বোটের সাথে বড় একটা মোটর ইয়ট দেখতে পেলাম, জেটিতে নোঙর ফেলা, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক নামানো। স্টার্ন এবং বো-তে নাম আঁকা রয়েছে-বুমেরাং। সমুদ্রগামী ইয়ট এটা, ইস্পাতের তৈরি খোল, সাদা এবং নীল রঙের। দেখেই বুঝলাম, অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দ্রুতগামী ইয়ট, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় যেতে পারবে। ধনী লোকের শখের

জিনিস। তার প্রায় সব পোর্টহোলেই আলো জ্বলছে। লোকজন দেখা যাচ্ছে ব্রিজে। রওনা দেবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

ছোট্ট জায়গাটা পেরিয়ে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে নিয়ে যাবার সময় ঘিরে রাখল আমাকে ওরা। ডেকে যখন উঠছি, বাঁক নিয়ে চলে গেল রোভারটা।

সেলুনটা দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত সবুজ কার্পেট মোড়া, একই রঙের জানালার পর্দাগুলো ভেলভেটের। ফার্নিচারগুলো গাঢ় রঙের টিক আর পালিশ করা চামড়া দিয়ে তৈরি। মূল্যবান তৈলচিত্রের সমাবেশও কারও দৃষ্টি এড়াবার নয়।

আন্দাজ করলাম পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের কম হবে না এটার দাম। সম্ভবত চার্টার করা। হয়ত ছয় মাসের জন্যে ভাড়া নিয়ে সিডনি শেরিডান নিজের ক্রু নিয়োগ করেছে। সমুদ্রবিহারের প্রতি তার লোভ আছে বলে কখনও শুনিনি।

কার্পেটের মাঝখানে দলটার সাথে দাঁড়িয়ে আছি, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক তুলে ফেলার শব্দটা নির্ভুল চিনতে পারলাম আমি, তারপরই নোঙর ওঠাবার আওয়াজ পেলাম। ইঞ্জিনগুলো মৃদু গুঞ্জন তুলল। সেলুনের পোর্টহোলের দিকে তাকাতেই দেখলাম বন্দরের আলো পিছিয়ে যাচ্ছে। মুখ থেকে ধীরে ধীরে সরে সেভার্ন নদীর খরস্রোতে বেরিয়ে এল বুমেরাং।

অবশেষে হাজির হতে মর্জি হল সিডনি শেরিডানের। নীল সিল্কের একটা গাউন পরে আছে সে, ঘুম থেকে উঠে এসেছে, তাই ফোলা ফোলা লাগছে মুখটা, কিন্তু লালচে চুলের ছোট ছোট তাকগুলো চিরুনির সাহায্যে নিখুঁত করা হয়েছে। তার হাসিটা সাদা এবং ক্ষুধার্ত।

'গুরু দয়াল,' বলল সে, 'ওরফে মাসুদ রানা, জানতাম আমি, আবার একদিন দেখা হবে আমাদের।'

'হ্যালো, সিডনি। ভারতের সাথে তোমার বন্ধুত্ব এখন কোন পর্যায়ে, জানতে ইচ্ছা করে।'

'ঠিক এই জিনিসটার প্রশংসা করি আমি। ভাগ্য বিরূপ জানা সত্ত্বেও যে লোক রসিকতা করতে পারে তার সান্নিধ্য সত্যি রোমাঞ্চকর।' সেলুনে ঢুকল স্বর্ণকেশী মেয়েটা, তার দিকে তাকাল সিডনি। 'এসো লোরনা।'

এক নাম্বার রাফেলা ওরফে লোরনা আজও উগ্র প্রসাধন ব্যবহার করেছে। চোখ-ধাঁধানো রঙের মত জ্বলছে তার মুখ। মাথার ওপর টোপরের মতো দাঁড়িয়ে আছে সাজানো চুলের স্তূপ। স্বচ্ছ সাদা একটা হাউজ গাউন পরে আছে সে, গলার কাছে লেস দিয়ে আটকানো।

'লোরনা-লোরনা পেজ,' বলল শেরিডান। 'আমার বিশ্বাস, এর সাথে পরিচয় আছে তোমার।'

'একটা অনুরোধ, সিডনি,' জরুরী ভঙ্গিতে বললাম আমি।

ভুরু কুঁচকে উঠছে শেরিডানের।

'এরপর যখন আমার সেবা যত্ন নিতে কাউকে পাঠাবে,' ওকে বললাম, 'ভাল জাতের কোন মেয়েকে পাঠিয়ো। বুনো বিড়ালটা খামচে-কামড়ে আর রাখেনি কিছু আমার।'

ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে দেখে বুঝলাম রাগে পুড়ে যাচ্ছে শেরিডান। কিন্তু হাসছে লোরনা। দারুণ আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল, 'তোমার বোটের খবর কি, রানা? খুব ভালবাসতে তুমি জলকুমারীকে।'

'এখন আরও ভালবাসি,' শেরিডানের দিকে তাকালাম আমি। 'কি করতে চাও, সিডনি? একটা সমঝোতায় আসতে পারি আমরা?'

চেহারায় দুঃখ আর বিষণ্নতা ফুটিয়ে তুলল শেরিডান, এদিক-ওদিক মাথা দোলাল। 'পারি না রানা। পারলে খুশি হতাম, সত্যি খুশি হতাম-কিন্তু একমাত্র তুমিই আমার ভেতর-বাইরের অনেক খবর জানো-আরেকটু জানলেই বিপদে ফেলতে পারবে আমাকে।

তুমিই বলো, সে ঝুঁকি আমার নেয়া উচিত? হাতে পেয়ে প্রাণের দুশমনকে কেউ ছেড়ে দেয়?'

'যদি কথা দিই...'

'প্রশ্নই ওঠে না, রানা,' যেন আদর করে সান্ত্বনা দিচ্ছে সিডনি শেরিডান আমাকে। 'হ্যাঁ, বিবেচনা করতাম তোমার আর্জি, যদি বিনিময় করার মত কিছু থাকত তোমার হাতে। তাছাড়া, সাংঘাতিক সেন্টিমেন্টাল তুমি। শুধু ভাবাবেগের বশে চুক্তি ভাঙবে তুমি, জানা আছে আমার। তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না। নিরো, জলকুমারী, দ্বীপবাসিনী সেই মেয়েটার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে রাজি হবে না তুমি। ভুলবে না নিরোর বোনটার কথা, যাকে খুন না করে উপায় ছিল না আমাদের...'

রাফেলাকে খুন করার জন্যে যাদেরকে পাঠিয়েছিল সিডনি, তারা মারধোর খেয়ে পালিয়ে গেছে, নিজেদের ব্যর্থতার রিপোর্ট পর্যন্ত এখনও দেয়নি তাকে, এটা বুঝতে পেরে একটু আনন্দ পেলাম আমি।

চেষ্টা করলাম কণ্ঠস্বরটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার, 'শোনো, সিডনি, বর্তমানে আমি একটি মাত্র আদর্শে বিশ্বাসী।'

'কি সেটা?'

'বেঁচে থাকার আদর্শ। যদি দরকার হয়, অতীতের সব কথা ভুলে যেতে রাজি আমি। বিশ্বাস কর, না হয় মাফও চাইব।'

হেসে উঠল সিডনি শেরিডান। বলল, 'বৃথা চেষ্টা করছ, রানা। তোমাকে যদি ভালভাবে না চিনতাম, বিশ্বাস করতাম তোমার কথা। দুঃখিত। তোমার সাথে কোন আপোস নয়।'

'তাহলে এত ঝামেলা করে আমাকে এখানে আনলে কেন?'

'এর আগে দু'বার আদেশ পাঠিয়েছি কাজটা শেষ করার জন্যে, রানা। দু'বারই ব্যর্থ হয়েছে ওরা। এইবার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছি আমি। কেপ টাউনের পথে গভীর পানি পাড়ি দিতে হবে আমাদেরকে, ওখানে কোথাও নামিয়ে দেব

তোমাকে। ভেব না, কয়েক মন লোহা থাকবে তোমার সাথে- যাতে ভেসে উঠতে না পার।'

'কেপ টাউন?' জানতে চাইলাম। 'তারমানে ভোরের আলোর পেছনে নিজেই লেগেছ? অবাক কাণ্ড, তাই না? কি এমন থাকতে পারে পুরানো একটা বিধ্বস্ত জাহাজে?'

'না জানার ভান কোরো না, রানা। না জানলে এত ভোগাতে না তুমি আমাকে।' হাসল শেরিডান। নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ না করাই ভাল, ভাবলাম আমি।

সে-জায়গায় আবার ফিরে যেতে পারবে বলে মনে কর তুমি?' স্বর্ণকেশীকে প্রশ্ন করলাম। 'সাগর তো ছোটখাট কিছু নয়, তাছাড়া একই রকম দেখতে অসংখ্য দ্বীপ আছে ওদিকে। ঠিক কোন্‌টা, চিনবে কিভাবে? তার চেয়ে আমাকে যদি গাইড হিসেবে নাও...'

'দুঃখিত, রানা,' বলল শেরিডান। বার-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, কেতাদুরস্ত ভদ্রতার খাতিরে ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'ড্রিঙ্ক?'

'স্কচ,' বললাম ওকে।

আধগ্লাস স্কচ হুইস্কি নিয়ে এসে দিল আমাকে শেরিডান। 'তোমার কাছে লুকাব না ব্যাপারটা-আসলে, কি জানো,' বিশ্বস্ত বন্ধুর মত আন্তরিকতার সাথে বলল সে, 'এত ঝামেলা শুধু লোরনার সম্মানে নিতে হয়েছে আমাকে। মেয়েটাকে তুমি সাংঘাতিক চটিয়ে দিয়েছ, রানা। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কতটা রেগে আছে ও তোমার ওপর। কেন, তা জানি না। কিন্তু আমরা, তুমি আর আমি, যখন বিদায় নেব তখন সেখানে উপস্থিত থাকতে চেয়েছে লোরনা। এসব দুর্লভ ঘটনা চাক্ষুষ করতে সাংঘাতিক ভালবাসে ও। তাই না, ডারলিং?' আবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল শেরিডান। 'পুরুষ মানুষের অসহায় মৃত্যু ওকে নাকি প্রচণ্ড উত্তেজিত করে তোলে। সেকসুয়ালি।'

দুই চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে সিডনির মুখের ওপর

হাসলাম। 'হ্যাঁ, তুমিও জানো, আমিও জানি, ওকে উত্তেজিত করতে না পারলে বিছানায় একটা লাশ ও।'

ঘুসিটা নিচের ঠোঁট থেঁতলে দিল আমার। 'তালা বন্ধ করে রাখো একে,' মৃদু গলায় বলল শেরিডান।

টেনে হিঁচড়ে সেলুন থেকে বের করে ডেক ধরে বো-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে ওরা। তিক্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এখন লোরনাকে, আপাতত এইটুকু ভেবেই খুশি আমি।

আশ্চর্য কালো আর চওড়া দেখাচ্ছে নদীটাকে।

আট

ব্রিজের সামনে, ফোক্যাসলের ওপর নিচু একটা ডেকহাউজ এবং একটা কম্প্যানিয়নওয়ে রয়েছে, একটা মইয়ের মাথায় গিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে সেটা। মইটা নেমে গেছে ছোট একটা লবিতে। ক্রুদের কোয়ার্টার এদিকে, খোলা দরজা পথে কেবিন এবং মেস দেখা যাচ্ছে।

বো-এর কাছে একটা ইস্পাতের মোটা পাত মোড়া দরজা, তাতে স্টেনসিল দিয়ে লেখা রয়েছে-ফোক্যাসল স্টোর। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ওরা আমাকে। ভারি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ক্লিক করে শব্দ হল তালা বন্ধ হবার।

ছয় ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া জায়গাটা। দুটো বাল্কহেডের গায়েই সারিবদ্ধ স্টোরেজ লকার রয়েছে। গুমোট একটা ভাব।

আমার প্রথম চিন্তা যে-কোন ধরনের একটা অস্ত্র পাওয়া যায় কিনা দেখা। লকারগুলোর তালা পরীক্ষা করে নিরাশ হলাম। কবাটগুলো এক ইঞ্চি পুরু ওক কাঠের, ভাঙতে হলে কুঠার দরকার। তবু কাঁধের ধাক্কা দিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম। জায়গাটা ছোট, তাই জোরের সাথে ধাক্কা মারাও সম্ভব নয়। কাজ হচ্ছে না। তবে শব্দের একটা প্রতিক্রিয়া ঘটল সাথে সাথে।

দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। চৌকাঠ থেকে যথেষ্ট পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন ক্রু, হাতে প্রকাণ্ড একটা পয়েন্ট ফরটি-ওয়ান ম্যাগনাম।

'খামোকা কষ্ট দিচ্ছ নিজেকে,' বলল লোকটা। 'তোমার কাজে লাগবে এমন কিছু নেই ওগুলোয়।' পেছন দিকের দেয়ালের কাছে স্তূপ করে রাখা লাইফ-জ্যাকেটগুলো দেখাল সে। 'চুপচাপ বসে থাক ওখানে। ফের যদি কোন আওয়াজ শুনি, মনে করব ধোলাই দরকার তোমার। সাহায্যের জন্যে ওদেরকে ডাকব তখন।' দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

নিঃশব্দে ফিরে এসে লাইফ-জ্যাকেটগুলোর ওপর বসলাম।

দরজার বাইরে গার্ড রাখা হয়েছে, ভাবছি আমি, অন্যান্যরাও রয়েছে কাছেপিঠে। লোকটা দরজা খুলবে, এ আমি আশা করিনি। ওকে দিয়ে আরেকবার খোলাতে হবে ওটা-কিন্তু সেবার যেভাবে হোক বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে। বুঝতে পারছি, সফল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ঘরের দিকে নল তুলে ট্রিগার টিপতে হবে শুধু ওকে। ব্যর্থ হবার কোন কারণ নেই ওর।

যথাসম্ভব ওর কাছাকাছি পৌঁছুতে হবে আমাকে, সেজন্যে ওর চোখে ধুলো-অথবা ধোঁয়া দিতে হবে। ভুরু কুঁচকে লকারগুলোর দিকে তাকালাম আরেকবার, তারপর মনোযোগ দিলাম নিজের পকেটগুলোয়। প্রায় সব জিনিসই বের করে নিয়েছে ওরা। লাইটার, চুরুট, গাড়ির চাবি, পেন-নাইফ-এসব কিছুই নেই। থাকার মধ্যে ভাঁজ করা পাঁচ পাউণ্ডের তিনটে নোট, রুমাল আর কব্জিতে রয়েছে ঘড়িটা।

লাইফ-জ্যাকেটের স্তূপটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি। সেগুলো তুলে আরেক পাশে সরিয়ে রাখলাম। নিচে থেকে বেরুল ফলের একটা কাঠের বাক্স। তাতে অর্ধেকটা সাবান, নাইলনের ফ্লোরব্রাশ, ক্লিনিং ব্যাগ, এবং এক বোতল স্বচ্ছ তরল পদার্থ দেখতে পাচ্ছি। ছিপি খুলে বোতলটা নাকের সামনে

তুলে শ্বাস টানলাম। জিনিসটা বেনজিন।

আবার বসলাম। সদ্য পাওয়া সম্পদগুলো কিভাবে ব্যবহার করা যায় ভাবছি। কিন্তু চমকপ্রদ কোন বুদ্ধি আসছে না মাথায়।

আলোর সুইচটা দরজার বাইরে। মাথার ওপরের বালব্‌টা মোটা কাঁচের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা। আবার দাঁড়ালাম। বেয়ে-ছেয়ে লকারগুলোর অর্ধেকটা পর্যন্ত উঠে গেলাম, ঢাকনিটা খুলে পরীক্ষা করলাম বালব্‌টা। ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি এখন।

মেঝেতে নেমে বেছে নিলাম ভারি একটা লাইফ-জ্যাকেট। রিস্টওয়াচের স্টীল স্ট্র্যাপের আঁকড়া দিয়ে তর্জনী ঢোকার মত একটা ফুটো করে নিলাম, তারপর ক্যানভাসটা টেনে ছিঁড়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলাম সাদা কাপোক। অনেকগুলো লাইফ-জ্যাকেটের ক্যানভাস ছিঁড়লাম। কাপোকের বেশ বড় সড় একটা স্তূপ তৈরি করলাম মেঝেতে। জিনিসটা তুলোর মত, তাতে বোতলের বেনজিন ঢালতে ভিজে সপসপে হয়ে গেল। এক মুঠো ভিজে কাপোক তুলে নিলাম আমি, তারপর লকারের গায়ে পা রেখে আবার উঠে দাঁড়ালাম।

বালব্‌টা খুলে নিতেই অন্ধকার হয়ে গেল ঘরটা। শুধু স্পর্শ অনুভব করে কাজ করছি আমি। বেনজিন ভেজা নরম কাপোক ইলেকট্রিসিটি টার্মিনালগুলোর দিকে চাপ দিয়ে ঠেলে দিচ্ছি। ব্যবহার করার মত কোন ইনসুলেশন নেই, তাই রিস্টওয়াচের স্টীল স্ট্র্যাপটা খালি হাতে নিয়ে ওটাকেই ব্যবহার করছি। অকস্মাৎ নীল আলো চমকে উঠল, বেনজিনে আগুন ধরে গেল সাথে সাথে, এবং একশো আশি ভোল্টের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লাম আমি ডেকের ওপর ক্যানভাসের স্তূপে, কাপোকের জ্বলন্ত বলটা এখনও রয়েছে আমার হাতে।

অস্পষ্টভাবে বিরক্তিসূচক চিৎকার ভেসে এল বাইরে থেকে। ফোক্যাসলের সমস্ত লাইটিং সিস্টেম বানচাল করে দিয়েছি আমি,

অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা। হাতের আগুনটা দ্রুত কাপোকের ভিজে স্তূপে ফেলে দিলাম আমি, দপ করে জ্বলে উঠল স্তূপটা। হাত থেকে আগুনের ফুলকি ঝেড়ে ফেলে নাক আর মুখ চেপে ধরলাম রুমাল দিয়ে। বেছে রাখা ভাল লাইফ-জ্যাকেটটা ছোঁ মেরে তুলে নিলাম আমি, দ্রুত দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পুড়ে শেষ হয়ে গেল বেনজিন। জ্বলন্ত কাপোক থেকে হু হু করে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। ঘরটা ভরে গেছে এরই মধ্যে, ঝর ঝর করে পানি বেরিয়ে আসছে আমার চোখ থেকে। খুব ধীরে এবং সাবধানে, শ্বাস টানতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ফুসফুসে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে ঝাঁঝাল ধোঁয়া, খক খক করে অদম্য কাশির সাথে শিরদাঁড়া বেঁকে যাচ্ছে আমার।

‘পুড়ছে! কিছু পড়ছে!’ দরজার বাইরে চিৎকার করে উঠল গার্ডটা। ‘দোহাই লাগে, আলোটা জ্বালার ব্যবস্থা কর,’ দূর থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল।

এবার আমার পালা। দু’হাত দিয়ে ঘুসি মারছি ইস্পাতের দরজায়, আতঙ্কে চিৎকার জুড়ে দিলাম, ‘আগুন! আগুন! জাহাজে আগুন ধরে গেছে! বাঁচাও!’ এর সবটাই অভিনয় নয়। ছোট্ট ঘরটার ভেতর ধোঁয়া এত ঘন হয়ে যাচ্ছে যে বুঝতে পারছি বড়জোর আর ষাট সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারব আমি, তারপরই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জ্ঞান হারাব।

দরজা খুলে ভেতরে টর্চের আলো ফেলল গার্ড। বাইরে অন্ধকার, কালো মূর্তিটা ছুটোছুটি করছে, গার্ডের হাতে টর্চ আর রিভলভারটা রয়েছে-এর বেশি কিছু দেখার অবকাশ পেলাম না।

ঘন, জমাট বাঁধা একটা কালো ধোঁয়ার মেঘ বেরিয়ে যাচ্ছে ঘরটা থেকে, সেটার মাঝখানে ঢুকে পড়লাম, তারই সাথে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমার ধাক্কা খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছে গার্ড, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল একটা গুলি। মাজল থেকে শিখা বেরিয়ে চারদিক আলোকিত করে দিল মুহূর্তের জন্যে,

কম্প্যানিয়নওয়ের মইটা দেখতে পেলাম আমি।

বুলেটের আওয়াজ কালো মূর্তিগুলোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মইয়ের দিকে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছি আমি, এই সময় তাদের একজন লাফ দিয়ে সামনে চলে এল আমাকে বাধা দেবার জন্যে। কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলাম তার বুকে, লিক হয়ে যাওয়া রিকশার চাকার মত শব্দ করে সব বাতাস বেরিয়ে এল তার ফুসফুস থেকে।

মার-মার কাট-কাট শুরু হয়ে গেছে চারদিক থেকে। লবি পেরোবার সময় মইয়ের গোড়ায় আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছি। গতি না কমিয়ে এগোচ্ছি, সবটুকু জোর দিয়ে লোকটার পেটে লাথি চালালাম। মুহূর্তের জন্যে থামলাম আমি, লোকটাকে মইয়ের গোড়ায় শুয়ে পড়তে দিচ্ছি। এই সময় একটা টর্চের আলো লোকটাকে ছুঁয়ে ছুটে গেল একদিক থেকে আরেক দিকে। অজ্ঞান লোকটাকে চিনতে পারলাম। এ সেই রসুনের গন্ধ। মই বেয়ে ওঠার সময় একটু সাহায্য নিলাম ওর কাছ থেকে। ওর কাঁধে একটা পা রেখে সেটাকে স্প্রিঙবোর্ডের মত ব্যবহার করলাম, লাফ দিয়ে উঠে গেলাম মইয়ের অর্ধেকটা।

গোড়ালির পেছনটা খামছে ধরল পেছন থেকে কেউ, পা ছুঁড়ে ছাড়িয়ে নিলাম আমি। পৌঁছে গেছি ডেক লেভেলে।

সরু রডের তৈরি মইয়ের ধাপে একটা মাত্র পা রয়েছে আমার, এক হাতে লাইফ-জ্যাকেট, অপর হাত দিয়ে ধরে আছি হ্যাণ্ডরেইল-এই রকম অসহায় মুহূর্তে ডেকের দরজা পথে আরও একটা কালো মুর্তি এসে দাঁড়াল, এবং আচমকা চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে জ্বলে উঠল সমস্ত আলো।

বালির বস্তা হাতে প্রকাণ্ডদেহী সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে আমার ওপরে, আঘাত করার জন্যে আমার মাথার ওপর বস্তাটা তোলার সময় হাসছে। আঘাতটা এড়িয়ে যাবার একমাত্র উপায় হ্যাণ্ডরেইল ছেড়ে দিয়ে পেছন দিকে ফোক্যাসলে পড়ে যাওয়া,

যেখানে আক্রোশে লাফালাফি করছে একদল কালো মূর্তি।

পেছন দিকে তাকালাম। হ্যাণ্ডরেইলটা সত্যি ছেড়ে দিতে যাচ্ছি। হঠাৎ আমার পেছন দিকে, নিচের ডেকে উঠে বসল রিভলভারধারী লোকটা, ইয়টের দোলা সামলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করেই গুলি ছুঁড়ল।

ভারী সীসার বুলেটটা আমার কানের পাশ দিয়ে উঠে গেল। ওপরে দাঁড়ানো লোকটা ঝাঁকি খেল, তার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, বুক স্পর্শ করল চিবুক। মাথা নিচু করে বুকের বাঁ দিক ঘেঁষা ফুটোটা অবাক বিস্ময়ে দেখছে যেন। এক সেকেণ্ড এই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল লোকটা। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত এড়াবার জন্যে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিলাম আমি। লোকটা সটান পড়ে যাচ্ছে মইয়ের দিকে, তার পাশ ঘেঁষে স্যাঁৎ করে উঠে এলাম ডেকে।

আমার পেছনে আবার গর্জে উঠল রিভলভার, হ্যাচের গায়ে লেগে ফেটে ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম বুলেটটাকে। তিন কদম ছুটে এসেই ডাইভ দিয়ে পেরিয়ে গেলাম রেইলটা, পেটের ভেতর জায়গা বদল করল নাড়িগুলো, ঝপাৎ করে পড়লাম কালো পানির বুকে।

প্রপেলারগুলো প্রচণ্ড আলোড়ন তুলছে পানিতে, সেই আলোড়নের মধ্যে পড়ে গেলাম আমি, সাঁ করে টেনে নিল আমাকে নিচে।

চামড়া ভেদ করে হাড়ে ঘষা খাচ্ছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। লাইফ জ্যাকেটটা পানির ওপর টেনে তুলল একসময় আমাকে। দিশেহারার মত নিজের চারদিকে তাকালাম। অনেক, অনেক দূরে কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে উপকূলের আলো-কিন্তু ওখানে সাঁতার কেটে পৌঁছানর কথা কোন পাগলও চিন্তা করবে না।

পানির ওপর চারপাশ ঘিরে মাথা উঁচু ঢেউ আমাকে আড়াল হয়ে থাকতে সাহায্য করছে। স্রোতটাও তীব্র। কিন্তু ঢেউগুলো

শত্রুর মতো আমাকে ওপর দিকে তুলেও ধরছে, যাতে ইয়ট থেকে ওরা সবাই আমাকে পরিষ্কার দেখতে পায়।

খোলা সাগরের দিকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বুমেরাং। সব আলো জ্বলছে তার, আলোকমালায় সজ্জিত প্রমোদতরীর মত লাগছে দেখতে। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাত আর পা ব্যবহার করে খুলে ফেললাম জুতো আর জ্যাকেট, তারপর লাইফ-জ্যাকেটের হাতায় হাত দুটো গলিয়ে দিলাম। আবার যখন তাকালাম, এক মাইল দূরে সরে গেছে বুমেরাং। কিন্তু হঠাৎ সে বাঁক নিতে শুরু করল। এবং ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল সাদা স্পটলাইটের সুদীর্ঘ বাহু। কালো সাগরের বুকে হালকাভাবে ঘুরছে, নাচানাচি করছে উজ্জ্বল আলোটা।

তীরচিহ্নের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম আমি। বুমেরাং পিছু ধাওয়া নাও যদি করে, ওখানে আমি পৌঁছুতে পারব না সাঁতার কেটে। কিন্তু একথাও ঠিক, চুপচাপ পানির ওপর ভেসে থাকারও কোন মানে হয় না। পশ্চিম মুখো স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম আমি।

ধীর গতিতে ফিরে আসছে বুমেরাং। স্পটলাইটের আলো দ্রুত সার্চ করছে একদিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত পানির উপরিভাগ। ক্রমশ এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এগোচ্ছি এখন, পানির ওপরটা ভেঙে গিয়ে সাদা ফেনা তৈরি হবার ভয়ে হাত পা ছুঁড়ছি না।

ইংলিশ গ্রাউণ্ডে বয়ার রাইডিং লাইটটা একটু আগে ভাটা শরু হবার সাথে সাথে দিক বদল করেছে। স্রোতের টানে বুমেরাঙের পথ থেকে সরে এসেছি আমি, আমার সাথে সমান্তরাল রেখার ওপর এগিয়ে আসছে সে, স্পটলাইট দিয়ে খোলা পানি সার্চ করছে।

বয়ার রাইডিং লাইট এর বেশি আমার দিকে এগিয়ে আসার অনুমতি দেবে না বুমেরাংকে। দেড়শো গজ দূর থেকে তার ব্রিজে লোকজন দেখতে পাচ্ছি আমি। সিডনি শেরিডানের নীল সিল্কের গাউনটা ফড়িঙের পাখনার মত ঝিকমিক করছে ব্রিজের আলোয়। ধমকের চড়া গলা শুনতে পাচ্ছি তার, কিন্তু কথাগুলো ধরতে পারছি না।

অভিযোগকারীর সাদা লম্বা একটা তর্জনীর মত স্পটলাইটের আলো এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বারবার আগুপিছু যাওয়া আসা করে পানির ওপরটা সার্চ করছে। পরের বার যখন আসবে, আমাকে স্পর্শ করবে আলোটা। পেছন দিয়ে চলে গেল এবার, শেষ প্রান্তে পৌঁছুল, কোন বিরতি না নিয়ে ফিরে আসছে আবার।

এক নিমেষে আমার ওপর এসে পড়ল আলোটা। ঠিক সেই সময় একটা ঢেউ থেকে নেমে গেছি আমি। ঢেউয়ের ফেনা ভেদ করে ম্লান আলো পড়ল আমার গায়ে, কিন্তু থামল না।

দেখতে পায়নি আমাকে ওরা। আরও কিছুক্ষণ নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির পর সেভার্নের মুখের দিকে ফিরে যাচ্ছে বুমেরাং। লাইফ-জ্যাকেটের কর্কশ আলিঙ্গনের মধ্যে শুয়ে আছি আমি। ক্লান্ত। ঠাণ্ডায় কাঁপছি। মাথার অসাড়ভাবটা এখন নেই, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছে হঠাৎ করে-সম্ভবত বিপদ কেটে যাওয়ায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সাইকিক পেইন।

কিন্তু মুক্তি পেয়েছি আমি। এখন শুধু একটাই দুর্ভাবনা-ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে কতক্ষণে মরব।

সাঁতার কাটছি আবার। অনেকক্ষণ হল চোখের আড়ালে চলে গেছে বুমেরাঙের আলো।

ইয়টের ফোক্যাসলে ফেলে রেখে এসেছি রিস্টওয়াচ, তাই বলতে পারব না কতক্ষণ একনাগাড়ে সাঁতার কাটার পর হাত এবং পাগুলো সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে আমার। এখনও সাঁতার কাটতে চাইছি আমি, চেষ্টাও করছি, কিন্তু জানি না হাত-পা সাড়া

দিচ্ছে কিনা।

নিজেকে ঢিল করে দিয়ে ভেসে থাকার অদ্ভুত একটা অনুভূতি উপভোগ করতে শুরু করেছি। উপকূলের আলোগুলো ক্রমশ ঝাপসা হতে হতে কখন জানি না একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোমল মেঘ যেন ঘিরে রেখেছে আমাকে। ভাবছি, এটাই যদি মৃত্যুকালীন পরিবেশ হয়, তাহলে এ সম্পর্কে যে আতঙ্ক ছড়ানো হয় তার দেখছি সবটাই পুরোপুরি মিথ্যে। নাক দিয়ে হাসির শব্দ বেরিয়ে এল। শুয়ে আছি অসহায় ভাবে লাইফ-জ্যাকেটে। ভিজছি।

দৃষ্টি শক্তি হারালাম কেন? বারবার বিরক্ত করছে প্রশ্নটা। মৃত্যুর অনেক বিবরণ শুনেছি, কিন্তু কই, অন্ধ হয়ে যাবার কথা তো শুনিনি! তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলাম ভোরের সাথে সাথে সৃষ্টি হয়েছে কুয়াশার, সেজন্যেই কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি। তবে, ভোরের আলোর তেজ বাড়ছে ক্রমশ। এখন বিশ ফুট দূরে দেখতে পাচ্ছি কুয়াশার নিশ্ছিদ্র, নিরেট প্রাচীর।

চোখ বুজলাম আমি, এবং তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। আমার শেষ চিন্তাটা ছিল, এটাই বোধহয় আমার শেষ চিন্তা। ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসার আগে নিজের হাসির শব্দ শুনছিলাম, মনে পড়ে।

কথাবার্তার আওয়াজে ভেঙে গেল ঘুমটা। চোখ মেলে কুয়াশা ছাড়া কিছুই দেখছি না। অথচ একেবারে কাছ থেকে এবং পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি লোকজনের কণ্ঠস্বর।

চিৎকার করার চেষ্টা করলাম। গলা দিয়ে মৃদু একটু চিঁ চিঁ আওয়াজ বেরুল কি বেরুল না-তাতেই মনে হল, যা হোক, বেঁচে আছি তাহলে। ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠছে লম্বা একটা জেলে নৌকো। দু'জন লোক কিনারা থেকে ঝুঁকে পড়ে জাল টানার নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছে।

আবার আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। প্রথমবারের চেষ্টায় আওয়াজ

বেরোয়নি, কিন্তু মুখের ভেতর থেকে পানিটুকু বেরিয়ে গিয়েছিল। এবার পথ খোলা পেয়ে আওয়াজটা এমন জোরে বেরুল যে চমকে উঠলাম নিজেই, এবং লজ্জা পেলাম।

'গুড মর্নিং, ভায়েরা।'

'জেসাস!' একজন জেলে দেখতে পেয়েছে আমাকে। বিস্ময় ধ্বনির সাথে দুই দাঁতের মাঝখান থেকে পাইপটা খসে পড়ল পানিতে, ছ্যাঁৎ শব্দে নিভে গেল আগুনটা।

নোংরা একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে খুদে হুইল হাউজে বসলাম আমি। সস্তা দামের টিনের মগে চিনি ছাড়া গরম চা খাচ্ছি। এত জোরে কাঁপছি যে চা-টুকু আমার দুই হাতে ধরা মগের মধ্যে পাক খাচ্ছে, লাফিয়ে উঠছে অবিরত।

সম্পূর্ণ শরীর নীল হয়ে গেছে আমার। নির্মম ম্যাসেজের ফলে রক্ত চলাচল শরু হতেই জয়েন্টগুলোয় তীব্র ব্যথা অনুভব করছি। সরল জেলে ওরা, প্রকৃতির সন্তান, ফালতু লাজলজ্জার বালাই নেই-সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে কিছুই ম্যাসেজ করতে বাকি রাখল না আর।

মাছ ধরা শেষ করে ওরা যখন বাড়ি-মুখো হল তখন বিকেল। ইতিমধ্যে আমার পোশাক শুকিয়ে গেছে, পেটে দানাপানি পড়েছে।

পোর্ট ট্যালবটে ভিড়ল নৌকা। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে ওদেরকে পাঁচ পাউণ্ডের নোট তিনটে দিতে গেলাম আমি। বয়স্ক জেলে লোকটা ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাগর থেকে কাউকে তুলতে পারলেই মনে করি পুরো পারিশ্রমিক পেয়ে গেছি, মিস্টার। টাকা রাখ।'

বারবার বাস আর ট্রেন বদল করে লণ্ডনে ফেরা দুঃস্বপ্নের মত লাগল। পরদিন সকাল দশটায় ট্রেন থেকে ছিটকে প্যাডিংটন স্টেশনে নামলাম। দুই যুবতী হাসতে হাসতে যাচ্ছে, আমাকে

দেখেই আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল দ্রুত। বুঝতে বাকি থাকল না চেহারাটা আমার দেখতে কি রকম হয়েছে।

ট্যাক্সির ড্রাইভার আরও পরিষ্কার ধারণা পেতে সাহায্য করল আমাকে। দু'দিনের গজিয়ে ওঠা দাড়ি, ফুলে ওঠা ঠোঁট, লাল চোখ এবং চামড়া ছেলা মুখের ক্ষতগুলোর দিকে তাকিয়ে সবজান্তার মত মাথা নাড়ল সে। 'ওর স্বামী বুঝি হঠাৎ এসে পড়েছিল? পালাবার সময় পাওনি?' জিজ্ঞেস করল আমাকে।

বিড়বিড় করে বললাম, 'তাকেও আমি ছেড়ে দিইনি।'

আঙ্কেল বার্ডের বাড়ির দরজা খুলে দিল রাফেলা। আমাকে দেখে ঢোক গিলল সে। কথা বলতে গিয়ে বিষম খেল। তারপর ক্রমশ বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার নীল চোখ।

'রানা!' ফিসফিস করে বলল ও। 'রানা, এ কি অবস্থা হয়েছে তোমার? তু-তুমি...'

'কেন, পছন্দ হয় না?' হাসতে চেষ্টা করলাম আমি। 'দরজা থেকেই ফিরিয়ে দেবে নাকি?'

আমার কাঁধ ধরে টানল রাফেলা। বাড়ির ভেতরে নিয়ে এল আমাকে। 'পাগল হতে বাকি আছে শুধু। সারাটা দিন! পুলিসে খবর দিয়েছি, সব হাসপাতালে খবর নিয়েছি-সম্ভাব্য সব জায়গায় গেছি নিজে...'

পেছনের একটা কামরায় ঘুর ঘুর করছে আঙ্কেল বার্ড, তার উপস্থিতি সাংঘাতিক পীড়া দিচ্ছে আমার স্নায়ুকে। গোসল করে কাপড় বদলাবার রাফেলার প্রস্তাব এক কথায় প্রত্যাখ্যান করলাম আমি। তার পরিবর্তে ওকে নিয়ে পালিয়ে এলাম উইণ্ডসোর আর্মসে।

দাড়ি কামিয়ে বাথরূমের দরজা খোলা রেখেই গোসল করছি, সেই সাথে কথা বলছি আমরা। আমার দৃষ্টিপথ থেকে সরে আড়ালে বসে আছে বটে রাফেলা, কিন্তু বুঝতে পারছি এই অবস্থায় ওর সাথে আলোচনা করার সুযোগটা আমাদেরকে আরও গভীরভাবে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে প্রচুর সাহায্য করছে। নিঃশব্দে শুনছে ও, এবং কোন সন্দেহ নেই মুগ্ধ বিস্ময়ই ওর এই মৌনতার একমাত্র কারণ।

কোমরে শুধু তোয়ালে জড়িয়ে বাথরূম থেকে বেরিয়ে এসে বিছানার কিনারায় বসলাম আমি। ঘটনার শেষ অংশটা শোনাচ্ছি ওকে, এই ফাঁকে আমার শরীরের কাটাকুটিগুলোর যত্ন নিচ্ছে রাফেলা।

'এবার তোমাকে অবশ্যই পুলিসের কাছে যেতে হবে, রানা,' অবশেষে মুখ খুলল ও। 'ব্যাপারটা আর সাধারণ পর্যায়ে নেই। ওরা তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে।'

'রাফেলা, মাই ডারলিং গার্ল, প্লীজ! পুলিসের নাম উচ্চারণ করে শুধু শুধু আমার হার্টটাকে দুর্বল করে দিয়ো না তুমি।'

'কিন্তু, রানা...'

'পুলিসের কথা ভুলে গিয়ে দেখ পার যদি কিছু খাবার আনাও। মনে হচ্ছে জন্মের পর থেকে কিছুই খাইনি আমি।'

হোটেলের কিচেন থেকে গ্রিল করা মাংস, টমেটো, ডিম ভাজা, টোস্ট আর চা এল।

'মজার কথা, আবার ভয়েরও কথা-কি জানো?' খেতে বসে বললাম ওকে। 'খরচের খাতায় ওরা তোমার নামও টুকে রেখেছে। তোমার হাতে শুধু ফোস্কা ফেলতে আসেনি সেদিন ওরা, খুন করতে এসেছিল। সিডনি শেরিডানের ধারণা ওর লোকেরা তোমাকে খুন করে গেছে।'

পাথর হয়ে গেল রাফেলা। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে।

'তার মানে,' বললাম ওকে, 'ভোরের আলো সম্পর্কে কেউ কিছু জানলেই হল, তারা তাকে খুন করবে।'

'হুঁ,' গম্ভীরভাবে বলল রাফেলা।

'যাই হোক, হাতে আমরা বেশ কিছু সময় পাচ্ছি।

শেরিডানের বুমেরাং খুবই শক্তিশালী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন, তবু দ্বীপে পৌঁছুতে তিন থেকে চার হপ্তা লেগে যাবে তার ।'

চায়ে সব শেষে দুধ মেশাল রাফেলা, আমি যেভাবে পছন্দ করি । আমার পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে ও, বুঝতে পেরে আরও আশাবাদী হয়ে উঠলাম আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে । 'ধন্যবাদ, রাফেলা-তোমাকে দিয়ে আমার চলবে ।'

ঠোঁট জোড়ার বাইরে জিভের ডগাটা বের করে দেখিয়ে দিল আমাকে ও ।

'কম করেও লাখখানেক পাউণ্ড খরচ করতে হবে শেরিডানকে এই অভিযানের পেছনে । কি যে আছে ওই পাঁচটা কেসে! কৌশলে তথ্য বের করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হাসল শেরিডান । তার ধারণা আমি জানি ।'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাফেলার মুখ । 'আর যদি কোন দুঃসংবাদ না থাকে, এবার একটা সুসংবাদ শুনবে?'

'বোধহয় এক-আধটু সইতে পারব ।'

'চিঠিতে নিরোর নোটটার কথা বলছি- B. Mus ।'

'ব্যাচেলর অভ মিউজিক?'

'না, ইডিয়ট-ব্রিটিশ মিউজিয়াম ।'

'আরে, তাই তো!'

'ব্যাপারটা নিয়ে আঙ্কেলের সাথে আলোচনা করছিলাম । সাথে সাথে অর্থটা ধরতে পেরেছেন । সম্ভবত ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটা বইয়ের রেফারেন্স এটা । আঙ্কেলের রিডার্স কার্ড আছে । একটা বইয়ের জন্যে রিসার্চ করছেন কিনা, প্রায়ই যান ওখানে ।'

'আমরাও যেতে পারব?'

'যেতেই হবে,' বলল রাফেলা ।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম ।

রিডিংরুমের সোনালি আর নীল গম্বুজের নিচে প্রায় দু'ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি । কিসের জন্যে অপেক্ষা করছি, কোন ধারণাই

নেই । নিরোর রেফারেন্স নাম্বারটা দিয়ে একটা ফর্ম পূরণ করেছি শুধু, সেটা জমা দিয়েছি ডেস্কে ।

অ্যাটেনড্যান্ট যখন প্রকাণ্ড একটা পাঁচ সের ওজনের বই এনে দিল, ব্যগ্রতার সাথে নিলাম সেটা আমি । সেকার অ্যাণ্ড ওয়ারবার্গ এডিশন এটা, উনিশশো তিপ্পান্ন সালে প্রথম ছাপা হয়েছে । লেখক একজন ডক্টর, পি. এ. রেডি । রেক্সিনের কাভারে সোনালি অক্ষরে নাম লেখাঃ

LEGENDARY AND LOST TREASURES
OF THE WORLD

বইটা খোলার আগে নিরোর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে । এই বইটা নাড়াচাড়া করেছে সে, সন্দেহ নেই । কাগজপত্রের এই সব সূত্র অনুসরণ করার পেছনে তার জীবনের অনেক ঘটনাচক্র দায়ী, অনুমান করা যায় । সাগরে হারিয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপ এবং গুপ্তধন সম্পর্কে তার প্রচণ্ড কৌতূহলই কি এ-পথে টেনে এনেছিল তাকে? এই বইটা তার হাতে পড়ে আগে, নাকি পুরানো চিঠিগুলো? এসব প্রশ্নের উত্তর কোনদিন জানতে পারব না আমি ।

ঊনপঞ্চাশটা পরিচ্ছেদে ভাগ করা বইটা । প্রতিটি পরিচ্ছেদ আলাদা বিষয় নিয়ে লেখা । তালিকাটা সাবধানে পড়া শেষ করলাম প্রথমে ।

পানামার সোনার তাল এবং পাত, জলদস্যুদের সমগ্র গুপ্তধন, উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালায় হারিয়ে যাওয়া সোনার খনি, দক্ষিণ আমেরিকার একটা ডায়মণ্ড ভর্তি উপত্যকা, আর্মাডার ট্রেজার শিপ, আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেটের স্বর্ণ ভাণ্ডার, আরও ট্রেজার শিপ-আধুনিক এবং প্রাচীন, দুই ধরনেরই-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে পেছনের দিকে ট্রয় নগরী ধ্বংস হওয়ার আগে পর্যন্ত, মুসোলিনীর ধন-সম্পদ-এই রকম অসংখ্য বিষয় রয়েছে । সত্য মিথ্যে, বাস্তব ঘটনা এবং রঙিন কল্পনা, ইতিহাস

এবং অনুমান-এই সব মিশিয়ে আশ্চর্য আলাদা একটা জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে বইটিতে। আটলান্টিক থেকে কালাহারি মরুভূমি পর্যন্ত শত শত বছর ধরে কত শহর আর সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেউ আজ আর তার খবর রাখে না, কিন্তু এখানে সেই সব শহর আর সভ্যতার বিপুল ধন সম্পদের সম্ভাব্য বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। যাকে বলে এলাহি কারবার, কোথায় খোঁজ করব আমি সে সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারছি না।

একটা দম নিয়ে সাহসে বুক বাঁধলাম, তারপর সম্পাদকীয় এবং ভূমিকা এড়িয়ে পাঠে মনোনিবেশ করলাম।

পাঁচটার মধ্যে ষোলোটা পরিচ্ছেদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম আর পাঁচটা পরিচ্ছেদ গভীর মনোযোগের সাথে খুঁটিয়ে পড়লাম। কিন্তু ভোরের আলোর সাথে এই সব পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর কোন যোগসূত্র পেলাম না, তবে নিরো কেন হারানো গুপ্তধন সম্পর্কে প্রচণ্ড উৎসাহী ছিল তা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছি। যে-কোন মানুষকে উত্তেজিত করার মত বিষয় এটা। এটা এমন একটা জগৎ যেখানে একবার ঢুকলে সহজে বেরুনো যায় না। নিজের অস্তিত্ব ভুলে বুঁদ হয়ে পড়ে যাচ্ছি আমি। আগ্রহে চকচক করছে আমার চোখ।

নতুন কেনা জাপানী রিস্টওয়াচটা দেখে আঁতকে উঠলাম আমি। বইটা জমা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলাম মিউজিয়াম থেকে। গ্রেট রাসেল স্ট্রীট পেরিয়ে একটা বারে ঢুকলাম, এখানে দেখা করার কথা আমার রাফেলার সাথে।

'দুঃখিত,' রাফেলার পাশের চেয়ারে বসে বললাম। 'সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

আমার একটা হাত চেপে ধরল ও। 'কি জানতে পেরেছ তাই বল। কৌতূহলে মরে যাচ্ছি আমি।'

রাফেলার আকণ্ঠ তৃষ্ণা মেটাতে পারলাম না, যা বললাম

তাতে ওর চোখ মুখে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কৌতূহলের আগুন। বইটার নাম শুনে আরও অস্থির হয়ে উঠল ও। অর্ডারের খাবার নিয়ে বেয়ারা ফিরে আসার আগেই আমাকে মিউজিয়ামে ফেরত পাঠাতে চাইল। অনেক কাকুতি মিনতি করে কিছুটা সময় চেয়ে নিলাম আমি। কিন্তু খাওয়া শেষ হতে আর একটা মিনিটও বসতে দিল না আমাকে।

উইণ্ডসোর আর্মসে আমার কামরার চাবি দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম ওকে। তারপর দ্রুত আবার ফিরে এলাম মিউজিয়ামের রিডিংরূমে। বইটার পরবর্তী পরিচ্ছেদের নাম-মহান মোঘল সম্রাট এবং ভারতের ব্যাঘ্র সিংহাসন।

পরিচ্ছেদের শুরুতেই একটা সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে প্রাচীন দুনিয়ার দুই প্রখ্যাত বীর তৈমুর লং এবং চেঙ্গিস খান উত্তর-ভারতের পর্বতমালা পেরিয়ে এসে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সাথে সাথে অনুধাবন করলাম আমি যে এলাকা সম্পর্কে আগ্রহী এটা তার আওতার মধ্যে পড়তে পারে। প্রাচীন এই উপমাহাদেশ থেকেই শেষবারের মত যাত্রা করেছিল ভোরের আলো।

সম্রাট বাবরের পর অন্যান্য মুসলিম শাসকদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে প্রথম দিকে। এই সব শাসকরা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন এবং দ্রুত ও কৃতিত্বের সাথে উপমহাদেশের চেহারা বদলে দেন। তাঁদের কীর্তির কথা বলে শেষ করা যায় না, যা আজও সারা ভারতে অক্ষয় হয়ে টিকে আছে। এই সব শাসকরা বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং তাঁরা তাজমহলের মত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সবশেষে বর্ণনা করা হয়েছে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন পর্ব। ইংরেজরা দিল্লীর দুর্গ দখল করে নিয়ে মোঘল রাজকুমারদের যাকে যেখানে পেল হত্যা করল, বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহকে বন্দী করল।

এরপর অকস্মাৎ লেখক ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পটভূমি থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ আলাদা এক গল্প ফেঁদে বসেছেন। তা হুবহু এই রকমঃ

ষোলোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে জিন ব্যাপ্টিস্ট তাভেরনিয়ের নামে এক ফ্রেঞ্চ পর্যটক এবং স্বর্ণকার মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে হাজির হয়েছিল। এর পাঁচ বছর পর প্যারিস থেকে সে ট্রাভেলস ইন দ্য ওরিয়েন্ট নামে একটা বই প্রকাশ করে। মুসলিম শাসকের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয় সে, এবং রাজপ্রাসাদের রত্ন ভাণ্ডারে প্রবেশ করার দুর্লভ অনুমতি পায়। শুধু তাই নয়, উল্লেখযোগ্য কিছু রত্নের পরিচিতি এবং বর্ণনা লিপিবদ্ধ করারও সুযোগ দেয়া হয় তাকে। এগুলোর মধ্যে একটা ডায়মণ্ড ছিল যেটার নাম দেয় সে-"গ্রেট মোঘল"। ডায়মণ্ডটা ওজন করে তাভেরনিয়ের, এবং তার ক্যাটালগে দুশো আশি ক্যারেটের কথা লেখে। সে তার বর্ণনায় জানায় অসাধারণ, অত্যাশ্চর্য দ্যুতি বিকিরণ করে ডায়মণ্ডটা, এবং এর রঙ এত পরিষ্কার আর সাদা, ঠিক যেন আসমানের গ্রেট নর্থ স্টার।

সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে জানান ষোলোশো পঞ্চাশ সালে গোলকুণ্ডা মাইন থেকে পাথরটা উদ্ধার করা হয় এবং তখন এটার ওজন ছিল সাতশো সাতাশি ক্যারেট।

পাথরটাকে কেটে গোলাকার একটা গোলাপের আকৃতি দেয়া হয়, কিন্তু এর সব দিক সমান ভাগে ভাগ করা নয়, অর্থাৎ কাটিংটা সিমেট্রিক্যাল হয়নি-একটা দিক ফুলে আছে।

পাথরটা সম্পর্কে এর পরে আর কেউ কোন বর্ণনা দিতে পারেনি, তাই অনেকে মনে করে যে তাভেরনিয়ের আলাদা কোন ডায়মণ্ড নয়, আসলে কোহিনুর অথবা অরলফ দেখেছিল। কিন্তু তাভেরনিয়েরের মত একজন অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক এবং দক্ষ কারিগর এ-ধরনের স্থূল ভুল করবে তা মোটেও আশা করা যায় না। কোহিনুর আর অরলফের সাথে গ্রেট মোঘলের চেহারা,

আকৃতি এবং ওজনগত পার্থক্য ব্যাপক, ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না। লণ্ডনে নতুন করে কাটার পর কোহিনুরের ওজন দাঁড়ায় মাত্র একশো একানব্বই ক্যারেট,-বলা বাহুল্য, সেটার আকৃতিও গোলাপের মত নয়। আর অরলফের আকৃতি গোলাপের মত হলেও এটা একটা সিমেট্রিক্যাল পাথর এবং এর ওজন একশো নিরানব্বই ক্যারেট। তাভেরনিয়ের যে পাথরটার কথা বলছে সেটার সাথে এ দুটোর বা অন্য কোন পাথরের কোন মিল নেই। এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণ প্রকাণ্ড একটা স্বতন্ত্র সাদা পাথরের অস্তিত্ব জাহির করছে, যেটা প্রকাশ্য দুনিয়া থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে।

সতেরশো উনচল্লিশ সালে পারস্যের নাদির শাহ ভারতে প্রবেশ করে দিল্লী দখল করেন, কিন্তু ভারতে তিনি স্থায়ী রাজত্ব কায়েম করতে চাননি, তার পরিবর্তে তিনি বিপুল ধন-রত্ন লুটপাট করে স্বদেশে ফিরে যান-এই সব রত্নের মধ্যে ময়ূর সিংহাসন এবং কোহিনূর ছিল, কিন্তু গ্রেট মোঘল ছিল না। যেভাবেই হোক, গ্রেট মোঘল নাদির শাহের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এরপর ভারত শাসনের দায়িত্ব চাপানো হয় মোঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহ-এর উপর। ঐতিহাসিক ময়ূর সিংহাসন নেই, তাই মোহাম্মদ শাহ তার বিকল্প একটা সিংহাসন তৈরি করার নির্দেশ দেন।

ময়ূর সিংহাসনের বিকল্প তৈরি হয় বটে কিন্তু নতুন এই মহা ঐশ্বর্যের অস্তিত্ব সম্ভাব্য সব কৌশলে গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। এর অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থানীয়দের কিছু বক্তব্য পাওয়া গেলেও ইউরোপীয়ানদের মধ্যে মাত্র একজনের বক্তব্য এখানে উল্লেখের দাবি রাখে।

সতেরশো সাতচল্লিশ সালে দিল্লীর দরবারে ইংরেজ দূত ছিলেন স্যার টমাস জেনিং, মোঘল সম্রাটের সাথে তাঁর এক সাক্ষাৎকারের কথা তিনি লিখে রেখে গেছেন ডায়েরীতে। 'মণিমুক্তোখচিত মহামূল্যবান সিল্কের পোশাক পরে আছেন সম্রাট, বসে আছেন বিশাল এবং সোনার তৈরি সিংহাসনে। ক্রোধোন্মত্ত

একটা বাঘের আকৃতি বিশিষ্ট তাঁর এই সিংহাসন। মুখ হাঁ করে আছে বাঘটা, রাক্ষসের মত একটা মাত্র অত্যুজ্জ্বল চোখ তার কপালে। বাঘের শরীরটা সবরকম দুর্লভ পাথর দিয়ে তৈরি। সিংহাসনের কাছাকাছি গিয়ে বাঘের চোখটা পরীক্ষা করার প্রার্থনা জানাই আমি, মহানুভব সম্রাট আমাকে অনুমতি দিয়ে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এই সময় তিনি আমাকে জানান বাঘের এই চোখটা সর্বকালের একটা বিস্ময়কর ডায়মণ্ড এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে অনেক হাত ঘুরে এটা তাঁর কাছে এসেছে।'

ভারতের ব্যাঘ্র সিংহাসনেই কি তবে তাভেরনিয়েরের গ্রেট মোঘল স্থান লাভ করেছে? তাই যদি হয়, তাহলে এই হারানো ঐশ্বর্য সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারি আমরা। আশ্চর্য কিছু ঘটনার রোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়ার পর এছাড়া আর কিছু বলার থাকতে পারে না।

আঠারশো সাতান্ন সালের ষোলোই সেপ্টেম্বর দিল্লীর পথে পথে যুদ্ধ বেধে যায়, রাস্তার ওপর আহত এবং মৃত লোকের স্তূপ জমে যায়। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যাপকতা লাভ করার আগেই বিশ্বস্ত সিপাইদেরকে নিয়ে ব্রিটিশ ফোর্স রাস্তায় নামে, ফলে দু'পক্ষের শক্তি একটা ভারসাম্যে স্থির হয়ে থাকে। ব্রিটিশ ফোর্সের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহীদেরকে ঝেঁটিয়ে শহর থেকে বের করে দিয়ে প্রাচীন দুর্গটা দখল করা-এই দুর্গই ছিল শহরের রক্ষাকবচ।

একশো একতম রেজিমেন্টের দু'জন ইংরেজ অফিসারের নেতৃত্বাধীন একদল বিশ্বস্ত সিপাইকে নদী পেরিয়ে প্রাচীর ঘিরে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয় উত্তর দিকে রাস্তাটা দখল করার জন্যে। এর উদ্দেশ্য ছিল মোঘল রাজ পরিবারের সদস্য এবং বিদ্রোহী নেতারা বিধ্বস্ত শহর ছেড়ে যেন পালাতে না পারে।

দু'জন ইংরেজ অফিসারের নাম ছিল ক্যাপ্টেন ম্যাথু লং এবং

কর্নেল স্যার রজার গুডচাইল্ড...

বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে লাফ দিয়ে উঠল দ্বিতীয় অফিসারের নামটা। নামের নিচে পেন্সিলের দাগ এবং মার্জিনে বিস্ময়বোধক চিহ্ন আঁকা রয়েছে। দাগ এবং চিহ্ন টানার ভঙ্গীটাই বলে দিচ্ছে আমাকে, এ কাজ নিরোর। দেখতে পাচ্ছি, হাত দুটো কাঁপছে আমার, উত্তেজনায় গরম লাগছে মুখটা। গোটা ধাঁধার এটাই শেষ সূত্র, বুঝতে পারছি। শব্দ এবং লাইনগুলোর ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে আমার দৃষ্টি।

আজ আর কেউ বলতে পারবে না ভারতীয় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া সেই নির্জন রাস্তায় সে-রাতে ঠিক কি ঘটেছিল। কিন্তু এর ছয়মাস পর ক্যাপ্টেন লং এবং ভারতীয় সুবেদার রাম পানাত কর্নেল গুডচাইল্ডের কোর্ট মার্শালে সাক্ষী দেবার সময় আশ্চর্য একটা কাহিনী প্রকাশ করে।

শহর দিল্লী তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। পলায়নপর একদল অভিজাত ভারতীয়কে পথে আটক করে তারা। দলে তিনজন মুসলিম ধর্মীয় নেতা এবং রাজ পরিবারের দু'জন কুমার ছিল। ক্যাপ্টেন লং-এর উপস্থিতিতে দুই রাজকুমারের একজন তাদের জীবন ও মুক্তির বিনিময়ে ব্রিটিশ অফিসারদেরকে পথ দেখিয়ে একটা গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। রাজকুমার জানায়, এক চোখ বিশিষ্ট বাঘ-আকৃতির একটা সোনার সিংহাসন রয়েছে সেখানে।

অফিসাররা রাজি হলে রাজকুমাররা তাদেরকে গভীর জঙ্গলের ভেতর একটা মসজিদে নিয়ে আসে। সেখানে তারা ছয়টা গরুর গাড়ি দেখতে পায়। গাড়িগুলো থেকে খড় দিয়ে ঢাকা জিনিসগুলো নামিয়ে পরীক্ষা করতেই রাজকুমারদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। সোনার সিংহাসনটা খুলে চারভাগে আলাদা করা হয়েছে- পেছনের অংশ, ধড়, গলা, এবং মাথা। ল্যাম্পের আলোয় সোনা

এবং মহামূল্যবান মণিমুক্তো দিয়ে তৈরি সিংহাসনের অংশগুলো দেখে অফিসাররা স্তম্ভিত হয়ে যায়।

কর্নেল রজার গুডচাইল্ড সেই মুহূর্তে ধর্মীয় নেতা এবং রাজকুমারদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। মসজিদের বাইরের দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো হয় তাদেরকে। সিপাইরা গুলি করার আগে কর্নেল গুডচাইল্ড রাজকুমারদের বিদ্রূপ করার জন্যে কিছুটা সময় ব্যয় করে। তারপর নিহত পাঁচজনের শরীরে সে নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে আরও পাঁচটা গুলি করে, তাদের মৃত্যু সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার জন্যে। মসজিদের একটা কুয়ায় ফেলে দেয়া হয় লাশগুলো।

এরপর শহরের প্রাচীর পাহারা দেবার জন্যে বেশির ভাগ সিপাইকে নিয়ে ফিরে আসে ক্যাপ্টেন লং।

ওদিকে পনেরোজন সিপাই এবং সুবেদার রাম পানাতকে নিয়ে কর্নেল গুডচাইল্ড গরুর গাড়ি যোগে রওনা দেয় অন্য দিকে।

ভারতীয় সুবেদার কোর্ট মার্শালকে এরপর আরও বিস্ময়কর এবং নিষ্ঠুর ঘটনার বর্ণনা দেয়।

কর্নেল গুডচাইল্ডের নেতৃত্বে পশ্চিম দিকে রওনা হয় তারা। ব্রিটিশ লাইন পেরিয়ে এসে ছোট একটা গ্রামে তিন দিনের জন্যে ক্যাম্প ফেলে। স্থানীয় কাঠমিস্ত্রী এবং তার দু'জন ছেলেকে ডেকে নিয়ে আসা হয়। কর্নেলের নির্দেশে সিংহাসনের চারটে অংশের জন্যে চারটে মজবুত কাঠের বাক্স তৈরি করে তারা। সিংহাসনের সোনার শরীর থেকে মহামূল্যবান পাথরগুলো অত্যন্ত সাবধানে খুলে নেয় কর্নেল, খোলার আগে সে একটা ডায়াগ্রামও তৈরি করে, যাতে আবার সেগুলো সেট করার সময় কোন অসুবিধেতে পড়তে না হয়। পাথরগুলো একটা আয়রন-সেফে রাখা হয়। আয়রন-সেফ সহ কাঠের বাক্স চারটে তোলা হয় গাড়িতে, তারপর এলাহাবাদ রেলস্টেশনের দিকে আবার শুরু হয় যাত্রা।

কর্নেলের হুকুমে কাঠমিস্ত্রী এবং তার দুই ছেলেকেও দলের

সাথে রওনা হতে হয়। সুবেদারের মনে পড়ে, রাস্তাটা যখন গভীর জঙ্গলে পৌঁছায়, কাঠমিস্ত্রীদেরকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায় কর্নেল গুডচাইল্ড। একটু পর ছয়টা গুলির শব্দ ভেসে আসে আড়াল থেকে, এবং গাড়ির কাছে ফিরে আসে কর্নেল গুডচাইল্ড একা।

অনেক বছর আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে ফুরিয়ে গেছে কর্নেল গুডচাইল্ড, তা নাহলে-পড়া থামিয়ে ভাবছি আমি-হয়ত এই লোকটাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিতে হত আমাকে। সিডনি শেরিডানের সাথে অনেক মিল লক্ষ করছি লোকটার, দু'জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম আমি, তাহলেই শেষ হত আমার দায়িত্ব-এর পরিণতি কি হত, জানা আছে আমার। ধারণাটা হাসির উদ্রেক করল মনে, আবার পড়তে শুরু করলাম।

ছয়দিনের দিন এলাহাবাদে পৌঁছুল কনভয়টা। সৈন্য নিয়ে একটা ট্রেন ফিরছিল বোম্বেতে, সামরিক অগ্রাধিকারের সুযোগ নিয়ে সেই ট্রেনে আয়রন-সেফ এবং বাক্সগুলো তুলে দেয় কর্নেল। ছোট দলটা এরপর ফিরে আসে দিল্লীতে নিজেদের রেজিমেন্টে।

এর ছয় মাস পর ক্যাপ্টেন লং পেটি অফিসার রাম পানাতের সমর্থন নিয়ে কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল গুডচাইল্ডের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে। আমরা ধরে নিতে পারি কর্নেল ওদেরকে সিংহাসনের ভাগ না দিয়ে সবটুকু একা মেরে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় বলেই খেপে গিয়ে ওই কাণ্ড করে ওরা। কিন্তু তা সে যাই হোক, এরপর থেকে সেই মহামূল্যবান গুপ্তধনের আর কোন হদিস কোথাও পাওয়া যায়নি।

বোম্বেতে অনুষ্ঠিত বিচার পর্ব ভারত এবং ইংল্যাণ্ডে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। কিন্তু কর্নেল গুডচাইল্ড সিংহাসনটার অস্তিত্বই অস্বীকার করে। অভিযোগকারীরা প্রমাণ হিসেবে সেটা বিচারকদের সামনে হাজির করতে ব্যর্থ হয়। ফলে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় কর্নেল। তবে এই কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায়

চাপের মুখে বাধ্য হয়ে কমিশন থেকে পদত্যাগ করে সে, ফিরে আসে ইংল্যাণ্ডে। ফেরার সময় সাথে করে ব্যাঘ্র সিংহাসন বা গ্রেট মোঘল ডায়মণ্ড নিয়ে এসেছে সে এর কোন প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। কর্নেলের বাকি জীবন অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে কাটে। কুখ্যাত এক মহিলার সাথে শহরে একটা জুয়ার আড্ডা খোলে সে, এবং সম্ভবত সিফিলিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আঠারশো একাত্তর সালে। তার মৃত্যুর পর পরই অমূল্য সেই ব্যাঘ্র সিংহাসনের প্রসঙ্গটা আবার আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু বাস্তব তথ্যের অভাবে তা আবার চাপা পড়ে যায়। এর রহস্যময় অস্তিত্ব দু'চারজন অতি উৎসাহী কল্পনাবিলাসীর মনেই ঠাঁই পেয়েছে, আর সবাই ভুলে গেছে।

আমরা বোধহয় এই পরিচ্ছেদের নাম, "যে গুপ্তধন কখনও ছিল না" রাখলে ভাল করতাম।

'মোটেও না,' সানন্দে ভাবছি আমি 'গুপ্তধন ছিল-এবং আছে।' এরপর আরেকবার প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলাম পরিচ্ছেদটা। এবার রাফেলার কথা ভেবে সাবধানে নোট নিচ্ছি।

জানালার ধারে একটা আরাম কেদারায় বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে রাফেলা। 'সব বল আমাকে,' চাপা স্বরে বলল ও।

'বিশ্বাস করবে না তুমি,' বললাম আমি।

'দশ সেকেণ্ড সময় দিলাম, মাসুদ রানা, এর মধ্যে যদি শুরু না কর, নখ দিয়ে আঁচড়ে দুটো চোখই তোমার...'

আমাদের কথা শেষ হতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে মেঝেতে হাঁটু আর কনুই ঠেকিয়ে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে ছড়ানো কাগজপত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছি আমরা। সেন্ট মেরীর আরকিপেল্যাগো অ্যাডমিরালটি চার্ট, ভোরের আলোর ড্রয়িং, ফার্স্ট মেট বারলোর বর্ণনা অনুযায়ী আমার তৈরি জাহাজডুবির

নকশা এবং নোট, এছাড়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিংরুমে তৈরি করা নোট পরীক্ষা করছি আমরা।

এর মধ্যে দু'বার কফি দিয়ে গেছে রুম-সার্ভিস। প্রায় সারারাত ধরে তর্ক করলাম আর প্ল্যান আঁটলাম আমরা। অসংখ্য প্রশ্ন আমাদের সামনে, এক এক করে সবগুলোর উত্তর বের করার চেষ্টা করছি। ভোরের আলোর খোলের কোন অংশে গুডচাইল্ডের পাঁচটা কেস ছিল? রীফ-এর কাছে কিভাবে ভোরের আলো ভাঙে? জাহাজের কোন অংশ ব্রেক-এর ভেতরে ঢোকে আর কোন অংশ সাগরের দিকে ডুবে যায়?

অনুমানের ওপর নির্ভর করে সম্ভাব্য বারোটা নকশা আঁকলাম আমি। অভিযানের প্রয়োজনে সাজ-সরঞ্জাম যেগুলো না হলেই নয় তার একটা তালিকা তৈরি হয়ে গেল। এ ব্যাপারে সাহায্য করল রাফেলা আমাকে, এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম যে ও একজন প্রথম শ্রেণীর স্কুবা ডাইভার।

হঠাৎ বুঝলাম, শুধু দর্শক হিসেবে নয়, আমার সঙ্গে এক জন সক্রিয় অভিযাত্রী হিসেবে যাচ্ছে রাফেলা। সে যোগ্যতা পুরোপুরি রয়েছে ওর, এবং প্রচণ্ড কৌতূহল আর আগ্রহেরও কোন অভাব নেই ওর মধ্যে।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে ও, কথা বলার তালে খেয়াল নেই দু'জনের মাঝখানের দূরত্বটা বিপজ্জনকভাবে কমে গেছে। মেঝেতে কার্পেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছি আমরা, কাঁধে কাঁধ ঠেকে আছে। আমার দিকে ফিরতে গিয়ে নাকে নাক ঠেকে গেল একবার, দু'জন তাকিয়ে থাকলাম দু'জনের দিকে।

হঠাৎ সোনার সিংহাসন আর কিংবদন্তীর ডায়মণ্ডের কথা ভুলে গেলাম আমরা। মুহূর্তটাকে চিনতে পারলাম দু'জনেই, এবং নির্লজ্জ ব্যগ্রতার সাথে পরস্পরকে পাকড়াও করলাম ওখানেই, ওই মেঝেতেই, ভোরের আলোর নকশার ঠিক ওপরেই। জরুরী ভঙ্গিতে পরস্পরকে নিয়ে মেতে উঠলাম আমরা।

তারপর ওকে তুলে নিয়ে গেলাম বিছানায়। চাদরের নিচে এক হলাম দু'জনে। তখনও ফিসফিস করে ওর কানে কথা বলছি আমি। আন্তরিক প্রেম নিবেদনের ভাষা যা হয় সেগুলো নিশ্চয়ই তাই, যে কথা ওর আগে আর কোন মেয়েকে কখনও শোনাইনি আমি।

এবং আমি থামলেই আমার বুকে মুখ ঘষছে রাফেলা, অর্থাৎ আরও শুনতে চাইছে। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে-রাতে কথা বলেছিলাম আমি।

এর পরের দুটো দিন গাধার খাটনি খাটলাম আমি। সন্দেহ ছিল সিডনি শেরডিানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ এতদিন পর জোগাড় করতে পারব কিনা। কিন্তু চরকির মত ঘুরে অসংখ্য জায়গা থেকে পাওয়া টুকরো-টুকরো সূত্রগুলো জোড়া লাগাতেই কংক্রিটের মত শক্ত হয়ে গেল সব। পাখির পালকের মত হালকা লাগছে নিজেকে, সার্থক হয়েছে আমার ইংল্যাণ্ডে আসা। মেজর জেনারেল রাহাত খান জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সিডনি শেরিডানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে তুমি?'

হ্যাঁ, এখন পারব আমি।

নয়

আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা মাছের পিঠের মত দেখাচ্ছে সেন্ট মেরী দ্বীপটাকে। গ্র্যাণ্ড হারবারটা যেন শরীরের তুলনায় বড় একটা মুখ, আর চোয়ালের মধ্যে বসানো রয়েছে ছোট্ট শহরটা। গাঢ় সবুজ খেত-খামারের মাঝখানে টিন আর টালির ছাদগুলো আয়নার মত ঝিক্ ঝিক্ করে উঠছে। দ্বীপটাকে ঘিরে দু'বার চক্কর মারল আমাদের ফকার ফ্রেণ্ডশিপ।

জানালার কাঁচে মুখ চেপে ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে রাফেলা। উৎসাহ আর উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ও। আনারসের খেতের কাছে নেমে এল প্লেন, কাজ ছেড়ে মুখ তুলে

তাকাচ্ছে দ্বীপবাসিনী মেয়েরা। রানওয়েতে নেমে খুদে এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে থামলাম আমরা, গায়ে মস্ত একটা সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে, তাতে লেখা-সেন্ট মেরী দ্বীপ, ভারত মহাসাগরের মুক্তো। এবং সাইনবোর্ডের ঠিক নিচেই আরও দুটো মহামূল্যবান মুক্তো দাঁড়িয়ে রয়েছে-রডরিক আর ল্যাম্পনি।

রডরিককে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলাম, আমরা আসছি। আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ল্যাম্পনিকে সাথে করে নিয়ে এসেছে ও। দৌড় প্রতিযোগিতায় রডরিককে হারিয়ে দিয়ে ব্যারিয়ারের দিকে ছুটে এল ল্যাম্পনি। ও আমাকে, নাকি আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম-ব্যাপারটা সম্ভবত পরিষ্কার হল না রাফেলার কাছে। ব্যাগগুলো ছিনিয়ে নিল ল্যাম্পনি আমার হাত থেকে। ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম আমি রাফেলা বার্ডের। রাফেলার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ল্যাম্পনি। তার মুগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টির সামনে পড়ে বেশ একটু বিব্রত এবং অপ্রতিভ হয়ে উঠতে দেখছি রাফেলাকে। হঠাৎ সাংঘাতিক ব্যস্ত হয়ে উঠল ল্যাম্পনি। অত্যন্ত তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞার সঙ্গে আমার হাতে ধরিয়ে দিল সে আমার ব্যাগগুলো। তারপর প্রচণ্ড আগ্রহ আর উদ্দীপনার সঙ্গে রাফেলার হাত থেকে তার ব্যাগগুলো কেড়ে নিল। রাফেলার কাছ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে পড়ল সে, পরম ভক্ত এবং অতি বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের মত অনুসরণ করছে ওকে। ঘাড় ফিরিয়ে যদি একবার তার দিকে তাকাচ্ছে রাফেলা, সেই উজ্জ্বল চকমকে হাসিটা ঝিক করে উঠছে তার মুখে। প্রথম দর্শনেই রাফেলার ভক্ত বনে গেছে সে।

কিন্তু সবটুকু গাম্ভীর্য আর বিশালত্ব নিয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে রডরিক। ত্রিকালদর্শী প্রাচীন ঋষির মত ভাবলেশহীন, কিন্তু চোহরায় স্থির হয়ে আছে নির্মল পাহাড়ের গা ছমছমে কাঠিন্য। তারপর প্রায় আঁতকে উঠে লক্ষ করলাম ধীরে ধীরে ভাবের বিকাশ ঘটছে তার প্রকাণ্ড মুখে। রাফেলার মনের

অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে ভেবে বাস্তবিক শঙ্কা বোধ করছি আমি। রডরিকের আকার এবং আয়তনই যে-কোন

শহরের মেয়ের জন্যে একটা বিকট দুঃস্বপ্নের মত। তারপর সে যদি সাবধানে নিজের ভাবগুলো লুকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে, যে-কোন মেয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলে তাকে দোষ দেয়া যায় না। কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে উঠল রডরিকের। কপাল এবং মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে উল্টে গেল। মস্ত থাবা দিয়ে আমার হাতটা ধরল সে, এবং দয়া করে খুব কম চাপ দেয়ায় আমি শুধু অসহ্য ব্যথায় দাঁতে দাঁত চাপলাম, জ্ঞান হারালাম না।

এরপর রাফেলার দিকে তাকাল রডরিক। পরিষ্কার আঁতকে ওঠার শব্দ বেরিয়ে এল রাফেলার গলা থেকে। পরমুহূর্তে যা ঘটল তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অভূতপূর্ব-এর আগে এ-দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। রডরিক তার নোংরা, তোবড়ান সী-ক্যাপটা তুলে ফেলল মাথা থেকে। খয়েরি রঙের মসৃণ গম্বুজটা দেখা যাচ্ছে। তারপর এতবড় করে হাসল, নিচের সারির শেষ প্রান্তের কৃত্রিম দাঁতটার বেগুনি মাড়িটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। প্লেনের হোল্ড থেকে রাফেলার আর আমার আরও লাগেজ এসে পৌঁছুল। ল্যাম্পনিকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল রডরিক, তারপর দু'হাতে রাফেলার দুটো ব্যাগ তুলে নিয়ে পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে চলল পিকআপের দিকে। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না ল্যাম্পনি, তার সমস্ত মনোযোগ রাফেলাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে নিবদ্ধ। এদিকে আমার নিজের একগাদা লাগেজের ওজনে নুয়ে পড়েছি আমি, টলতে টলতে কোন রকমে এগিয়ে এসে গাড়ির পেছন দিকে একটু জায়গা করে নিলাম। সান্ত্বনা পাচ্ছি এই ভেবে যে এই প্রথমবার আমার পছন্দ পছন্দ হয়েছে ওদের।

রডরিকের বাড়ির কিচেনে বসেছি আমরা। ব্যানানা কেক আর কফি দিয়ে আমাদেরকে খাতির করল বেগম রডরিক। এর মধ্যে

রডরিকের সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হলাম আমি। প্রথম দশমিনিট প্রচণ্ড দর কষাকষির মধ্যে কাটল, কিন্তু অবশেষে নতুন মোটর সহ ওর হোয়েল বোটটা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে আমাকে দিতে রাজি হল ও-রাজি হল ওর দাবির চেয়ে তিন গুণ বেশি ভাড়া নিতে। এরই সাথে ঠিক হল, আগের পারিশ্রমিকেই আমার ক্রু হিসেবে কাজ করবে ও এবং ল্যাম্পনি, এবং আমার অভিযান যদি সফল হয়, চার্টারের শেষে, মোটাতাজা একটা "বিল ফিশ বোনাস"ও পাওনা হবে ওদের। আমার অভিযানের উদ্দেশ্য বা খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানতে চাইল না ওরা। আমি শুধু ওদেরকে জানালাম দ্বীপমালিকার বাইরের দিকে কোন এক জায়গায় ক্যাম্প ফেলব আমরা, এবং আমি আর রাফেলা কাজ করব পানির নিচে।

প্রস্তুতির কাজে ওদেরকে লাগিয়ে দিয়ে রাফেলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। পাম গাছের ভেতর দিয়ে টার্টল বে-র দিকে যাবার পথে মা এডির দোকানে একবার থামলাম, নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে নেবার জন্যে।

'এটা একটা রূপকথার রাজ্য,' চওড়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল রাফেলা। যেদিকে তাকাচ্ছে, দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে। পামগাছের ভেতর দিয়ে ধূসর সাগর সৈকত দেখতে পাচ্ছে ও।

ঠিক ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানলাম। আমার গায়ে হেলান দিল ও, আমার কব্জি দুটো ধরে চাপ দিচ্ছে।

'বিশ্বাস করো, এতটা সুন্দর, তা কিন্তু ভাবতে পারিনি,' আবার বলল ও।

দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটছে ওর মধ্যে, পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি আমি। শীতকালীন লতা যেন ও, দীর্ঘদিন সূর্যের পরশ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তবু আমি অনুভব করেছি নিজের

ভেতর কি যেন একটা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চেপে রেখেছে ও, অত গভীরে আমি নামতে পারছি না-ফলে একটা অস্বস্তিবোধ খোঁচা মারছে আমাকে সর্বক্ষণ। রাফেলা সাধারণ কোন মেয়ে নয়, তাই সহজে তাকে বোঝাও যাচ্ছে না। কিন্তু এটুকু পরিষ্কার বুঝি, চেপে রাখা বিষয়টা ওকেও অশান্তির মধ্যে ফেলে রেখেছে। আমি ওকে লক্ষ করছি না ভেবে কয়েকবারই গভীর মনোযোগ আর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছে ও, কিন্তু ব্যাপারটা প্রতিবার ধরে ফেলেছি আমি। তারপর সরাসরি চোখাচোখি হতেই সতর্ক হয়ে উঠেছে ও, চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে অপ্রতিভভাবে। কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমার প্রতি একটু যেন বিরূপ ভাবের প্রতিচ্ছায়া ওর চোখে দেখতে ভুল করিনি আমি। আমার মনে হয়েছে, যে-কোন কারণেই হোক, সম্ভবত ঘৃণা করে ও আমাকে।

এসব ঘটেছে দ্বীপে আসার আগেই। কিন্তু এখন আমি ওর পরিবর্তনটা স্পষ্ট ধরতে পারছি। দীর্ঘদিন পর সূর্যের উষ্ণ পরশ পেয়ে লকলকিয়ে উঠছে শীতকালীন লতা।

পা ছুঁড়ে জুতো জোড়া খুলে ফেলল ও, আমার বাহুর ঘেরের মধ্যে শরীরটা ঘুরিয়ে নিল, তারপর পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে উঁচু হল। আমাকে চুমো খাবার জন্যে।

'ধন্যবাদ, রানা। এখানে আমাকে নিয়ে আসার জন্যে ধন্যবাদ,' আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সুর বাজল আমার কানে।

আমার অনুপস্থিতিতে রোজ একবার করে এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে রেখে গেছে বেগম রডরিক। রেফ্রিজারেটরটা চালু অবস্থায় পেলাম, ফুলদানিতে তাজা ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছে। হাত ধরাধরি করে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছি আমরা। কিছু ফার্নিচার সত্যি মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করল রাফেলার, কিন্তু বাকি সব বাতিলযোগ্য ঘোষণা করে জানাল নতুন ফার্নিচারের অর্ডার দেবার সময় তার সঙ্গে আমি না গেলেও চলবে। ফুলদানির ফুলগুলোর

প্রশংসা করল ও, কিন্তু সেগুলো নতুন করে সাজাতে দশটা মিনিট ব্যয় করল। এক ঘন্টার মধ্যেই গোটা বাড়ির চেহারায় নতুন এবং নিজস্ব রুচির ছাপ রাখতে সমর্থ হল ও।

বড় বেডরূমে ঢুকে পোশাক পাল্টে সুইমস্যুট পরলাম আমরা। রাফেলা আমার প্রেমে আক্রান্ত হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আবিষ্কার করেছি নিজের শরীরটাকে যথাসম্ভব ঢেকে রাখার ব্যাপারে সাংঘাতিক সতর্ক ও, দিগম্বর সেজে সাগরে যাওয়ার আমার প্রস্তাবের কপালে ওর মুখভেঙচানি ছাড়া কিছুই জুটল না। সুন্দরী এবং ভালবাসি এমন একটা মেয়ের সান্নিধ্য পেতে হলে কিছু ত্যাগ তো স্বীকার করতেই হবে, তাই নিয়ম এবং অভ্যাস ভেঙে সুইমস্যুটটা পরতেই হল আমাকে। রাফেলা বিকিনি পরল। এই প্রথম ওকে সবচেয়ে খোলা অবস্থায় দেখার সুযোগ পাচ্ছি আমি। মুগ্ধ হয়ে আবিষ্কার করলাম একা ওর গায়ের রঙটাই যে-কোন চক্ষুষ্মান পুরুষকে পাগল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। তরল সোনার সঙ্গে মধু মেশালে এ রঙ আসে কিছুটা। বেশ লম্বা রাফেলা, কাঁধ দুটো একটু বেশি চওড়া, কিন্তু নিতম্বটা যেন একেবারে নিখুঁত মাপ নিয়ে গড়া। কোমরটা সরু, সমতল তলপেট, নাভিটা গভীর।

ওটার দিকে তাকিয়ে আছি, কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ করল না ও। 'দাদী আম্মা গো!-ছোকরার চোখ দুটো কত বড় দেখ না!' অভিযোগের সুরে বলল ও, তারপর তোয়ালেটা সারঙের মত কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে ঢেকে ফেলল নাভিটা। তবে খালি পায়ে বালির ওপর দিয়ে যখন হাঁটতে শুরু করল তখন ওর মধ্যে কোন রকম জড়তা বা সঙ্কোচ দেখছি না। ঘাড় ফিরিয়ে ওর বুক এবং নিতম্বের দোল দোল দুলুনি দেখছি লক্ষ করেও মুখ ভেংচাল না।

পানির নাগাল থেকে অনেক দূরে তোয়ালে খুলে রেখে শক্ত আর ভিজে বালির ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছি আমরা স্বচ্ছ, উষ্ণ পানির দিকে। ধীর এবং সাবলীল ভঙ্গিতে দ্রুত সাঁতার কাটার

অদ্ভুত গুণ রয়েছে ওর মধ্যে, বারবার আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে ও, প্রতিবার প্রচুর খেটে ধরার চেষ্টা করছি ওকে।

রীফ ছাড়িয়ে এসে পানির ওপর একই জায়গায় ভেসে রয়েছি আমরা। 'অনেকদিন অভ্যাস করি না কিনা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও।

খানিক বিশ্রাম নেবার পর উন্মুক্ত সাগরের দিকে তাকিয়েছি, সেই মুহূর্তে পানির গা ফুঁড়ে কালো ফিন-এর একটা রেখা জেগে উঠল। পনেরো বিশ হাত ব্যবধান রেখে একটা করে ফিন, সংখ্যায় পনেরো বিশটা, একই সরলরেখায় থেকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। পুলকের ঢেউ জাগল আমার শরীরে। আনন্দ চেপে রাখতে পারলাম না।

'তুমি ওদের সম্মানিত অতিথি,' রাফেলাকে বললাম, 'এটা একটা বিশেষ অভ্যর্থনা।'

উত্তেজিত একদল কুকুর ছানার মত আমাদেরকে ঘিরে চক্কর মারছে ডলফিনগুলো, কাছে এসে ডিগবাজি খেয়ে পালাচ্ছে, রাফেলাকে সতর্কভাবে লক্ষ করার ফাঁকে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করছে নিজেদের মধ্যে। এর আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানি আমি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আগন্তুক দেখামাত্র গোমড়া মুখ নিয়ে দ্রুত ফিরে যায় ওরা। প্রথমবারের সাক্ষাতে গা ছোঁয়ার কোন সুযোগ কখনও কাউকে ওরা দিয়েছে বলেও জানা নেই আমার। অনেক দিনের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার পরও তত কাছে আসে না ওরা, অনেক অনুরোধ এবং প্রেম নিবেদন করলে তবে হয়ত মন গলে ওদের। যাই হোক, রাফেলার বেলায় দেখছি প্রথম দর্শনেই প্রেম-রডরিক আর ল্যাম্পনির মতই ওর পরম ভক্ত হয়ে উঠেছে ওরা।

পনেরো মিনিটও কাটল না, ওকে নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল ডলফিনদের মধ্যে। একটার পিঠ থেকে খসে পড়া মাত্র বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে নাক দিয়ে তুলে নিচ্ছে ওকে আরেকটা। ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা শুরু

হয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে।

একটা ডলফিন রাফেলাকে নিয়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছে, এদিকে অন্যান্যরা নাক দিয়ে গুঁতো মারছে আমাকে, চাইছে আমিও ওদের পিঠে চেপে রাফেলাকে অনুসরণ করি। কিন্তু একবার সম্মতি দিলে সহজে এই খেলা থেকে সরিয়ে আনা যাবে না ওদেরকে, তাই ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম আমি। নিরাশ হয়ে আমাকে ছেড়ে দল বেঁধে চলে গেল ওরা। বিশ মিনিট পর দিগন্তরেখার কাছে দেখতে পেলাম আবার ওদেরকে, রাফেলাকে পেছনে নিয়ে তীরবেগে এগিয়ে আসছে গোটা দলটা সরল একটা লাইন বেঁধে।

আরও কাছে আসতে ভুলটা ভাঙল আমার। ভেবেছিলাম ভয়ে বুঝি আধমরা হয়ে গেছে রাফেলা। কিন্তু তা নয়। আনন্দে এবং উত্তেজনায় চিকচিক করছে ওর চোখ, মুক্তোর মত দাঁত দেখা যাচ্ছে, পানির ঝাপটা লাগলেই মাথা ঝাঁকাচ্ছে দ্রুত এবং ঘনঘন। হাসছে।

কাছে এসে পড়ল ওরা। কিন্তু তখুনি আমার হাতে ফিরিয়ে দিল না ওরা রাফেলাকে। রাফেলার ওপর ওদেরও যেন সম্পূর্ণ অধিকার আছে, নিজেদের খুশি মত যতক্ষণ পারে ওকে নিয়ে খেলা করতে চায়।

এর কিছুক্ষণ পর ওরা বোধহয় বুঝতে পারল আমরা ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। সানন্দে ফিরে আসতে দিল আমাদেরকে তীরের দিকে। কিন্তু একটা প্রকাণ্ডদেহী বুল ডলফিন রাফেলার পিছু ছাড়ল না। অনুসরণ করে অগভীর পানিতে চলে এল সে। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে রাফেলা, বুল ডলফিন উল্টে গিয়ে চিৎ হয়ে আছে। রাফেলা কর্কশ একমুঠো সাদা বালি ঘষছে তার তলপেটে, আর নির্বোধ নিঃশব্দ ডলফিন-হাসিটা স্থির হয়ে আছে তার মুখে।

সন্ধ্যার পর, যখন আমরা বারান্দায় বসে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি, তখনও শুনতে পাচ্ছি বুল ডলফিন লেজ দিয়ে বাড়ি মারছে পানিতে, শিস দিচ্ছে-বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে সেই থেকে

ডাকছে ও রাফেলাকে।

পরদিন সকালে কাজে হাত দিলাম আমরা।

জলকুমারী থেকে উদ্ধার করা সাজ-সরঞ্জামগুলো পরীক্ষা শেষ করে একমুঠো টাকা নিয়ে কমপ্রেশারের জন্যে একটা ইঞ্জিন কিনতে চলে গেল রডরিক। মোটর নিয়ে ফিরল ও, জানাল, কিছু মেরামত দরকার হবে ওটার। প্রায় সারাদিনের কাজ পেয়ে গেলাম আমি। ক্যাম্পিং সরঞ্জাম আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করতে পাঠিয়ে দিলাম রাফেলাকে মা এডির দোকানে। রডরিকের সাথে আলোচনা করে তিন দিন পর রওনা হবার প্ল্যান করেছি আমরা। হাতে এত বেশি কাজ, তিনটে দিন কিভাবে কেটে গেল টেরই পেলাম না আমরা কেউ।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, বোটে যে যার জায়গায় উঠে বসলাম আমরা। স্টার্নের দিকে মোটরের কাছে রডরিক আর ল্যাম্পনি, আর দাঁড়ে বসা জোড়া পাখির মত মালপত্রের বোঝার ওপর আমি ও রাফেলা।

কালো ঘোমটা খুলে গরম লাল লোহার মত বেরিয়ে এল ভোর। লক্ষণ দেখে বোঝা গেল দিনটা হবে আগুন ঝরা। দক্ষিণ মুখো এমন একটা কোর্স ধরেছে রডরিক যেদিকে ছোট একটা বোট নিয়ে দক্ষ এবং অসমসাহসী একজন স্কিপারই শুধু যেতে পারে। খুদে, ছড়ানো ছিটানো দ্বীপমালিকা আর প্রবাল প্রাচীরের গা ঘেঁষে ছুটছি আমরা, কখনও আমাদের কীল আর ছড়ানো প্রবাল কণার মাঝখানে মাত্র আঠারো ইঞ্চি পানি দেখতে পাচ্ছি।

আশ্চর্য উৎসাহ আর উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে আমাদের সবার মধ্যে। অগাধ ধন-সম্পদ উদ্ধার করার আশায় উত্তেজিত হয়ে আছি, ব্যাপারটা ঠিক তাও নয়। এখনও আমার একমাত্র চিন্তা জলকুমারীর মত একটা বোট পেলে আর কিছু চাওয়ার নেই আমার। সব সম্পদের সেরা সম্পদ, দুর্লভ একটা রত্ন বলতে

এখনও আমি জলকুমারীর মত একটা বোটকেই বুঝি। সাগর থেকে যদি কিছু তুলে এনে ওরকম একটা বোট ফিরে পেতে পারি, সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

সাগর থেকে উঠে এল উত্তপ্ত সূর্য। কঠিন, নীল, বিশাল আকাশ জ্বলছে মাথার ওপর। বো-তে দাঁড়িয়ে জ্যাকেট আর জিনস খুলছে রাফেলা, নিচে পরে আছে বিকিনিটা। পোশাকগুলো খুলে ভাঁজ করে রেখে দিল ব্যাগে। সান লোশনের একটা টিউব বের করে সোনালি মখমলের মত চামড়ায় সেটা মাখাচ্ছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল রডরিক আর ল্যাম্পনি। সাধারণ ভদ্রতা জলাঞ্জলি দিয়ে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ওরা। আলোচ্য বিষয়ে দু'জনেই যে ঐকমত্য পোষণ করে তা ওদেরকে প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়তে দেখেই বুঝতে পারলাম। একটু পরই একটা ক্যানভাসের টুকরো দিয়ে ল্যাম্পনিকে পাঠাল রডরিক। রাফেলার গায়ে যাতে রোদ না লাগে তার জন্যে ক্যানভাস টাঙিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে চায় সে। কাজটা ল্যাম্পনি শুরু করতেই বাধা দিল রাফেলা, সাথে সাথে দু'জনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে গেল।

হাত ছুঁড়ে প্রতিবাদ করল ল্যাম্পনি। 'রোদ লাগলে আপনার সোনার চামড়া জ্বলে যাবে, মিস রাফেলা!'

কিন্তু সুবিধে করতে পারল না ওরা, ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হল ল্যাম্পনিকে। রাফেলা হেসে উড়িয়ে দিল ওর কথা।

প্রচণ্ড শোকে ম্রিয়মান দুই এতিমের মত বসে থাকল ওরা। প্রকাণ্ড মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে উল্টে গিয়ে বুলডগের মত চেহারা হয়েছে রডরিকের, আর নার্ভাস ভঙ্গিতে দ্রুত হাত কচলাচ্ছে ল্যাম্পনি, দুশ্চিন্তায় আরও কালো হয়ে গেছে তার মুখ।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সহ্য করতে না পেরে আবার ওরা গোপন পরামর্শ শুরু করল, এবং আবার প্রতিনিধি করে পাঠানো হল ল্যাম্পনিকে। এবার সমর্থন আদায় করার জন্যে আমার

কাছে।

'মিস রাফেলাকে এ-কাজে বাধা দাও তুমি, মিস্টার রানা,' রাফেলা দ্বীপে আসার পর থেকে আমাকে সম্বোধন করার রীতি বদলে নিয়েছে ল্যাম্পনি। 'এভাবে গায়ে রোদ লাগালে কালো হয়ে যাবেন উনি।'

'ঠিক তাই হতে চাইছে ও, ল্যাম্পনি,' বললাম ওকে। তবে দুপুরের কড়া রোদের ব্যাপারে সাবধান করে দিলাম রাফেলাকে আমি। দুপুর বেলা যখন খাবার সময় হল তখন একটা বালুকাবেলায় নামলাম আমরা, তার আগে বাধ্য মেয়ের মত নিজেকে ঢেকে নিল রাফেলা।

বিকেলের দিকে ওল্ড মেন-এর চূড়া তিনটে দেখতে পেলাম আমরা, সবিস্ময়ে বলল রাফেলা, 'কি আশ্চর্য! ফার্স্ট মেট বারলোর বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে, রানা!'

সাগরের দিক থেকে এগোচ্ছি আমরা দ্বীপটার দিকে, দ্বীপ আর রীফ-এর মাঝখানে শান্ত পানির সরু বিস্তৃতি ধরে। জিনবালা ক্রাশবোটকে ফাঁকি দেবার জন্যে যে প্রবেশ মুখের ভেতর দিয়ে জলকুমারীকে নিয়ে চ্যানেলে ঢুকেছিলাম সেটার পাশ দিয়ে যাবার সময় রডরিক আর আমি নিঃশব্দে হাসলাম।

সেদিকটা দেখিয়ে বললাম রাফেলাকে, 'মেইন ক্যাম্প দ্বীপে ফেলব বলে ঠিক করেছি, আর জাহাজডুবির জায়গায় ফেরার জন্যে ওই গ্যাপটা ব্যবহার করব।'

সরু চ্যানেলটার দিকে গম্ভীরভাবে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রাফেলা, তারপর বলল, 'বেশ একটু ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ঘুর পথে যেতে হলে রোজ প্রায় বিশ মাইল পাড়ি দিতে হবে। তাছাড়া, দেখে যতটা ভয় লাগছে আসলে তত বিপজ্জনক নয় ওটা। একবার আমি আমার পঞ্চাশ ফুটি বোটকে ওটার ভেতর দিয়ে ফুল স্পীডে নিয়ে গেছি।'

'তুমি পাগল নাকি?' নাক থেকে চশমাটা মাথায় তুলে আমার দিকে তাকাল রাফেলা।

'তা তুমিই ভাল বলতে পারবে,' নিঃশব্দে হাসলাম আমি।

'তা যা বলেছ,' নিঃশব্দ হাসিটা ফিরিয়ে দিল ও। 'তোমার সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠছি আমি।'

ওর নাক, কপাল আর গালের দু'দিক ঝলমল করছে। রোদ লেগে চামড়া পুড়ে বা ঝলসে না গিয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ভরা জোয়ারের সময় দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে সুরক্ষিত একটা ছোট্ট বে-তে পৌঁছুলাম আমরা। বালুকাবেলার যেখানটায় বোট থামাল রডরিক সেখান থেকে প্রথম সারির নারকেলগাছগুলো মাত্র বিশ ফুট দূরে।

কার্গো নামিয়ে নারকেলগাছের ভেতর দিয়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে পানির সম্ভাব্য ছোঁয়ার বাইরে রাখলাম সেগুলো, তারপর গুঁড়ো লবণ বাতাসে উড়ে এসে পড়ার ভয়ে ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে দিলাম সব। ইতিমধ্যে উত্তাপ কমে গেছে রোদের। নারকেলগাছের লম্বা ছায়া মাড়িয়ে দ্বীপের ভেতর দিকে চলেছি আমরা, সাথে পাঁচ গ্যালন বিশুদ্ধ পানির কনটেইনার আর যে-যার ব্যক্তিগত জিনিস ছাড়া কিছুই নিইনি। সর্বদক্ষিণ প্রান্তের চূড়াটার পেছনে, খাড়া ঢালের গায়ে যুগ যুগ ধরে গভীর গুহা তৈরি করেছে জেলে সম্প্রদায়। মালপত্র রাখার জন্যে বড় একটা গুহা বেছে নিলাম আমি। অপেক্ষাকৃত ছোট একটা নির্বাচন করল রাফেলা, সেটায় ও আর আমি থাকব। ঢালের কিনারা ঘেঁষে প্রায় একশো গজ এগিয়ে গিয়ে আরেকটা গুহা দখল করল নিজেদের জন্যে রডরিক আর ল্যাম্পনি, মাঝখানে আমাদেরকে আড়াল করে রেখেছে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের একটা পাঁচিল।

নারকেলের পাতা দিয়ে একটা ঝাঁটা তৈরি করল রাফেলা। নতুন ঘরটা পরিষ্কার করে পাশাপাশি রাখল স্লিপিং ব্যাগ দুটো।

মুচকি হেসে ঝাঁকি জালটা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লাম আমি, ফিরে যাচ্ছি ছোট বে-র দিকে।

সন্ধ্যার পর এক ডজন মুলিট নিয়ে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে ল্যাম্পনি আগুন জ্বেলে তাতে কেটলি বসিয়ে দিয়েছে। নিঃশব্দে খেয়ে উঠলাম আমরা।

নিজেদের গুহায় পাশাপাশি শুয়ে আমি আর রাফেলা, কান পেতে শুনছি নারকেলগাছের ভেতর কাঁকড়াদের হাঁটাচলার শব্দ।

'পরিবেশটা, জানো, আশ্চর্য আদিম লাগছে আমার কাছে,' ফিসফিস করে একসময় বলল রাফেলা। 'আমরা যেন পৃথিবীর প্রথম পুরুষ আর নারী।'

কথাটা স্বীকার করে নিতেই আমার আরও কাছে চলে এল ও।

দশ

পরদিন ভোরবেলা হোয়েলবোট নিয়ে একা রওনা হয়ে গেল রডরিক। সেন্ট মেরী দ্বীপে যাচ্ছে, হপ্তা দুয়েকের ব্যবহারের জন্যে যথেষ্ট পেট্রল আর পানি নিয়ে আগামীকাল ফিরে আসবে ও।

ওর অপেক্ষায় থাকার সময় আমি আর ল্যাম্পনি তীরের কাছ থেকে সরঞ্জাম আর রসদ গুহায় বয়ে নিয়ে আসার কঠিন কাজটা সেরে ফেললাম। কমপ্রেশারটা সেট করে খালি এয়ার বটল দুটো চার্জ করে নিলাম, পরীক্ষা করলাম ডাইভিং গিয়ার। ওদিকে আমাদের কাপড় ঝুলিয়ে রাখার জন্যে দড়ি টাঙানো থেকে শুরু করে জুতো রাখার জায়গা নির্বাচন পর্যন্ত ঘর-দোরের হাজারটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকল রাফেলা, নিজেকে দম ফেলার ফুরসত দিচ্ছে না।

পরদিন ওকে নিয়ে দ্বীপটা ঘুরে ফিরে দেখার জন্যে বেরুলাম আমি। চূড়া, উপত্যকা এবং সৈকতে ঢুঁ মারলাম বিশুদ্ধ পানির সন্ধানে। একটা ঝর্ণা বা একটা কুয়া পাওয়া যেতে পারে, যা

জেলেদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু পেলাম না আমরা। বুঝলাম, বুড়ো জেলেদের চোখকে কিছুই ফাঁকি দিতে পারে না।

দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তটা আমাদের ক্যাম্প থেকে সবচেয়ে দূরে। চূড়া আর সাগরের মাঝখানে বিশাল এলাকাটা কাদাময় আর জলমগ্ন, তাতে ঘন আর লম্বা ঘাস জন্মেছে। মরা মাছ আর পচা ঘাসের দুর্গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। কাদার গায়ে হাজার হাজার গর্ত দেখা যাচ্ছে, গর্তের বাইরে মুখ বের করে বসে আছে লাল কাঁকড়াগুলো। ম্যানগ্রোভে হীরণ পাখিরা বাচ্চা ফোটাচ্ছে। একটু গভীর পানিতে ঝপাৎ করে কি যেন পড়ল, ঘাড় ফেরাতেই স্যাৎ করে ডুবে যেতে দেখলাম একটা কুমীরের লেজ। এলাকাটাকে পাশ কাটিয়ে আরও উঁচুতে উঠে এলাম আমরা, তারপর ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে সর্ব দক্ষিণ প্রান্তের চূড়াটার দিকে এগোলাম।

রাফেলার সিদ্ধান্ত, এই চূড়াটাতে অবশ্যই উঠতে হবে আমাদেরকে। এটা সবচেয়ে লম্বা আর খাড়া, এই যুক্তি দেখিয়ে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করলাম ওকে। কোন গুরুত্বই দিল না কথাটায়।

চূড়ার দক্ষিণ প্রাচীরের নিচে সরু একটা কার্নিস দেখতে পেয়ে সেটা ধরে উঠছি আমরা। সাংঘাতিক বিপজ্জনক পথ এটা, প্রস্তুতি না নিয়ে এখানে ওঠার মত বোকামি আর কিছু হতে পারে না, কিন্তু ভূতে ধরেছে রাফেলাকে, আমার সমস্ত কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে তবু এগিয়ে যাচ্ছে ও। একান্ত বাধ্য হয়েই অনুসরণ করে যাচ্ছি ওকে আমি।

'ভোরের আলোর মেট বারলো যদি একেবারে চূড়ায় উঠতে পারে, আমিও তাহলে পারব,' ঘোষণা করল ও।

'আর সব চূড়া থেকে যা দেখেছ এটার মাথা থেকেও তাই দেখা যাবে-সুতরাং কষ্ট করে লাভ কি?'

'সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়।'

‘বিবেচ্য বিষয় তাহলে কোন্‌টা?’ জানতে চাইলাম আমি।

নিঃশব্দে করুণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল রাফেলা, কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

কার্নিসের কিনারা থেকে ঝপ করে খাড়া দুশো ফিট নেমে গেছে পাহাড়ের গা, নিচে ঢালটা দেখা যাচ্ছে। ভ্রূক্ষেপ না করে নির্বিকার এগোচ্ছে রাফেলা। ভাগ্য ভাল যে কার্নিসটা ক্রমশ আরও সরু হয়ে যায়নি। ওর কাছ থেকে হাত দশেক পিছিয়ে পড়েছি, হঠাৎ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ও, তারপর কার্নিসের একটা বাঁক পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এক নিমেষে।

বাঁকটা আমিও পেরোলাম, দেখি, পাহাড়ের খাড়া শরীর লম্বালম্বিভাবে চিরে দু’ভাগ করে দিয়েছে একটা ফাটল, তার ভেতর দিয়ে সিঁড়ির ধাপের মত উঠে গেছে একটা প্যাসেজ, একেবারে সেই চূড়া পর্যন্ত। প্যাসেজটা প্রকৃতির তৈরি একটা চিমনির মত। রাফেলাকে অনুসরণ করে সেটার ভেতর ঢুকে স্বস্তিবোধ করলাম আমি। প্রায় সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠল ও।

‘ও ডিয়ার গড! রানা, দেখ!’ একদিকের দেয়ালের গায়ে অগভীর একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে, ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, সেদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে রাফেলা। ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম আমি।

গর্তের পেছন দিকের সমতল দেয়ালে বহু যুগ আগে কেউ একজন অত্যন্ত ধৈর্য ধরে কয়েকটা অক্ষর খোদাই করেছিল, আজও তা অম্লান হয়ে আছে। লেখাটা পড়তে শুরু করতেই ছ্যাঁত করে উঠল বুক।

“এ. বারলো
এই জায়গায় সর্বস্বান্ত হয়েছিল
১৪ অক্টোবর, আঠারশো সাতান্ন সাল”

লেখাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আমরা, অনুভব করছি ওর হাতটা হাতড়ে খুঁজে নিল আমার একটা হাত, সেটা চেপে ধরে অভয় পেতে চাইছে ও। ভয়ে শুকিয়ে গেছে ওর মুখ।

‘গা ছমছম করছে আমার,’ ফিসফিস করে বলল ও। ‘ভৌতিক, তাই না? মনে হচ্ছে গতকাল কেউ লিখে রেখে গেছে- এত বছরের পুরানো বলে ভাবতে পারছ?’

মিথ্যে বলেনি রাফেলা, ঝড়-বৃষ্টি আর রোদের মুখ দেখেনি বলে লেখাগুলোকে সদ্য পাথর কেটে তৈরি করা বলে মনে হচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে তাকালাম আমি, যেন বুড়ো বারলো কোথাও থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কিনা পরীক্ষা করলাম।

ধাপ বেয়ে চিমনির ভেতর দিয়ে অবশেষে চূড়ায় উঠে এলাম আমরা। কিন্তু এখনও বারলোর সেই কবেকার রেখে যাওয়া বার্তাটা ম্রিয়মান করে রেখেছে আমাদেরকে। ওখানে দু’ঘন্টা বসে গানফায়ার রীফ-এর গায়ে সাদা একটা রেখায় আছাড় খেয়ে ঢেউগুলোকে ভেঙে পড়তে দেখছি। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি রীফ-এর গ্যাপ এবং ব্রেক-এর বিশাল কালো পুলটা। কিন্তু প্রবালের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া সরু চ্যানেলটার অস্তিত্ব অস্পষ্ট ভাবে কোনরকম টের পাচ্ছি। ঠিক এই জায়গা থেকে আর্থার বারলো ভোরের আলোকে ডুবে যেতে দেখেছিল, একের পর এক উঁচু ঢেউ এসে জাহাজটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

‘সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, রাফেলা,’ ওকে বললাম আমি। ‘সিডনি শেরিডান বুমেরাং নিয়ে বেরিয়েছে আজ চোদ্দ দিন। কেপ-টাউন থেকে খুব বেশি দূরে নেই এখন। অবশ্য ওখানে সে পৌঁছুলেই জানতে পারব আমরা।’

‘কিভাবে?’

‘আমার এক পুরানো বন্ধু আছে ওখানে, ইয়ট ক্লাবের মেম্বার। ট্রাফিকের দিকে নজর রাখছে সে। বুমেরাংকে ভিড়তে দেখলেই জানাবে আমাকে।’

চূড়ার পেছন দিকের ঢাল বেয়ে নেমে গেল আমার দৃষ্টি, এবং

এই প্রথম নারকেলগাছের মাথার ওপর নীলচে ধোঁয়া উড়তে দেখলাম। বুঝলাম, রান্নার কাজে আগুন ধরিয়েছে ল্যাম্পনি।

'এখন থেকে সাবধানে চলতে হবে আমাদেরকে,' বললাম আবার। 'এ পর্যন্ত পিকনিকে বেরুনো একদল স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর মত আচরণ করেছি আমরা। কিন্তু সময় হয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রাখার জন্যে সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করার। চ্যানেলের ওপারেই জিনবালা ক্রাশবোটে রয়েছে আমার প্রাণের বন্ধু হুমায়ুন দাদা-আমি জানি, মাথার চারপাশে আট জোড়া চোখ লাগিয়ে খুঁজছে সে আমাকে। এবং যখন এলে আমি খুশি হব তারচেয়ে অনেক আগেই এদিকের পানিতে পৌঁছে যাবে বুমেরাং। এখন থেকে সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে।'

'কাজটা শেষ করতে কতটা সময় লাগবে আমাদের?'

'তা যদি জানতাম!' চিন্তিতভাবে বললাম আমি। 'সেন্ট মেরী থেকে পেট্রল আর পানি আনতেই প্রচুর সময় বেরিয়ে যাবে। প্রতি জোয়ারের সময় মাত্র কয়েক ঘন্টা কাজ করতে পারব আমরা পুলে, যখন আবহাওয়া এবং পানির উচ্চতা অনুকূল বলে মনে হবে। কাজ শুরু করার পর কে জানে ওখান থেকে কি পাব আমরা। শেষ পর্যন্ত আমরা হয়ত আবিষ্কার করব গুডচাইল্ডের পার্সেল ভোরের আলোর পেছনের হোল্ডে ছিল, এবং জাহাজের সে-অংশটা খোলা সাগরের দিকে পড়েছে। তা যদি হয়, ওটার আশা ছেড়ে দিয়ে সসম্মানে নিজেদেরকে পরাজিত ধরে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'এ বিষয়ে বিস্তর তর্ক এর আগে করেছি আমরা, রানা, দ্য গ্রেট নৈরাশ্যবাদী,' বলল রাফেলা। 'তার চেয়ে এসো, কিছু মজার বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যাক।'

প্রস্তাবটা লুফে নিলাম আমি, এবং সাথে সাথে জানতে চাইলাম, 'জলদি বল! ক'টা ছেলে, ক'টা মেয়ে চাই? কার কি নাম রাখবে? তাদেরকে কোথায় রেখে মানুষ করবে? কাকে কি

পড়াবে?'

'এটা দেখছ?' মুঠো পাকানো হাতটা নিজের নাকের সামনে তুলল রাফেলা।

অবাক হয়ে বললাম, 'মজার বিষয়ের সাথে ঘুসোঘুসির কি সম্পর্ক?'

সম্ভবত আমার বিস্ময় লক্ষ্য করেই হাসি চেপে রাখতে পারল না রাফেলা। তারপর বলল, 'আচ্ছা, তুমি জানো, রঙিন স্বপ্ন দেখলে ঠকতে হয় মানুষকে?'

দৃঢ় ভঙ্গিতে জানালাম ওকে, 'আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঠিক উল্টো কথা বলে। আমার অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে, বাকিগুলোও হবে।'

ম্লান হেসে চুপ করে থাকল রাফেলা। কেন যেন হাসি-ঠাট্টা এরপর আর জমল না, তারপর বহু দূরে কালো একটা বিন্দুর মত সাগরে দেখতে পেলাম হোয়েল-বোটটাকে। পানি আর পেট্রল নিয়ে ফিরে আসছে রডরিক।

চূড়া থেকে দ্রুত নামতে শুরু করলাম আমরা। নারকেলগাছের ভেতর দিয়ে ছুটলাম ওর সাথে দেখা করার জন্যে। প্রান্তর ঘুরে ছোট্ট বে-তে ঢুকছে ও, এই সময় সৈকতে পৌঁছুলাম আমরা। প্লাস্টিকের ক্যান ভর্তি পেট্রল আর পানির ওজনে পানিতে নিচু হয়ে আছে হোয়েলবোট। স্টার্নে দাঁড়িয়ে আছে অনন্তকালের এক গোমড়ামুখো পাহাড়, রডরিক। চিৎকার করে আমাদেরকে হাত নাড়তে দেখে স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যের সাথে একবার মাত্র ওপর-নিচে মাথা নাড়ল সে।

বেগম রডরিক আমার জন্যে ব্যানানা কেক আর রাফেলার জন্যে একটা পাম পাতার তৈরি প্রকাণ্ড সান-হ্যাট পাঠিয়েছে। সন্দেহ নেই, রাফেলার আচরণ নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামিয়েছে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে। কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে লক্ষ করে মুখটা গ্রেনেডের মত বিস্ফোরোন্মুখ হয়ে উঠল রডরিকের। ইতিমধ্যেই

নিজের চামড়া রোদে ঝলসে নিয়েছে রাফেলা।

পঞ্চাশটা ক্যান গুহায় বয়ে নিয়ে আসতে সন্ধ্যা উতরে গেল। আগুন জ্বেলে খাঁড়ি থেকে বিকেলে সংগ্রহ করা চিংড়ি রান্না করছে ল্যাম্পনি। আগুনের ধারে গোল হয়ে বসেছি আমরা সবাই। অভিযানের উদ্দেশ্য এবং বিবরণ আমার ক্রুদেরকে জানাবার এটাই উপযুক্ত সময়। রডরিককে আমি বিশ্বাস করতে পারি, শারীরিক অত্যাচাররের মুখেও কোন কথা বের করা যাবে না ওর পেট থেকে। কিন্তু অতটা ল্যাম্পনির কাছে আশা করি না আমি। সেজন্যেই এই নির্জন, লোকবসতিহীন দ্বীপে আসার আগে মুখ খুলিনি আমি। বিশেষ করে মেয়ে পটাবার জন্যে দরকার হলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্য আর গোপন কথা ফাঁস করে দিতেও দ্বিধা করে না ল্যাম্পনি। যাই হোক, এখন ওদেরকে সবকথা বলা যেতে পারে।

আমি কথা বলছি, নিঃশব্দে শুনছে ওরা। আমার সব কথা বলা শেষ হয়ে যেতেও চুপ করে থাকল। ল্যাম্পনি উৎসাহের সাথে অপেক্ষা করছে রডরিক কিছু বলবে এই আশায়। কিন্তু সে ভদ্রলোক প্রকাণ্ড একটা পাথরের মূর্তির মত একদৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন তো আছেনই, নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই।

প্রায় পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হবার পর, রডরিকের যখন মনে হল পরিবেশটা রোমাঞ্চকর নাটকীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে, ধীরস্থির ভঙ্গিতে নড়ে উঠল সে। কিছু বলবে এবার, এই আশায় আমরা সবাই উন্মুখ হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমাদেরকে সে নিরাশ করল। কথা না বলে প্যান্টের পেছনের পকেটে একটা হাত ভরল সে, সেখান থেকে বের করে আনল একটা মানিব্যাগ। অনেক দিনের পুরানো, একসময় ওটার রঙ ছিল লাল, এখন সেটা কালো হয়ে গেছে, এখানে সেখানে ছিঁড়ে গেছে চামড়া।

'ছোকরা বয়সে আমি যখন গানফায়ার রীফে মাছ ধরতাম,' আগুনের দিকে এখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রডরিক, 'তখনকার একটা ঘটনা। সে-সময় একবার আমি প্রকাণ্ড একটা ড্যাডি গ্রুপার ফিশ ধরি। মাছটার পেট কাটার পর সেখান থেকে এই জিনিসটা পেয়েছিলাম।' মানিব্যাগ থেকে একটা গোল চাকতি বের করল সে। 'সেই থেকে এটা নিজের কাছে রেখেছি, শুভ লক্ষণ হিসেবে। এক জাহাজের অফিসার এটার বিনিময়ে আমাকে দশটা পাউণ্ড দিতে চেয়েছিল, তাকে আমি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলাম।'

চাকতিটা নিয়ে আগুনের আলোয় পরীক্ষা করলাম আমি। এটা একটা স্বর্ণ মুদ্রা, আকারে একটা শিলিংয়ের চেয়ে বড় নয়। মুদ্রার এক পিঠে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা সিংহ, এক হাতে একটা ঢাল অপর হাতে একটা শিরস্ত্রাণ। ভোরের আলোর ঘন্টার গায়েও এই প্রতীক চিহ্ন দেখেছি আমি। মুদ্রার উল্টো পিঠে ক্যাপিটাল অক্ষরে লেখা রয়েছে-F~HxAIJ FBIK A~EAB D„y‡B~P.

'সেই থেকে নিজেকে কথা দিয়ে আসছি, একদিন আমি আবার ফিরে যাব গানফায়ার রীফে,' বলে চলেছে রডরিক।

মুদ্রার কোথাও সন তারিখ উল্লেখ নেই। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কোম্পানির একটা মোহর এটা। 'একটা মাছের পেট থেকে পেয়েছ?'

'চকচক করছে দেখে গপ্ করে খেয়ে ফেলেছিল,' বলল রডরিক। 'তারপর পেট থেকে আবার বেরিয়ে যাবার আগেই আমার হাতে ধরা পড়ে যায়।'

মোহরটা ফিরিয়ে দিলাম ওকে। 'তাহলে বুঝতেই পারছ আমার গল্পটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়।'

'না, তা নয়,' স্বীকার করল রডরিক।

গুহা থেকে ভোরের আলোর ড্রয়িংগুলো, আর একটা গ্যাস

লণ্ঠন নিয়ে এলাম আমি। রডরিকের পিতামহ একটা ঈস্ট ইণ্ডিয়াম্যানের টপমাস্টম্যান হিসেবে সাগরে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে শিখেপড়ে রীতিমত একজন বিশেষজ্ঞ বনে গেছে রডরিক, সুতরাং আমাদের আলেচনায় গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যবহুল অবদান রাখতে পারল সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ভোরের আলোর সব প্যাসেঞ্জারের লাগেজ এবং অন্যান্য ছোটখাট জিনিস ফোক্যাসলের পাশে ফোর-হোল্ডে ছিল। এ ব্যাপারে তার সাথে তর্ক করতে গেলাম না আমি। যে বিষয়ে কিছুই জানি না সে বিষয়ে তর্ক করতে অনেকবার নিষেধ করে দিয়েছে ও আমাকে।

জোয়ার-ভাটার সময়সূচীটা বের করলাম আমি। হিসেব কষে বের করার চেষ্টা করছি কোন দিন কখন অনুকূল সুযোগ পাব পুলে গিয়ে কাজ করার-এই সময় হঠাৎ রডরিকের চেহারা বিকট বিকৃতি লাভ করল, আর কেউ না বুঝলেও ব্যাপারটা ধরতে পারলাম আমি-রডরিক হাসছে।

ছাপার অক্ষরের ওপর এক বিন্দু আস্থা নেই রডরিকের। এসব জিনিস দেখলেই হাসি পায় ওর। ওর নিজের মাথার ভেতরে একটা সী-ক্লক আছে, সেটার সাহায্যে জোয়ার-ভাটার সময় নির্ধারণ করে ও। অন্য কোন রকম সাহায্য না নিয়ে জোয়ার কখন আসবে তা এক হপ্তা আগে নির্ভুল ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখেছি ওকে আমি।

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কাল একটা চল্লিশে ভরা জোয়ার আসবে।'

'ম্যান,' বলল রডরিক, 'জীবনে এই প্রথম হিসেবে কোন ভুল করনি তুমি।'

ভার মুক্তো হোয়েলবোটটা রীফের ভেতর দিয়ে চ্যানেলের দিকে দ্রুত ইঁদুরের মত ছুটে চলেছে। বো-তে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাম্পনি, পানিতে ডোবা প্রবাল প্রাচীরের বিপদ সম্পর্কে হাত নেড়ে সতর্ক

করে দিচ্ছে স্টার্নে বসা রডরিককে। শান্ত পানি পেরিয়ে এসেছি আমরা। আত্মবিশ্বাসের সাথে ঢেউয়ের ভগ্ন-চূড়ার ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বোটটাকে রডরিক। ছোট বোটটা ঢেউয়ের গায়ে গুঁতো মারছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, পাছা দুলিয়ে তাল সামলাচ্ছে-কখনও শূন্যে উঠে আবার নেমে আসছে ঝপাৎ করে পানির গায়ে, দু'পাশ থেকে ছলকে ওঠা পানিতে ভিজে গোসল হয়ে যাচ্ছি আমরা।

প্যাসেজটা যতটা না বিপজ্জনক, তারচেয়ে বেশি রোমাঞ্চকর। ভয় এবং শিহরণে, আনন্দ এবং বিস্ময়ে কত রকম শব্দ বেরিয়ে আসছে রাফেলার গলা থেকে তার হিসেব রাখা দায়। কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে তীক্ষ্ণ চিৎকার, কিন্তু এতক্ষণে জানা হয়ে গেছে সবার, ওটা হাসির আওয়াজ।

প্রবাল প্রাচীরের মাঝখানে সরু গলায় ঢুকল হোয়েলবোট, দু'দিকে এক ফিট করে ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। জলকুমারীর তুলনায় হোয়েলবোটের বীম ছোট, গলার ভেতর দিয়ে অনায়াসে আমাদেরকে বের করে নিয়ে এল রডরিক। এরপর চ্যানেলের পেছন দিকের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এলাম আমরা পুলে।

'নোঙর ফেলার চেষ্টা করে লাভ নেই,' ভারী গলায় বলল রডরিক। 'পানি এখানে গভীর, রীফ খাড়া নেমে গেছে নিচে। বিশ ফ্যাদম পানির নিচে গজিয়ে আছে হাজার রকম ফ্যাকড়া।'

'বোট তাহলে স্থির থাকবে কিভাবে?' জানতে চাইলাম।

'মোটর চালু রেখে পাওয়ারের সাহায্যে।'

'প্রচুর ফুয়েল খরচ হবে তাতে, রডরিক।'

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছাড়ল রডরিক। বলল, 'তা যেন আমার জানা নেই!'

জোয়ারের পানি এখনও পুরোপুরি ফুলে উঠতে দেরি আছে, কিন্তু এরই মধ্যে রীফ টপকে এপারে চলে আসছে বড় ঢেউগুলো।

তেমন জোর নেই সেগুলোর, পুলের পানির ওপর ধাবমান একটা স্তর তৈরি করছে মাত্র, পানির পাতলা ছাল তুলে নিয়ে সেটাকে লক্ষ-কোটি বুদবুদে রূপান্তরিত করছে। সময়ের সাথে সাথে ফুলে-ফেঁপে উঠবে জোয়ারের পানি, রীফ পেরিয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী স্রোত ভয়াল গতিতে ছুটে আসতে শুরু করবে। জোয়ারের স্ফীতি কখনও খুব কম হয়, আবার কখনও খুব বেশি। স্ফীতি কম হলে চ্যানেলে ঢোকার জন্যে প্রয়োজনীয় পানির গভীরতা পাওয়া যায় না, আবার উল্টোটা ঘটলে প্রচণ্ড শক্তিশালী স্রোতে হোয়েলবোট উল্টে যাবার ভয় রয়েছে। আজকের লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে খুব উঁচু হয়েই আসছে জোয়ার। তার মানে আরও ঘন্টা দুয়েক পুলে থাকার সময় পাব আমরা।

প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। রাফেলা এবং আমি এরই মধ্যে ওয়েট স্যুট পরে নিয়েছি। ফেস-প্লেটের স্ট্র্যাপ বাঁধাও শেষ। ল্যাম্পনি এখন আমাদের পিঠে স্কুবা সেট আটকে দিচ্ছে।

'রেডি, রাফেলা?'

'রেডি।'

বোটের কিনারা থেকে পানিতে নামলাম আমরা। দু'জন একসাথে চুরুট আকৃতির খোলের নিচে চলে এলাম। ওপরে তাকিয়ে দেখি এক ঝলক রূপালী আলোর মত দেখাচ্ছে পানির মোটা স্তরটাকে, একটু লম্বাটে আকৃতির বুদবুদগুলো ঠেলাঠেলি করে দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছে ওপর দিকে, ঝলমলে পারদের মত রঙ সেগুলোর।

রাফেলার দিকে মনোযোগ দিলাম আমি। অভিজ্ঞ একজন ডাইভারের মত ধীর স্থিরভাবে নিঃশ্বাস ফেলছে ও, কোন তাড়াহুড়ো বা ব্যস্ততা নেই। ফেস-প্লেটের ভেতর প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে ওর মুখটা। হাসছে।

সোজা নিচের দিকে তাক করলাম আমি মাথাটা, তারপর সুইমিং ফিন-এর সাহায্যে পেডাল মারতে শুরু করলাম। দ্রুত

নেমে যাচ্ছি নিচের দিকে, গতি মন্থর করে অক্সিজেন অপব্যয় করতে রাজি নই।

আমাদের নিচে পুলটা গভীর একটা অন্ধকার খাদ। চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রবাল প্রাচীর আলোকে ঠেকিয়ে রেখেছে, ফলে ক্রমশ নিচের দিকে গাঢ় হয়ে আসছে অন্ধকার। এদিকের পানি ভীষণ ঠাণ্ডা, ঘন আর কালো-পরিবেশটা ভৌতিক, গা ছমছম করে। কি যেন একটা অশুভ শক্তি এর গভীর তলদেশে ওত পেতে রয়েছে।

খাড়া প্রবাল প্রাচীর অনুসরণ করে নামছি আমরা। প্রাচীরের গায়ে অসংখ্য ঝুল-বারান্দা, কার্নিস আর গুহা দেখতে পাচ্ছি। কোথাও প্রাচীরের গা বেঢপ ভাবে ফুলে আছে, কোথাও অনেকটা জায়গা সমতল, মসৃণ। প্রাচীরের প্রবাল সব জায়গায় এক জাতের নয়, কয়েকশো ধরনের প্রবাল দেখতে পাচ্ছি প্রাচীরের বিভিন্ন অংশে-বিচিত্র তাদের রঙ, গঠন, আকৃতি। সাপের মত কিলবিল করছে সামুদ্রিক লতা, হাজার হাজার কাঙাল যেন দু'হাত পেতে ভিক্ষা চাইছে।

রাফেলার দিকে তাকালাম। ঠিক আমার পেছনেই রয়েছে ও। আবার সে হাসল। আমার মত অহেতুক ভয় পায়নি।

আরও নিচে নামছি আমরা। পানিতে তোলপাড় লক্ষ করে অদৃশ্য ঝুল-বারান্দা থেকে ঝুপ করে নামছে হলুদ জায়েন্ট ক্রেফিশ, ধীর ভঙ্গিতে জায়গা বদল করছে ওরা, গুহার ভেতর ঢুকে বাঁক নিচ্ছে। অস্পষ্টভাবে টের পাচ্ছি ওদের উপস্থিতি। একটা বিশাল চোখ বা ছড়ানো লেজের অংশ হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি, কখনও পানির একটা মাঝারি তোড় এসে বুকে ধাক্কা খাচ্ছে। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু পরিষ্কার আঁচ করতে পারছি আমাদের উপস্থিতিতে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেছে পানির নিচের এই বৈরী জগতে।

প্রাচীরের গা ঘেঁষে বহু-রঙা মেঘের মত ভেসে যাচ্ছে প্রবাল

মাছের ঝাঁক, ম্লান নীলচে আলোয় মণি-মুক্তোর মত রঙ বেরঙের দ্যুতি ছড়াচ্ছে তারা। কাঁধে স্পর্শ অনুভব করে পেছন ফিরলাম আমি। রাফেলার দিকে তাকিয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। মুখে হাসিটা নেই এখন। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে গভীর এবং অন্ধকার একটা গুহার দিকে তাকালাম আমি।

দুই বিশাল চোখ, তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। অন্ধকার সয়ে আসতে দৈত্যাকৃতি একটা গ্রুপারের প্রকাণ্ড মাথা দেখতে পেলাম। রঙ-বেরঙের চওড়া একটা ঢাল-এর মত মুখটাকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে মোটা ঠোঁট। ঢাল-এর গায়ে সোনালি, সবুজ, হলুদ আর কালো রঙের ছোপ। আমাদেরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সতর্ক হয়ে উঠেছে দৈত্যটা। ক্রমশ ফুলে উঠছে তার পেট, পিঠ আর বুক-দ্রুত ছোট হয়ে আসছে গুহার দু'পাশের ফাঁকা জায়গা। নাক ঢেকে রাখা মাংসের পর্দাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে, বিস্ময়কর ভাবে ফুলে আরও বড় হয়ে যাচ্ছে মাথাটা। সবশেষে মুখ খুলল সে, ছুঁচাল দাঁতের সারির ভেতর গভীর একটা গর্ত দেখতে পাচ্ছি-ওখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারবে রডরিক।

আমার হাত চেপে ধরেছে রাফেলা। ধীরে ধীরে ওকে নিয়ে সরে আসছি আমি গুহার কাছ থেকে। তাই দেখে মুখ বন্ধ করল মাছটা, ধীরে ধীরে আগের আকারে ফিরে এল। গ্রুপার মেরে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে চাইলে কোথায় আসতে হবে জানা হয়ে গেল আমার। পানিতে সব জিনিস বড় দেখায়, তা মনে রেখেও বাজি ধরে বলতে পারি কম করেও এক হাজার পাউণ্ড ওজন হবে এই গ্রুপার মহাশয়ের।

প্রবাল প্রাচীর ঘেঁষে আবার আমরা শুরু করেছি নিচে নামতে। অতলতলের অপরিচিত, অজানা, বিচিত্র জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জীবন এবং সৌন্দর্য, মৃত্যু এবং বিপদ। জলজ

পাতাবাহারের বিষাক্ত বাহুতে কি সুন্দর ছোট ছোট পরীর মত মাছেরা আস্তানা গেড়েছে, ডগায় বিষ মাখানো খুদে বর্শা ওদের গায়ে বেঁধে না। প্রবাল প্রাচীর ঘেঁষে লম্বা কালো যুদ্ধ-জাহাজের মত পিছলে বেরিয়ে গেল একটা ঈল, নিজের গুহার কাছে পৌঁছে গোটা শরীরে সাবলীল ঢেউ খেলিয়ে পাক খেল একটা, ভয় দেখাবার জন্যে ফিরল আমাদের দিকে। কর্কশ, ভোঁতা এবং উঁচু-নিচু দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার, চোখ দুটো সাপের মত জ্বলজ্বল করছে।

নিচে নেমে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে কয়েকবার তাকালাম ওটার দিকে। অন্ধকারে ঝাপসা হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল।

ফিন দিয়ে প্যাডেল করে আরও নিচে নেমে এলাম আমরা। অবশেষে এতক্ষণে তলাটা দেখতে পাচ্ছি। জলজ উদ্ভিদ, গাছ-গাছড়া আর ঘন বাঁশঝাড়ে ঢাকা অন্ধকার একটা জগৎ। ফাঁক ফোকর দিয়ে আরও নিচে খসে পড়া পাতা দিয়ে মোড়া উঁচু-নিচু ঢিবি দেখা যাচ্ছে।

দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ওপর ঝুলে রয়েছি আমরা। টাইম-এলাপস্ রিস্টওয়াচ আর ডেপথ গজটা চেক করে নিলাম আমি। একশো বিশ গজ নেমেছি আমরা, সময় বয়ে গেছে পাঁচ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ড।

হাত নেড়ে নিজের জায়গা ছেড়ে নড়তে নিষেধ করলাম রাফেলাকে। একা ডুবে যাচ্ছি জলজ বনভূমির মাথার দিকে। বৃক্ষরাজির পিচ্ছিল পাতা দু'হাত দিয়ে সরিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিলাম ফাঁকের ভেতর। জঙ্গল ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে এসেছি কিন্তু তবু এখনও গাছের পাতা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে। বেশ খানিক দূরে আরও নামার পর অপেক্ষাকৃত খোলা একটা জায়গায় পৌঁছুলাম। বাঁশঝাড়ের পাতা দিয়ে ছাওয়া জায়গাটা, এখানে বাস করে নতুন জাতের মাছ আর জলজ প্রাণী।

এখানে পৌঁছেই বুঝতে পারলাম, পুলের মেঝে সার্চ করা সহজ কাজ হবে না। আবছা অন্ধকারে দশ ফিট দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। অথচ সর্বমোট দুই কি তিন একর এলাকায় খোঁজাখুঁজির কাজ সারতে হবে আমাদেরকে।

ঠিক করলাম রাফেলাকে নিচে আনতে হবে। দু'জন মিলে প্রাচীরের ভিত-রেখা ধরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত হেঁটে যাব আমরা, পরস্পরের কাছ থেকে দশ ফিট দূরে, দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকব।

ঘন পাতার রাজ্য ফুঁড়ে জঙ্গলের ওপর খোলামেলা পানিতে উঠে এলাম আমি। রাফেলাকে দেখতে না পেয়ে কেঁপে উঠল বুক, পরমুহূর্তে প্রবালের কালো প্রাচীরের গায়ের কাছ থেকে রূপালী বুদবুদের মিছিল ওপরে উঠে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগোলাম সেদিকে। আমার কথা না শুনে সরে গেছে ও। ঠিক বিরক্ত নয়, অস্বস্তি বোধ করছি। ওর কাছ থেকে বিশ ফিট দূরে থাকতে দেখতে পেলাম কি করছে ও। সেই মুহূর্তে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম আমি।

গানফায়ার রীফ-এ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, সর্বনাশ আর নিষ্ঠুর শাস্তি-রাফেলাকে দিয়েই শুরু হল তার সূচনা।

প্রবাল প্রাচীরের গায়ে হরিণের শিং-এর মত গজিয়েছে রঙিন প্ল্যান্ট, শাখা-প্রশাখা ছড়ানো অদ্ভুত সুন্দর এক-একটা কাঠামো সেগুলোর, ম্লান পিঙ্ক ক্রমশ ক্রিমসন রঙে পরিণত হয়েছে গায়ে। এরই একটা ডাল ভেঙেছে রাফেলা। খালি হাতে ধরেছে সেটা। যত দ্রুত সম্ভব ওর দিকে ছুটে যাবার সময় দেখলাম ওর পায়ে হালকাভাবে ঘষা খেল ওই ফায়ার কোরালের লাল একটা প্রশাখা।

কব্জি চেপে ধরে নিষ্ঠুর এবং সুন্দর প্ল্যান্টের কাছ থেকে সরিয়ে আনলাম ওকে। ওর হাতের মাংসে চেপে বসে গেছে আমার বুড়ো আঙুল, প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকাতে শুরু করেছি ডাল ধরা

হাতটা। অভিজ্ঞতা থেকে জানি এই প্রবাল শাখার গায়ে লেপ্টে থাকা লক্ষ লক্ষ খুদে পলিপ তাদের সেল থেকে বিষাক্ত বর্শা ছুঁড়ছে রাফেলার চামড়ায়।

ডালটা ফেলে দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আমাকে দেখছে রাফেলা। ঠিক কি ঘটেছে বুঝতে না পারলেও, খারাপ কিছু যে ঘটেছে সে-ব্যাপারে সচেতন। সাথে সাথে ওকে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছি আমি। দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠলেও সতর্কতার সাথে পালন করে যাচ্ছি পানির নিচ থেকে ওপরে ওঠার প্রাথমিক নিয়ম, আমার নিজের বুদবুদগুলোকে ওভারটেক করছি না, ওগুলোর সাথে সাথে উঠে যাচ্ছি।

রিস্টওয়াচ চেক করলাম-আট মিনিট ত্রিশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেছে। ডিকমপ্রেশন-এর জন্যে কতক্ষণ পর পর বিরতি নিতে হবে দ্রুত তার একটা হিসেব কষে নিলাম। অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই আক্রান্ত হল রাফেলা, বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল ওর মুখ। দ্রুত এবং ঘন ঘন ছোট নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে ও। ডিমাণ্ড ভালবের যান্ত্রিক সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়ে যাবে কিনা ভয় হল আমার। ওটা বিকল হয়ে গেলে বাতাস পাবে না ও।

আমার মুঠোর ভেতর মোচড় খেতে শুরু করেছে ওর হাত। এলোপাথাড়ি পা ছুঁড়ছে পানিতে। ঊরুর ওপর চাবুক পড়ার দাগের মত লাল হয়ে ফুলে উঠেছে মাংস। ক্রমশ আকারে আরও বড় হচ্ছে সেটা। আঁটো সুইম স্যুট থাকায় ঊরু ছাড়িয়ে ওপর দিকে আক্রান্ত হবে না ও, এই ভেবে একটু স্বস্তি বোধ করলাম আমি।

পানির ওপর থেকে পনেরো ফিট নিচে ডিকমপ্রেশন-এর জন্যে থেমেছি, বন্য ঘোড়ার মত হাত-পা খিঁচাচ্ছে এখন রাফেলা, মোচড় খাচ্ছে শরীরটা। ওকে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে আমার পক্ষে।

পানির ওপর মাথা তুলেই মাউথপীস সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'রডরিক, কুইক!'

পঞ্চাশ গজ দূরে হোয়েলবোট, কিন্তু মোটরটা চালু রয়েছে, কিছু জানতে বা বুঝতে না চেয়ে সেটাকে লেজের ওপর রেখে বিন্ করে আধপাক ঘুরিয়ে নিল রডরিক। হোয়েলবোটের নাক আমাদের দিকে তাক হতেই ল্যাম্পনিকে কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে চলে এল বো-তে।

'ফায়ার কোরাল, রডরিক,' চেঁচিয়ে বললাম ওকে। 'খুব খারাপভাবে লেগেছে ওকে। তোলো!'

হোয়েলবোট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রাফেলার ঘাড়ের কাছে বেল্টটা ধরল রডরিক, পানি থেকে শূন্যে তুলে নিল শরীরটা। ভিজে একটা ঘুড়ির মত রডরিকের কালো মুঠোয় ঝুলছে রাফেলা।

স্কুবা সেট পানিতে খুলে রেখে হোয়েলবোটের কিনারা ধরে উঠে পড়লাম আমি। বোট ঘুরিয়ে নিয়ে পানি থেকে ওটা তুলে নেবে ল্যাম্পনি। রাফেলাকে পাটাতনের ওপর শুইয়ে দিয়েছে রডরিক, ভাঁজ করা দুই হাতের মাঝখানে আগলে রেখে শান্ত করার চেষ্টা করছে ওকে। অসহ্য ব্যথায় ফোঁপাচ্ছে রাফেলা, অবোধ শিশুর মত হাত-পা ছুঁড়ছে। বো-এর কাছে ইকুইপমেন্টের একটা স্তূপের ভেতর মেডিক্যাল কিটটা পেলাম আমি। পেছনে রাফেলার কাতরানি শুনছি, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরও দেরি করে ফেলছে আমার হাতগুলো। মরফিন ভর্তি একটা অ্যামপুলের মাথা ভেঙে সিরিঞ্জের সূচটা ঢুকিয়ে দিলাম তার ভেতর। শুধু দুশ্চিন্তা নয়, এখন আমার প্রচণ্ড রাগও হচ্ছে।

'অন্ধ নাকি তুমি!' বকা দিচ্ছি রাফেলাকে। 'কচি খুকী? কোন সাহসে ছুঁতে গেলে ও-জিনিস!'

উত্তর দেবে কি, ঠোঁট দুটো অদম্যভাবে কাঁপছে ওর। ঊরুর একটু চামড়া দুই আঙুল দিয়ে ধরে তার ভেতর সূচটা ঢুকিয়ে

দিলাম। স্বচ্ছ তরল পদার্থ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ওর মাংসের ভেতর।

'ফায়ার কোরাল, মাই গড-একজন কংকোলজিস্টের বুড়ো আঙুল হবার যোগ্যতাও তোমার নেই! দ্বীপের একটা বাচ্চা ছেলেও এ-ভুল করবে না!'

'আমার মনে ছিল না, রানা,' অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রাফেলা।

'মনে ছিল না!' রাফেলার চেহারায় ব্যথার ছাপ দেখে আরও রেগে উঠেছি আমি, প্রায় ভেঙচে দিলাম ওকে। 'কেন মনে ছিল না? বোকামির একটা সীমা থাকা দরকার...'

সূচটা টেনে বের করে নিলাম ওর ঊরু থেকে। মেডিক্যাল কিটটা তছনছ করে খুঁজছি অ্যান্টি হিসটাসিন স্প্রে। 'কচি খুকী, কোলে পড়ে দুধ খাচ্ছ...'

ঝট করে প্রকাণ্ড মুখটা তুলে তাকাল আমার দিকে রডরিক। 'মাসুদ, মিস রাফেলাকে আর একটা কটু কথা বলে দেখো-স্রেফ দু'ভাগ করে দেব তোমার মাথা। বোঝা গেছে?'

ক্ষীণ একটু বিস্ময়ের সাথে বুঝলাম, ঠিক তাই করবে ও, ঠাট্টা করছে না। মাথা দু'ভাগ করে দিতে এর আগে দেখেছি ওকে আমি, তাই জানি, সেটা এমন একটা ব্যাপার যা এড়িয়ে যাওয়াই উচিত।

বললাম, 'ভাষণ না দিয়ে দ্বীপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার না আমাদেরকে?'

'নরম ব্যবহার করো ওর সাথে, ম্যান, তা নাহলে তোমার পেছনের মাংস আগুনে ঝলসাব-যাতে মনে হবে মিস রাফেলার নয়, ফায়ার কোরালে বসার দুর্মতি হয়েছিল তোমারই।'

বিদ্রোহটা অগ্রাহ্য করে রাফেলার ফুলে ওঠা লালচে ঘায়ে অ্যান্টি-হিসটাসিন স্প্রে করছি। তারপর ওকে দু'হাত দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। দ্বীপে না ফেরা পর্যন্ত ওকে

এভাবে নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণা ধীরে ধীরে কমে এল মরফিনের প্রভাবে।

ওকে নিয়ে ঢাল-এর গুহায় ঢুকলাম। ইতিমধ্যে নেতিয়ে পড়েছে ও। সারাটা রাত জেগে বসে থাকলাম ওর পাশে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল ওর, দরদর করে ঘামছে। জ্বরের মধ্যে প্রলাপ বকছে, কিন্তু তা এতই অস্পষ্ট যে কি বলছে বুঝতে পারা গেল না। একবার শুধু ওর ঠোঁটের কাছে কান নামিয়ে শুনতে পেলাম বলছে, 'দুঃখিত, রানা। জানতাম না আমি। প্রবাল পানিতে এই প্রথম ডাইভ দিয়েছি কিনা। চিনতে পারিনি।'

সারারাত জেগে বসে আছে রডরিক আর ল্যাম্পনিও। আগুনের কাছ থেকে ওদের চাপা ফিসফিস আওয়াজ পাচ্ছি। এক আধঘন্টা পর পরই গলা খাকারী দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকছে ওদের একজন, উদ্বেগের সাথে খোঁজ-খবর নিচ্ছে।

'এখন কেমন আছে, মাসুদ?'

সকালের মধ্যে বিষের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা কাটিয়ে উঠল রাফেলা। ঘা-টা আরও ছড়িয়েছে, এবং আরও পিচ্ছিল লাল আর দগদগে হয়ে উঠেছে, কিন্তু জ্বালা-পোড়া ভাব কমে গেছে অনেকটা।

কিন্তু আরও ছত্রিশ ঘন্টার আগে পুলে যাবার কথাটা তুলতে উৎসাহ পেলাম না আমরা কেউ। প্রসঙ্গটা যখন উঠল তখন উল্টোদিকে বইছে স্রোত। আরেকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে।

প্রতিটি ঘন্টা এখন মহামূল্যবান, কিন্তু নিরুপায় হয়ে লক্ষ করছি সেই মহামূল্যবান সময় আমাকে বিদ্রূপ করে বয়ে যাচ্ছে নিজের পথে, কোন ফায়দা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারছি না আমি।

কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, পানি কেটে দ্রুত বেগে ছুটে আসছে বুমেরাং। আমার আর সিডনি শেরিডানের মাঝখানে সময়ের প্রচুর

ব্যবধান ছিল, এই ব্যবধানের ওপরই ভরসা করেছিলাম আমি- কিন্তু ফাঁকটা দ্রুত ছোট হয়ে আসছে। ভয় হচ্ছে, আমি প্রস্তুত হবার আগেই ছুটে এসে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেবে বুমেরাং।-অথবা হুমায়ুন দাদার জিনবালা ক্রাশবোট।

এগারো

তিন দিনের দিন আবার পুলে এলাম আমরা। রওনা হলাম বিকেলে, তখনও ফুলে ওঠেনি জোয়ারের পানি, ঝুঁকি নিয়ে পানির নিচের প্রবাল কণাগুলোকে কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে ফাঁকি দিয়ে চলে এলাম।

এখনও ম্লান আর নিস্তেজ হয়ে আছে রাফেলা। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটার দিকে শোকার্ত নয়নে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর যেন কোন কাজ নেই ওর। ল্যাম্পনিকে সঙ্গ দেবার জন্যে ওকে রেখে আমি আর রডরিক নামলাম পানিতে।

বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর পৌঁছে প্রথম একটা মার্কার বয়া ফেললাম আমি। সুশৃঙ্খল নিয়ম ধরে পুলের তলাটা সার্চ করতে চাই। গোটা এলাকাটা কয়েকটা চৌকো অংশে ভাগ করে নিচ্ছি মোটা নাইলনের রশিতে বাঁধা মার্কার বয়ার সাহায্যে।

এক ঘন্টা পানির নিচে কাজ করলাম। এর মধ্যে জাহাজের বিধ্বস্ত কোন অংশই চোখে পড়ল না আমাদের। উঁচু হয়ে ফুলে থাকা বেঢপ ছোট ছোট প্রবাল ঢিবির গায়ে শ্যাওলা আর লতানো চারা গজিয়েছে, সেগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা না করে কিছু বলার সময় এখনও অবশ্য আসেনি। আমার উরুতে আটকানো আণ্ডারওয়াটার স্লেটে বিষয়টা টুকে রাখলাম।

এক ঘন্টার শেষের দিকে আমাদের জোড়া নাইনটি কিউবিক-ফিট বটলের এয়ার রিজার্ভ কমে যাওয়ায় কষ্ট পাচ্ছি আমরা। আমার চেয়ে বেশি বাতাস ব্যবহার করেছে রডরিক, আমার চেয়ে আকারে বড় ও, তাছাড়া কম খরচের কৌশল জানা নেই ওর-তাই

নিয়মিত পরীক্ষা করছি ওর প্রেশার গজ। অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে চেষ্টা করলে রক্তে বুদবুদ সৃষ্টি হবে, আর একটা খুদে বুদবুদ যদি ব্রেনে পৌঁছায়, স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে-রডরিককে এ কথা বোঝানো কঠিন। তাই বারবার নানা ছুতোয় বাধা দিয়ে দেরি করিয়ে দিতে হচ্ছে।

'পেলে কিছু?' পানির ওপর আমরা মাথা তুলতেই জানতে চাইল রাফেলা। মাথা নাড়লাম, সাঁতার কেটে চলে এলাম হোয়েলবোটের কাছে।

বিশ্রামের সময় থার্মোস থেকে এক কাপ করে কফি খেলাম আমরা। একটা চুরুট ধরালাম আমি। এক ডুব দিয়েই সাত রাজার ধন তুলে আনতে পারিনি বলে আমরা সবাই একটু নিরাশ হয়ে পড়েছি।

সদ্য চার্জ করা বটলে ডিমাণ্ড ভালব বদলে নিয়ে আবার আমরা নামলাম পানিতে। এবার আমি একশো ত্রিশ ফুট নিচে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি থাকব না। কারণ প্রতি ডাইভে গ্যাস জমছে রক্তে, বারবার গভীর পানিতে ডাইভ দেয়া বিপজ্জনক।

বাঁশ ঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়েছি আমরা। প্রবালের অলিগলির ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছি, ফাটল আর বেঢপ স্ফীতি পরীক্ষা করার জন্যে এখানে সেখানে থামছি। কৌতূহল জাগাচ্ছে এমন প্রতিটি জিনিস চিহ্ন দিয়ে রাখছি স্লেটে আঁকা ম্যাপে। মার্কার বয়ার মাঝখানে জায়গাটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বারবার যাওয়া-আসা করছি। তেতাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে যাবার পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি রডরিকের দিকে। আমাদের কারও সুইমস্যুট ফিট করে না ওকে, তাই মান্ধাতা আমলের কালো উলেনের একটা বেদিং কস্টিউম ছাড়া উলঙ্গ হয়ে নেমেছে ও। আমার একটা বন্ধু-ডলফিনের মত দেখাচ্ছে ওকে। বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে একটা দৈত্য যেন ছুটোছুটি করে খুঁজছে কাকে। মাথা ঘুরিয়ে নেব, এই সময় বাঁশঝাড়ের ঘন পাতার

মাঝখানে কোথাও একটু ফাঁক পেয়ে এক চিলতে ম্লান আলো ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঠিক রডরিকের নিচেই কি যেন চিক চিক করে উঠল সেই আলোয়। দ্রুত ঢুকে পড়লাম ঝাড়ের ভেতর। সাদা একটা বস্তু, প্রথমে মনে হল এটা একটা ক্ল্যাম শেলের টুকরো। কিন্তু তারপর লক্ষ করলাম জিনিসটা ক্ল্যাম শেলের তুলনায় অনেক বেশি মোটা, এবং আকৃতির মধ্যে একটা সৌষ্ঠব রয়েছে। ওটার আরও কাছে চলে এলাম আমি, দেখলাম কঠিন প্রবালের গায়ে আটকে আছে জিনিসটা। বেল্ট থেকে হাতুড়িটা বের করে কিছুক্ষণ প্রবালের গায়ে ঠোকাঠুকি করতেই আলগা হয়ে বেরিয়ে এল একটা খণ্ড। পাঁচ পাউণ্ডের বেশি ওজন হবে বলে মনে হল, নেটের ব্যাগে ভরে নিলাম ওটা। তাকিয়ে দেখি আমাকে লক্ষ্য করছে রডরিক। ওপরে ওঠার সিগন্যাল দিলাম ওকে।

'পেলে কিছু?' পানির ওপর আমরা মাথা তুলতেই ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল রাফেলা।

সাঁতার কেটে বোটের কাছে এলাম আমরা। নেট ব্যাগটা দিলাম রাফেলাকে। 'জানি না,' বললাম ওকে। কিন্তু আমার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। নেটের ভেতর থেকে সাদা জিনিসটা বের করতে ব্যস্ত সে।

এরই মধ্যে রীফ টপকে তেড়ে আসতে শুরু করেছে ঢেউয়ের মিছিল, টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে পুলের পানি। বিরামহীন আন্দোলনে টলমল করছে হোয়েলবোট, তাকে এক জায়গায় ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ল্যাম্পনি। একদিনের পক্ষে যথেষ্ট সময় পানির নিচে কাটিয়েছি আমরা, তাছাড়া, পুলে থাকার নিরাপদ সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে-কিছুক্ষণ পরই ভারত মহাসাগরের প্রচণ্ড স্রোত আর বিশাল ঢেউ প্রবাল প্রাচীরকে ডুবিয়ে দিয়ে আছড়ে পড়বে পুলের ওপর।

'ফিরিয়ে নিয়ে চল, রডরিক,' বললাম ওকে। দ্রুত মোটরের কাছে চলে গেল ও।

অসংখ্য বুনো ষাঁড়ের মত ঢেউয়ের মিছিল, সেগুলোর পিঠে চড়ে ফেরার সময় অন্য কোনদিকে খেয়াল দেবার অবকাশ পেলাম না আমরা। উগ্র মেজাজী স্রোতের ধাক্কায় সারাক্ষণ কাত হয়ে আছে হোয়েলবোট, যে-কোন মুহূর্তে উল্টে গিয়ে আছাড় খেতে পারে চ্যানেলের পাঁচিলে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ-সাথে রডরিক রয়েছে। চুল-চেরা হিসেবে কোথাও একটু ভুল করল না সে। ইঞ্চির ব্যবধানে সমস্ত বিপদকে ফাঁকি দিয়ে রীফের পেছন দিকের সুরক্ষিত পানিতে আমাদেরকে বের করে নিয়ে এল। তারপর বাঁক নিয়ে দ্বীপের দিকে তাক করল হোয়েলবোট।

পুল থেকে তুলে নিয়ে আসা প্রবাল খণ্ডটা এবার মনোযোগ দাবি করল। কিভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে ওটাকে সে বিষয়ে অহেতুক উপদেশ খয়রাত করছে রাফেলা। পাটাতনে রেখে হাতুড়ির বাড়ি মেরে তিন টুকরো করে ফেললাম ওটাকে। প্রবালের ভেতর সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল কয়েকটা জিনিস, বেরিয়ে পড়ল সেগুলো।

মার্বেল আকারের তিনটে গোল জিনিস রয়েছে। প্রবালের বিছানা থেকে সেগুলোর একটা তুলে নিয়ে ওজন অনুভব করলাম। বেশ ভারী। রাফেলার বাড়ানো হাতে তুলে দিলাম ওটা।

'বল দেখি, কি ওটা?'

'মাস্কেট বল,' নির্দ্বিধায় বলল রাফেলা।

'আরে, তাই তো!' জিজ্ঞেস করার আগেই জিনিসটা চিনতে পারা উচিত ছিল আমার। যাই হোক, পরের জিনিসটা ওর আগে চিনতে পারার কৃতিত্ব আদায় করার জন্যে তাড়াতাড়ি বললাম, 'এটা? এটা একটা ছোট পিতলের চাবি।'

'তুমি একটা প্রতিভা!' বিদ্রূপের সুরে বলল রাফেলা। 'যে জিনিস দেখা মাত্র চেনা যায় সেটাকে চিনতে পারার মধ্যে কৃতিত্ব কতটুকু জানি না।'

ওর কথায় কান না দিয়ে যে সাদা জিনিসটা দেখে প্রবাল খণ্ডটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবার সেটা খুব সাবধানে প্রবালের গা থেকে মুক্ত করে নিলাম আমি। একটা চীনামাটির টুকরো, উল্টোদিকে নীল নকশা আঁকা রয়েছে। নেড়েচেড়ে দেখার সময় বুঝতে পারছি একটা চীনামাটির প্লেটের ভাঙা কিনারা এটা, সাদা, চকচক করছে। উল্টোদিকের নকশাটা মাত্র অর্ধেক রয়েছে টুকরোটায়, কিন্তু পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সিংহটাকে প্রায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা। তারমানে এটাও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটা জিনিস, ভোরের আলোর এক সেট প্লেটের ক্ষুদ্র একটা অংশ।

রাফেলার হাতে প্লেটের ভাঙা কিনারাটা দেবার সময় আমি হঠাৎ কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম ভোরের আলো কিভাবে ভেঙে যাচ্ছে। উত্তেজিত ভাবে ব্যাপারটা বলতে শুরু করলাম ওকে। চীনামাটির টুকরোয় আঙুল বুলিয়ে আদর করছে ও, মনোযোগ দিয়ে শুনছে আমার কথা।

'স্রোত আর রীফের চাপে মাঝখান থেকে ভেঙে গিয়েছিল ভোরের আলো, ফলে তার সব ভারী কার্গো জায়গা বদল করে, ইনার বাল্কহেড ভেঙে বেরিয়ে আসে। খোল থেকে কামান, গোলা, প্লেট আর সিলভার, ফ্লাস্ক আর কাপ, মুদ্রা আর পিস্তল-সব সে ঢেলে দেয় পুলের দিকে। এবং এতদিনে প্রবাল সব হজম করে ফেলেছে।'

'কর্নেলের কেসগুলো?' জানতে চাইল রাফেলা। 'সেগুলো কি পড়ে গেছে খোল থেকে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে আমাদের কথা রডরিক, হঠাৎ সে কথা বলতে শুরু করল, 'ফোরহোল্ড সবসময় ডবল ছালের হয়, তিন ইঞ্চি মোটা ওক কাঠের প্ল্যাঙ্ক-যাতে ঝড়-ঝাপটার সময় কার্গো জায়গা বদল করতে না পারে। ওখানে সেদিন যা ছিল,

আজ এখনও তাই আছে।'

'তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত,' হাততালি দিয়ে বলল রাফেলা। 'তুমি না থাকলে কি দশা যে হত আমাদের, ভাবতে ভয় করে, রডরিক।'

প্রশংসা পেয়েই অভ্যস্ত রডরিক, কিন্তু রাফেলার কাছ থেকে হঠাৎ জিনিসটা পেয়ে লজ্জায় একেবারে মাটির সাথে মিশে গেল সে। ভদ্রতা দেখিয়ে একটু হাসল সে, মনে হল প্রচণ্ড আক্রোশে ঘোঁত ঘোঁত করছে। তবে এতদিনে রাফেলা চিনতে পারে ওটা হাসি, আক্রমণের পূর্ব লক্ষণ নয়। তারপর দূর দিগন্তরেখার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, যেন দুনিয়ার কোন বিষয়ে ওর কোন আগ্রহ নেই।

দ্বীপে ফিরে ভোজন এবং বিশ্রামের সময় দীর্ঘ আলোচনা হল বিষয়টা নিয়ে। একটা ব্যাপারে একমত হলাম আমরা পুলের তলায় ভোরের আলোর সম্পূর্ণ সামনের অংশটা পড়ে আছে, এবং তার ওপর কয়েক স্তর প্রবাল জমে পাথর হয়ে গেছে, সেই শক্ত পাথরে গজিয়েছে শ্যাওলা এবং জলজ চারা।

ঠিক হল আমাদের কাজটা দুই ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। প্রথম কাজ কেসগুলো কোথায় আছে তা অনুমান করা, তারপর সেগুলোকে প্রবালের দৃঢ় আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করা।

'এর জন্যে কি জিনিসের দরকার হবে আমাদের তুমি জানো, রডরিক,' বললাম আমি। সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও।

'সেই কেস দুটো আছে তো?' রাফেলার সামনে জেলিগনাইটের নাম উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ বোধ করলাম আমি।

এদিক-ওদিক মাথা দোলাল রডরিক। 'নেই, মাসুদ। ওগুলো সাংঘাতিক ঘামছিল। কেউ যদি পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে হাঁচি দিত, নির্ঘাৎ দ্বীপের মাথাটা উড়িয়ে নিয়ে যেত বিস্ফোরণের সাথে। তাই আমি আর ল্যাম্পনি মোজাম্বিক চ্যানেলের কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছি ওগুলো।'

'তাহলে উপায়?'

'মিস্টার গোখলে রামাদীনের সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে,' জানাল রডরিক। 'সে জোগাড় করে দিতে পারবে।'

'তাই কর, বুঝলে। এরপর যখন সেন্ট মেরীতে যাবে। তিন বাক্স, কেমন?'

'জলকুমারী থেকে যে আনারসগুলো উদ্ধার করেছি সেগুলো দিয়ে কাজ চালানো যায় না?' জানতে চাইল ল্যাম্পনি।

আনারস মানে এম-কে সেভেন হ্যাণ্ড গ্রেনেড। 'না,' বললাম ওকে। 'একশো ত্রিশ ফুট পানির নিচে ও জিনিস নিয়ে নামছি না আমি।'

ভোরে ঘুম ভাঙতেই চারদিকে নিস্তব্ধ অস্বাভাবিকতা লক্ষ করে বিস্মিত হলাম আমি। একই সাথে বাতাসে একটা উত্তাপ অনুভব করছি। জেগে শুয়ে আছি, গভীর মনোযোগের সাথে চেষ্টা করছি শুনতে, কিন্তু একটা শব্দ নেই কোথাও। সারাক্ষণ চরে বেড়ায় যে কাঁকড়াগুলো, তাদেরও কোন সাড়া নেই। নারকেলগাছের পাতাগুলো এমন কোন সময় নেই যখন খস খস করে না, অথচ তারাও একেবারে স্থির হয়ে গেছে। একমাত্র শব্দ পাচ্ছি আমার পাশে শুয়ে থাকা মেয়েটার নিঃশ্বাস পতনের। আলতোভাবে ওর কপালে চুমু খেলাম আমি, তারপর বহুকষ্টে ঘুম না ভাঙিয়ে ওর মাথার নিচ থেকে আমার হাতটা সরিয়ে নিলাম। রাফেলার দাবি, বুদ্ধি হবার পর থেকে সে নাকি কখনও বালিশ ব্যবহার করেনি, ওতে নাকি মেরুদণ্ডের ক্ষতি হয়। কিন্তু তাই বলে আমার শরীরের কোন অংশকে বলিশ হিসেবে ব্যবহার করতে উৎসাহের কোন অভাব দেখিনি ওর মধ্যে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দুর্বল হাতটা ম্যাসেজ করছি। তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, ম্লান, রুগ্ন লাগছে ভোরটাকে। একটু বাতাস নেই।

আগুনে ডালপালা যোগাচ্ছে রডরিক, ফুঁ দিয়ে জ্যান্ত করে তুলতে চাইছে। আমাকে দেখে মুখ তুলল। ঘামে ভিজে গেছে প্রকাণ্ড মুখটা।

'কিছু বুঝতে পারছ, রডরিক?' জানতে চাইলাম আমি।

'আবহাওয়া একটু তামাশা করবে।'

'ঠিক কি আসছে, রডরিক?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'আটাশ পয়েন্ট দুই-এ নেমে গেছে গ্লাস-তবে এখনই কিছু বলার সময় আসেনি-দুপুরের মধ্যে জানা যাবে।' আগুনে আবার ফুঁ দিতে শুরু করল ও।

সকাল এগারোটায় পুলে নামলাম আমি আর রডরিক। পঁয়ত্রিশ মিনিট হল নেমেছি, এখনও উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কার করিনি, এই সময় ক্লিঙ্ক, ক্লিঙ্ক-ক্লিঙ্ক! ক্লিঙ্ক, ক্লিঙ্ক- ক্লিঙ্ক!-পানির ভেতর দিয়ে আসছে আওয়াজটা। থেমে গেছি আমি, শুনছি। লক্ষ করছি স্থির হয়ে গেছে রডরিকও। আবার এল শব্দটা, একই ছন্দে দু'বার।

পানির ওপর থেকে তিন ফুট লম্বা লোহার রেইলের অর্ধেকটা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে ওপরের অংশে হাতুড়ির ঘা মারছে ল্যাম্পনি।

রডরিককে ইশারা করে ওপরে উঠতে শরু করলাম আমি।

বোটে ওঠার সময় রাগের সাথে জানতে চাইলাম, 'ব্যাপারটা কি, ল্যাম্পনি?'

উত্তরে নিঃশব্দে একটা হাত তুলল ল্যাম্পনি। রীফের পেছন দিকের উঁচু নিচু মাথার ওপর দিয়ে সাগরের দিকে তাকালাম আমি।

কিছুই দেখতে পেলাম না। মাস্ক খুলে চোখ পিট পিট করে তাকালাম আবার। এবার দেখতে পেলাম। অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

দূর সাগরের গায়ের কাছে কালো দেখাচ্ছে ওটাকে। চিকন

একটা ফিতের মত। কাঠ-কয়লা দিয়ে খেয়ালী সৃষ্টিকর্তা যেন দিগন্তরেখা বরাবর একটা সরল রেখা এঁকেছে। কিন্তু আমাদের তাকিয়ে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে রেখাটা মোটা হচ্ছে, সেই সাথে ছড়িয়ে গিয়ে বড় হচ্ছে আরও লম্বায়। সাগরের নিচে যেন আগুন ধরে গেছে, তা থেকে ধোঁয়া উঠে এসে ঢেকে দিচ্ছে ম্লান নীল আকাশের বিশাল গম্বুজের নিচের দিকটা।

চাপাস্বরে গর্জে উঠল রডরিক, আঁতকে উঠে ঝাঁকি খেলাম আমি। গম্ভীরভাবে হাসছে ও।

'ভদ্রমহিলা আসছেন, ম্যান! পাগলি ভদ্রমহিলা-চিনতে পারছ, মাসুদ?'

নিঃশব্দে অনেকটা সম্মোহিতের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে জানালাম, পারছি চিনতে।

'লেডি সি,' বলল রডরিক। 'খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলাকে।'

নিচু, গাঢ় সম্মুখ অংশটার তীব্রগতি অপার্থিব লাগছে আমার চোখে। পলক পড়ার আগে গোগ্রাসে গিলে নিচ্ছে নীলচে আকাশের বিশাল এলাকা, তুমুল গতিতে টেনে নিয়ে আসছে কালো একটা পর্দা।

উঠে এসে গলুইয়ে আমার পাশে বসল রাফেলা, রাবারের ওয়েট স্যুট খুলতে সাহায্য করছে আমাকে।

'কি, রানা?'

'লেডি সি, বলে দ্বীপের লোকেরা,' জানালাম ওকে। 'সাইক্লোন। কয়েক বছর পর-পরই যখন মর্জি হয় আসে। ভোরের আলোকে ডুবিয়েছিল এই লেডি সি। আবার শিকার খুঁজতে বেরিয়েছে।'

ফোরপীক থেকে লাইফবেল্ট বের করে প্রত্যেককে একটা করে দিল ল্যাম্পনি। যে যারটা বেঁধে নিয়ে একসাথে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম আমরা সবাই। বিস্ফারিত চোখে দেখছি

প্রকৃতির প্রলয় আয়োজন। অশুভদর্শন কালিমায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে দ্রুত এই-বড় প্রকাণ্ড আকাশ।

ভীত-সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ছুটছি আমরা হোয়েলবোট নিয়ে, মুখ ব্যাদান করে পিছু ধাওয়া করছে আমাদেরকে সাইক্লোনটা। চ্যানেল পেরিয়ে এসে ভেতরের পানির ওপর দিয়ে হোয়েলবোটকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রডরিক। আমরা সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছি পেছনের দিকে। সবার অস্তিত্ব জুড়ে একটা অসহায় বোধ চেপে বসেছে। কত ক্ষুদ্র আর নগণ্য আমরা, অথচ আমাদেরকে বিনাশ করতে প্রকৃতির কি ভয়াবহ আয়োজন-স্তম্ভিত বিস্ময়ে এর বেশি কিছু ভাবতে পারছি না।

বে-তে যখন ঢুকছি, মেঘের সামনের ভাগটা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে পর্দা টেনে সামনে চলে এল। দপ করে নিভে গেল দিনের প্রায় সবটুকু আলো, অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে গেল চারদিক। প্রথম ঝাপটাটা হিম শীতল চাবুকের মত বাড়ি মারল পিঠে, সবাই একসাথে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম আমরা বোটের ওপর। বিচ্ছিন্ন একটা তোড়ের মত চলে গেল সেটা আমাদের ওপর দিয়ে। তারপর বালি আর পানির ফণা নিয়ে এল পরবর্তী ঝাপটা। কিন্তু সাগর আর দ্বীপমালা ছুঁয়ে এসেছে বলে এটা প্রথম ঝাপটার মত শক্তিশালী নয়।

'মোটর!' আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল রডরিক, সেই মুহূর্তে তীর স্পর্শ করল হোয়েলবোট। একজন পরিশ্রমী লোকের অর্ধেক জীবনের সঞ্চয় এই নতুন মোটর দুটো, ওর উদ্বেগ যথার্থ বলে মেনে নিলাম আমি।

'সাথে করে তুলে নিয়ে যাব আমরা,' আশ্বাস দিয়ে বললাম ওকে।

'বোটটা?'

'ডুবিয়ে দেব। তলায় এদিকে শক্ত বালি, শুয়ে থাকতে পারবে।'

মোটর দুটো খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি আর রডরিক। আমাদের সমস্ত ইকুইপমেন্ট এক জায়গায় জড়ো করে ক্যানভাস দিয়ে মুড়ে ফেলছে ল্যাম্পনি আর রাফেলা। নাইলনের রশি দিয়ে ক্যানভাসের চার প্রান্ত এক করে বাঁধল ওরা, তারপর আরও মোটা একটা রশি দিয়ে পেট মোটা পোঁটলাটাকে বোটের সাথে বেঁধে রাখল।

রডরিক আর ল্যাম্পনি ভারী মোটর দুটো নামাল তীরে। ওদেরকে এগোতে বলে বাতাসের সাহায্যে বে-তে নিয়ে এলাম বোটকে, তারপর ড্রেইন প্লাগগুলো খুলে দিলাম। ফুটোগুলো দিয়ে পানি ঢুকে দ্রুত ভরিয়ে দিচ্ছে বোটটাকে। বিশ ফুট পানির নিচে ডুবে গেল সে।

প্রতিটি ঢেউ মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, শরীর কাত করে সাঁতার কেটে তীরে ফিরে এলাম। রাফেলাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে ল্যাম্পনি, কিন্তু আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রডরিক। দু'জনে মোটর দুটো তুলে নিলাম যার যার কাঁধে। শিরদাঁড়া খাড়া করেই হাঁটছে রডরিক, কিন্তু মোটরের ওজনে বেঁকে গেছে আমারটা, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাঁটছি।

পেছন দিকে তাকালাম আমি। প্রহরীর ভূমিকা নিয়েছে রডরিক, সবার পেছনে রয়েছে ও। সাদা বালি উড়ছে, সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে ওর কোমর পর্যন্ত।

নারকেল গাছ এলাকায় ঢুকেছি, এই সময় দ্বীপে আঘাত করল সাইক্লোনের অপেক্ষাকৃত বড় ধাক্কাটা। ত্রিশ সেকেণ্ডের মত স্থায়ী হল সেটা, আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, যেন একসাথে কুর্নিশ করছে কাউকে।

ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ল্যাম্পনি। রাফেলা একা এগিয়ে যাচ্ছে, সবার সামনে রয়েছে ও, দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মাথাটাকে। ল্যাম্পনিকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় চিৎকার করে বললাম, 'মাথা নিচু কর!' কিন্তু চিৎকারটা আমার মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে

গেল তীব্র বাতাস, ল্যাম্পনি পর্যন্ত তো দূরের কথা, চার ইঞ্চি দূরে আমার কান পর্যন্তও সেটা পৌঁছল না। গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল আমার।

নারকেল গাছগুলোর এই আর্তনাদ চিরকাল মনে থাকবে আমার। নুয়ে পড়ছে ওরা, আতঙ্কে আর তীব্র যন্ত্রণায় একটানা কাতরাচ্ছে। ঝড়ের তীব্রতায় পলকের জন্যে একটু ঢিল পড়লেই ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত বিদ্যুৎবেগে আবার খাড়া হয়ে যাচ্ছে ওরা, তীব্র ঝাঁকি খেয়ে পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে কামানের ভয়ঙ্কর গোলার মত শক্ত নারকেল ছুটে আসছে আমাদের দিকে। এগুলোর একটা আমার কাঁধের ওপর ভারী মোটরে ড্রপ খেল, হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে গিয়ে কোন রকমে সামলে নিলাম। আরেকটা আমাদের পায়ে চলা পথের পাশে পড়ল, ড্রপ খেয়ে লাগল গিয়ে রাফেলার হাঁটুর নিচে। নারকেলের এই আঘাতে তেমন জোর ছিল না, তবু দড়াম করে পড়ে গেল রাফেলা, বাতাস ওকে গড়িয়ে নিয়ে গেল খানিকদূর। আমি ওর কাছে পৌঁছুবার আগেই উঠে দাঁড়াতে পারল ও। কিন্তু পেছন থেকে লক্ষ করছি, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

ঢাল বেয়ে উঠছি আমরা, আমাদেরকে ঘিরে উন্মত্ত গর্জন করছে নারকেল গাছগুলো। ঢালের মাথায় প্রায় পৌঁছে গেছি, এই সময় সাইক্লোনের বিস্ময়কর একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। নারকেল গাছের সগর্জন তাণ্ডব, ঝড়ের একটানা বিকট হুঙ্কার ছাপিয়ে উঠল নতুন একটা আওয়াজ। তীক্ষ্ণ নয়, ভরাট এবং গম্ভীর শব্দটা দূর কোথাও থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে, মাথার অনেক ওপর দিয়ে।

মাটিতে একটা কম্পন অনুভব করছি। নারকেল গাছের শিকড় এবং জড় ধরে টান দিয়েছে এবার সাইক্লোন, এবং সামনে তাকাতেই দেখি প্রথম গাছটা ভেঙে পড়তে যাচ্ছে।

পঞ্চাশ ফুট উঁচু গাছটা নুয়ে পড়তে পড়তে কাঁপছে থরথর

করে, বাতাসকে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্যাতীত চেষ্টা করছে সে, ফলে ক্রমশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে, আরও নুয়ে পড়ছে মাটির দিকে। গাছটার ভিতের চারপাশের মাটি ফুলে উঠছে একটু একটু করে, বেলে মাটির নিচে ছড়ানো শিকড়গুলো ছিঁড়তে শুরু করেছে প্রচণ্ড টানে। ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে গাছটা, কাঠুরের কুঠারের মত মাথার ওপর থেকে নেমে আসছে সেটা আমাদের সামনে। আমার পনেরো ফুট সামনে রয়েছে রাফেলা, নিচের দিকে তাকিয়ে ঢালের মাথা থেকে মাত্র নামতে শুরু করেছে। হাত দুটো দিয়ে এখনও চেপে ধরে রেখেছে ও মাথাটাকে।

গাছটা যেখানে পড়ছে ঠিক সেই জায়গার দিকে ছুটে যাচ্ছে রাফেলা। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। ওই জায়গায় রাফেলাও পৌঁছুবে, ঠিক তখন গাছটাও পড়বে। আঘাতটা টেরও পাবে না ও, তার আগেই মারা যাবে। এত কাছে রয়েছে ও, অথচ আমার বজ্রকণ্ঠের চিৎকার মোটেও শুনতে পাচ্ছে না। ঝড়ের গর্জন আমাদের সমস্ত বোধ আর অনুভূতি উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মোটরটা ফেলে দিলাম আমি। ছুটছি। কিন্তু জানি, দেরি করে ফেলেছি অনেক। সময় মত পৌঁছুতে পারব না ওর কাছে। অনুভব করছি হতাশায় দুর্বল হয়ে আসছে আমার শরীর। তারপর, মরিয়া হয়ে উঠে, যতটা না রাফেলাকে বাঁচাবার জন্যে, তারচেয়ে ওর সাথে একত্রে মরার অদ্ভুত এক জেদের বশে ডাইভ দিলাম আমি। সামনে সবটুকু বাড়িয়ে দিয়েছি দুই হাত। রাফেলার পেছনের পায়ে বাড়ি মারলাম, পা-টা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে ও, ঠিক সেই মুহূর্তে, ধাক্কা খেয়ে দুই পা ঠুকে গেল রাফেলার, হাঁটু ভেঙে ওখানেই পড়ে গেল ও। দু'জন হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছি, এই সময় ধরাশায়ী হল গাছটা। বজ্রপাতের মত কড়াক করে ভাঙল কাণ্ডটা। পতনের ধাক্কায় কেঁপে উঠল মাটি, দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল আমার।

স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, টেনে তুললাম

রাফেলাকে। গাছটা আঠারো ইঞ্চির জন্যে ছুঁতে পারিনি ওকে। আতঙ্কে স্থবির হয়ে গেছে ও। দু'হাত দিয়ে ধরে কয়েক সেকেণ্ড ঝাঁকালাম ওকে। এতক্ষণে তাকাল আমার দিকে ও। দু'হাত দিয়ে শূন্যে তুলে নিলাম ওকে, ধরাশায়ী গাছটাকে টপকে এপারে এসে নামিয়ে দিলাম আবার মাটিতে। 'দৌড়াও।' চেঁচিয়ে উঠলাম ওর কানে।

কথা শুনল রাফেলা। টলতে টলতে এগোল ও। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে ওর গতি। মোটরটা আবার কাঁধে তুলতে আমাকে সাহায্য করল ল্যাম্পনি। তারপর আবার একবার গাছটা টপকে ছুটন্ত রাফেলাকে অনুসরণ করলাম আমি।

চারদিকে কড়াক কড়াক শব্দে গাছ ভাঙছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি সম্ভাব্য বিপদ আগেভাগে টের পাবার জন্যে। ঢালের মাথায় উঠে পড়েছি নিজের অজান্তে, ফলে বাতাসের অবিচ্ছিন্ন ধাক্কাটার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না, প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লাম সামনের দিকে, ঢালের মাথা থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়লাম পাঁচ হাত নিচে, মোটরটা কাঁধ থেকে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে একপাশে পড়ে গড়াতে শুরু করেছে।

গড়িয়ে নেমে যাচ্ছি আমরা। সামনে পড়ল রাফেলা। ওর পায়ের সাথে ধাক্কা খেল আমার বুক, ফলে হাঁটু ভেঙে আমার গায়ের ওপরেই পড়ে গেল ও। মোটর, আমি, রাফেলা-পাল্লা দিয়ে গড়িয়ে নামছি এখন।

এই আমি রয়েছি ওপরে, পরমুহূর্তে আমার দুই শোল্ডার বেডের মাঝখানে বসে রয়েছে রাফেলা বার্ড, তারপর দেখা যাচ্ছে আমাদের দু'জনের ওপর চড়ে বসে আছে মোটরটা।

ঢালের নিচে পৌঁছে থামলাম আমরা। বাতাসের ছোবল বাধা পাচ্ছে ঢালের মাথায়, জায়গাটা প্রায় নিরাপদ। আহত পশুর মত হাঁপাচ্ছি আমরা। ল্যাম্পনি নেমে এসে পরীক্ষা করল রাফেলাকে। হাড়গোড় ভাঙেনি ওর। রডরিককে নামতে দেখে আবার আমরা

রওনা হলাম।

মোটরটা ওদের গুহায় রেখে রাফেলাকে সাথে নিয়ে ফিরে এলাম নিজেদের গুহায়। ঢাল ভেঙে সাইক্লোনের চোদ্দ গোষ্ঠীর সাধ্য নেই এই গুহায় ঢোকে, সুতরাং খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিজেদেরকে পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমরা। তারপর ক্যানভাস দিয়ে গুহার মুখটা ঢেকে দিল রাফেলা। আমি গ্যাস স্টোভটা জ্বেলে কফির জন্যে পানি চড়ালাম।

'কি সাংঘাতিক, তাই না?' বলল রাফেলা। 'থামবে কখন?'

'পাঁচ দিন পর,' মুচকি হেসে বললাম ওকে। কান পেতে শুনছি ঝড়ের অবিচ্ছিন্ন হুঙ্কার।

'কি! কে বলল তোমাকে?'

'এই ঝড়ের এ-ই মেয়াদ।'

'তার মানে...'

'হ্যাঁ,' মুচকি হেসে বললাম। 'প্রকৃতি আমাদেরকে পাঁচ দিনের জন্যে কয়েদ করেছে। এই সময়টা আমরা পরস্পরকে আরও গভীরভাবে জানার কাজে ব্যয় করতে পারি।'

'কে চায় তা?' ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল রাফেলা, যা মোটেও ঠাট্টা বা কৃত্রিম বলে মনে হল না আমার।

সেই সন্দেহটা ফিরে এল আমার মনে। রাফেলা কি আমাকে ঘৃণা করে?

অনেক ভেবেচিন্তে, অনেক ছোটখাট ঘটনা স্মরণ করে সিদ্ধান্ত নিলাম, সম্ভবত তাই, ও বোধহয় আমাকে ঘৃণাই করে। কিন্তু কেন?

এর কোন সম্ভাব্য উত্তর জানা নেই আমার।

মনে মনে আরেকবার স্বীকার করলাম, এখনও আমার কাছে দুর্ভেদ্য একটা রহস্য হয়েই রয়েছে রাফেলা বার্ড।

রসদের অভাবে প্রথম তিন দিন অভুক্ত থাকল রডরিক আর

ল্যাম্পনি। ঝড়ের বেগ দুপুরের পর এত বেড়ে গেল যে একশো গজ পেরিয়ে বড় গুহাটার কাছে আসতে সাহস হল না ওদের।

দ্বিতীয় দিন সকালে আমি রওনা হবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, এই সময় রডরিক এসে হাজির। এই একশো গজের মধ্যে ও যা দেখে এসেছে তার যা বর্ণনা ওর কাছ থেকে পেলাম তাতে শিউরে উঠলাম আমরা। অর্ধেকের বেশি নারকেল গাছ শুয়ে পড়েছে মাটিতে, যেগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর মাথা কামিয়ে ন্যাড়া করে দিয়েছে ঝড়।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিলাম রডরিককে। বাইরে নতুন সুরে বাঁশী বাজাচ্ছে লেডি সি।

ঘরের ভেতর পরিবেশটা শ্বাসরুদ্ধকর না হলেও রাফেলার অদ্ভুত আচরণে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে ও। রাতে পাশাপাশি শুচ্ছি আমরা, কিন্তু কেউ কারও গায়ে হাত না দেবার কঠোর নিয়ম মেনে চলছি। যদিও এ ব্যাপারে দু'জনের কারও তরফ থেকেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।

এখন পর্যন্ত আমার সম্পর্কে ওর নিজের অনুভূতি কি তা প্রকাশ করার চেষ্টা করেনি ও। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়েও কোন উচ্চবাচ্য করিনি আমরা।

আমার কথা বাদ দিলেও, রাফেলা নিজে যে শান্তিতে আছে তাও নয়। খাচ্ছে, হাসছে, ঘুমাচ্ছে, কিন্তু এসবের মধ্যে মাঝে মাঝে চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখেছি ওকে।

চার দিনের দিনও ঝড়ের প্রকোপ এতটুকু কমল না। ইতিমধ্যে রাগ আর বিরক্তির উত্তাপে ঝলসে গেছি আমি। নিষ্ফল আক্রোশে খাঁচায় বন্দী বাঘের মত সারাটা দিন গুহার ভেতর পায়চারি করে কাটালাম।

পঞ্চম দিনে ভোর বেলা জেগে উঠলাম আমি। গোটা দ্বীপের

কোথাও কোন শব্দ নেই। ঝড়ের তাণ্ডবের পর এই নিস্তব্ধতা অসহ্য লাগছে, চোখ না খুলে কিছু একটা শুনতে পাবার আশায় কান পেতে আছি। পাশে নড়ে উঠল রাফেলা। চোখ মেলে তাকালাম আমি।

'ঝড় থেমে গেছে,' মৃদু গলায় বলল ও। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে।

ভোরের কচি রোদে বেরিয়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়ালাম আমরা। ধ্বংসের যে চিহ্ন রেখে গেছে ঝড় তা চোখ পিট-পিট করে দেখছি। যুদ্ধবিধ্বস্ত রণক্ষেত্রের ফটোর মত চেহারা হয়েছে দ্বীপটার। নারকেল গাছগুলো আব্রুহীন, উলঙ্গ-যেন আকাশের দিকে ঠ্যাং তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাটি চাপা পড়ে গেছে পাতা আর নারকেলে। সব কিছু স্থির হয়ে আছে, বাতাসের একটু নড়াচড়া নেই কোথাও। নীলচে আকাশটাকে ম্লান করে রেখেছে এখনও বালি আর পানির কণা।

যেন শীতকালটা কাটিয়ে নিজেদের গুহা থেকে বড় ভালুক আর ছোট ভালুক বেরিয়ে এল-অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাচ্ছে ওরাও, রডরিক আর ল্যাম্পনি।

অকস্মাৎ ক্যাঙ্গারুর মত একটা লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল ল্যাম্পনি, হুপ করে আওয়াজ ছাড়ল সে। তারপর লেজ তোলা বাছুরের মত নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে ছুটল সে।

'সবচেয়ে পরে পানিতে নামবে যে সে একজন ফ্যাসিস্ট,' চেঁচিয়ে ঘোষণা করল ল্যাম্পনি।

চ্যালেঞ্জটা সবার আগে গ্রহণ করল রাফেলা।

রাফেলার চেয়ে দশ ফুট আগে থেকে প্রথম সৈকতে পৌঁছুল ল্যাম্পনি, কিন্তু খাড়িতে ওরা ঝাঁপ দিয়ে নামল একসাথে। তারপরই একজন আরেকজনের দিকে মুঠো ভর্তি বালি ছুঁড়ে মারামারি বাধিয়ে দিল।

উজ্জ্বল রঙের ডোরাকাটা পাজামা পরা রডরিককে নিয়ে

পানিতে নামলাম আমি। কয়েক পা এগিয়ে বালির ওপর বসলাম আমরা, আমাদের কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে পানির নিচে। কড়া কয়েকটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লাম আমি, তারপর চুরুটটা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

'পাঁচটা দিন হারিয়েছি আমরা, রডরিক,' ওকে বললাম।

ঘরঘরে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল রডরিকের গলার ভেতর থেকে। তার মানে দুঃখ প্রকাশ করছে ও। 'হাড়ভাঙা খেটে পুসিয়ে নেয়া যাবে, মাসুদ,' আশ্বাস দিল আমাকে। 'নাও, ওঠো, এক্ষুনি কাজে লাগতে হবে।'

এয়ারব্যাগের সাহায্যে পানি থেকে তুলে বৈঠা চালিয়ে তীরে নিয়ে এলাম আমরা হোয়েলবোট। সারাদিন ব্যস্ত থাকার মত যথেষ্ট কাজ রয়েছে হাতে। ক্যানভাসের মোড়ক থেকে ইকুইপমেন্টগুলো বের করে ধুয়ে মুছে রোদে শুকাতে হবে, গুহা থেকে নিয়ে এসে বোটে ফিট করতে হবে মোটর দুটো, বাতাস ভরতে হবে এয়ার বটলে-তারপর গানফায়ার রীফে যাবার প্রস্তুতি। সন্ধ্যার পর ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে আলোচনার সময় আমরা সবাই স্বীকার করলাম যে ভোরের আলোর কিছুটা অংশ পুলের দিকে পড়েছে, ব্যস, এর বেশি কিছু এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি আমরা। অথচ এক এক করে দশটা দিন পেরিয়ে গেছে। বিপদ এখন যে-কোন দিক থেকে ঘাড়ে এসে পড়তে পারে।

যাই হোক, পরদিন জোয়ারের চার্ট দেখে খুব ভোরেই রওনা হতে পারলাম আমরা। আবছা অন্ধকারে পানির নিচের ছড়ানো প্রবালকণা দেখা যায় কি যায় না, কিন্তু নির্বিঘ্নে আমাদেরকে রীফ-এর পেছন দিকে নিয়ে এল রডরিক। হোয়েলবোট যখন থামল পুলে, সূর্যের ওপরের কিনারা সবে মাত্র দিগন্তরেখার কাছে উঁকি দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে হাত এবং উরুর ঘা প্রায় শুকিয়ে গেছে রাফেলার।

এবং আজ তার একই জেদ, আমার সাথে পানিতে নামবে ও।

ওকে নিয়ে দ্রুত নেমে এলাম আমি, বাঁশঝাড়ের ভেতর ঢুকে পজিশন নিলাম সেই মার্কারের কাছে, শেষবার ডাইভ দিয়ে আমি আর রডরিক যেখান থেকে উঠে গিয়েছিলাম। চৌকো জায়গাটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে ফিরে আসছি আবার, এরই মধ্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নিজের বটলে টোকা মারতে শুরু করল রাফেলা। বাঁশের ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোচ্ছি ওর দিকে।

প্রাচীরের কাছে বাদুড়ের মত পা ওপরে মাথা নিচে করে রয়েছে রাফেলা, প্রবালের একটা ধস এবং মেঝেতে জমে থাকা স্তূপ পরীক্ষা করছে ও। ঝুলে থাকা প্রবালের গাঢ় ছায়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ও, ঠিক কি পরীক্ষা করছে তা একেবারে ওর পাশে না পৌঁছানো পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

প্রাচীরের গায়ে একদিকে কাত হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা, গোল আকৃতির জিনিসটা। নিচের প্রান্তটা প্রবাল স্তূপ আর জলজ উদ্ভিদের ভেতর ঢুকে রয়েছে। বাকি অংশে মৃত প্রবাল জমে পাথর হয়ে গেছে, তার ওপর আবার জীবিত প্রবালেরা বসতি স্থাপন শুরু করেছে। তবু আকৃতির সৌষ্ঠব দেখে বোঝা যায় এটা মানুষের হাতে তৈরি জিনিস-নয় ফুট লম্বা, বিশ ইঞ্চি চওড়া, নিখুঁত গোল। দেখেই চিনতে পেরেছি আমি, উত্তেজনায় ঘাড়ের পেছনে খাড়া হয়ে উঠেছে চুলগুলো। দুই হাত এক করে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে পিস্তল তৈরি করে দেখালাম রাফেলাকে, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রয়েছে ও। দ্রুত আমার স্লেটে লিখলাম-কামান।

প্রচণ্ড বেগে মাথা নেড়ে সমর্থন করল এবার রাফেলা, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার, একগাদা বুদবুদ ছেড়ে বিজয়ের উল্লাস প্রকাশ করল।

ভোরের আলোর নাইন পাউণ্ডার কামান এটা, কিন্তু এর

গায়ের খোদাই করা লেখা বা প্রতীক চিহ্ন পড়ার কোন উপায় নেই, সব হজম করে ফেলেছে প্রবাল। কামানটাকে ঘিরে চারদিকে ঘুরছি, এই সময় প্রাচীরের আরও কাছাকাছি আরেকটা কামান দেখতে পেলাম আমি। প্রথমটার ব্যারেলের নিচে দিয়ে সাঁতার কেটে সেটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি এটার তিন চতুর্থাংশ প্রাচীরের গায়ে ঠেকে আছে, এবং জীবন্ত প্রবালেরা সেটুকু ঢেকে রেখেছে সম্পূর্ণ। বাকি অংশটা পুলের মেঝেতে পড়ে রয়েছে, কিন্তু বিশাল প্রবালের স্তূপে চাপা পড়ে গেছে সেটুকুও।

আরও কাছে পৌঁছে ছ্যাঁৎ করে উঠল কলজে। অনুভব করছি, হার্টবিট বেড়ে গেছে আমার।

ফুলে উঁচু হয়ে থাকা টুকরো প্রবালের স্তূপের ওপর দিয়ে দ্রুত এগোচ্ছি আমি, খুঁজছি কোথা থেকে আবার শুরু হয়েছে অবিচ্ছিন্ন কঠিন প্রবাল এলাকা। বাঁশঝাড় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, ফাঁক দিয়ে এগোচ্ছি আমি। টুকরো প্রবালের স্তূপটার আকার রেলগাড়ির একটা বগির মত। জলজ উদ্ভিদের বড়সড় একটা চাপড়া সরাবার পর দেখতে পেলাম গানপোর্টের ভোঁতা মুখটা, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা কামানের মাস্তুলটাও চিনতে পারছি, তবে গায়ে শক্ত হয়ে এঁটে বসে থাকা প্রবাল ওটার চেহারা বদলে দিয়েছে। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার। ফ্রিগেট ভোরের আলোর সম্পূর্ণ সামনের অংশটা আবিষ্কার করেছি আমরা, মেইন মাস্টের ঠিক পেছন থেকে ভেঙে পুলের এপারে পড়েছে।

এর মধ্যে আমার পাশে চলে এসেছে রাফেলা। প্রচণ্ড উত্তেজনায় অধীর হয়ে হাত দিয়ে আমার কাঁধ খামচে ধরল ও। ঝট করে মাউথপীস সরিয়ে চুমো খেল আমার গলায়। আবার জায়গা মত মাউথপীসটা বসিয়ে নিল ও। ওপরে উঠে যাবার ইঙ্গিত দিলাম ওকে আমি। কিন্তু প্রচণ্ডভাবে মাথা দোলাচ্ছে ও। হাত ছুঁড়ে সরে গেল আমার নাগালের বাইরে, ধরা দেবে না।

অর্থাৎ আবিষ্কারটা ছেড়ে উঠতে চাইছে না ও।

ঝাড়া দশ মিনিট চেষ্টা করার পর রাজি করলাম ওকে। পানির ওপর মাথা তুলে দু'জন একসাথে চেঁচামেচি জুড়ে দিলাম। ওর চেয়ে আমার গলার জোর বেশি, কিন্তু ওরটা আমার চেয়ে তীক্ষ্ণ। অভিযানের নেতা হিসেবে আগে কথা বলার অধিকার আমার, এই বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে আরও কিছু সময় ব্যয় হল। হোয়েলবোটে উঠে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম রডরিকের কাছে।

'ওটা ভোরের আলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রীফ পেরিয়ে এপারে আসার পরপরই কার্গো আর আর্মামেন্টের ভারে সোজা ডুবে গেছে, ভারি একটা পাথরের মতো। প্রাচীরের গা ঘেঁষে পড়ে রয়েছে অংশটা। খোল থেকে খসে পড়েছে একটা কামান। টুকরো প্রবালের নিচে...'

আমাকে বাধা দিয়ে আবার শুরু করল রাফেলা, 'প্রথমে চিনতে পারিনি আমরা। জঞ্জাল, আবর্জনার নিচে রয়েছে কিনা...'

'কোন্ ভঙ্গিতে শুয়ে আছে ও?' প্রথম কথাটাই কাজের কথা রডরিকের।

'উল্টে রয়েছে,' বর্ণনা করলাম আমি, 'ডুবে যাবার সময়...'

'তাহলে তো সমস্যা,' বলল রডরিক। 'গানপোর্ট দিয়ে ভেতরে ঢোকা যাবে?'

এদিক ওদিক মাথা দুলিয়ে বললাম, 'ভাল ভাবে দেখে এসেছি, কিন্তু খোলে ঢোকার কোন রাস্তা পাইনি। গানপোর্টগুলো ঢেকে দিয়েছে প্রবাল।'

'আরও ভাল করে দেখতে হবে। চল যাই,' উৎসাহের সাথে বলে উঠল রাফেলা।

'এক ঘন্টা বিশ্রাম,' বললাম আমি। 'গরম কফি আর চুরুট দরকার এখন।'

আবার ডাইভ দিয়ে বেশিক্ষণ নিচে থাকতে পারলাম না আমরা। রডরিকের সিগন্যাল পেয়ে পানির ওপর মাথা তুলে দেখি

প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে পুলে, রীফ থেকে লাফ দিয়ে নামছে তীব্র গতির স্রোত।

রডরিক আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। খাঁড়ির প্রশান্ত পানিতে পৌঁছে আবার আমরা মুখ খুললাম।

'ব্যাঙ্কের ভল্টের মত নিশ্ছিদ্র খোলটা,' জানালাম ওদেরকে। 'একটা গানপোর্ট জুড়ে রয়েছে কামানটা। আরেকটা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলাম, কিন্তু চার ফুটের বেশি এগোতে পারিনি। বাল্কহেডের একটা অংশ ধসে পড়ে বন্ধ করে রেখেছে পথটা। প্রকাণ্ড পাইথনের মত দেখতে একটা ঈলের আস্তানা এখন ওটা, ওর দাঁতগুলো বুলডগের মত। আমি বেরিয়ে আসছি, এই সময় কোথাও থেকে ফিরছিল ও। ওর সাথে আলোচনা না করেই বুঝে নিয়েছি-আমাদের বন্ধুত্ব হবে না।'

'কোমরের কাছে কোন ফাঁক দেখতে পাওনি?' জানতে চাইল রডরিক।

'নেই,' বললাম ওকে। 'হয়ত ছিল এককালে, কিন্তু প্রবাল সমস্ত ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে দিয়েছে। ভোরের আলো, ধরে নাও, এখন একটা পাথরের তৈরি জাহাজ। ভেতরে ঢুকতে হলে গর্ত করে ঢুকতে হবে, আর কোন উপায় নেই।'

'তাই মনে হচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল রাফেলা, 'কিন্তু এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করলে... বিস্ফোরণে সব কিছু টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না তো?'

'আমরা তো আর অ্যাটম বোমা ব্যবহার করব না,' বলাম ওকে। 'ফরওয়ার্ড গানপোর্টে আধ টুকরো জেলিগনাইট দিয়ে শুরু করব আমরা, শুধু প্রবালের স্তর সরাবার জন্যে তাই যথেষ্ট।' একটু বিরতি নিয়ে রডরিককে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ রাতে আমাদেরকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেন্ট মেরীতে?'

প্রশ্নটা অপমানকর বলে মনে করল রডরিক, তাই উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

মাঝরাতের অনেক পরে সেন্ট মেরীতে পৌঁছুলাম আমরা। গ্র্যাণ্ড হারবারে হোয়েলবোট নোঙর করে উঠে এলাম নির্জন, চন্দ্রালোকিত রাস্তায়।

বেগম রডরিক দরজা খুলে দিল আমাদেরকে। এর আগে তাকে হ্যাট ছাড়া খালি মাথায় দেখিনি। রডরিকের মত তার মাথা কামানো নয় দেখে বিস্মিত হলাম আমি। আর সব ব্যাপারে আশ্চর্য মিল রয়েছে দু'জনের।

কফি খেয়ে বিদায় নিলাম আমরা। পথে পোস্টাফিসের সামনে পিক-আপ দাঁড় করিয়ে নেমে গেলাম আমি। আমার লেটার-বক্সটা অর্ধেক ভরা অবস্থায় পেলাম। কয়েকজন পুরানো চার্টার পার্টি আমার হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে কিনা জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছে, চিঠিগুলোর সাথে একটা টেলিগ্রামও দেখতে পাচ্ছি। খারাপ খবর নিয়ে আসাই স্বভাব এগুলোর, তাই ভয়ে ভয়ে পড়তে শুরু করলাম মেসেজটা।

যা ভেবেছি। কেপ টাউন থেকে আমার বন্ধু জানাচ্ছে, ওখান থেকে ছয়দিন আগে রওনা হয়ে গেছে বুমেরাং।

আসছে সিডনি শেরিডান। যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়ে দ্রুত আসছে সে।

ভোর। সূর্য উঠবে এবার।

'থামলে কেন?' মুখের সামনে হাত রেখে একটা হাই তুলল সোহানা।

বালিশ থেকে মাথা নামিয়ে সোহানার গলায় মুখ ঠেকাল রানা। 'আর পারছি না, সোহানা। ধরে নাও ঘুমিয়ে গেছি আমি।' চোখ বুজল ও।

'না!' আবদারের সুরে বলল সোহানা। 'রাফেলা-রাফেলা বার্ডের কথা আরও বল আমাকে-শুনতে চাই।'

চুপ করে থাকল রানা। সারারাত জেগে ভীষণ ক্লান্ত ও।

আড়মোড়া ভাঙল।
'তোমার প্রথম প্রেম?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সোহানা।
'হ্যাঁ। তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?'
'একটু। কিন্তু তুমি তো জান, এতে আমার কিছু এসে যায় না। আমার প্রাপ্য আমি পেয়েছি তোমার কাছে। যতটা যোগ্যতা, তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। তোমার জীবনে কত মেয়ে এসেছে-সব মেনে নিতে পারি আমি। আসলে ঈর্ষা হচ্ছে না, সত্যি। কিন্তু ভাবছি, কি সুন্দর প্রেম...ওই রাফেলা যদি আমি হতাম, তোমার প্রথম প্রেম যদি আমার সাথে হত-বড় ভাল হত।' তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'এখনও মনে পড়ে ওকে?'
'পড়ে।'
আরও খাদে নেমে গেল সোহানার কণ্ঠস্বর। 'এখনও ভালবাস?'
'বাসি। ওকে নয়।'
পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর জানা আছে সোহানার, তবু করল প্রশ্নটা। 'কাকে?'
হাসল রানা। পাশ ফিরে চোখ মেলল।
'তুমি তা জান।' ধীরে ধীরে রানার একটা হাত জড়িয়ে ধরছে সোহানার ক্ষীণ কটি। 'জানো না?'

মাসুদ রানা

আই লাভ ইউ, ম্যান-৩

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

আজ আরেক শনিবার।
গল্পের তৃতীয় এবং শেষ অংশটুকু শোনাবে আজ রানা। সেই রকমই কথা ছিল।
কিন্তু ভয় পেয়েছে সোহানা। লক্ষ করেছে সে, দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই কেমন যেন বিষণ্ন আর গম্ভীর হয়ে উঠছে রানা। মুখের দিকে তাকানো যায় না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে তার, রানাকে এই অতীত স্মৃতি রোমন্থনে বাধ্য করাটা কি সত্যিই উচিত হল? আশ্চর্য এক কাহিনী জানা যাচ্ছে বটে, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে সে, নতুন করে চিনছে রানাকে, জানছে-কিন্তু গল্পটা বলতে গিয়ে কি যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে রানার মধ্যে, সেটাও তার নজর এড়ায়নি। ওকে কষ্ট দিতে রীতিমত খারাপ লাগছে তার এখন। অথচ শেষ পর্যায়ে এসে এখন...ঠিক কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না সোহানা।
দুপুর দুটো। অফিস ছুটি।
আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে সোহানা। নিজের রুম থেকে রানা বেরুতেই ওকে অনুসরণ করল সে, ধরে ফেলল এলিভেটরের কাছে এসে। 'তোমার সঙ্গে যাচ্ছি আমি,' ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল।
ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তাকে রানা। ধমক খাবার জন্যে মনে

মনে তৈরি হয়ে গেল সোহানা। কিন্তু ওকে বিস্মিত করে দিয়ে মৃদু গলায় রানা শুধু বলল, 'এসো।'

নিচে নেমে লাল ডাটসানে উঠল রানা। পাশের সিটে সোহানা উঠে বসতেই স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। পথে কোন কথা হল না। একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ঢুকে প্রায় নীরবেই লাঞ্চ সারল ওরা।

'কি হয়েছে তোমার, রানা?' খাবার থেকে হঠাৎ মুখ তুলে জানতে চাইল সোহানা।

সোহানার মুখের দিকে তাকাল না রানা। চেহারায় সেই বিষণ্ন ভাবটা রয়েছে এখনও। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কিছু না।'

'ম্লান দেখাচ্ছে তোমাকে। কি যেন ভাবছ।'

'সোহানা,' নিচু গলায় বলল রানা, 'তোমার মনে আছে, গল্পটা তোমাকে শোনাতে চাইনি আমি?'

'আছে।'

'অনেক চেষ্টা করেছিলাম এড়িয়ে যাবার?'

'হ্যাঁ।'

'কেন জানো?'

'কেন?'

'ভয়ে।'

'ভয়ে?' ভুরু কুঁচকে উঠল সোহানার। 'কিসের ভয়?'

জবাব দিল না রানা। গম্ভীর। আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না সোহানা।

লাঞ্চ সেরে সোহানাকে নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে এল রানা। মনে মনে স্থির করেছে, দুপুরেই শুরু করবে আজ, যেমন করে হোক আজই শেষ করতে হবে ওর গল্পটা, তারপর মুছে ফেলতে হবে সবকিছু মনের পর্দা থেকে।

'কফি?' জানতে চাইল সোহানা।

'ইয়েস, থ্যাংকিউ।'

বাড়ির সামনের খোলা বারান্দায় পাশাপাশি বসল ওরা সোফায়। পাশের টিপয়ে কফির কাপ, সামনে সুন্দর সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন, সাজানো ফুলের বেড, শজনে আর কৃষ্ণচূড়ার ডালে ছোট ছোট পাখিদের ব্যস্ততা। রানার একটা হাত তুলে নিল সোহানা নিজের হাতে।

'ভয় কেন, রানা?'

'ভয় লাগে, তার কারণ,' সোহানার হাতে মৃদু চাপ দিল রানা, 'স্মৃতি বড় বেদনাদায়ক, সোহানা। পুরানো সেইসব দিনের কথা আমি স্মরণ করতে চাই না। কিন্তু একবার যখন শুরু করেছি, সব মনে পড়ে যাচ্ছে-এ যেন ঠিক খুঁচিয়ে পুরানো ক্ষতটাকে দগদগে করে তোলা।

রানার চোখেমুখে ব্যথার ছাপ উঠতে দেখে সোহানা বলল, 'তবে না হয়...'

'না, তা হয় না,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রানা। 'শুরু করার পর থেকে প্রতিটা খুঁটিনাটি সব মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। এখন যদি শেষ না করি, তুমি তো কষ্ট পাবেই, নিজেও কষ্ট পাব। শুরু করি তাহলে, কেমন?'

দুই

আসছে সিডনি শেরিডান।

কেপটাউন থেকে ছয় দিন আগে রওনা হয়ে গেছে বুমেরাং। টেলিগ্রাম মেসেজটা পেয়ে ইচ্ছে হল এক্ষুনি ছুটে যাই কুলি পীক-এ, দিগন্তরেখায় চোখ বুলিয়ে দেখি বুমেরাং আসছে কিনা। কিন্তু নিজেকে শান্ত করলাম আমি, টেলিগ্রামটা রাফেলাকে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ফ্রবিশার স্ট্রীটে চলে এলাম।

ঢ্যাঙা গোখলে রামাদীন তার ট্রাভেল এজেন্সির দরজা মাত্র খুলছে, মা এডির দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাবার সময় দেখতে পেলাম। কেনাকাটার একটা তালিকা সহ রাফেলাকে

দোকানে ঢুকিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে এগোচ্ছি আমি। জলকুমারীর ইনশিউরেন্সের টাকা বীমা কোম্পানিতে জমা দেয়নি বলে খুন করতে গিয়েও করিনি রামাদীনকে, এবং সেই থেকে ওর সঙ্গে দেখা নেই আমার।

ডেস্কের পেছনে বসে আছে ও। পরনে হাঙ্গরের চামড়ার স্যুট, নেকটাইয়ের গায়ে নারকেল গাছের সারি, সৈকত এবং দ্বীপবাসিনী এক যুবতীর নকশা ছাপা। ধূর্ত একটা হাসি লেপ্টে রয়েছে ঢ্যাঙার ঠোঁটে, যখন একা থাকে আপনমনে এই হাসিটাই হাসে সে। মাথা নিচু করে একটা পেপার-ওয়েট নাড়াচাড়া করছে, লাল পাথরটার গায়ে সাদা হরফে লেখা রয়েছে-'ভারত মহাসাগরের মুক্তো সেন্ট মেরীতে স্বাগতম'।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে হাসিভরা মুখটা তুলল সে, কিন্তু আমাকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ চেহারাটা রক্তশূন্য হয়ে গেল তার, ঝুলে পড়ল মুখটা। আতঙ্কিত একটা চিৎকার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, পায়ের ধাক্কায় ঠকাঠক নেচে চার হাত দূরে সরে গেল চেয়ারটা। আধপাক ঘুরেই পেছনের দরজার দিকে ছুটল সে। কিন্তু ততক্ষণে আমি ওর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছি। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পিছু হটছে, করুণ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে। ঠোঁট দুটো নড়ছে দ্রুত, ব-ব-ব-ব- শব্দ বেরিয়ে আসছে শুধু। হাঁটুর পেছনে চেয়ারটা ঠেকল, ধপ করে বসে পড়ল তাতে। এতক্ষণে মৃদু হাসলাম আমি। অনুভব করছি, স্বস্তিতে এখন ও জ্ঞান হারাতে পারে।

'কেমন আছ, মিস্টার কবিরাজ?'

উত্তর দিতে চেষ্টা করল ঢ্যাঙা রামাদীন, কিন্তু গলা থেকে ব্-ব্ ছাড়া আর কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। তবে প্রচণ্ড বেগে মাথা নাড়তে দেখে বুঝলাম খুব ভাল আছে সে।

'তোমার কাছে একটু সাহায্য চাইতে এসেছি আমি।'

'জান দিয়ে দেব,' হঠাৎ কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল

ঢ্যাঙা রামাদীন, ফ্রবিশার স্ট্রীটের শেষ মাথা পর্যন্ত যে-কেউ শুনতে পাবে তার এই চিৎকার। 'শুধু মুখ ফুটে উচ্চারণ করুন, এক্ষুনি করে দেব আপনার সব কাজ, স্যার, মিস্টার রানা।'

ধীরে ধীরে শান্ত এবং সুস্থ হয়ে উঠছে রামাদীন, কান পেতে শুনছে তিন বাক্স বিস্ফোরকের জন্যে আমার অনুরোধ। আমি থামার আগেই মাথা নাড়তে শুরু করল সে, বোঝাতে চাইছে আমার এই অনুরোধ রক্ষা করা তার সাধ্যের বাইরে। কোটরাগত চোখ দুটো গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, টুপ টুপ করে ঝরে পড়তে বাকি শুধু। জিভ আর টাকরা সহযোগে হতাশাব্যঞ্জক বিচিত্র শব্দ উৎপাদন করে চলেছে সে।

তার এসব ভাবভঙ্গি দেখেও না দেখার ভান করে আমি বললাম, 'হাতে একেবারেই সময় নেই। বড়জোর কাল দুপুর পর্যন্ত সময় দিতে পারি তোমাকে। ওই সময়ের মধ্যে তিন বাক্স ওই জিনিস চাই আমার। যদি দিতে না পার, তুমি আর আমি ইনশিউরেন্স প্রিমিয়ামের বিষয়টা নিয়ে আবার আলোচনায় বসব...'

দশটা আঙুল খাড়া করে হাত দুটো নেতিবাচক ভঙ্গিতে নাড়ছিল রামাদীন, আমার কথা শেষ হবার আগেই হাত দুটো কোলের ওপর পড়ে স্থির হয়ে গেল। চেহারায় বুদ্ধি এবং সদিচ্ছার ভাব ফুটে উঠল আবার।

'তার কোন প্রয়োজন নেই, স্যার, মিস্টার রানা। আপনি যা চাইছেন তা বোধহয় আমি জোগাড় করে দিতে পারব-কিন্তু, ভয় করছি, বড় বেশি দাম পড়ে যাবে জিনিসগুলোর।'

'কত?'

'এক একটা কেস তিনশো ডলারের কম তো নয়ই,' আমাকে আঁতকে উঠতে না দেখে সম্ভবত ভাবল দামটা কম চাওয়া হয়ে গেছে, তাই দ্রুত সংশোধন করে নিল নিজেকে, বলল, 'আন্দাজে বলছি। পাঁচশো ডলারও হতে পারে।'

‘লিখে রেখো।’ ধারে কিনতে চাইছি আমি।

‘স্যার, মিস্টার রানা!’ কান্না-করুণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ঢ্যাঙা রামাদীন। ‘আমাকে বাঁচতে দিন, প্লীজ! কেউ ধার চাইলে আমি লজ্জায় মরে যাই...’

চুপ করে থাকলাম আমি। কিন্তু পরিবর্তে ভুরু কুঁচকে চোখ দুটো পাকালাম, দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল দুটো উঁচু করলাম এবং গভীর ভাবে বাতাস টেনে ফোলাতে শুরু করলাম বুকটা।

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে!’ ব্যগ্র ব্যস্ততার সঙ্গে দ্রুত বলল রামাদীন। ‘ওসবের কোন দরকার নেই, স্যার, মিস্টার রানা। আপনি আমার সম্মানিত খদ্দের। আপনাকে ধার দেব না তো কাকে দেব? যখন যা দরকার হবে মুখ ফুটে বলবেন শুধু, তাহলেই পেয়ে যাবেন।’ একটু বিরতি নিয়ে মনে মনে বোধহয় যাচাই করল প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কথা বলে ফেলছে কিনা, তারপর একটু হেসে বলল, ‘তাহলে সেই কথাই রইল-আগামীকাল আপনি মালটা ডেলিভারি নেবেন, আর পরশু দিন দাম চুকিয়ে দেবেন।’

‘কে বলেছে পরশু দিন টাকা দেব?’

‘বলেননি?’ বিস্মিত দেখাল রামাদীনকে। ‘তাহলে বোধহয় শুনতে ভুল হয়েছে আমার। ঠিক আছে, তার পরদিন...’

‘এমাসের শেষ তারিখে পাবে,’ জানালাম ওকে। ‘তার আগে চাইলে এক পয়সাও পাবে না।’

‘বেশ তো, তাই হবে। না হয় আরও একমাস পরে দেবেন। আপনি তো আর টাকা মেরে দেবার মানুষ নন...’

‘চমৎকার! লোক তুমি ভালই, রামাদীন। শুধু পেচ্ছাব করে তাতে গড়াগড়ি খাবার একটা বদভ্যাস আছে, এই যা। যাই হোক, অনুরোধ রক্ষার জন্যে ধন্যবাদ।’

‘আপনার কাজ করে আনন্দ পাই, স্যার, মিস্টার রানা,’ আশ্বস্ত করল আমাকে ও। ‘দারুণ আনন্দ পাই।’

‘আর মাত্র একটা অনুরোধ, রামাদীন,’ বললাম ওকে। মনে মনে আঁতকে উঠল ও, টের পেলাম চেহারা দেখে, কিন্তু এক সেকেণ্ডের মধ্যেই অসম সাহসের সঙ্গে মুখে হাসি টানল।

‘আপনার অনুরোধে ঢেঁকি পর্যন্ত গিলতে পারি, স্যার, মিস্টার রানা।’

‘অদূর ভবিষ্যতে সুইটজারল্যাণ্ডের জুরিখে একটা কার্গো পাঠাতে চাই আমি। আমাকে যেন কাস্টমসের ঝামেলায় পড়তে না হয়। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ?’

‘পানির মত, স্যার...’

‘লাশ পাঠাবার অভিজ্ঞতা আছে তোমার?’ জানতে চাইলাম।

চোখ কপালে উঠে গেল রামাদীনের। ‘স্যার, ঠিক কি বলতে চাইছেন...’

‘দ্বীপে বেড়াতে এসে কোন ট্যুরিস্ট যদি, ধরো, হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল, তার লাশটা ফেরত পাঠানো হয় কিনা? যদি হয়, কে পাঠায়?’

‘আমি,’ একগাল হেসে বলল রামাদীন। ‘কার্গো আনা-নেয়ার যাবতীয় বেসরকারী কাজ এই অধমকেই করতে হয়-মড়াকে মানুষ নয়, কার্গো হিসেবেই গণ্য করি আমি।’

‘গুড! তাহলে কিভাবে কি করতে হয় সবই জানা আছে তোমার। একটা কাঠের তৈরি কফিনের ব্যবস্থা করে রাখ আমার জন্যে, ওটা কবে পাঠাতে হবে পরে তোমাকে জানাব আমি।’

‘স্যার, মিস্টার রানা, আমি কি জানতে পারি ঠিক কি জিনিস রফতানি করতে চান আপনি?’

‘তোমার লাশ নয় সেটা।’

‘এটুকু জেনেই আমি সন্তুষ্ট,’ গম্ভীরভাবে বলল রামাদীন।

গাড়ি চালিয়ে দুর্গে চলে এলাম আমি। প্রেসিডেন্টের সেক্রিটারির সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, মাননীয় প্রেসিডেন্ট বৈঠকে বসেছেন, তবে আমি যদি দুপুর একটায় তাঁর অফিসে

লাঞ্চ খেতে আসি তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে।

আমন্ত্রণটা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সময়টা কাটাবার জন্যে। কুলি পীক-এ উঠলাম যতদূর গাড়ি ওঠে, তারপর পায়ে হেঁটে পুরানো লুকআউট এবং সিগন্যাল স্টেশনের ধ্বংসাবশেষের দিকে এগোলাম। প্যারাপেটে বসে চুরুট ধরালাম একটা, দিগন্ত বিস্তৃত মহাসাগর আর সবুজ দ্বীপমালিকা দেখছি। এই সুযোগে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আর কর্ম পদ্ধতিগুলো খুঁটিয়ে আরেকবার বিশ্লেষণ করে নিচ্ছি।

ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি আমি, জীবনের কাছ থেকে আপাতত তিনটে জিনিস চাওয়ার আছে আমার। দু'নাম্বার জলকুমারী, রাফেলা এবং দ্বীপবাসীদের ভালবাসা। দ্বীপবাসীরা এমনিতেই যথেষ্ট ভালবাসে আমাকে, কিন্তু সেই ভালবাসা যদি হারাতে না চাই তাহলে দ্বীপের একটা উপকার করতে হবে আমাকে এবং বড় ধরনের একটা মহত্ত্বের পরিচয় দিতে হবে। দু'নাম্বার জলকুমারী পেতে হলে প্রচুর নগদ টাকার দরকার হবে আমার। আর রাফেলা বার্ডকে পেতে হলে...এইখানে এসে হোঁচট খেল আমার চিন্তা। অনেকক্ষণ দুশ্চিন্তায় কাটালাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে তা অনুমান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলাম আমি। 'সাহসে বুক বাঁধো, রানা,' নিজেকে পরামর্শ দিয়ে ফেলে দিলাম চুরুটটা। ফেরার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

গাড়ি নিয়ে দুর্গে ফিরে আসতেই সেক্রেটারি আমাকে জানাল মাননীয় প্রেসিডেন্ট আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন প্রেসিডেন্ট, অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে রিসেপশনে বেরিয়ে এসেছেন তিনি, আমার কাঁধে একটা হাত তুলে দেবার জন্যে পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে নাগাল পাবার চেষ্টা করছেন। তাঁকে সম্মান দেখিয়ে একদিকের কাঁধ যথাসম্ভব নিচু আর কাত করে রাখলাম আমি। তিনি আমাকে তাঁর অফিসে নিয়ে এলেন।

রুচিসম্মতভাবে সাজানো অফিস কামরাটা বিশাল একটা হলরুমের মত। সিলিং থেকে ঝুলছে ঝাড়বাতি, দেয়ালে হাতির দাঁতের মোটা ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো ধোঁয়াটে তৈলচিত্র এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য। কাঁচের ডিম্বাকৃতি জানালাগুলো মেঝে থেকে উঠে সিলিং ছুঁয়েছে, সামনে দাঁড়ালে বন্দরটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। কামরার মেঝেটা ইরানী কার্পেটে মোড়া।

জানালার সামনে ওক কাঠের কনফারেন্স টেবিলে সাজানো হল রাজকীয় লাঞ্চ। খেয়ে নয়, খাইয়ে তৃপ্তি পাবার দলে পড়েন মাননীয় প্রেসিডেন্ট-সুতরাং আমার কোন প্রতিবাদে কান না দিয়ে অত্যাচারের স্টীম-রোলার চালিয়ে গেলেন তিনি। তিনজনের খাবার একা খেয়ে যখন শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে, তখন সবিনয়ে ক্ষমা চাইলাম আমি।

স্নেহ মাখা হাসির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আমাকে রেহাই দিলেন। বললেন, 'এবার, লক্ষ্মী ছেলে, বল দেখি, তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি।' বললাম।

বাড়ি ফিরে একটা চিরকুট পেলাম রাফেলার, বেগম রডরিকের সঙ্গে দেখা করতে গেছে সে। ঠাণ্ডা একটা বিয়ার নিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসলাম আমি। প্রেসিডেন্ট পিডলের সঙ্গে আমার আলোচনাটা আদ্যোপান্ত স্মরণ করলাম আরেকবার।

কোথাও কোন খুঁত নেই, ভাবলাম আমি। সম্ভাব্য সব রকম পরিস্থিতির কথা মনে রেখে সমস্ত ফুটো বন্ধ করতে পেরেছি আমি-শুধু একটা ছাড়া, গা বাঁচাবার জন্যে দরকার হলে ওটা ব্যবহার করব আমি।

মেইন ল্যাণ্ড থেকে রামাদীন'স ট্রাভেল এজিন্সির ঠিকানায় বেলা দশটার প্লেনে তিনটে কাঠের বাক্স এসে পৌঁছুল, সেগুলোর গায়ে রঙ দিয়ে লেখা-'টিনজাত মাছ। নরওয়ের পণ্য'।

টার্টল বে-তে ডেলিভারি নিলাম বাক্সগুলো। পিকআপের পেছনে তুলে ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে রাখলাম।

'মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত, তাহলে,' বিদায় নেবার আগে স্মরণ করিয়ে দিল আমাকে ঢ্যাঙা রামাদীন, 'স্যার, মিস্টার রানা। আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না, আমিই ঠিক সময়ে এসে হাজির হব।'

'কাবলিওয়ালার মত? না, তার দরকার নেই। টাকাটা আমিই তোমাকে দিয়ে আসব-সময় হলে।'

ঢোক গিলে কি যেন বলতে গিয়েও বলা উচিত হবে না ভেবে নিঃশব্দে বিদায় নিল রামাদীন।

প্রয়োজনীয় সব জিনিস ইতিমধ্যে প্যাক করে ফেলেছে রাফেলা। আমার একটা পুরানো শার্ট আর রঙ চটা জিনস পরেছে ও, ঢোলা আর হাস্যকর দেখাচ্ছে। প্যাক করা জিনিসপত্রের বাক্সগুলো গাড়িতে তুলতে সাহায্য করলাম ওকে আমি। তারপর উঠে বসলাম পিকআপে।

'এপথে আবার ধনী হয়ে ফিরে আসব আমরা,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে আশ্বস্ত করলাম রাফেলাকে।

নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে পাইনগাছের নিচে মেইন রোডে বেরিয়ে এলাম আমরা, তারপর বাঁক নিয়ে উঠতে শুরু করলাম পাহাড় সারির দিকে।

পাহাড়ের গা বেয়ে পেঁচানো পথ ধরে শহর আর বন্দরের মাথায় উঠে এসেছি, এই সময় প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'গড ড্যাম ইট!' সেই সঙ্গে অকস্মাৎ ব্রেক কষলাম। রাস্তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঘষা খেয়ে পিছলে গেল গাড়ির চাকা, পেছনের পাইনঅ্যাপলের ট্রাকটা সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে দ্রুত নেমে পড়ছে রাস্তা থেকে। ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ট্রাকটা, জানালা দিয়ে গলা বের করা ড্রাইভারের অগ্নিমূর্তি দেখতে পেলাম পলকের জন্যে।

ড্যাশবোর্ডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রাফেলা, নিজেকে সিধে করে নেয়ার সময় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কি, কি হয়েছে?'

দিনটা মেঘমুক্ত উজ্জ্বল-বাতাস এত স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার যে ছবির মতো লাগছে আশ্চর্য সুন্দর সাদা আর নীল ইয়টটাকে। গ্র্যাণ্ড হারবারের প্রবেশ মুখে মেইল শিপ এবং প্রমোদতরীর জন্যে নির্ধারিত এলাকায় নোঙর ফেলে বসে আছে ওটা।

ইয়টের গায়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে রঙচঙে অসংখ্য সিগন্যাল ফ্ল্যাগ। সাদা স্যুট পরা ক্রুরা রেইল ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে তীরের দিকে। পানি কেটে ইয়টের দিকে ছুটছে হারবার টেণ্ডার, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হারবার মাস্টার, কাস্টমস ইন্সপেক্টর এবং ডাক্তার ডানিয়েলকে।

'বুমেরাং?' জানতে চাইল রাফেলা।

'বুমেরাং এবং সিডনি শেরিডান,' জানালাম ওকে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত নিচে নামছি আবার।

'কি করবে তুমি এখন?' জানতে চাইল রাফেলা।

'আর যাই করি, ওরা যখন তীরে উঠবে আমি তখন সেন্ট মেরীতে থাকছি না।'

পাহাড় থেকে নেমে প্রথম বাসস্টপের কাছে গাড়ি দাঁড় করালাম আমি। রাফেলাকে গাড়িতে রেখে কনফেকশনারি অ্যাণ্ড জেনারেল স্টোরে গিয়ে উঠলাম। ব্যবসাটা রডরিকের এক মামার। আমাকে দেখে কোন প্রশ্ন করল না সে, ঘাড় নেড়ে ভেতরের কামরায় যাবার অনুমতি দিল। শুধু ফোন করার প্রয়োজন হলেই এখানে আসি আমি।

রডরিকের নিজের ফোন নেই, কিন্তু পাশের বাড়িতে আছে। আমার কণ্ঠস্বর শুনে রডরিককে ডেকে আনল তারা।

'রডরিক,' ওকে বললাম আমি, 'মেইল শিপ মুরিংয়ে ওই ভাসমান ব্রথেলটা আমাদের জন্যে কোন সুখবর বয়ে নিয়ে আসেনি।'

আমি কি বলতে চাইছি তা বুঝতে এক সেকেণ্ডের বেশি লাগল না রডরিকের। সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল সে, 'বলে দাও কি করতে হবে।'

'ছুট লাগাও। পানির ক্যানগুলো স্ট্যাম্প নেট দিয়ে ঢেকে ফেল, যেন মাছ ধরতে যাচ্ছ। সাগরে বেরিয়ে এসে ঘুরপথে চলে এসো টার্টল বে-তে। সৈকত থেকে মালপত্তর তুলব আমরা হোয়েলবোটে। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে রওনা দেব গানফায়ার রীফের দিকে।'

'দু'ঘন্টার মধ্যে বে-তে পৌঁছাচ্ছি,' বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে।

দু'ঘন্টা নয়, এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল রডরিক। ওর এই সময় জ্ঞানের জন্যে ভালবাসি ওকে আমি। সময় উল্লেখ করে আসবে বলে যদি কথা দেয়, ওর কথার ওপর সারা জীবনের সঞ্চয় বাজি ধরা যায়।

সূর্য ডোবার পর অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা। হোয়েলবোট নিয়ে যখন রওনা দিলাম তখন একশো গজ দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। টার্টল বে থেকে বেরিয়ে দ্বীপ থেকে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে এসেছি, এই সময় চাঁদ উঠল আকাশে।

তারপুলিনের নিচে রাখা একটা জেলিগনাইটের বাক্সের ওপর বসে রাফেলা আর আমি বুমেরাংয়ের উদয় সম্পর্কে আলোচনা করছি।

'সিডনি শেরিডান কি করবে এখন?' জানতে চাইছে রাফেলা।

'পকেট ভর্তি টাকা দিয়ে তার ছেলেছোকরাদেরকে তথ্য সংগ্রহের জন্যে পাঠাবে,' বললাম আমি। 'দোকান এবং বারগুলোয় ঢুকে পশ্ন করবে ওরা-কেউ মাসুদ রানাকে দেখেছ?'

'উত্তরে কি বলবে সবাই?'

'উত্তর দেবার জন্যে লাইন দেবে দ্বীপবাসীরা,' বললাম আমি। 'প্রথমে ওরা দুঃখের সঙ্গে জলকুমারীর দুর্ভাগ্য বর্ণনা করবে।

তারপর বলবে, বেচারা মাসুদ রানা তার ক্রু রডরিকের হোয়েলবোট ভাড়া নিয়ে সী-শেল খোঁজার জন্যে ডাইভ দিয়ে বেড়ায় এখন। এর মধ্যে কেউ একজন ওদেরকে ঢ্যাঙা রামাদীনের কাছে যেতে বলবে আরও তথ্যের জন্যে। এবং ঢ্যাঙা রামাদীনকে ওরা যদি যথেষ্ট সালামী দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে, গড় গড় করে বলে দেবে সে।'

'এরপর কি করবে সিডনি শেরিডান?'

'সেভার্নে ডুবে আমি মারা যাইনি বুঝতে পেরে হার্টে একটু ব্যথা অনুভব করতে পারে সে। ব্যথাটা কমলে টার্টল বে-তে আমার আস্তানা সার্চ করার জন্যে লোক পাঠাবে। ওখানে মস্ত একটা শূন্যতা ছাড়া কিছুই পাবে না সে। এরপর প্রিয়তমা লোরনা পেজ তাকে পথ দেখিয়ে বিগ গাল আইল্যাণ্ডের জলসীমায় নিয়ে যাবে, মুঘল সম্রাটদের ব্যাঘ্র-সিংহাসন উদ্ধারের আশায়। ওখানে দুটো দিন কাটবে ওদের। তারপর বুঝতে পারবে ভোরের আলোর বেলটা ছাড়া ওখানে কিছু ছিল না এবং নেই।'

'তারপর?'

'তারপর? তারপর সম্ভবত উম্মাদ হয়ে উঠবে সিডনি। সম্ভবত প্রিয়তমাকে কিছু নির্যাতনও সইতে হতে পারে। এরপর ঠিক কি ঘটবে, আমি জানি না। শুধু জানি, চোখের আড়ালে থেকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কর্নেল গুডচাইল্ডের শখের ধন-সম্পদ উদ্ধার করতে হবে আমাদেরকে।'

পরদিন স্রোতের মতিগতি সুবিধের না হওয়ায় সকালের শেষ ভাগের আগে চ্যানেলে ঢুকতে পারা গেল না। এই সময়টুকু হাতে পেয়ে সুবিধেই হল, প্রস্তুতিপর্বের কিছু কাজ বাকি ছিল, সেগুলো সেরে নিতে পারলাম আমরা।

জেলিগনাইটের বাক্স খুলে দশটা হলুদ স্টিক বের করে নিলাম আমি। বাক্সটা বন্ধ করে বাকি দুটোর সঙ্গে, ক্যাম্পের কাছ থেকে

যথেষ্ট দূরে, বেলেমাটির নিচে পুঁতে রাখলাম। এরপর রডরিককে বিস্ফোরক সরঞ্জামগুলো সাজিয়ে এবং চেক করে নিতে বললাম।

এটা-সেটা দিয়ে হাতে তৈরি একটা ব্যবস্থা, কিন্তু এর সাহায্যে অনেকবার বিস্ফোরণ ঘটাতে সফল হয়েছি আমরা। সরঞ্জাম বলতে সাধারণ একটা সুইচবক্সের ভেতর নাইনভোল্টের দুটো ট্রানজিস্টার ব্যাটারি, চার রীল হালকা ইনসুলেটেড কপার অয়্যার এবং চুরুটের একটা বাক্স ভর্তি ডিটোনেটর। প্রতিটি সিলভার টিউব যত্ন এবং সতর্কতার সঙ্গে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে। বাক্সে বাছাই করা কিছু পেন্সিল আকৃতির টাইম ডিলেড ডিটোনেটরও রয়েছে।

এগুলো নিয়ে কাজ করার সময় রাফেলা আর ল্যাম্পনিকে সরিয়ে দিলাম আমরা। ইলেকট্রিক ডিটোনেটরগুলো হাতে তৈরি টার্মিনালে বেঁধে আটকে নিলাম অত্যন্ত সাবধানে।

শক্তিশালী বিস্ফোরক ব্যবহার করার নিয়মটা পানির মত সহজ, কিন্তু একজন বুদ্ধিমান লোক যখন জিনিসটা ব্যবহার করতে যায় তখন তার স্নায়ুর ওপর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করে। এমন কি এক নাম্বারের একটা গাধাও তারের সংযোগ ঘটিয়ে বোতামে চাপ দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এর কাছ থেকে ষোলো আনা কাজ নিপুণভাবে আদায় করার কৌশল রপ্ত করা অত সহজ নয়। নিখুঁত বিস্ফোরণ ঘটানো সাংঘাতিক কঠিন কাজ, তাই এটা একটা শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আধ-বাক্স জেলিগনাইটের বিস্ফোরণ হজম করে মাঝারী আকারের একটা গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমি। গাছটা তার সব পাতা আর উল্টোদিকের কিছু ছাল হারিয়েছিল শুধু। কিন্তু মাত্র একটা স্টিকের অর্ধেকটা দিয়ে ওই গাছটাকেই আমি রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ভঙ্গিতে ধরাশায়ী করতে পারি, তাতে যানবাহন চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়বে রাস্তাটা। শুধু

তাই নয়, গাছটা থেকে একটা পাতাও খসবে না। ঠাট্টা বা গর্ব করছি না, এ ব্যাপারে নিজেকে আমি একজন শিল্পী বলে মনে করি। এ ব্যাপারে যতটুকু জানি আমি, তার সবটুকু শিখিয়েছি রডরিককে। বিস্ফোরক দ্রব্যের ওপর ওর দুর্বলতা জন্মগত, কিন্তু কায়দা কানুন যতই শেখাই, শিল্পী ও কোনদিনও হতে পারবে না। গোটা ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে নেয় ও, মজার একটা বিষয় বলে মনে করে। ডিটোনেটর নিয়ে কাজ করার সময় আনন্দে প্রলাপ বকতে শুরু করে দেয়।

দুপুরের খানিক আগে পুলে ঢুকে পজিশন নিলাম আমরা। পানিতে আমি একা নামলাম, সঙ্গে নিলাম শুধু একটা নেমরড এয়ার স্পিয়ার গান। স্পিয়ার গানের মাথার দিকটা আমার নিজের ডিজাইনে তৈরি। শেষ প্রান্তটা সূচের মত ছুঁচালো, এবং প্রথম ছয় ইঞ্চি সরু ইস্পাতের কাঁটায় ভর্তি। তীক্ষ্ণ-মুখো মোট চব্বিশটা খুদে কাঁটা রয়েছে ওখানে, ওগুলোর পেছনে ক্রস-চিহ্নের ভঙ্গিতে আটকানো হয়েছে একটা চার ইঞ্চি লম্বা ইস্পাতের রড, যাতে আমি যখন স্পিয়ার গানের অপর প্রান্তটা ধরে থাকব তখন যেন আহত প্রাণীটা পিছলে এসে আমাকে আঘাত করতে না পারে। গানের সঙ্গে রয়েছে পাঁচশো পাউণ্ড টেস্টের নীল নাইলনের লাইন, এই লাইনের একটা বিশ ফুট লম্বা লুপ রয়েছে ব্যারেলের নিচে।

ফিন পরা পা দিয়ে প্যাডেল করে নেমে এলাম বেঢপ ভাবে ফুলে থাকা ভোরের আলোর খোলের কাছে। গানপোর্টের পাশে এক জায়গায় দাঁড়ালাম আমি, চোখে অন্ধকার সইয়ে নেবার জন্যে পাতা দুটো বুঁজে থাকলাম কয়েক সেকেণ্ড।

চোখ খুলে সাবধানে উঁকি দিয়ে তাকালাম চারকোণা অন্ধকার গহ্বরটার ভেতর, আমার সামনে বাড়িয়ে ধরেছি স্পিয়ার গানের ব্যারেলটা।

মস্ত চাকার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে গানপোর্টের ভেতর মোরে ঈলটা-কালো, চকচকে আর পিচ্ছিল দেখাচ্ছে তাকে।

আমার সাড়া পেয়ে নড়ে উঠল সে, প্যাঁচ ছাড়াচ্ছে শরীরের। হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে পিছিয়ে যাচ্ছে, ভীতিকর অসমান হলুদ দাঁতগুলো বের করে ভয় দেখাচ্ছে আমাকে। তার চোখ দুটো কালো আর উজ্জ্বল, অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মত জ্বলজ্বল করছে।

সাপের মত ঈল মাছটা আমার ঊরুর সমান চওড়া, লম্বায় সাত ফুটের কম না। দাঁত বের করে আক্রমণের হুমকি দিচ্ছে যখন, তার ডরসাল ফিনের ঢেউখেলানো ঝুঁটি শক্ত আর খাড়া হয়ে উঠছে প্রচণ্ড রাগে।

ইতিমধ্যে গানপোর্টের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে চারকোণা মুখের সামনে দাঁড়িয়েছি আমি। সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছি, কিন্তু মাথাটা আরেকটু তুলে একদিকে সামান্য একটু না ঘোরানো পর্যন্ত বারবার ঢোক গিলে অপেক্ষা করছি আমি। গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে আমার। মাত্র একটা শট ছুঁড়তে পারব আমি, সেটা যদি জায়গা মতো লেগে ওটাকে কাবু করতে না পারে, এক নিমেষে উড়ে চলে আসবে আমার দিকে। ছোবল মেরে ডিঙি নৌকার কাঠের কিনারা দাঁত দিয়ে কামড়ে ভেঙে ফেলতে দেখেছি আমি আহত একটা মোরে ঈলকে। ওর ওই ধারাল দাঁত রাবার স্যুট আর মাংস ছিঁড়ে অনায়াসে পৌঁছে যাবে হাড়ের কাছে।

মন্থর ছন্দে দুলছে মাছটা, ফণা তোলা কেউটের মত। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখছে আমার হাবভাব। লক্ষ্যভেদ করার জন্যে দূরত্বটা আরও কমিয়ে আনতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু একবার যখন ওর চোখে পড়ে গেছি, ওর দিকে এগোবার চেষ্টা করা স্রেফ বোকামি হবে এখন।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। আক্রমণের দ্বিতীয় লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখলাম ওর মধ্যে। গলাটা অকস্মাৎ ফুলিয়ে মাথাটা সামান্য একটু ঘোরাল ও, ফলে

মুখের একটা পাশ দেখতে পেলাম এতক্ষণে আমি।

বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে, তার কারণ এর আগে একবার মাত্র খেলাচ্ছলে অস্ত্রটা ব্যবহার করেছি আমি। ট্রিগার টেনে ধরতেই প্রচণ্ড হিস্‌স্‌ করে উঠল গ্যাস, সশব্দে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে গেল প্লাঞ্জারটা, ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে দিল স্পিয়ারটাকে। লম্বা একটা রেখা তৈরি করে ছুটছে স্পিয়ার, চাবুকের মত দুলছে পেছনে লাইনটা।

মাছটার খুলির একটু পেছনে কান আকৃতির কালো একটা দাগের ওপর লক্ষ্য স্থির করেছি, লক্ষ্যভেদ করলাম দুই ইঞ্চি ডান দিক ঘেঁষে, দেড় ইঞ্চি ওপরে। কেউ যেন বোতামে চাপ দিয়ে ইলেকট্রিক চরকিটাকে ঘুরিয়ে দিল, বিদ্যুৎগতিতে কয়েকবার পাক খেল মোরে ঈল। মোচড় খেয়ে লম্বা শরীরটা কয়েক জায়গায় গোল রিঙ-এর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল, রিঙগুলো চোখের পলকে ছুটোছুটি করছে গোটা গানপোর্ট জুড়ে। গানটা ফেলে ফিন দিয়ে পেডাল মেরে সামনে এগোলাম দ্রুত। চঞ্চলভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে স্পিয়ারের হাতলটা, কয়েকবার চেষ্টা করে সেটাকে মুঠোয় ধরতে পারলাম আমি। কাঁটা বসানো স্পিয়ারের মাথার সঙ্গে মোটা চামড়া আর রাবারের মত পেশী আটকে গেছে-হাতল ধরে পিছিয়ে আসছি আমি, টেনে বের করে আনছি ওকে ওর আশ্রয় থেকে।

নিঃশব্দ আক্রোশে মুখ হাঁ করে রয়েছে ঈলটা, রিঙ-এর জট খুলে গেল, প্রচণ্ড আক্ষেপে মোচড় খাচ্ছে শরীরটা ঝড়ে পড়া একটা যুদ্ধ জাহাজের মত।

মাথাটা সরিয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই প্রচণ্ড একটা ঝাপটা খেলাম লেজের, ধাক্কা লেগে মুখ থেকে সরে গেল মাস্কটা। নাক এবং চোখে পানি ঢুকে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড কিছুই দেখতে পেলাম না। মাথা ঝাঁকাচ্ছি। ঈলটা প্রচণ্ড শক্তিতে আছাড় খাচ্ছে এলোপাতাড়ি ভাবে। স্পিয়ারের হাতলটা ছিটকে

বেরিয়ে যেতে চাইছে মুঠো থেকে। এক হাতে মাস্কটা আবার জায়গা মত বসিয়ে নিয়ে ওপর দিকে উঠে আসতে চেষ্টা করছি আমি। কোন বাধাই পাচ্ছি না, আমার সঙ্গে সঙ্গে স্পিয়ারের কাঁটাবহুল মাথায় আটকে থাকা ঈলটা দিব্যি উঠে আসছে। দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসছে আমার। এই সময় দেখলাম ঈলটা অদ্ভুত এক মোচড় দিয়ে পেছন দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে তার মাথা, ভীতিকর হাঁ করা মুখের ভেতর স্পিয়ারের ধাতব অংশটা নিয়ে চোয়াল দুটো বন্ধ করছে। ইস্পাতের গায়ে দাঁত ঘষা খাওয়ার শব্দ পাচ্ছি আমি। পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে ইস্পাতের রডটা, আবার খপ করে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে নিচ্ছে সেটা। কামড়ে ধরা জায়গাগুলোর ছাল উঠে গেছে, উজ্জ্বল রূপালী দাগ ফুটে উঠেছে।

আমার শিকারটা উঁচু করে ধরে পানির ওপর ভেসে উঠলাম আমি। সাপের মত সামুদ্রিক দানবটাকে পানির ওপর মোচড় খেতে আর আড়মোড়া ভাঙতে দেখে আতঙ্কে তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল রাফেলার গলা থেকে। কিন্তু আনন্দে আর আহ্লাদে আটখানা হল রডরিক।

'বাপজানের কাছে চলে এসো,' লোভে চকচক করে উঠল রডরিকের চোখ দুটো, ঝুঁকে পড়ে স্পিয়ারটা ধরে হোয়েলবোটে তুলে নিল ঈলটাকে ও। মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে উল্টে যাচ্ছে, বুলডগের মত কুৎসিত দেখাচ্ছে চেহারাটা-ওর সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য এই মোরে ঈল। গানের সঙ্গে বাইন মাছটার ঘাড় চেপে রেখে বেইট নাইফ দিয়ে নিপুণভাবে বিশাল দানবটার ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা করে ফেলল ও, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল সেটা।

'মিস রাফেলা, ম্যাডাম,' অত্যন্ত সম্মান দেখিয়ে বলল রডরিক, 'আপনিই প্রথম এ স্বাদ গ্রহণ করবেন। জীবনে ভুলতে পারবেন না।'

'মাগো!' শিউরে উঠল রাফেলা। রক্তাক্ত বীভৎস প্রাণীটার কাছ থেকে আরও একটু পিছিয়ে গেল সে।

'আর দেরি নয়, জেলিগনাইট নিয়ে এসো,' তাড়া দিলাম আমি।

ক্যারি-নেটটা ধরিয়ে দিল আমার হাতে ল্যাম্পনি। ইনসুলেটেড রীল হাতে নিয়ে পানিতে নামল রাফেলা, নিচে নামার সময় তার ছাড়ছে ও।

সোজা গানপোর্টের কাছে নেমে এলাম আমি। ভেতরে ঢুকে জায়গাটা আরেকবার পরীক্ষা করে নিলাম। পেছনের প্রবাল টুকরোর স্তূপের সঙ্গে শক্তভাবে আটকে গেছে কামানের ব্রীচ। বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে দুটো জায়গা বেছে নিলাম আমি। ধাক্কা খাইয়ে একপাশে সরিয়ে দিতে চাই কামানটাকে, চাই প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ির মত ঘা মেরে প্রবালের সঙ্গে জমাট বেঁধে আটকে যাওয়া একটা প্ল্যাঙ্ক ভেঙে ফেলুক। একই সঙ্গে প্রবাল জঞ্জালের প্রাচীরটা ভাঙবে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ, গানডেকে ঢোকার পথটা উন্মুক্ত হয়ে যাবে তাতে।

জেলিগনাইটের টুকরো দুটো দু'জায়গায় শক্তভাবে বেঁধে দিলাম তার দিয়ে। রাফেলার কাছ থেকে লাইনের শেষ প্রান্ত নিয়ে সাইড কাটার দিয়ে চেঁছে কপার অয়্যার বের করলাম, সেটা আটকে দিলাম টার্মিনালের সঙ্গে।

সব ঠিক আছে কিনা খুঁটিয়ে আরেকবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এলাম গানপোর্ট থেকে খোলের ওপর। পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে রাফেলা, কোলের ওপর পড়ে রয়েছে রীলটা। ফেলে রাখা স্পিয়ার গানটা তুলে নিয়ে সিগন্যাল দিলাম ওকে। উঠতে শুরু করলাম আমরা।

হোয়েলবোটে উঠে এসে দেখি একটা খেলনার মত ব্যাটারি সুইচবক্স নিয়ে গলুইয়ে বসে আছে রডরিক। ইতিমধ্যে তার সংযোগের কাজও সেরে ফেলেছে ও। এখন আরও কদর্য দেখাচ্ছে ওকে, তার মানে বিস্ফোরণ ঘটাবার এই সুযোগটাকে ঈল মাছ খেতে পাওয়ার চেয়েও বেশি আনন্দদায়ক বলে মনে

করছে ও। এখন যদি সুইচবক্স ছেড়ে উঠে আসতে বলি ওকে, কোন সন্দেহ নেই, আমার সঙ্গে মারামারি বাধিয়ে দিতেও দ্বিধা করবে না ও।

'দিই ফাটিয়ে, মাসুদ?'

'দাও,' মৃদু কণ্ঠে বললাম ওকে। কিন্তু যা ভেবেছি, তাই। একচুল নড়ছে না রডরিক, মুখে অদ্ভুত এক হাসি নিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুইচবক্সের বোতামটার দিকে। তারপর বোতামটার গায়ে একটা কালো মোটা আঙুলের ডগা ছোঁয়াল সে। আঙুলটা আলতোভাবে বোতামের গায়ে বুলাচ্ছে। তার এই আদরের ঘটা দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি, এবং বিরক্তি প্রকাশ করে কোন লাভ নেই জেনে চুপ করে আছি, অপচয় হতে দিচ্ছি কয়েকটা মূল্যবান সেকেণ্ড।

শেষ পর্যন্ত ঝোঁকটা সামলাতে পারল না রডরিক, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল বোতামটা।

অকস্মাৎ মাথাচাড়া দিয়ে কেঁপে উঠল পুলের পানি, ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল হোয়েলবোট। কিছুক্ষণ পর রাশ রাশ বুদবুদ ভেসে উঠল পানির ওপর। 'স্যুটের ট্রাউজারটাও এবার পরে নাও, রাফেলা,' ওকে বললাম আমি।

'কেন?' তর্ক জুড়ে দিল ও। 'তোমার কি ধারণা বিস্ফোরণের ফলে পানি গরম হয়ে গেছে?'

দস্তানা এবং জুতোও পরতে হবে,' রাবারের ফুল প্যান্টটা নিজের পায়ে গলিয়ে নিয়ে আবার বললাম ওকে। 'খোলটা যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, এবারের ডাইভেই ভেতরে ঢুকব আমরা। চোখা কিছুর সঙ্গে ঘষা লাগতে পারে, তাই সাবধান হবার দরকার আছে।'

তর্ক করার পুরোপুরি ইচ্ছে থাকলেও হাতে কোন যুক্তি নেই দেখে অবশেষে আমার কথা মেনে নিল রাফেলা। সামনে একরাশ কাজের বোঝা দেখতে পাচ্ছি আমি-ওকে ট্রেনিং দিয়ে আমার ঘর

করার উপযুক্ত করে তুলতে বেশ সময় লাগবে, ভাবলাম।

আণ্ডারওয়াটার টর্চ জেনি বার আর হালকা নাইলনের এক কয়েল লাইন চেয়ে নিলাম ল্যাম্পনির কাছ থেকে। ওদিকে টাইট রাবার প্যান্টটা টানাটানি করে ওপরে তুলতে হিমশিম খাচ্ছে রাফেলা। শেষপর্যন্ত হার মানল ও, অসহায়ভাবে তাকাল ল্যাম্পনির দিকে। বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের মত এগিয়ে এসে ওকে সাহায্য করছে ল্যাম্পনি। কাজটা শেষ হতেই বোতাম আটকে নিল রাফেলা, আমার দিকে ফিরে বলল, 'রেডি।'

পানিতে নেমে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছি, এই সময় ঝাপসা নীল গভীরে চিৎ হয়ে ভেসে থাকা প্রথম মরা মাছের দেখা পেলাম আমরা। বিস্ফোরণে কয়েক হাজার মাছ হয় মারা গেছে, নয়ত অবশ অচেতন হয়ে গেছে, এদের মধ্যে রয়েছে কড়ে আঙুলের সমান চুনো থেকে শুরু করে দুই হাত লম্বা ডোরাকাটা স্ন্যাপার আর রীফ-ব্যাস। হত্যাযজ্ঞের নমুনা দেখে বিষাদে ভরে উঠল মনটা, কিন্তু নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে যত মাছ মেরেছি তা একটা ব্লুফিন টানির একদিনের খোরাকও নয়।

ঝাঁক ঝাঁক মরা মাছের ভেতর দিয়ে নামছি আমরা, অন্ধকার রাতের আকাশে নিস্প্রভ তারার মত চারদিকে হঠাৎ জ্বলে উঠছে মাছদের চোখ। পুলের তলাটা বালু-কণা আর অন্যান্য জঞ্জালের গুঁড়োয় ঘোলা দেখাচ্ছে। বাঁশঝাড়ের মাথার এক জায়গায় গভীর একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে বিস্ফোরণের ফলে, সেটার ভেতর দিয়ে নামছি আমরা।

নজর বুলিয়েই বুঝলাম যা চেয়েছিলাম তাই ঘটেছে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় খোল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে কামানটা, গানপোর্টের প্রাচীন চোয়াল থেকে পোকায় খাওয়া দাঁতটা সম্পূর্ণ উপড়ে নিয়েছে। ছিটকে এসে কামানটা পুলের মেঝেতে পড়েছে সঙ্গে করে নিয়ে আসা প্রবাল জঞ্জালের মাঝখানে।

গানপোর্টের ওপরের ঠোঁট ভেঙে যাওয়ায় গর্তটা আরও বড়

হয়েছে, একজন মানুষ ওখানে এখন সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারবে। গর্তটার ওদিকে টর্চের আলো ফেললাম, কিন্তু ভাসমান জঞ্জালের গুঁড়ো আর বালুকণা ভর্তি ঘোলা পানিতে দৃষ্টি চলে না। এই ময়লা থিতিয়ে পড়তে আরও সময় নেবে। কিন্তু অতক্ষণ ধৈর্য ধরতে রাজি নই আমি। খোলের মাথায় বসে সময় আর এয়ার রিজার্ভের হিসেব মেলাচ্ছি। এর আগে দু'বার ডাইভ দেয়ায় এবার ডি-কমপ্রেশনের জন্যে অতিরিক্ত সময় দিতে হবে আমাদেরকে, সে-কথা মনে রেখে সিদ্ধান্ত নিলাম, হাতে আমাদের এখনও নিরাপদ সতেরো মিনিট সময় রয়েছে। রিস্টওয়াচের সুইভেল রিঙটা সেট করে ভোরের আলোর ভেতরে ঢোকার প্রস্তুতি নিলাম আমি।

রাফেলাকে জায়গা ছেড়ে নড়তে নিষেধ করে নাইলন লাইনের শেষ প্রান্তটা বাঁধলাম ছিটকে পড়া কামানের সঙ্গে, তারপর পেছনে লাইন ছাড়তে ছাড়তে আবার উঠে এলাম গানপোর্টের খোলা মুখের কাছে। নিষেধ মানেনি রাফেলা, গানপোর্টের ভেতর দিয়ে ঢুকে খোলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে ও। রেগেমেগে হাত নেড়ে বেরিয়ে আসতে বলছি ওকে, কিন্তু জেদের বশে পাল্টা হাত নেড়ে পরিষ্কার জানাচ্ছে, আমার কথা শুনতে রাজি নয় ও। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কারাতের একটা মারের ভঙ্গি দেখিয়ে হুমকি দিতে হল ওকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু স্লেটে লিখতে ভুলল না- 'এই অন্যায়ের বিচার করবে রডরিক।'

সাবধানে গানপোর্টের ভেতর ঢুকছি আমি, ঘোলা পানিতে তিন ফুটের বেশি দৃষ্টি যাচ্ছে না। বিস্ফোরণের ফলে কামানের পেছন দিকে যে বাধাটা ছিল সেটার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে হলে আরও বড় করতে হবে ওটাকে। জেনি বার-এর সাহায্যে ধ্বংসস্তূপের বড় কয়েকটা টুকরো সরাবার পর দেখলাম ভারি গান ক্যারেজটাই আসলে প্রধান বাধা তৈরি করছে।

সদ্য বিস্ফোরণে ধসে পড়া স্তূপে কাজ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক,

জানার কোন উপায়ই নেই কিসের ওপর স্থির হয়ে আছে গোটা ব্যাপারটা, আঙুলের একটু ছোঁয়া বা পানির একটু ধাক্কায় হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর নেমে আসবে কিনা।

কাজ করছি ধীর-স্থির ভাবে, আমার শিড়দাঁড়ার নিচের দিকের শেষ গিঁটে তালু দিয়ে বারবার অসহিষ্ণু চাপ দিচ্ছে রাফেলা, কিন্তু গ্রাহ্য করছি না। একবার টুকরো কয়েকটা প্ল্যাঙ্ক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি, রাফেলা দ্রুত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার স্লেটে লিখল-'আকারে ছোট আমি!' ছোট শব্দটার নিচে দুটো রেখা টেনেছে ও, যাতে জোড়া বিস্ময়বোধক চিহ্নটা আমার নজর এড়িয়ে না যায়। উত্তরে আবার কারাতের কোপ দেখালাম ওকে। পরিষ্কার দেখলাম মাস্কের ভেতর মুখ ভেঙচাচ্ছে ও।

এর মধ্যে জায়গাটা মোটামুটি পরিষ্কার করে ফেলেছি, ঢোকার পথে এখন একমাত্র বাধা ভারী গান ক্যারেজটা, গান ডেকের প্রবেশপথে আড়াআড়ি ভাবে একটু কাত হয়ে ঝুলছে সেটা। এর বিরুদ্ধে জেনি বারটার করার কিছুই নেই। হয় আমাকে ফিরে গিয়ে জেলিগনাইট নিয়ে আসতে হয় আগামীকাল, নয়ত একটা ঝুঁকি নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি এখনই একবার।

রিস্টওয়াচে চোখ রেখে জানলাম বারো মিনিট খরচ করে ফেলেছি এরই মধ্যে। তাছাড়া, এবারে নিচে নেমে অন্যান্য বারের তুলনায় কিছু বেশি বাতাস টানছি আমি। তবু ঠিক করলাম এখনই একটা চেষ্টা করে দেখব।

টর্চ আর জেনি বার রাফেলাকে দিয়ে আবার ঢুকলাম গানপোর্টে। গান ক্যারেজের ওপরের প্রান্তের নিচে কাঁধ ঠেকালাম, পা নেড়ে চেড়ে খুঁজে নিলাম শক্ত একটা জায়গা। বুক ভরে শ্বাস নিলাম, তারপর চাপ দিতে শুরু করলাম কাঁধ দিয়ে।

ধীরে ধীরে চাপ বাড়াচ্ছি, আমার পা আর পিঠের পেশী লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে। মুখ আর গলায় রক্ত উঠে এসে গরম করে তুলেছে চামড়া, অনুভব করছি, কোটর ছেড়ে লাফ

দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে চোখ দুটো। একচুল নড়ছে না গান ক্যারেজটা। নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বুক ভরে নিলাম বাতাসে, আবার চেষ্টা করলাম, এবার টিম্বার বীমে আমার সবটুকু শক্তি দিয়ে চাপ দিলাম।

কাঁধে প্রচণ্ড চাপ, তারপরই ঢিল অনুভব করলাম। কাজ হয়েছে। ভারসাম্য হারিয়ে পেছন দিকে ডিগবাজি খেলাম আমি, হুড়মুড় করে সশব্দে নেমে আসছে আমার ওপর প্রবাল জঞ্জাল।

পতনের শব্দ থামল এক সময়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘিরে রেখেছে আমাকে। প্রবাল গুঁড়ো আর পচা কাঠের ঘন কাদার ঘোলা পানিতে আলো ঢুকতে পারছে না। নড়তে চেষ্টা করলাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আঙুল থেকে মাথার খুলি পর্যন্ত হিম হয়ে গেল ভয়ে। কিসে যেন আটকে গেছে আমার একটা পা, নড়াতে পারছি না। উন্মত্তের মত ছুঁড়তে চেষ্টা করছি পা-টা। আতঙ্কে ভোঁতা হয়ে গেছে আমার অনুভূতি, ছয়বার পা ছোঁড়ার পর আবিষ্কার করলাম এর আগেই কপাল গুণে মুক্ত হয়ে গেছে পা-টা। গান ক্যারেজটা সিকি ইঞ্চির জন্যে ছুঁতে পারেনি আমার পা, পড়েছে আমার রাবার সুইমিং ফিনের ওপর। জুতো থেকে টেনে বের করে নিলাম পা, অন্ধকারে পথ হাতড়ে ফাঁকটা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

খবরের জন্যে ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছে রাফেলা। স্লেটে লিখলাম-'পথ হয়েছে!!' শব্দ দুটোর নিচে দুটো রেখা টানলাম। গানপোর্টের দিকে হাত তুলল ও, ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইছে। রিস্টওয়াচ দেখলাম আমি। আরও দু'মিনিট আছে হাতে। মাথা কাত করে সায় দিলাম, ওকে পেছনে নিয়ে এগোলাম আবার গানপোর্টের দিকে।

টর্চের আলোতেও আঠারো ইঞ্চির বেশি দেখতে পাচ্ছি না। তবে সদ্য তৈরি ফাঁকটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। বেশ বড়ই হয়েছে সেটা, এয়ার বটল বা ব্রিদিং হোস কোথাও আটকাল না,

সহজভাবে ঢুকতে পারলাম।

ভোরের আলোর ডেক আর কম্প্যানিয়নওয়ের গোলক ধাঁধায় পথ হারাতে চাই না, তাই পেছনে নাইলন লাইন ছেড়ে এগোচ্ছি আমি। লাইন ছুঁয়ে আমাকে অনুসরণ করছে রাফেলা, আমার পায়ের আঙুলে, গোড়ালিতে ওর হাতের স্পর্শ পাচ্ছি।

গান ক্যারেজের ওদিকে পানির ঘোলাটে ভাব একটু কম। ফাঁকটা গলে গান ডেকের নিচু, চওড়া একটা চেম্বারে এসে পৌঁছুলাম আমরা। রহস্যময় আর ভৌতিক লাগছে পরিবেশটা, আমাদের চারদিকে বেঢপ আকৃতির কি সব দেখতে পাচ্ছি। কোনটা চিনতে পারছি, বেশির ভাগই চেনা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় গান ক্যারেজটা দেখতে পেলাম আমি। বাঁক এবং কোণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অথবা স্তূপ হয়ে রয়েছে ক্যানন বলগুলো। আর সব জিনিস অনেকদিন পানিতে ভিজে তাদের চেহারা বদলে নিয়েছে, চেনা যাচ্ছে না।

ধীর গতিতে এগোচ্ছি সামনে, আমাদের ফিনের ঝাপটায় আবর্জনা আর কাদার ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে পানিতে। এখানেও আমাদের সামনে ভাসতে দেখছি মরা মাছ। তবে কিছু লাল রীফ ক্রেফিশ চোখে পড়ছে, আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে প্রকাণ্ড মাকড়সার মত হামাগুড়ি দিয়ে জাহাজের নিচের দিকে ভেসে যাচ্ছে।

আমাদের মাথার ওপর ডেকের গায়ে টর্চের আলো ফেললাম আমি, লোয়ার ডেক আর হোল্ডগুলোয় ঢোকার পথ খুঁজছি। জাহাজটা উল্টে থাকায় এর যে ড্রয়িংটা দেখেছি আমি সেটার সঙ্গে মিলিয়ে পথ খুঁজে নিতে একটু বেশি সময় লাগছে আমার।

ভেতরে ঢোকার মুখ থেকে পনেরো ফুট এগিয়ে ফোক্যাসলের মইটা দেখতে পেলাম আমি, আরেকটা চৌকো গর্ত দেখতে পাচ্ছি মাথার ওপর। ফাঁকটা গলে উঠে আসছি, বুদ বুদগুলো রূপালী, তরল পারদের মত বাল্কহেড আর ডেকিং ঘেঁষে উঠে যাচ্ছে ওপর

দিকে। পচে ঘন কাদা হয়ে আছে মইটা, ছোঁয়া লাগতে না লাগতে খসে পড়ছে, লোয়ার ডেকে যাবার সময় আমার মাথার চারপাশে স্থিরভাবে ভাসছে টুকরোগুলো।

সরু একটা প্যাসেজ দিয়ে এগোচ্ছি আমরা, দু'দিকে সার সার দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজাগুলো দিয়ে ভেতরে ঢোকার অদম্য ইচ্ছা জাগছে আমার। এগুলো সম্ভবত অফিসার্স মেস এবং প্যাসেঞ্জার কেবিন। ভেতরে ঢুকে চমকপ্রদ অনেক কিছু আবিষ্কার করার ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রেখে লম্বা ডেকের শেষ প্রান্তে একটা বড় বাল্কহেডের সামনে এসে থামলাম। এটা সম্ভবত ফরওয়ার্ড হোল্ডের বাইরের দেয়াল, ডেক ভেদ করে নেমে গেছে জাহাজের পেটের কাছে।

যতটুকু এগিয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে টর্চের আলো ফেলে রিস্টওয়াচ দেখলাম আমি। নিরাপদ সময়ের পরও চার মিনিট পার করে দিয়েছি বুঝতে পেরে অন্যায় একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলাম, প্রতিটি সেকেণ্ড আমাদেরকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এয়ার বটল খালি হয়ে যাবার ভীতিকর বিপদের দিকে। শুধু তাই নয়, এর ফলে ডি-কমপ্রেশনের জন্যে বিরতিগুলো সম্পূর্ণ করতেও পারব না, ফলে রক্তে বুদ বুদ সৃষ্টি হওয়ার ভয়াবহ ঝুঁকিয়ে নিতে হবে আমাদেরকে।

খপ করে রাফেলার একটা হাত ধরলাম আমি, রিস্টওয়াচ দেখিয়ে বিপদের সিগন্যাল দিলাম ওকে। সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বটা বুঝল ও, দ্রুত অনুসরণ করল আমাকে। খোলের ভেতর দিয়ে গাইডিং লাইন ধরে গানপোর্টের দিকে ফিরে আসছি আমরা। এরই মধ্যে ডিমাণ্ড ভালভের আড়ষ্টতা অনুভব করছি, বটল খালি হয়ে আসায় বাতাস যোগান দিতে ইতস্তত করছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওপরে তাকাবার আগে প্রথমে আমার পাশে রাফেলা এসে পৌঁছেছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে জেনে নিলাম। তারপর মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়েই ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার বুক। আতঙ্কে গলায় বাতাস আটকে গেল, আমার তলপেটের ভেতর কেউ যেন গরম তেল ঢেলে দিয়েছে।

তিন

গানফায়ার ব্রেক-এর পুল রক্তাক্ত একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিস্ফোরণে নিহত কয়েক টন মাছ টেনে এনেছে ঝাঁক ঝাঁক গভীর পানির কিলার শার্ককে। মাংস আর রক্তের গন্ধ, সেই সঙ্গে স্বজাতিদের অস্থিরভাবে সাঁতার কাটার খবর পানির ভেতর দিয়ে পেয়ে গেছে ওরা, দল বেঁধে ছুটে চলে এসেছে নির্বিচার নির্মমতায় মেতে ওঠার জন্যে। এই নির্দয়তার পেছনে বুদ্ধি বিবেচনার ছিটেফোঁটাও নেই, তাই একে বলা হয় ফিডিং ফ্রেঞ্জি। এ এক ধরনের উন্মত্ত অবস্থা, তিন দিনের খাবার একবারে খেয়ে নিয়েও সামনে যা পায় তাই গোগ্রাসে গিলে নিতে থাকে-যতক্ষণ খাবার দেখতে পায় চোখের সামনে। এর কোন বিরাম নেই।

তোমার মনে আছে, বাটু ফারেঙ্গির সেই ড্রাগন স্পটে কি হয়েছিল অবস্থাটা? অনেকটা সেই রকম। কিন্তু তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ভয়ঙ্কর।

দ্রুত রাফেলাকে টেনে নিয়ে পিছিয়ে এলাম গানপোর্টের ভেতর। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখছি পানির আলোকিত সিলিংয়ের গায়ে বিশাল আকৃতিগুলোর দ্রুত আনাগোনা।

অপেক্ষাকৃত ছোট হাঙ্গরের ঝাঁকের ভেতর কমপক্ষে দু'ডজন কুৎসিত হিংস্র রক্তলোলুপ, ভয়ঙ্কর জানোয়ার দেখতে পাচ্ছি; যেগুলোকে দ্বীপবাসীরা আলবাকোর শার্ক বলে। শরীরটা ব্যারেল-এর মত, অর্থাৎ মাঝখানটা মোটা, পেছনে এবং সামনেটা ক্রমশ সরু। মুখ আর নাক গোল, পেটটা ঝুলে পড়া, চওড়া নিঃশব্দ হাসি মাখা চোয়াল। কদাকার উন্মত্ত দানবের মত ছুটোছুটি করছে ওরা, শক্তিশালী লেজ ঝাপটাচ্ছে, মুখগুলো বিদ্যুৎচালিত যান্ত্রিক মেশিনের মত দ্রুত আর ঘন ঘন খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে-মাছ, রক্ত,

আঁশ, মাংশের টুকরো আর কণা, ক্ষুধার্ত রাক্ষসের মত কিছুই বাদ দিচ্ছে না, গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে সব। যতদূর জানি এরা সাংঘাতিক লোভী আর বোকা, উদরস্থ করার উন্মাদনায় মেতে থাকে না যখন তখন এক আধটু ভয় দেখালেই পিছু হটে যায়। কিন্তু এখন নিজেদের ভালমন্দ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ওরা, লোভে উত্তেজিত আর অন্ধ হয়ে আছে, একবার ঘাঁটালে আর রক্ষা নেই। কিন্তু শুধু এই দুই ডজন হলে তবু আমি ডি-কমপ্রেশনের জন্যে মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে ওপরে উঠে যাবার কল্পনাতীত ঝুঁকিটা প্রাণ বাজি রেখে হলেও নিতাম।

আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে এরা নয়, অন্য দুটো প্রসারিত আকৃতি, যারা নিঃশব্দ রাজসিক ভঙ্গিতে দ্রুত টহল দিয়ে তুমুল আলোড়ন তুলছে পানিতে। এদেরকে দেখেই হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে আমার। গভীরভাবে দু'ফাঁক করা চওড়া লেজের একটা মাত্র শক্তিশালী ঝাপটায় বাঁক নিচ্ছে ওরা, তাতে ছুঁচালো নাক লেজের প্রায় ডগা ছুঁই ছুঁই করছে, তারপর সমস্ত শক্তি আর গর্বিত ঈগলের সাবলীল ভঙ্গিতে উড়ে চলছে আরেকদিকে।

এই ভয়ঙ্কর মাছের যে-কোন একটা যখন সামনে খাবার দেখে থামছে, আধখানা চাঁদ আকৃতির প্রকাণ্ড মুখটা খুলে যাচ্ছে, ভেতরে দেখা যাচ্ছে আগে-পিছে অসংখ্য দাঁতের সারি, দাঁতগুলো চওড়া আর লম্বা, বাইরের দিকে ছড়ানো।

জোড়াটা একই আকৃতির, নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত তেরো-চোদ্দ ফুট লম্বা, ডরসাল ফিনের দেড় হাত উঁচু ফলাটা খাড়া হয়ে আছে। পিঠের চওড়া অংশের রঙ স্লেট পাথরের মত, পেটটা তুষারের মত ধবধবে সাদা আর ঝকঝকে লেজ আর ফিনের কিনারাগুলোর রঙ গাঢ় কালো। একটা মাত্র কামড়ে একজন মানুষকে দু'টুকরো করতে পারে এরা এবং টুকরো দুটো একটা মাত্র ঢোকে গিলে নিতে পারে।

গানপোর্টের মুখ থেকে উঁকি মারছি, ব্যাপারটা ওদের একজনের চোখে পড়ে গেল। এক নিমেষে লেজ ঝাপটে আধ পাক ঘুরে গেল সে, স্যাঁত করে নেমে এল আমাদের মাথার কাছে, কয়েক ফুট ওপরে থেমে বুদ্ধি পাকাচ্ছে। আঁতকে উঠে গানডেকের অন্ধকার গহ্বরের আরও ভেতরে পিছিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগেই দেখলাম আরেকবার লেজ ঝাপটা দিয়ে বাঁক নিচ্ছে বিশাল আকৃতিটা, উঠে যাচ্ছে খাড়াভাবে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বাইরে বেরিয়ে থাকা চোখা পুরুষাঙ্গটা।

এদেরকে ভয়ঙ্কর হোয়াইট ডেথ শার্ক বলে, পানির নিচে এরাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী।

অল্প বাতাস নিয়ে ডি-কমপ্রেশনের জন্যে জরুরী বিরতি সহ পানির ওপর উঠে যাওয়ার চেষ্টা করা এখনও সম্ভব, কিন্তু হোয়াইট ডেথের উপস্থিতে ঝুঁকিটা নিলে আমার মৃত্যুর জন্যে শুধু নির্বুদ্ধিতাকেই দায়ী করা হবে।

কিন্তু নিজের কথা একবারও ভাবছি না এখন, আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা রাফেলাকে নিয়ে। আমিই ওকে নিয়ে এসেছি, ওকে বাঁচাবার দায়িত্বটাও আমারই। সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিতে হলেও নিতে হবে আমাকে। শুধু ওর জন্যে, তা নইলে এই ঝুঁকি নেবার কথা চিন্তা পর্যন্ত করা যায় না।

স্লেটে দ্রুত আঁচড় কেটে লিখলাম-'অপেক্ষা কর! বন্দুক আর বাতাস আনার জন্যে ওপরে যাচ্ছি আমি।'

মেসেজটা পড়েই দ্রুত প্রচণ্ডভাবে মাথা ঝাঁকাল রাফেলা, জরুরী ভঙ্গিতে হাত আর মুখ নেড়ে বাধা দিতে চেষ্টা করছে আমাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে হারনেসের কুইক রিলিজ বাকল-এর পিন টেনে খুলে ফেলেছি আমি, শেষবার বুক ভরে বাতাস টানলাম, তারপর স্কুবা সেটটা ঠেলে দিলাম রাফেলার হাতে। ওয়েট-বেল্টটা ফেলে দিয়ে হালকা করে নিলাম নিজেকে, খোলের গা ঘেঁষে ঝুপ করে নেমে গেলাম নিচের দিকে।

উল্টে পড়ে থাকা জাহাজের আড়ালে যতটা সম্ভব গা ঢাকা দিয়ে দ্রুত সাঁতার কেটে এগোচ্ছি প্রবাল প্রাচীরের দিকে। পেছনে রেখে যাচ্ছি আমার জীবনের প্রথম প্রেম-রাফেলাকে। প্রাণপণ চেষ্টা করব, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু জানি না আবার ওর কাছে ফিরে আসতে পারব কিনা। শেষ যেটুকু বাতাস ছিল তার সবটুকু রেখে যাচ্ছি ওর কাছে, সংযমের সঙ্গে খরচ করলে পাঁচ কি ছয় মিনিট সরবরাহ পাবে ও। আর আমার রয়েছে শুধু ফুসফুসের বাতাসটুকু, এইটুকুর ওপর ভরসা করে পেরোতে হবে আমাকে শত্রু এলাকা।

প্রাচীরের কাছে পৌঁছেছি আমি, উঠতে শুরু করেছি প্রবাল ঘেঁষে, আশা করছি আমার কালো রঙের স্যুটটা এর রঙের সঙ্গে মিশে যাবে, প্রবালের দিকে পেছনে ফিরে, খোলা পুলের দিকে মুখ করে রয়েছি আমি, সামনে দেখতে পাচ্ছি বিশাল আকৃতিগুলো দ্রুত বাঁক নিচ্ছে, ডাইভ দিচ্ছে, চক্কর মারছে।

বিশ ফুট উঠেছি আমি, পানির চাপ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার ফুসফুসের ভেতর ক্রমশ বাড়ছে বাতাসের প্রচণ্ড চাপ। ভেতরে চেপে রাখা সম্ভব নয়, সে-চেষ্টা করলে ফুসফুসের টিস্যুগুলো ছিঁড়ে যাবে। ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে আসতে দিলাম কিছু রূপালী বুদবুদকে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো একটা হোয়াইট ডেথ শার্কের চোখে পড়ে গেল।

একপাক গড়িয়ে বাঁক নিল সে, দ্রুত এবং ঘন ঘন লেজের বাড়ি মেরে তীরের মত সোজা ছুটে আসছে আমার দিকে।

মরিয়া হয়ে প্রাচীরের ওপর দিকে চোখ বুলালাম। ছয় ফুট ওপরে পচন ধরা প্রবালের গায়ে ছোট একটা গুহা দেখতে পেলাম আমি। ডাইভ দিয়ে গুহাটার ভেতর ঢুকেছি, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ম্লান রঙের মত আমার পাশ ঘেঁষে চলে গেল হাঙ্গরটা, বাঁক নিল, তারপর পিছু হটে আমি আরও পেছনে সরে যাবার আগেই আবার স্যাৎ করে ছুটে গেল গুহার সামনে দিয়ে। অন্ধকারের ভেতর

আমাকে দেখতে না পেয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল সে, পাক খেয়ে ছুটল ঝরা পাতার মত ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে আসা একটা মরা স্ন্যাপারের দিকে, গপ্ করে মুখে পুরে নিয়ে ছোট্ট একটা ঢোক গিলে চালান করে দিল সেটা ভেতর দিকে।

বাতাস থেকে অক্সিজেন হজম করে নিয়ে আমার ফুসফুস দুটো লাফাচ্ছে এখন। রক্তে কার্বন-ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে। অ্যানোক্সিয়ায় আক্রান্ত হতে যাচ্ছি আমি, জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। গুহার নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এলাম, প্রাচীর ঘেঁষে একটা মাত্র সুইমিং ফিনের সাহায্যে আবার উঠতে শুরু করেছি ওপর দিকে।

ওঠার সময় ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আবার রূপালী বুদবুদ ছাড়ছি, জানি আমার শিরাগুলোতেও নাইট্রোজেন সাংঘাতিক দ্রুত চাপ-মুক্ত হচ্ছে, একটু পরই জিনিসটা গ্যাসে পরিণত হয়ে বুদবুদ সৃষ্টি করবে রক্তে। মাথার ওপর পানির সিলিংটাকে ধাবমান আয়নার মত দেখাচ্ছে, তার গায়ে ঝুলছে চুরুট আকৃতির হোয়েলবোটটা। দ্রুত উঠছি আমি, মাঝখানের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। নিচের দিকে তাকালাম আবার। আমার কাছ থেকে অনেক নিচে এখনও দেখতে পাচ্ছি হাঙ্গরের ঝাঁকগুলো বাঁক নিচ্ছে, ডাইভ দিচ্ছে, পাক খাচ্ছে, ছুটছে দ্রুতগতিতে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে ফাঁকি দিতে পেরেছি আমি ওদের চোখকে।

তীব্র ব্যথা শুরু হয়েছে আমার ফুসফুসে, মাথার খুলিতে বাড়ি মারছে রক্তের চাপ। এই সময় সিদ্ধান্ত নিলাম, প্রাচীরের আশ্রয় ছেড়ে খোলা পানিতে বেরিয়ে হোয়েলবোটের দিকে যাত্রা শুরুর সময় হয়েছে আমার।

প্রাচীরের গায়ে পায়ের ধাক্কা মেরে হোয়েলবোটের দিকে রওনা দিলাম আমি। রীফ-এর কাছ থেকে একশো গজ দূরে ওটা। অর্ধেক দূরত্ব নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এসে নিচের দিকে তাকালাম একবার। যা দেখলাম তার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম আমি,

তবু লাফিয়ে উঠল কলজেটা।

একটা হোয়াইট ডেথ শার্ক দেখতে পেয়েছে আমাকে। এখনও ধাওয়া করতে শুরু করেনি। কিন্তু পাক খেয়ে বাঁক নেবার ভঙ্গির মধ্যে বিদ্যুৎগতি ব্যস্ততা লক্ষ করেই বুঝে নিলাম কপালে কি আছে আমার। যা ভেবেছি তাই। প্রচণ্ড বেগে আমার দিকে ছুটে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

নীল গভীরতা থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে এভাবে ওকে ছুটে আসতে দেখলে অন্য কোন পরিবেশে বিস্ময়ে হতভম্ব, স্থির পাথর হয়ে যেতাম আমি। এক্ষেত্রে ঠিক উল্টো প্রতিক্রিয়া হল আমার। আতঙ্ক নতুন শক্তি যুগিয়ে দিল আমাকে, আরও দ্রুত উঠে যাচ্ছি আমি হোয়েলবোট লক্ষ করে।

তাকিয়ে আছি নিচের দিকে। এগিয়ে আসতে দেখছি শার্কটাকে। আমার দিকে যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে ওর আকার। ওর শরীরের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য জ্বলজ্বল করছে আমার চোখে। মুখের সামনেটা শূয়রের মত, সেখানে লম্বা দুটো ফাটল দেখা যাচ্ছে-ও-দুটো নাকের ফুটো। চোখ দুটো সোনালী, কিন্তু মণি দুটো কালো, তীর-চিহ্নের মাথার মত দেখতে। চওড়া নীল পিঠ, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ভীতিকর ডরসাল ফিনের ফলাটা।

নিচ থেকে পানির গা ফুঁড়ে বেরিয়ে এলাম-এত দ্রুত যে আমার কোমর পর্যন্ত উঠে এসেছে শূন্যে। বাতাসে পাক খেয়ে ঘুরে গিয়েই হাত চালালাম। বোটের শক্ত গানেলের গায়ে বাড়ি খেল হাতটা। আঙুলগুলো বাঁকা করে ধরে ফেলেছি গানেল। সবটুকু শক্তি দিয়ে সামনের দিকে টেনে আনলাম শরীরটা। পা দুটো গুটিয়ে তুলে ফেললাম আমার চিবুকের নিচে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আঘাত হানল হোয়াইট ডেথ।

আমার চারদিকের পানি বিস্ফোরিত হল, পানি ভেদ করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল সে। ধাক্কাটা অনুভব করলাম-কর্কশ, খরখরে চামড়ার সঙ্গে আমার পায়ের স্যুট ঘষা খেয়ে ছিঁড়ে গেল।

তারপরই হোয়েলবোটের খোলের গায়ে ধাক্কা খেল সে, প্রচণ্ড সংঘর্ষে নিমেষে একদিকে কাত হয়ে গেল বোটটা।

ঝাঁকি খেয়ে দুলছে হোয়েলবোট, চমকে উঠে হতভম্ব হয়ে গেছে রডরিক আর ল্যাম্পনি। বিদ্যুৎগতিতে শরীরটা টেনে গুটিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু শার্কটাও দিক বদলে নিতে পেরেছিল শেষ মুহূর্তে। একটুর জন্যে ব্যর্থ হয়েছে সে, ধাক্কা খেয়েছে খোলের সঙ্গে।

এখন আরেকটা মরিয়া চেষ্টায় পা ছুঁড়ে আর লাফ দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে গানেল টপকালাম আমি, হোয়েলবোটের তলায় দড়াম করে পড়ে গেলাম।

ওখানে শুয়ে হাঁপাচ্ছি, প্রিয় মিষ্টি বাতাস গিলে ফুসফুসের তীব্র ব্যথা দূর করছি। হালকা তুলোর মত লাগছে মাথাটা, কড়া মদের নেশার চেয়েও বেশি আচ্ছন্নতা বোধে আক্রান্ত হয়েছি আমি।

একটা চিৎকার ঢুকছে আমার কানে। গলাটা চিনতে পারছি। রডরিকের। চারদিক থেকে ভেসে আসছে তার বিকট চিৎকার আমার দুই কানে।

'মিস রাফেলা কোথায়? ওই শার্কটা মিস রাফেলাকে ধরেছে?'

গড়িয়ে চিৎ হলাম আমি, অস্বাভাবিক দ্রুত বাতাস টানতে গিয়ে হাঁপাচ্ছি আর ফোঁপাচ্ছি।

'স্পেয়ার লাঙস!' এক নিঃশ্বাসে বললাম আমি। 'নিচে, গানপোর্টে মারা যাচ্ছে রাফেলা। ওর বাতাস দরকার।'

লাফ দিয়ে বোতে পড়ল রডরিক, হ্যাঁচকা টানে ক্যানভাস শীটটা সরিয়ে দুই হাত দিয়ে ধরল অতিরিক্ত স্কুবা সেটটা।

'ল্যাম্পনি!' হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'জনি পিল বের কর!' একটা মার্কিন স্পোর্টস গুডস ক্যাটালগ দেখে এই কপার অ্যাসিটেট পিল আনিয়ে রেখেছি আমি, বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে শার্ক তাড়াবার জন্যে এর নাকি জুড়ি নেই। এখনও যাচাই করা হয়নি এর কার্যকারিতা। রডরিকের কাছ থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ছাড়া এখন

পর্যন্ত কিছুই জোটেনি এর কপালে। 'দেখা যাক,' বলল রডরিক, 'জিনিসটা কোন কম্মের কিনা।'

মাতালের মত টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম আমি, ওকে বললাম, 'সমস্যা শুধু ওকে নিয়ে নয়, রডরিক। বড় সাহেব গিজগিজ করছে পুলে, তাদের সঙ্গে নিচে বড় লাট রয়েছে দু'জন। তাদের একজনই ধাওয়া করেছিল আমাকে।'

নতুন সেটে ডিমাণ্ড ভালভ ফিট করছে রডরিক। 'তুমি সোজা উঠে এসেছ, মাসুদ?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'আমার বটল দুটো রাফেলাকে দিয়ে এসেছি। গানপোর্টে অপেক্ষা করছে ও।'

'তুমি পঙ্গু হতে শুরু করবে, মাসুদ?' মুখ তুলে আমার চোখে তাকাল রডরিক, ওর চেহারায় উদ্বেগ লক্ষ করছি আমি।

আবার আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'হ্যাঁ, রডরিক,' এলোমেলো ভাবে পা ফেলে এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম আমার ট্যাকল বক্সটার কাছে ঢাকনি তুলে ভেতরে তাকালাম। 'এক্ষুনি আবার তাড়াতাড়ি নেমে যেতে হবে আমাকে-বুদবুদ সৃষ্টি হবার আগেই আবার চাপ ফেলতে হবে রক্তে।' এক্সপ্লোসিভ হেড-এর বাণ্ডিলটা তুলে নিলাম বাক্স থেকে।

একটা দশ ফুট স্টেইনলেস স্টীল স্পিয়ারের শ্যাফটের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকাবার ব্যবস্থা রয়েছে প্রতিটি হেডের। স্ট্রাপ দিয়ে বাণ্ডিলটা ঊরুর সঙ্গে বেঁধে নিচ্ছি দ্রুত। মোট বারোটা হেড, ভাবছি, আরও থাকলে ভাল হত। প্রতিটি হেড-এর এক্সপ্লোসিভ চার্জ একটা বারো-গজ শটগান শেলের সমান। হাতলের একটা ট্রিগার দিয়ে চার্জটা ফায়ার করতে পারব আমি। হাঙর মারার ভাল একটা অস্ত্র এটা।

স্কুবা সেটের একটা আমার পিঠে হারনেস দিয়ে বেঁধে দিল রডরিক। আমার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসেছে ল্যাম্পনি, জনি পিলের ফুটো করা প্লাস্টিক কনটেইনারগুলো বেঁধে দিচ্ছে আমার

গোড়ালিতে।

'আরেকটা ওয়েট-বেল্ট দরকার আমার,' বললাম ওদেরকে। 'একটা ফিনও ফেলে রেখে এসেছি নিচে। অতিরিক্ত একটা সেট আছে...'

কথা শেষ করতে পারলাম না। আমার বাম হাতের কনুইয়ে আগুন-ধরা প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম। নিজের অজান্তে তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল আমার গলা থেকে, হাতটা নিজে থেকেই কনুইয়ের কাছে ভাঁজ হয়ে গেল, ছেড়ে দেয়া স্প্রিংয়ের মত ঝট্ করে উঠে এসে বাড়ি মারল আমার বুকে। রক্তের ভেতর দিয়ে এগিয়ে বুদবুদগুলো নার্ভ আর গ্রন্থিতে গুঁতো মারতে শুরু করেছে।

'মাসুদ মচকে যাচ্ছে!' একটা হাহাকার ধ্বনি বেরিয়ে এল রডরিকের গলা থেকে। 'সুইট মেরি, মাসুদ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে!' লাফ দিল ও। মোটরের কাছে গিয়ে পড়ল। প্রবাল প্রাচীরের দিকে তাক করল বোট। একটা ঝাঁকি খেয়ে ছুটতে শুরু করল সেটা। 'তাড়াতাড়ি সার, ল্যাম্পনি,' চেঁচিয়ে বলল সে, 'এক্ষুনি ওকে পানিতে নামিয়ে দিতে হবে।'

তীব্র, অসহ্য ব্যথাটা আঘাত করল আবার, এবার আমার ডান পায়ে। কিছু ধরে তাল সামলাবার সময়ও পেলাম না আমি, অকস্মাৎ ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটুটা, হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম দুর্বল শিশুর মত। এগিয়ে এসে আমার কোমরে দ্রুত বেঁধে দিচ্ছে ল্যাম্পনি ওয়েট বেল্টটা। আমার অসাড়, পঙ্গু পায়ে সুইমিং ফিনটা ঢুকিয়ে দিল ও।

রীফের কাছাকাছি এসে মোটর বন্ধ করল রডরিক। ছুটে গলুইয়ে আমার কাছে চলে এল সে। হাঁটু মুড়ে বসল আমার সামনে। মাউথপীসটা আমার ঠোঁটের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে এয়ার বটলের ছিপি খুলে দিল দ্রুত।

'ঠিক আছে, মাসুদ?' বাতাস টেনে বুক ভরে নিলাম আমি, ওর প্রশ্নের উত্তরে মাথা ঝাঁকালাম একবার।

হামাগুড়ি দিয়ে বোটের কিনারায় চলে গেল রডরিক।

পাঁচ সেকেণ্ড নড়ল না ও। পুলের পানি পরীক্ষা করছে। 'ঠিক আছে, মাসুদ,' আশ্বাসের সুরে জানাল আমাকে, 'বড় লাট জনি অন্য কোনদিকে চলে গেছে।'

হালকা একটা বস্তার মত দু'হাত দিয়ে আমাকে শূন্যে তুলে নিল রডরিক। তারপর ধীরে ধীরে বোট আর প্রবাল প্রাচীরের মাঝখানের পানিতে নামিয়ে দিল।

আমার বেল্টের সঙ্গে অতিরিক্ত স্কুবা সেটটা আটকে দিল ল্যাম্পনি, তারপর আমার হাতে ধরিয়ে দিল দশ ফুট লম্বা স্পিয়ার গানটা। ভাবছি, হাত থেকে এটা ফেলে না দিই!

'মিস রাফেলাকে ওখান থেকে তুলে আনতে হবে-তোমার মনে আছে, মাসুদ?' বলল রডরিক।

একটা মাত্র পা ছুঁড়ে পানির নিচে ডুব দিলাম আমি।

পেশী আর হাড়ের সংযোগে প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও পানিতে ডুব দিয়ে সবচেয়ে আগে ভয়ে ভয়ে খুঁজছি হোয়াইট ডেথের বিশাল উড়ন্ত আকৃতিটাকে। একটাকে দেখতে পেলাম আমি, কিন্তু অনেক নিচে সেটা, এক ঝাঁক আলবাকোর হাঙ্গরের মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রাচীরের আশ্রয় ঘেঁষে একটা পা ছুঁড়ে দিগভ্রান্ত একটা জলজ পোকার মত নেমে যাচ্ছি আমি। ত্রিশ ফুট নামার পর একটু একটু করে কমতে শুরু করল ব্যথা। পানির চাপে রক্তপ্রবাহে গজিয়ে ওঠা বুদবুদগুলো আকারে ছোট হয়ে আসছে। হাত এবং পায়ের সাড়া পাচ্ছি এখন, কাজে লাগাতে পারছি ওগুলো।

আরাম পেয়ে স্বস্তির পরশ অনুভব করছি শরীরে, হতাশার জায়গায় নতুন উৎসাহ আর আশায় ভরে উঠেছে বুক, আগের চেয়ে অনেক দ্রুত নেমে আসছি আমি। প্রচুর বাতাস রয়েছে সঙ্গে, অস্ত্র রয়েছে। অন্তত লড়ার একটা সুযোগ পাব আমি এখন।

নব্বই ফুট নিচে নেমে এসেছি আমি, এখানে সেখানে দেখতে

পাচ্ছি পুলের তলার কিছু কিছু অংশ। ধোঁয়াটে নীল গভীরতা থেকে উঠে আসতে দেখছি রাফেলার বুদবুদগুলোকে, ও এখনও বাতাস পাচ্ছে বুঝতে পেরে পুলক অনুভব করলাম শরীরে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাতাস শেষ হয়ে যাবে ওর, কিন্তু পুরো চার্জ করা নতুন এক সেট স্কুবা রয়েছে আমার সঙ্গে। আমাকে শুধু এটা নিয়ে ওর কাছে পৌঁছতে হবে।

দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছি, এই সময় একটা আলবাকোর শার্ক দেখে ফেলল আমাকে। এদিকেই আসছিল, আমাকে দেখে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন তার শরীরে। অনেক দূর থেকে আসছে, ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে আকৃতিটা। ইতিমধ্যেই কয়েক মন মাছ খেয়ে বেঢপভাবে ফুলিয়ে নিয়েছে পেটটা, কিন্তু সীমাহীন খিদে তাতে মেটেনি। চওড়া লেজ দিয়ে পেডাল করে, ভীতিকর নিঃশব্দ হাসিমুখে তীরবেগে ছুটে আসছে আমার দিকে।

পিছিয়ে এলাম দ্রুত। পানিতে স্থির ভাবে ভাসছি। আমার ঠিক পেছনেই রয়েছে প্রাচীরের গা। শার্কের দিকে মুখ করে রয়েছি আমি, কিন্তু এখন আর আগের মত ভয়ে মরে যাচ্ছি না। এক্সপ্লোসিভ হেড পরানো স্পিয়ারটা বাড়িয়ে দিয়েছি সামনের দিকে। ধীরে ধীরে ফিন দিয়ে পেডাল করে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে রেখেছি, আমার চারদিকে ঘন মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ছে শার্ক তাড়াবার পিল থেকে উজ্জ্বল নীল রঙের ডাই।

কাছে চলে এসেছে আলবাকোর। ওর মুখে আঘাত করার জন্যে তাক করে ধরেছি স্পিয়ারটা। কিন্তু নীল ডাইয়ের মেঘের গায়ে মাথা আর নাকের ছোঁয়া লাগতেই চোখের পলকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল সেটা, ভয় আর হতাশায় ঘন ঘন লেজের বাড়ি মেরে দিক বদলাচ্ছে। নাকের ফুটো, চোখ আর মুখ পুড়ে গেছে ওর কপার অ্যাসিটেট লেগে। চমকে গিয়ে আধপাক ঘুরে পিট্টান দিল ও।

পিলগুলো সাংঘাতিক কাজ দেয়, বুঝতে পেরে খুশি হয়ে

উঠল মনটা। আবার আমি দ্রুত নিচের দিকে নেমে যেতে শুরু করেছি। বাঁশ-বাগানের মাথার ওপর পৌঁছে গেছি। ত্রিশ ফুট নিচে দেখতে পাচ্ছি রাফেলাকে। গানপোর্টের মুখে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নিজের এয়ার বটল শেষ করে আমার দুটো ব্যবহার করছে এখন। কিন্তু বুদবুদের প্রচুর উত্থান দেখে বুঝতে পারছি আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বাতাস পাবে ও, তারপরই নিঃশেষ হয়ে যাবে সব বাতাস।

প্রবাল প্রাচীরের আশ্রয় ছেড়ে এবার ওর দিকে এগোচ্ছি আমি। আমাকে উদ্দেশ্য করে পাগলের মত হাত নাড়ছে ও, দেখে হুঁশ হল আমার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই লম্বা নীল টর্পেডোর মত হোয়াইট ডেথকে আমার দিকে তেড়ে আসতে দেখলাম আমি।

বাঁশ-ঝাড়ের উঁচু মাথা ঘুরে আসছে বড়লাট, চোয়ালের এক কোণে আটকে রয়েছে দেড় হাত লম্বা একটা থেঁতলানো মাছ, সম্ভবত কোন আলবাকোর হাঙ্গরের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাকে আরও সুস্বাদু খোরাক মনে করে ছুটে আসছে সে, মাছটাকে গিলে নেবার অবসর পায়নি। আমাকে পেটে ঢোকাতে হলে মুখের পথটা পরিষ্কার করা দরকার, সম্ভবত সে-কথা ভেবেই প্রকাণ্ড মুখটা খুলল সে, এক ঢোকে গিলে নিল মাছটাকে, সাপের ছড়ানো ফণার মত ধবধবে সাদা দাঁতের সারি দেখতে পেলাম আমি।

ওর দিকে মুখ করে তৈরি হয়ে আছি আমি। ঠিক যখন আঘাত হানতে যাচ্ছে ও, ফিন দিয়ে ঘন ঘন পেডাল করে দ্রুত পিছিয়ে আসছি আর ব্লু ডাইয়ের ঘন স্মোক স্ক্রিন ছাড়ছি দু'জনের মাঝখানে।

লেজের প্রচণ্ড কয়েকটা বাড়ি মেরে শেষ কয়েক গজ তীরবেগে পেরিয়ে এল সে। ব্লু ডাইয়ের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠল, আমার দিক থেকে ঘুরে যাচ্ছে আরেক দিকে। কিন্তু পাশ ঘেঁষে

বেরিয়ে যাবার সময় তার লেজের একটা ভারি ঝাপটা লাগল আমার কাঁধে। একবার, দু'বার, বারবার ডিগবাজি খাচ্ছি আমি সেই ধাক্কায়। দিগভ্রান্ত অবস্থা এখন আমার। তাল সামলে নিজের চারদিকে দ্রুত তাকাচ্ছি। প্রথমেই দেখতে পেলাম আমার শত্রুকে। নাছোড়বান্দা হোয়াইট ডেথ চক্কর মারছে আমাকে ঘিরে।

চল্লিশ ফুট দূরে রয়েছে সে। আমার চারদিকে টহল দিচ্ছে। পুরো শরীরটা একটা বিশাল যুদ্ধ-জাহাজের মত লম্বা লাগছে আমার চোখে। মেঘমুক্ত আকাশের মত গাঢ় নীল দেখাচ্ছে ওর গায়ের রঙ। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার যে এই দানবরা এটার চেয়ে দ্বীগুণ বড় হয় আকারে। সেই ধাড়ীগুলোর তুলনায় এটা এখনও শিশু-সেজন্য ধন্যবাদ দিলাম আমার ভাগ্যকে।

সরু স্টীল স্পিয়ারের ওপর এত যে ভরসা করেছিলাম, হঠাৎ সেটাকে ফালতু একটা খেলনা বলে মনে হচ্ছে আমার। হাঙ্গরটার ঠাণ্ডা হলুদ চোখে ঘৃণা দেখতে পাচ্ছি আমি, চোখ গরম করে দেখছে আমাকে সে। মাঝে মাঝে মোটা পাপড়ি নেড়ে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে চোখ টিপছে আমাকে। চোয়ালের আড়ষ্টতা কাটাবার ভঙ্গিতে প্রকাণ্ড মুখটা খুলল একবার, আমার মাংসের স্বাদ কেমন হবে ভেবে যেন নিঃশব্দে হাসছে।

বিরতি নেই, সেই একই দূরত্বে, একই গতিতে, আমাকে মাঝখানে রেখে চক্কর মারছে সে। ওর সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছি আমি, ওর অনায়াস সাবলীল গতির সঙ্গে তাল রাখার জন্য উন্মত্তের মত পেডাল করছি ফিন দিয়ে।

ঘুরছি, এই ফাঁকে বেল্ট থেকে স্পেয়ার লাঙটা খুলে আমার বাঁ কাঁধের হারনেসের সঙ্গে আটকে নিলাম। স্পিয়ারের হাতলটা বগলের নিচে শক্ত ভাবে এঁটে বসিয়ে নিয়েছি, মাথার দিকটা তাক করে রেখেছি উড়ন্ত দানবটার দিকে। নিঃসন্দেহে জানি, ওর যা সাইজ, তাতে মুখে এক্সপ্লোসিভ স্পিয়ার দিয়ে আঘাত করলে

ওকে শুধু খেপিয়ে তোলাই হবে, মারাত্মক ভাবে আহত করা বা ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। সুফল পেতে হলে ওর ব্রেনে আঘাত করতে হবে আমাকে।

প্রচণ্ড রাগ আর খিদে অস্থির করে তুলেছে ওকে। ব্লু ডাইয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা হয় ভুলে গেছে ও, নয়ত গ্রাহ্য করছে না। আঘাত করার জন্যে তৈরি হয়েছে ও, মুহূর্তটা স্পষ্ট চিনতে পারলাম আমি। লেজটা যেন শক্ত হয়ে গেল ওর, সেটা দিয়ে এক দফায় কয়েকটা প্রবল ঝাপটা মারল।

আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে, বুকের সঙ্গে সেঁটে ধরে রেখেছি স্কুবা সেটটা। অকস্মাৎ এক ঝটকায় এবং চোখের পলকে দিক বদল করল হাঙ্গরটা, চওড়া বৃত্ত ভেঙে সোজা ছুটে আসছে আমার দিকে।

মুখটা খুলে যাচ্ছে ওর, দুই চোয়ালের মাঝখানে মস্ত একটা গহ্বর দেখতে পাচ্ছি, চ্যাপ্টা আর ছুঁচালো ডগার দাঁত সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যখন লাগতে যাচ্ছে আঘাতটা, এক সেকেণ্ড বাকি থাকতে, স্কুবার জোড়া স্টীল বটল সামনের দিকে ঠেলে দিলাম আমি, ঢুকিয়ে দিলাম গহ্বরটার ভেতর।

সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল দুটো বন্ধ করল হাঙ্গরটা, বটল জোড়া আমার হাত থেকে ছুটে গেল, প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে একপাশে ছিটকে পড়লাম স্রোতে পড়া গাছের পাতার মত।

আবার যখন তাল সামলে নিজের চারদিকে তাকাচ্ছি, বিশ ফুট দূরে দেখতে পেলাম হাঙ্গরটাকে। ধীর গতিতে এগোচ্ছে, কিন্তু ইস্পাতের বটল দুটোকে নিয়ে সাংঘাতিক ব্যস্ত সে। বাচ্চা কুকুর যেভাবে স্যাণ্ডেল চিবায়, ঠিক সেইভাবে বটল জোড়ার ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছে বড়লাট।

কামড়ে জোর পাওয়ার জন্যে মাথা ঝাঁকাচ্ছে হাঙ্গরটা, এর এক একটা ঝাঁকিতে মাংসের বড় বড় টুকরো ছিঁড়ে নিতে অভ্যস্ত সে, কিন্তু এক্ষেত্রে তার বদলে রঙ করা ধাতব বোতলে গভীর দাগ

তৈরি হচ্ছে শুধু।

সুযোগটা দেখতে পাচ্ছি আমি, এটাই আমার শেষ এবং একমাত্র সুযোগ। দ্রুত পেডাল করে ধূমকেতুর মত ওর চওড়া নীল পিঠের ওপর উঠে এলাম, ওর দিকে নামতে শুরু করে ঘষা খেলাম লম্বা ডরসাল ফিনের সঙ্গে। পেছনের উঁচু আকাশ থেকে একটা হানাদার ফাইটার প্লেনের মত যেখানে ওর দৃষ্টি চলে না সেখানে নেমে যাচ্ছি।

নাগালের মধ্যে এসেই স্টীল স্পিয়ারের এক্সপ্লোসিভ হেডের ডগাটা ওর ঢেউখেলানো নীল খুলিতে চেপে ধরলাম শক্ত করে, ঠাণ্ডা এবং ভীতিকর হলুদ দুই চোখের ঠিক মাঝখানে। স্পিয়ারের হাতলে স্প্রিঙ বসানো ট্রিগারে আঙুল পেঁচিয়ে রেখেছি আগেই, এখন সেটা টেনে দিলাম শুধু।

কড়াক শব্দে কানের পর্দা কেঁপে উঠল আমার, মুঠোর ভেতর জোর একটা ঝাঁকি খেল স্পিয়ারটা। চমকে ওঠা বন্য ঘোড়ার মত পেছন দিকে লাফ দিল হাঙ্গরটা। ভাগ্য ভাল যে বিশাল শরীরের সঙ্গে হালকাভাবে মৃদু একটু ধাক্কা খেলাম আমি, তবু তাতেই ছিটকে পড়লাম দূরে, ডিগবাজি খেলাম পর পর গোটা তিনেক। তাল সামলে নিতে আগের বারের চেয়ে এবার কম সময় লাগল আমার। তাকিয়ে দেখি, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে বড়লাট। বিধ্বস্ত ব্রন থেকে আক্ষেপের ঢেউ এসে মসৃণ চামড়ার নিচের পেশীগুলোকে মোচড় খাওয়াচ্ছে। গুটিয়ে যাচ্ছে তাল তাল মাংস, ফুলে ফেঁপে উঁচু ঢিপির মত আকার নিচ্ছে, পর মুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠে সমান হয়ে যাচ্ছে শরীরের সঙ্গে। সেই সঙ্গে গোটা শরীর দুমড়ে মুচড়ে, বেঁকেচুরে যাচ্ছে।

দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করেছে এবার সে, ডাইভ দিয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, বন বন করে ঘুরছে লম্বা শরীরটা। তীরবেগে সোজা ছুটে গিয়ে পুলের পাথুরে মেঝেতে ধাক্কা খেল সংঘর্ষে প্রচণ্ডভাবে থেঁতলে গেল মুখটা। ড্রপ খেল, ঝাঁকির সঙ্গে উঠে এল

খানিকটা, তারপর অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে কাত হতে শুরু করল।

লেজের ওপর ভর দিয়ে রয়েছে হাঙ্গরটা এখন। একটা মস্ত স্তম্ভ যেন। স্তম্ভটা ছোট ছোট লাফ দিয়ে দ্রুত এবং ঘন ঘন জায়গা বদল করে যাচ্ছে অবিরাম।

সসম্মান দূরত্ব রেখে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। স্ক্রু খুলে বিস্ফোরিত হেডটা ফেলে দিয়ে তার জায়গায় তাজা হেড ফিট করে নিয়েছি স্পিয়ারে।

হোয়াইট ডেথের দুই চোয়ালের মাঝখানে রাফেলার জোড়া এয়ার বটল দুটো আটকে রয়েছে এখনও। ওটা আমি হারাতে পারি না। দৃষ্টি দিয়ে এখনও ওর অনিশ্চিত, চঞ্চল গতি অনুসরণ করে যাচ্ছি আমি। অবশেষে এক জায়গায় স্থির হল ও। নাক ঠেকে আছে পুলের শক্ত মেঝেতে, খাড়া হয়ে ভাসছে চওড়া লেজের সাহায্যে। ধীর, সতর্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছি ওর দিকে আমি। ওর খুলিতে আরেকবার ঠেকালাম স্পিয়ারের ডগাটা।

কড়াক করে শব্দ হতেই লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলাম আমি, ভয়ে ঢোক গিললাম একবার। কিন্তু হাঙ্গরটা নিজে থেকে নড়ছে না আর বিস্ফোরণের ধাক্কায় একবার শুধু ঝাঁকি খেয়েছে শরীরটা। কিন্তু এরপর সেটা আর খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকছে না। মন্থর গতিতে ঘুরছে, আর কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে পুলের মেঝেতে। এগিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে স্কুবাটা ধরে টান মারলাম। কর্কশ কয়েকটা ধাতব শব্দ করে গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল সেটা।

সঙ্গে সঙ্গে সেটটা পরীক্ষা করলাম আমি। এয়ার হোসগুলো ফুটো হয়ে গেছে কয়েক জায়গায়, গভীর কামড়ের দাগ ছাড়া তেমন কোন ক্ষতি হয়নি বটল জোড়ার।

রাফেলা, রাফেলা-ওর নাম জপছি মনে মনে, দ্রুত উঠছি বাঁশঝাড়ের মাথার দিকে।

ওপর থেকে কোন বুদবুদ দেখতে পাচ্ছি না। বুকটা ধড়াস

করে উঠল। বাঁশঝাড়ের মাথার গর্ত দিয়ে নামার সময় দেখতে পাচ্ছি রাফেলাকে। শেষ স্কুবা সেটটাও খালি হয়ে গেছে ওর, খুলে ফেলে দিয়েছে সেটা ও। বাতাস নেই, বাতাস নিচ্ছে না-ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে রাফেলা।

একটু একটু করে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবার মত এই রকম বিপদেও মাথা ঠিক রেখেছে ও, পানির ওপর উঠে যাবার আত্মহত্যাপ্রবণ চেষ্টা করছে না। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ও। মারা যাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস হারায়নি আমার ওপর।

চার

রাফেলার পাশে এসে থামলাম আমি, আমার নিজের মাউথপিসটা খুলে দিলাম। শ্লথ হয়ে গেছে ওর নড়াচড়া, শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত-মাউথপিসটা ধরল, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না, পিছলে বেরিয়ে এল হাত থেকে। ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে সেটা, এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসছে বাতাস। খপ করে ধরে ফেলে টেনে নামিয়ে আনলাম সেটাকে রাফেলার মুখের কাছে, পরিয়ে দিলাম দ্রুত।

বাতাস টানতে শুরু করেছে ও। বুকটা উঠছে আর পড়ছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শক্তি আর আশা ফিরে পেল ও। সন্তুষ্ট হয়ে পিছিয়ে এলাম আমি। খালি একটা সেট থেকে ডিমাণ্ড ভালভ খুলে নিলাম। ক্ষতিগ্রস্ত সেটের ডিমাণ্ড ভালভের সঙ্গে বদল করলাম এটা। রাফেলার পিঠে বেঁধে দেবার আগে আধ মিনিট বাতাস টানলাম নতুন চার্জ করা সেটটা থেকে। তারপর ওর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিলাম আমার মাউথপিস।

পানির নিচে যেটা না থাকলেই নয় সেই বাতাস রয়েছে এখন আমাদের কাছে। দীর্ঘ বিরতি নিয়ে উঠে যাবার জন্যে যথেষ্ট। রাফেলার চোখে চোখ রেখে অভয় দিয়ে হাসলাম আমি। ম্লান একটু হাসি দেখলাম ওর ঠোঁটের কোণে। স্পিয়ার থেকে

বিস্ফোরিত হেডটা ফেলে দিয়ে তাজা হেড ফিট করে নিলাম আমি। তারপর আবার একবার গানপোর্টের নিরাপদ আশ্রয় থেকে উঁকি দিয়ে তাকালাম পুলের খোলা পানির দিকে।

বেশির ভাগ মরা আর অচেতন মাছ চালান হয়ে গেছে হাঙ্গরদের পেটে, ঝাঁক বেঁধে ফিরে গেছে হাঙ্গররাও। রক্তঘোলা পানিতে বড়সড় দু'একটা আকৃতি দেখা যাচ্ছে শুধু, সাংঘাতিক লোভী ওরা, এখনও পানিতে তোলপাড় তুলে খোরাক খুঁজছে। তবে চলাফেরার ভঙ্গিতে আলসেমি ফুটে রয়েছে ওদের। রাফেলাকে নিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা এখনই করা যেতে পারে।

রাফেলার একটা হাত ধরলাম আমি, একটু চাপ দিয়ে অভয় দিলাম ওকে। মৃদু চাপ দিয়ে সাড়া দিল ও। ওকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম গানপোর্ট থেকে।

বাঁশ-বনের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দ্রুত চলে এলাম আমরা প্রবাল প্রাচীরের কাছে।

প্রাচীরের দিকে পেছন ফিরে পরস্পরের হাত ধরে পাশাপাশি রয়েছি আমরা, ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছি পুলের ওপর দিকে।

আলোর রেশ আরেকটু যেন বাড়ল। এক সময় মুখ তুলে ওপর দিকে তাকালাম আমি। ওপরে, অনেক উঁচুতে চুরুটের মত একটা আকৃতি অস্পষ্টভাবে, ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি। উৎসাহ এবং সাহস বেড়ে গেল আমার। চিনতে পারছি হোয়েলবোটটাকে।

ষাট ফুটের মাথায় ডি কমপ্রেশনের জন্যে থামলাম আমরা। একটা পেটমোটা আলবাকোর শার্ক আমাদের পাশ কেটে সাঁতরে গেল, কিন্তু নজর দিল না এদিকে-দূরে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, স্পিয়ারটা নামিয়ে নিলাম আমি।

দূরত্ব চল্লিশ ফুট থাকতে দ্বিতীয়বার ডি-কমপ্রেশনের জন্যে থামলাম। ঝাড়া দুই মিনিটের বিরতি এখানে। আমাদের রক্তের নাইট্রোজেনকে ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে ক্রমশ বেরিয়ে যেতে দিচ্ছি। এরপর রওনা হলাম বিশ ফুট দূরত্বে

পরবর্তী বিরতিতে থামার জন্যে।

উঁকি দিয়ে রাফেলার ফেস-মাস্কের ভেতর তাকালাম একবার, আমাকে উদ্দেশ্য করে চোখের মণি দুটো একপাক ঘোরাল ও, হাসল। সাহস এবং শক্তি দুটোই ফিরে পেয়েছে ও ইতিমধ্যে। সবকিছু ঠিকঠাক মত চলছে এখন। প্রচুর বাতাস রয়েছে আমাদের সঙ্গে। হোয়েলবোট বেশি দূরের ব্যাপার নয় আর। ধারে কাছে কোন বিপদও দেখতে পাচ্ছি না। বলা যায় প্রায় বাড়িতে পৌঁছে গেছি, চুমুক দিচ্ছি চায়ের কাপে-আর মাত্র বারো মিনিটের ব্যাপার।

হোয়েলবোটটাকে এত কাছে দেখাচ্ছে, আমি যেন স্পিয়ারটা দিয়ে ছুঁতে পারি ওটাকে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি রডরিক আর ল্যাম্পনির দুটো মুখ কিনারা থেকে ঝুঁকে পড়েছে, কখন আমরা পানির গা ফুঁড়ে উঠব তার জন্যে অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে।

ওদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে আরেকবার সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি আমি। আমার দৃষ্টিসীমার সর্বশেষ প্রান্তে, যেখানে ঘোলা আর ঝাপসা পানি নিশ্ছিদ্র গাঢ় নীলে পরিণত হয়েছে, কি যেন নড়তে দেখলাম আমি। সন্দেহের একটা ছায়াও হতে পারে, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হল আসাযাওয়া করছে ছায়াটা...চোখের ভুল হলে তা কেন মনে হবে? পরিষ্কার নয় এখনও কিছু, তবু ভয়ে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল আমার।

পানিতে স্থিরভাবে ঝুলছি। সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছি আরেকবার। খুঁজছি, বুঝতে চাইছি-আর ওদিকে দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সেকেণ্ড আর মিনিটগুলো।

আবার চলে গেল ছায়াটা, এবার পরিষ্কার দেখা দিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে এক নজর দেখতে পেলাম, কিন্তু অসম্ভব দ্রুত গতি আর আকৃতির আভাস লক্ষ করে বুঝতে পারলাম ওটা

আলবাকোর শার্ক নয়। ক্যাম্পফায়ারের চারদিকে ছায়ায় টহলরত একটা হায়েনার আকৃতি আর আক্রমণোদ্যত একটা সিংহের আকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, এক্ষেত্রেও সে ধরনের পার্থক্য দেখতে পেয়েছি আমি।

অকস্মাৎ পানির ধোঁয়াটে নীল পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এল দু'নাম্বার হোয়াইট ডেথ শার্ক। সে এল ঝড়ের বেগে আর নিঃশব্দে, পঞ্চাশ ফুট দূর দিয়ে চলে গেল, যেন আমাদেরকে দেখেও গুরুত্ব দিতে চাইছে না। যেতে যেতে প্রায় আমাদের দৃষ্টিসীমার শেষ বিন্দুতে পৌঁছে গেল, মনে হল এই বুঝি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপর একটা মাত্র ঝটকায় আধপাক ঘুরেই ফিরে আসতে শুরু করল তীরবেগে আগের পথ ধরে। এই একই ভঙ্গিতে বারবার যাওয়া আসা করছে খাঁচায় বন্দী বাঘের মত।

ভয় পেয়ে আমার গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেল রাফেলা। কয়েকবার হাত ঝাড়া দিতেও মুঠো আলগা করল না ও। ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম আমি। এবার ছেড়ে দিল আমার হাত।

পায়চারি করছে যেন হোয়াইট ডেথ। পরের বার ফেরার সময় সে তার আসা-যাওয়ার গতিপথ বদল করল, বিরাট একটা বৃত্ত রচনা করে ছুটছে এখন, চক্কর মারতে শুরু করেছে আমাদেরকে মাঝখানে রেখে। লক্ষণ খারাপ। আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি এটা তার। এরপর আর একবার মাত্র দিক বদল করবে সে।

ঘুরছে তো ঘুরছেই, চক্কর মারার মধ্যে কোন বিরাম নেই। সারাক্ষণ হলুদ, ক্ষুধার্ত চোখ দুটো দিয়ে চেয়ে আছে আমাদের দিকে।

আচমকা অন্য একটা বিষয় দৃষ্টি কেড়ে নিল আমার। ওপর থেকে ধীর গতিতে নামছে কি সব। কাছে নেমে এল সেগুলো, এবার চিনতে পারলাম। জনি পিলের প্লাস্টিক কনটেইনার, ডজনখানেকের কম হবে না। আমাদের বিপদ আঁচ করতে পেরে

রডরিক নিশ্চয়ই পুরো বাক্সটা উল্টে দিয়েছে কিনারা থেকে। নাগালের মধ্যে দিয়ে নেমে যাচ্ছে একটা, হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরলাম সেটা, গুঁজে দিলাম রাফেলার হাতে।

হু হু করে নীল ডাই ছাড়ছে ওটা রাফেলার হাত থেকে। আবার আমি পুরোপুরি মনোযোগ দিলাম হোয়াইট ডেথের দিকে। ব্লু ডাই দেখতে পেয়ে একটু ঘাবড়ে গেছে হাঙ্গরটা, সতর্ক হয়ে একটু কমিয়ে এনেছে গতি, কিন্তু এখনও মাঝখানে আমাদেরকে রেখে চক্কর দিয়ে চলেছে সে, মুখ ভরা নিঃশব্দ হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম রিস্টওয়াচে। আরও তিন মিনিট বিরতি নিলে তারপর ওপরে ওঠা নিরাপদ হবে। তবে আমার আগে রাফেলাকে ওপরে পাঠাবার ঝুঁকিটা আমি নিতে পারি। ওর রক্তে এখনও একবারও বুদবুদ সৃষ্টি হয়নি সুতরাং আর এক মিনিট বিরতি নিয়ে ওপরে উঠে গেলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না ওর।

এইবার একটু একটু করে বৃত্তটাকে ছোট করে আনছে হোয়াইট ডেথ। এত কাছে ও, এত বেশি কাছে যে ওর চোখের কালো ছুঁচালো মণি দুটোর গভীরতা দেখতে পাচ্ছি আমি, পড়তে পারছি কুৎসিত মতলবটা।

দ্রুত আরেকবার চোখ বুলালাম রিস্টওয়াচে। এক মিনিট পেরোয়নি এখনও, কিন্তু আর দেরি না করে রাফেলাকে ওপরে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। ওর কাঁধে চাপড় মেরে ওপরের দিকে জরুরী ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করলাম আমি।

ইতস্তত করছে রাফেলা। তর্জনী খাড়া করে ওপর দিকটা দেখালাম ওকে আবার। নির্দেশটা মেনে নিল ও। উঠতে শুরু করল ওপর দিকে।

ঠিক যেভাবে উচিত, ধীর গতিতে উঠে যাচ্ছে রাফেলা। কিন্তু ওর ঝুলন্ত পা দুটো পানিতে বাড়ি মারছে আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে।

আমাকে অগ্রাহ্য করে রাফেলার সঙ্গে একই ভাবে ধীর গতিতে উঠে যাচ্ছে হাঙ্গরটাও।

ওদের দু'জনেরই নিচে এখন আমি। দ্রুত পেডাল করে একপাশে সরে যাচ্ছি, এই সময় দেখতে পেলাম হোয়াইট ডেথের লেজে শক্ত একটা ভাব এসে গেছে। আক্রমণের পুর্ব-লক্ষণ এটা।

হোয়াইট ডেথের ঠিক নিচে পৌঁছেছি, কিন্তু দম ফেলার ফুরসত পেলাম না, দেখলাম রাফেলাকে আঘাত হানার জন্যে ঘুরে যাচ্ছে সে। উন্মত্তের মত পা ছুঁড়ে আরও একটু উঠে এলাম আমি। নরম তুলতুলে গলায় স্পিয়ার হেডটা ঢুকে যেতেই চাপ দিলাম ট্রিগারে।

দেখতে পেলাম ঝাঁকি খেল ওর গলার সাদা মাংস, পলকের জন্যে একটা ফাটল দেখতে পেলাম সেখানে আমি। লেজের কয়েকটা বিদ্যুৎগতি বাড়ি মেরে অকস্মাৎ পিছিয়ে গেল সে, প্রায় খাড়াভাবে রকেটের মত উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। পানির গা ফুঁড়ে শূন্যে বেরিয়ে গেল তার সম্পূর্ণ শরীর, পর মুহূর্তে দড়াম করে আছড়ে পড়ল ফেনা আর বুদবুদের উঁচু বেদীর ওপর।

প্রচণ্ড উত্তেজনা আর উদ্বেগে আমার মাথার খুলি ফেটে যাবে বলে মনে হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি রাফেলা তার মাথা ঠাণ্ডা রেখে অলস ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে হোয়েলবোটের দিকে। পানির গা ফুঁড়ে নেমে এল বিশাল দুটো কালো থাবা রাফেলাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে।

পানিতে ফিরে এসেই লাটিমের মত দ্রুত পাক খেতে শুরু করেছে হাঙ্গরটা, সেই সঙ্গে আবার বৃত্ত রচনা করে ঘুরছে চারদিকে। ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছি ছেঁকে ধরেছে যেন তাকে, তীব্র যন্ত্রণায় আর আক্রোশে উন্মাদ হয়ে গেছে। বারবার চোয়াল দুটো খুলছে আর ঝপ করে বন্ধ করে ফেলছে সে।

কালো দুই থাবার নাগালে পৌঁছে যাচ্ছে রাফেলা। মোটা কলার মত আঙুলগুলো রাফেলার আঙুলের ফাঁকে ঢুকে গেল,

ইস্পাতের হুকের মত সেগুলো আটকে নিয়ে বিস্ময়কর শক্তির এক টানে পানি থেকে তুলে নিল ওকে।

এখন শুধু আমাকে নিয়ে সমস্যা। আরও কয়েক মিনিট পানিতে থাকতে হবে আমাকে। তারপর রাফেলাকে অনুসরণ করে বোটে উঠে যাবার চেষ্টা করতে হবে। বিস্ফোরণের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠছে হাঙ্গরটা। এখন আর সে লাটিমের মত পাক খাওয়াচ্ছে না নিজের শরীরটাকে। কিন্তু বৃত্ত ধরে চক্কর মারার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে আরও।

প্রতিটি চক্করের সঙ্গে বৃত্তটাকে ছোট করে আনছে সে।

পরবর্তী এক মিনিটে তিনবার রিস্টওয়াচ দেখলাম আমি। ডি-কমপ্রেশনের জন্যে যথেষ্ট বিরতি নেয়া শেষ করেছি, এখন পানির ওপর উঠে গেলে আমার কোন ক্ষতি হবে না।

সামান্য একটু উঠলাম আমি। হাঙ্গরটার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে থামলাম। শরীর মচকাবার তীব্র যন্ত্রণা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। আর যাই করি, দ্রুত ওপরে উঠে যেতে রাজি নই আমি। ধীরে ধীরে উঠছি ।

কিন্তু আরও কাছে, কাছ থেকে আরও কাছে সরে আসছে হোয়াইট ডেথ।

হোয়েলবোটের দশ ফুট নিচে আরেকবার থামলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ করল হাঙ্গরটা, খানিক আগে গলার কাছে ভীতিকর বিস্ফোরণের কথা মনে পড়ে গেছে তার। চক্কর মারা বন্ধ করে ম্লান পানিতে চুপচাপ স্থির পাথর হয়ে গেছে সে, পেকটোরাল ফিনের চওড়া ছুঁচালো ডানার ওপর ভর দিয়ে ঝুলছে পানিতে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা। নিঃশব্দে। দু'জনের মাঝখানে পনেরো ফুট ব্যবধান। কারও চোখে পলক নেই কয়েক সেকেণ্ড।

কিন্তু পরিষ্কার অনুভব করছি, প্রকাণ্ড নীল পশুটা চূড়ান্ত আঘাত করার জন্যে তৈরি হতে শুরু করেছে।

স্পিয়ার ধরা হাতটা যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দিলাম আমি ওর দিকে। হালকা ভাবে পেডাল করছি ফিন জোড়া দিয়ে। ধীর গতিতে এগোচ্ছি ওর দিকে। ভয়ে কাঁপছে বুক, হার্টবিট বেড়ে গেছে আমার। কিন্তু নিজেকে এই বলে ভরসা দিচ্ছি, এখন যদি তেড়েও আসে ও, ওর দিকে তাক করা স্পিয়ারের ডগার সঙ্গে ধাক্কাটা খাবে আগে। আরেকবার আহত হবে ।

কিন্তু তাকিয়ে আছে শুধু, তেড়ে আসছে না। এমন আশ্চর্যভাবে স্থির হয়ে আছে, যেন চোখ মেলে ঘুমাচ্ছে ও। ওর মুখের নিচে নাকের লম্বা ফাটলের এক ইঞ্চির মধ্যে পৌঁছে গেছে স্পিয়ারের মাথায় পরানো এক্সপ্লোসিভ হেড।

ট্রিগার টিপে দিলাম আমি।

বিস্ফোরণের কড়াক শব্দে কানের পর্দা নড়ে উঠল আমার। চমকে উঠে পিছিয়ে যাচ্ছে হোয়াইট ডেথ, একটা গড়ান দিয়ে উন্মত্ত গতিতে বাঁক নিতে শুরু করেছে। স্পিয়ারটা ফেলে দিয়েই প্রাণপণে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছি আমি।

আহত সিংহের মত খেপে উঠেছে হোয়াইট ডেথ, আঘাতগুলোর তীব্র যন্ত্রণা তাড়া করছে ওকে। প্রকাণ্ড একটা নীল পাহাড়ের মত পিঠ নিয়ে আর বিশাল গুহার মত মুখটা হাঁ করে ধাওয়া করেছে আমাকে সে। জানি, এবার ওকে কোনভাবে ফেরানো যাবে না।

আমার মাথার ওপর কালো দুটো বিশাল থাবা দেখতে পাচ্ছি। কি যে ভাল লাগল রডরিককে! ডান হাতটা মাথার ওপর তুলে দিলাম ওর একটা থাবার দিকে। আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে হাঙরটা, তীরবেগে এই শেষ দূরত্বটুকু পেরিয়ে আসছে সে। অনুভব করছি আমার কব্জিতে পেঁচিয়ে যাচ্ছে রডরিকের লোহার মত আঙুলগুলো। 'টান আমাকে!' আমার সমস্ত অস্তিত্ব নিঃশব্দ আবেদনে কেঁপে উঠল।

পরমুহূর্তে আমার চারদিকে বিস্ফোরিত হল পানি। হাতে প্রচণ্ড

একটা টান অনুভব করলাম আমি, একই সঙ্গে হাঙরটা পানি দু'ফাঁক করে আমার কাছে পৌঁছে গেল। পানিতে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন উঠল, কিন্তু সেই আলোড়নের ধাক্কাটা পুরোপুরি অনুভব করার আগেই দেখলাম হোয়েলবোটের ডেকে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছি আমি-হোয়াইট ডেথের খোলা চোয়ালের ভেতর থেকে ছিনিয়ে এনেছে আমাকে রডরিক।

'তোমার খুব নেওটা ওরা, মাসুদ,' তিক্ত, ঝাঁঝালো গলায় বলল রডরিক, 'চমৎকার পোষ মানিয়েছ!'

মাথা তুলে দ্রুত চারদিকে তাকালাম রাফেলার খোঁজে। ভিজে, রক্তশূন্য মুখে স্টার্নে বসে আছে ও। 'ঠিক আছ তুমি, রাফেলা?' জানতে চাইলাম আমি।

কথা বলতে পারল না, একদিকে শুধু একটু কাত করল মাথাটা।

উঠে দাঁড়ালাম আমি। হারনেসের রিলিজ পিন খুলে স্কুবার ভারমুক্ত হচ্ছি। 'রডরিক,' ডাক দিয়ে দ্রুত বললাম ওকে, 'জেলিগনাইটের একটা স্টিক রেডি কর-তাড়াতাড়ি।'

মাস্ক আর ফিন খুলে ফেলে হোয়েলবোটের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে পুলের দিকে তাকালাম আমি। এখনও আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেনি বড়লাট। আক্রোশে আর হতাশায় উন্মাদ হয়ে গেছে সে, হোয়েলবোটকে মাঝখানে রেখে চক্কর মারছে অবিরাম। পানির গা ভেদ করে তুলে দিয়েছে সে তার ডরসাল ফিনের সবটুকু দৈর্ঘ্য। আমি জানি, ইচ্ছে করলেই গুঁতো মেরে শূন্যে তুলে দিতে পারে সে হোয়েলবোটটাকে, সে শক্তি তার আছে।

'ওকে তাড়াও! রানা, যেভাবে পার ওকে বিদায় কর!' কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রাফেলা।

'ভয় নেই, তাড়াচ্ছি,' আশ্বাস দিলাম রাফেলাকে।

হোয়াইট ডেথের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি আমি, কিন্তু তার আগে কিছু একটা দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে ওকে, যাতে আমি তৈরি হবার

আগেই আক্রমণ করে না বসে।

'ল্যাম্পনি, মোরে ঈল আর একটা বেইট-নাইফ দাও আমাকে,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

ঠাণ্ডা, পিচ্ছিল ঈলের ধড়টা ল্যাম্পনির হাত থেকে নিলাম। প্রায় দশ পাউণ্ড ওজনের এক টুকরো মাংস কেটে ছুঁড়ে দিলাম পুলের পানিতে। বাঁক নিয়ে চোখের পলকে ছুটে এল টুকরোটার দিকে হোয়াইট ডেথ, গতি এতটুকু মন্থর না করে খোলা চোয়ালের ভেতর ঢুকিয়ে নিল সেটা। হোয়েলবোটের খোলের সঙ্গে ঘষা খেল পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার সময়। টালমাটাল অবস্থা হল বোটের। আমরা সবাই ঝাঁকি খেলাম।

'তাড়াতাড়ি কর, রডরিক,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। মাংসের আরেকটা টুকরো ছুঁড়ে দিলাম হাঙ্গরটাকে। পানিতে সেটা পড়তে না পড়তে খপ্ করে মুখে পুরে নিল সে। এবার পিঠ নিচু করে বেরিয়ে গেল খোলের নিচ দিয়ে-কিন্তু আবার ধাক্কা লাগল, প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল বোট। টলে উঠলাম আমরা, আর তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল রাফেলার গলা থেকে। ডাইভ দিয়ে পড়ল ও, বোটের গানেল ধরে ঝাঁকুনি সামলাচ্ছে।

'রেডি,' বলল রডরিক।

ঈলের দুই ফুট লম্বা একটুকরো মাংস দিলাম রডরিককে আমি, টুকরোটার সঙ্গে ব্যাগের মত ঝুলছে নাড়িভুঁড়ির একটা অংশ। 'স্টিকটা ভরো এর ভেতর,' রডরিককে বললাম। 'তারপর মুড়ে বেঁধে দাও।'

নিঃশব্দে হাসতে শুরু করেছে রডরিক। 'খুব পছন্দ হয়েছে প্ল্যানটা আমার, মাসুদ,' জানাল সে।

পানির দানবটাকে মাংসের টুকরো দিয়ে ভুলিয়ে রাখছি আমি, ওদিকে আরেক টুকরো মাংসের ভেতর জেলিগনাইট ঢুকিয়ে নিখুঁত একটা প্যাকেট তৈরি করছে রডরিক। ইনসুলেটেড তামার তার বেরিয়ে এসেছে ওটার ভেতর থেকে। প্যাকেটটা আমার হাতে

তুলে দিল রডরিক।

তারের এক ডজন লূপ তৈরি করলাম আমার বাঁ হাতে, রডরিককে বললাম, জুড়ে দাও এবার।'

এক মুহূর্ত পর রডরিক জানাল, 'রেডি আমি।' নিঃশব্দে হাসছে ও।

মাংস আর এক্সপ্লোসিভের প্যাকেটটা হোয়াইট ডেথের চক্কর মারার পথের ওপর ছুঁড়ে দিলাম আমি। গতি বেড়ে গেল হাঙ্গরটার, নীল চকচকে চওড়া পিঠটা ভেসে উঠল পানির ওপর। চোয়াল দুটো খুলে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে প্যাকেটটা সেঁধিয়ে গেল উন্মুক্ত গহ্বরের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে বোটের কিনারা থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে শুরু করল তামার তার। রীল থেকে আরও কিছুটা ছাড়াচ্ছি আমি।

'গিলে নিতে দাও,' পরামর্শ দিলাম আমি রডরিককে। 'পেটের ভেতর পৌঁছুতে দাও।'

মস্ত ঘাড় নেড়ে সায় দিল রডরিক।

পাঁচ সেকেণ্ড পর আবার বললাম, 'ঠিক আছে, রডরিক, এবার বিদায় কর বড়লাটকে।'

ফিন তুলে পানির ওপর ভেসে উঠছে হোয়াইট ডেথ। দিক বদলে আবার চক্কর মারা শুরু করতে যাচ্ছে, আধখানা চাঁদের মত মুখের কোণে দেখা যাচ্ছে তামার তার।

সুইচ টিপে দিল রডরিক। হাঙ্গরটার পেটটা লাল একটা তরমুজের মত বিস্ফোরিত হল। স্তম্ভের আকৃতি নিয়ে খাড়া হয়ে গেল রক্তাক্ত মাংসের কণাগুলো, পানি থেকে শূন্যে পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত সোজা উঠে গিয়ে ছড়িয়ে যেতে শুরু করল চারদিকে। বৃষ্টির মত ঝম ঝম করে নেমে এল রক্ত আর মাংস পুলের পানিতে। হোয়েলবোটেও আছড়ে পড়ল কিছুটা।

ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া হাঙ্গরের খোলসটা পানির ওপর ঝাঁকি খাচ্ছে, তারপর গড়িয়ে চিত হয়ে গিয়ে ডুবে যেতে শুরু

করল।
‘গুড বাই, বড়লাট জনি আপটেইল,’ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ল্যাম্পনি। আর পানির দিকে তাকিয়ে কদাকার, বীভৎস করে তুলল রডরিক তার বিকট চেহারাটাকে-হাসি আসছে।
‘চল, ফেরা যাক এবার,’ বললাম আমি, সামুদ্রিক ঢেউ এরই মধ্যে রীফ টপকাতে শুরু করে দিয়েছে। ভয় হচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক হলেই হোয়েলবোট থেকে ছিটকে পড়ে যাব আমি পানিতে।
সাফ-সুতরো হয়ে নিজেদের গুহায় বসে আমরা হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি, এই সময় মৃদু গলায় বলল রাফেলা, ‘আমার প্রাণ রক্ষার জন্যে তোমাকে আমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত...’
‘না, ডারলিং, তার কোন দরকার নেই। কতটুকু কৃতজ্ঞ তুমি কাজে দেখাও।’
সানন্দে রাজি হল রাফেলা।
আধ ঘন্টার মধ্যেই কৃতজ্ঞ করে ফেলল আমাকে ও।

পাঁচ

গানফায়ারের রীফকে ভয় করতে শুরু করেছে রডরিক আর ল্যাম্পনি। সামুদ্রিক ভূত আর পেত্নীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওদের বিশ্বাস এত বেশি দৃঢ় যে ব্যর্থ হব জেনে ওদের সে-বিশ্বাস কখনও আমি ভাঙার চেষ্টা করিনি।
আমাদেরকে একের পর এক দুর্ঘটনা আর মন্দ ভাগ্যের শিকার হতে দেখে রাফেলাও কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে, রডরিক আর ল্যাম্পনির প্ররোচনায় সে-ও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে অলৌকিক শক্তির ওপর। ওদের ধারণা, গান ফায়ার রীফ একটা অভিশপ্ত জায়গা।
‘আমার কি মনে হয়, জানো?’ হাসির সঙ্গে কথাটা বলছে বটে রাফেলা, কিন্তু এর সবটাই কৌতুক নয়। ‘মনে হয়, নিহত মুঘল

রাজকুমাররা গুপ্তধনের পিছু নিয়ে গান ফায়ার রীফে চলে এসেছে, নিজেদের ধন-সম্পদ পাহারা দিচ্ছে ওরা...’ রোদ ঝলমলে এই উজ্জ্বল সকালেও ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল রডরিক আর ল্যাম্পনির। ‘বড়লাট জনি আপটেইল জোড়া, গতকাল যাদেরকে মেরেছি আমরা, জানো কারা ওরা? ওরাই সেই নিহত মুঘল রাজকুমার, ছদ্মবেশ নিয়ে ওদের আত্মারা হাঙর সেজে ছিল...’
রডরিকের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে পচা এক ডজন বালিহাঁস দিয়ে নাস্তা করেছে সে। দ্রুত ক্রস চিহ্ন আঁকল নিজের বুকে।
‘মিস রাফেলা,’ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বলল ল্যাম্পনি, ‘দয়া করে এ-ধরনের অশুভ কথা আপনি আর মুখে আনবেন না।’
‘আনবেন না!’ ল্যাম্পনিকে সমর্থন করে বলল রডরিক।
‘আরে, তোমরা ব্যাপারটা এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন! আমি তো ঠাট্টা করছিলাম,’ প্রতিবাদের সুরে বলল রাফেলা।
‘এ-ধরনের ঠাট্টা দয়া করে আর কখনও করবেন না। আমরা ভূত পেত্নি-এই সব বিশ্বাস করি, শুধু তাই নয়, ওদেরকে সম্মান দিই, শ্রদ্ধা করি।’
‘তাই নাকি!’ রাফেলা আহত হয়েছে, তাই একটু বিদ্রূপের সুরে বলল কথাটা।
‘আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এসব আপনি বিশ্বাস করেন না,’ বলল ল্যাম্পনি। ‘বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমরা জানি, ওরা আছে। আমাকে একটা পেত্নী একবার...’
‘ধাক্কা দিয়ে একটা কবরের ভেতর ফেলে দিয়েছিল,’ ল্যাম্পনির হয়ে কথাটা শেষ করলাম আমি। গল্পটা জানা আছে আমার। ল্যাম্পনি আর রডরিকের মুখে অমন একশোবার এ গল্প শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার ধারণা, অন্ধকারে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল ও কবরটার ভেতর।
‘আর রডরিকের পেছনে প্রায় এ বছর ধরে লেগেছিল একটা ভূত সুযোগ পেলেই সে...’

‘রডরিকের বুকে পেচ্ছাব করে দিত,’ এবারও ল্যাম্পনির হয়ে কথাটা শেষ করলাম আমি। এ-গল্পটাও ওদের মুখ থেকে শুনতে হয়েছে আমাকে। রডরিক যখন বছরের মধ্যে দশ মাস মদ খেয়ে-ল্যাম্পনির ভাষায় গরুর লাদার মত-পড়ে থাকত, তখনকার ঘটনা এটা। নেশা ভাঙার পর প্রায়ই নাকি এই ভূতের প্রস্রাব আবিষ্কার করত সে তার বুকে-শার্টটা ভিজে সপসপে হয়ে থাকত, আর সে কি দুর্গন্ধ! আমার ধারণা, মদ খেয়ে বেহুঁশ অবস্থায় বমি করে শার্টটা ভিজিয়ে রাখত রডরিক।

যাই হোক, চ্যানেল ধরে এগোবার পথে আমাদের মধ্যে আর কোন কথা হল না। ওরা তিনজনেই অস্বাভাবিক গম্ভীর।

অবশেষে রীফের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুলাম আমরা। হোয়েলবোটটাকে পুলের এক জায়গায় স্থির করল রডরিক।

বোতে বসে আছি আমি। ওরা তিনজন একসঙ্গে মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। ওদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে মনে মনে হাসলাম আমি, বুঝলাম তিনজনই আতঙ্কিত হয়ে ভাবছে কাকে সঙ্গে নিয়ে পানির নিচে নামতে চাইব আমি আজ। গতকালকের ঘটনা দগদগে ঘায়ের মত জ্বলজ্বল করছে ওদের স্মৃতিতে।

‘আমি একাই নামছি,’ বললাম ওদেরকে। স্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল তিনজনই।

‘আমি না হয় যাই তোমার সঙ্গে,’ স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল রাফেলা।

‘পরে,’ বললাম ওকে। ‘প্রথমে আমি দেখে আসি হাঙ্গর আছে কিনা। যে-সব জিনিস ফেলে রেখে এসেছি কাল, সেগুলোও নিয়ে আসব আমি।’

অত্যন্ত সাবধানে নামলাম। বোটের নিচে ঝুলে থাকলাম পাঁচ মিনিট, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছি পুলের গভীর প্রদেশ পর্যন্ত ভীতিকর বিশাল আকৃতি-গুলোর কোন আভাস পাওয়া যায় কিনা। রাতের জোয়ার এসে পানি বদলে দিয়েছে পুলের, আগের পানির

সঙ্গে ভেসে গেছে মরা মাছের সব রক্ত আর মাংস কণা। স্পিয়ার, খালি স্কুবা সেট, নষ্ট ডিমাণ্ড ভালব্ নিয়ে পানির ওপর ফিরে এলাম আমি। পুলে হাঙ্গর নেই শুনে আজ এই প্রথম হাসল আমার ক্রুরা।

ওদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে বললাম, ‘ঠিক আছে, আজই আমরা হোল্ডটা ভাঙতে যাচ্ছি।’

‘তুমি খোলের ভেতর দিয়ে ঢুকতে চাও, মাসুদ?’ জানতে চাইল রডরিক।

‘খোল ভাঙতে হলে এক জোড়া প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে,’ বললাম আমি। ‘তা আমি চাই না। প্যাসেঞ্জার ডেক দিয়ে হোল্ডের কুয়ায় ঢুকতে চাই।’ সহজে ওদেরকে বোঝাবার জন্যে ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে স্লেটে একটা নকশা আঁকছি আমি। ‘জাহাজটা উল্টে গেছে, তার মানে জায়গা বদল করেছে তার কার্গো। ওই বাল্কহেডের ঠিক পেছনে গাদা হয়ে আছে সব। এখানটায় যদি ফাটল সৃষ্টি করতে পারি, এক এক করে সব কার্গো কম্প্যানিয়নওয়ে দিয়ে টেনে আনতে পারব আমরা।’

‘ওখান থেকে গানপোর্ট অনেক জটিল আর দূরের পথ,’ মাথায় সী ক্যাপ তুলে ন্যাড়া গম্বুজটা চিন্তিত ভঙ্গিতে চুলকাচ্ছে রডরিক।

‘গানপোর্ট আর গানডেক মইয়ের কাছে দুটো কপিকল তৈরি করে নেয়া যায়।’

‘মেলা কাজ,’ বিষণ্ন দেখাচ্ছে রডরিককে।

‘ঠিক,’ বললাম আমি। ‘তাই হোল্ডে ঢোকার পথ হয়ে গেলে তোমাকে দরকার হবে ওখানে আমার।’ রাফেলার দিকে তাকালাম আমি। ‘এক্সপ্লোসিভ সেট করার কাজে সাহায্য দরকার আমার, তোমাকে নিয়ে যেতে চাই আমি।’

আসলে গতকালের ভয়টা থেকে বের করে আনতে চাই ওকে আমি । ‘কুয়ার দেয়াল ভেঙে আজ আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাব।

বিস্ফোরণের পরপরই পানিতে নামতে যাবার মত ভুল আর আমরা করছি না। রাতের মধ্যে মরা মাছ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে জোয়ারের স্রোত। কাল আবার ফিরে আসব আমরা।'

নিঃশব্দে মাথা কাত করে রাজি হল রাফেলা।

পানিতে নেমে গানপোর্ট দিয়ে ভোরের আলোর ভেতর ঢুকলাম আমরা। প্রথমবার এসে নাইলন লাইন বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম, সেটাই আমাদেরকে গাইড করে গানডেক, সেখান থেকে কম্প্যানিয়ন ল্যাডার ধরে প্যাসেঞ্জার ডেক, তারপর টানেলের ভেতর দিয়ে ফরওয়ার্ড হোল্ডের বেঢপ ভাবে ফুলে থাকা বাল্কহেডের সামনে নিয়ে এল।

বাল্কহেডের কোণে এবং মাঝখানে ছয়টা হাফস্টিক জেলিগনাইট পেরেক দিয়ে আটকালাম আমি। রাফেলা টর্চের আলো ফেলে সাহায্য করল আমাকে।

হোয়েলবোটে ফিরে এসে আমরা যখন স্কুবা গিয়ার খুলছি, এই সময় বিস্ফোরণ ঘটাল রডরিক। বিস্ফোণের ধাক্কাটা জাহাজের খোলই বেশিরভাগ হজম করে নিল, পানির ওপর ক্ষীণ একটা স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই টের পেলাম না আমরা।

তখুনি পুল ত্যাগ করলাম আমরা। সামনে একটা অলস দিন, তাই দেখে খুব খুশি রাফেলা। আবার আগামীকাল ফিরব আমরা, ইতিমধ্যে আজকের মরা মাছগুলোকে জোয়ারের স্রোত এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

বিকেলে আমি আর রাফেলা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে এলাম পিকনিক করতে। এক ঝুড়ি ভর্তি খাবারদাবার নিয়ে এসেছি আমরা, তার সঙ্গে রয়েছে এক বোতল স্কচ হুইস্কি আর এক বোতল শ্যাম্পেন। এসবের সঙ্গে যোগ হল বালি খুঁড়ে বের করা বড় আকারের স্যাণ্ড ক্ল্যাম। এগুলো জলজ লতাপাতা দিয়ে মুড়ে আবার আমি বালিতে পুঁতে রাখলাম, তার ওপর কাঠ জড়ো করে একটা আগুন জ্বালল রাফেলা।

সূর্য নেমে এল দিগন্তরেখার ওপর। ওদিকে মুখে তোলার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে ক্ল্যামগুলোও। শ্যাম্পেন, খাবার, অস্তগামী সূর্যের টকটকে লাল আভা আর ঠাণ্ডা বাতাস নরম একটা প্রতিক্রিয়া ঘটাল রাফেলার ওপর। ওর চোখে এসে বাসা বাঁধল ঝলমলে স্বপ্নেরা, গায়ের সোনা রঙ গলতে শুরু করেছে। আর আকাশ থেকে লালিমার শেষ রেশটুকু মুছে নিয়ে সূর্য পথ করে দিল ই-য়া বড় এক মানসপ্রিয়া চাঁদকে।

সমস্ত বিশ্ব চরাচর মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। কি বিশাল আকাশ! সেখানে এরই মধ্যে অনন্তের পথে চোখ জ্বেলে রওনা হয়েছে তারার দল। আর মাটির পৃথিবীতে আমরা দু'জন দু'জনের হাতে হাত রেখে চোখে চোখ রেখে অপলক তাকিয়ে আছি, বুকে জ্বলছে নির্বাক অনন্ত প্রেম। কিছু বলতে চাইল রাফেলা, কিন্তু সন্ধ্যার কোমল সৌন্দর্য বিহ্বল করে ফেলেছে ওকে, গলা বুজে গেছে ওর। আর আমি, এই মহান সৌন্দর্যের অপার মহিমা এক বিন্দু নষ্ট করতে চাই না বলে কথা বলার কোন চেষ্টাই করলাম না।

প্রকৃতির অমিয় সুধা আকণ্ঠ পান করে নেশাগ্রস্ত মাতালের মত উঠে দাঁড়ালাম আমরা, খালি পায়ে ভিজে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে ফিরে আসছি হাত ধরাধরি করে ক্যাম্পের দিকে। সৌজন্যের সঙ্গে আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছে হলুদ চাঁদটা।

পরদিন সকালেই পুলে পৌঁছুলাম আমরা। হোয়েলবোট থেকে কপিকল সরঞ্জাম নামালাম রডরিক আর আমি। গানডেকে সেগুলো রেখে খোলের ভেতর ঢুকলাম আমরা।

কুয়ার বাইরের গায়ে ফিট করা বিস্ফোরক ডেকিং আর প্যাসেঞ্জার কেবিনের বাল্কহেডগুলো ধসিয়ে দিয়েছে, লম্বা প্যাসেজটার চারভাগের এক ভাগ চাপা পড়ে গেছে তাতে।

রডরিককে কপিকল তৈরির কাজে লাগিয়ে দিয়ে ভেসে চলে

এলাম আমি সবচেয়ে কাছের কেবিনটায়। বিধ্বস্ত, ফাটল ধরা প্যানেলিংগুলো দেখে নিলাম টর্চের আলো ফেলে। আর সব জায়গার মত কেবিনের ভেতরেও মোটা জলজ উদ্ভিদের পিচ্ছিল স্তর জমেছে, তবে এর নিচে সাধারণ ফার্নিচারের আকারগুলো চিনতে পারছি আমি।

ডেক অর্থাৎ মেঝেতে হাজারটা জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এখানে সেখানে থামছি আমি, এটা সেটা তুলে পরীক্ষা করছি। চীনামাটির ভাঙা প্লেট রূপোর তৈরি মল, চুলের কাঁটা, কসমেটিক পট, সেন্ট বটল, ছোটখাট ধাতব জিনিস, এবং ভাঁজ করা মসৃণ কাদা যেগুলো এককালে কাপড় ছিল-এই সব দেখার ফাঁকে রিস্টওয়াচে টর্চের আলো ফেললাম আমি। ওপরে ওঠার সময় হয়েছে আমাদের, এয়ার বটল বদলাতে হবে। ঘুরতে যাচ্ছি, এই সময় চারকোণা একটা জিনিস চোখে পড়ল আমার। টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে গেলাম সেটার দিকে। কাদা আর শ্যাওলার স্তর সরিয়ে হাতে তুলে নিলাম জিনিসটা। কাঠের একটা বাক্স। আকারে পোর্টেবল ট্র্যানজিসটার রেডিওর চেয়ে বড় নয়। কিন্তু ঢাকনাটা মাদার-অব-পার্ল আর টরটয়েজ শেল দিয়ে সুন্দর কারুকাজ করা। বাক্সটা বগলদাবা করে বেরিয়ে এলাম আমি। কপিকল তৈরি শেষ করে গানডেক মইয়ের পাশে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে রডরিক।

হোয়েলবোটের পাশে ভেসে উঠে বাক্সটা ধরিয়ে দিলাম আমি ল্যাম্পনির হাতে।

'একেবারে খালি হাতে ফিরে আসনি, সেজন্যে ধন্যবাদ!' একটু বিদ্রুপের সুরে কথাটা বলে আমাদের জন্যে কফি তৈরি করতে বসল রাফেলা।

নতুন স্কুবা বটলে আমাদের জন্যে ডিমাণ্ড ভালভ চার্জ করছে ল্যাম্পনি, একটা চুরুট ধরিয়ে বাক্সটা নিয়ে বসলাম আমি।

সময় আর লোনা পানি বাক্সটার ক্ষতি করতে কিছু বাকি

রাখেনি। ওপরের ছাল পচে কাদা হয়ে গেছে। রোজউডে চিড় ধরেছে, তালা আর আঙটা ক্ষয়ে গেছে অর্ধেক।

গলুইয়ে আমার পাশে এসে বসল রাফেলা, সাগ্রহে তাকিয়ে আছে বাক্সটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল ও, বলল, 'কি বল তো এটা? লেডিস জুয়েল বক্স। খোল, রানা। দেখি কি আছে ভেতরে।'

তালার ভেতর একটা স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে চাপ দিতেই আঙটা খুলে গেল, লাফিয়ে উঠে ঢাকনিটা চলে গেল পেছন দিকে।

'ওমা!' চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বিস্মিত আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল রাফেলা। তার হাতটাই সবার আগে ঢুকে গেল বাক্সের ভেতর, প্রকাণ্ড একটা লকেট সহ মোটা চেইন তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল হাতটা। কম করেও আট ভরি সোনার ওটা।

বাক্সের ভেতর সবাই এখন হাত ভরছে। সোনা আর নীলা পাথর দিয়ে তৈরি কানের একজোড়া দুল বের করে আনল ল্যাম্পনি, সেটা তার পুরানো তামার ইয়াররিঙ জোড়াকে কান থেকে হটিয়ে দিয়ে জায়গা দখল করল। ওদিকে প্রায় এক পাউণ্ড ওজনের একজোড়া ব্রেসলেট আর দশ ভরি ওজনের একটা নেকলেস নিয়েছে রডরিক, নেকলেসটা গলায় পরে হাসছে সে।

'আমার বেগমকে মানাবে এটা,' মন্তব্য করল সে।

উচ্চ-মধ্যবিত্ত কোন এক গৃহিণীর ব্যক্তিগত গহনাগাটির বাক্স এটা, কোন অলঙ্কারই খুব একটা বেশি দামী নয়, কিন্তু সংগ্রহের সংখ্যা এবং প্রত্যেকটির নির্মাণ সৌন্দর্য অতুলনীয়। বলাই বাহুল্য, বেশিরভাগ অলঙ্কার দখল করে নিল মিস রাফেলা, তবে ওদের কাড়াকাড়ি থেকে সাদামাঠা একটা সোনার ওয়েডিং ব্যাণ্ড কোনরকমে ছিনিয়ে নিতে পারলাম আমি।

'ওটা দিয়ে কি করবে তুমি?' রুখে উঠে জানতে চাইল রাফেলা, বাক্সের ছোট্ট একটা জিনিসও হাতছাড়া করতে রজি নয় ও।

‘কি করব তা আমার মনই জানে,’ বললাম ওকে। ‘তবে শেষ পর্যন্ত এটা তোমার ভাগেই পড়বে।’ কথাটা শেষ করে ভুরু নাচিয়ে হাসলাম আমি, কিন্তু হাসির তাৎপর্যটুকু বৃথা গেল, কারণ এরই মধ্যে আমার ওপর আগ্রহ হারিয়ে আবার বাক্সটার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে রাফেলা। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াচ্ছে।

রডরিকের দিকে চোখ পড়তে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। প্রকাণ্ড কালো-পাহাড়টা বাঙালী নববধূর মত গহনায় ঢাকা পড়ে গেছে। পানিতে আবার ওকে নামাতে ঝামেলা পোহাতে হল আমাকে, কিন্তু প্যাসেঞ্জার ডেকে একবার আমরা নামতেই ধ্বংস স্তূপের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে দানবের মত কাজে লেগে গেল সে।

কপিকল আর আমাদের দু'জনের মিলিত শক্তি দিয়ে প্যাসেজ থেকে ধসে পড়া প্যানেলিং আর টিম্বার বাল্ক সরালাম আমরা, সব গানডেকে নিয়ে এসে একধারে জড়ো করে রাখলাম।

ফরওয়ার্ড হোল্ডের কুয়ার কাছে যখন পৌঁছুলাম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আমাদের এয়ার সাপ্লাই। কুয়ার ভারি প্ল্যাঙ্কের দেয়াল বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেঙে গেছে, গর্তের ভেতর দেখা যাচ্ছে নিরেট মালপত্রের কালো আকৃতি।

পরদিন বিকেলে হোল্ডে ঢুকলাম আমরা। আশা করিনি আমাদের সামনে কাজের এতবড় একটা পাহাড় রয়েছে। হোল্ডের কার্গোগুলো লোনা পানিতে একশো বছরের বেশি ডুবে রয়েছে। নব্বই ভাগ কনটেইনার পচে খসে পড়েছে, ভেতরের জিনিসগুলো কালো এবং শক্ত কাদায় পরিণত হয়েছে। এই কাদার সঙ্গে জড়িয়ে এবং গেঁথে রয়েছে লোহার কনটেইনার, ধাতব এবং পচনশীল নয় এমন সব জিনিসপত্র। এসব উদ্ধার করার জন্যে এই কাদা খুঁড়তে হবে আমাদেরকে।

কাজে হাত দিতে না দিতে দেখা দিল আরেক সমস্যা। কাদার ঢিপি একটু ছুঁলেই সঙ্গে সঙ্গে কালো রঙের জঞ্জাল মেঘের মত উঠছে পানিতে, সেই মেঘগুলোকে ভেদ করতে পারছে না টর্চের আলো, ফলে গাঢ় অন্ধকার ঘিরে ধরছে আমাদেরকে।

বাধ্য হয়ে শুধু হাতের স্পর্শ দিয়ে কাজ করছি আমরা। অস্বস্তিকর পরিবেশ, কাজও এগোচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। কাদার ভেতর নিরেট কিছু হাতে পড়লেই সেটাকে আমরা টেনে টুনে বের করে আনছি, তারপর ঠেলেঠুলে প্যাসেজ দিয়ে নিয়ে এসে কপিকলের সাহায্যে গানডেকে নামাচ্ছি, তারপর পরীক্ষা করে দেখছি জিনিসটা কি আনলাম। ভেতরের জিনিস বের করার জন্যে কখনও আমাদেরকে কন্টেইনারের বাকিটুকু ভেঙে ফেলতে হচ্ছে।

পরীক্ষা করে দেখার পর যেগুলো ফালতু বা অল্প মূল্যের সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি কাজের জায়গাটা পরিষ্কার রাখার জন্যে। প্রথম দিন কাজের শেষে আমরা মাত্র একটা জিনিস উদ্ধার করলাম যেটাকে হোয়েলবোটে তুলব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শক্ত কাঠের একটা বাক্স, ওপরটা চামড়া দিয়ে আর কোণগুলো মোটা পিতলের পাত দিয়ে মোড়া। আকারে বড় একটা কেবিন ট্রাঙ্কের মত।

বাক্সটা এত ভারী যে দু'জনে ধরেও সেটাকে আমরা তুলতে পারলাম না। শুধু ওজন লক্ষ্য করেই প্রচণ্ড আশা জাগল আমার। বিশ্বাস করতে শুরু করেছি এর ভেতর বাঘ সিংহাসনের একটা অংশ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বাক্সটা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় গ্রামের একজন ছুতোর মিস্ত্রি আর তার ছেলেদের তৈরি বলে মনে হয় না, তবে বোম্বে থেকে জাহাজে তোলার আগে সিংহাসনটা নতুন করে প্যাক করাও হয়ে থাকতে পারে।

এই বাক্সে সিংহাসনের কোন অংশ যদি থাকে, পানির মত সহজ হয়ে যাবে আমাদের বাকি কাজ। তখন আমরা জানতে পারব ঠিক কি ধরনের আরও বাক্স খুঁজছি আমরা। কপিকল আর

নিজেদের গায়ের জোর খাটিয়ে গানডেকে, সেখান থেকে গানপোর্টে বের করে আনলাম আমরা বাক্সটাকে। ওপরে ওঠাবার সময় খুলে বা ভেঙে যেতে পারে, তাই একটা নাইলনের কার্গো নেট দিয়ে জড়িয়ে ফেলা হল ওটাকে। এরপর নেটের সঙ্গে বাঁধলাম ক্যানভাসের কয়েকটা এয়ারব্যাগ। সেগুলো আমাদের এয়ার বটলের বাতাস দিয়ে ভরা হল।

তোলার সময় দরকার মত এয়ারব্যাগের বাতাস কমিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে সোজা হোয়েলবোটের দিকে কোর্স কন্ট্রোল করছি আমরা। ভেসে উঠলাম হোয়েলবোটের পাশে, ল্যাম্পনি আমাদেরকে ছয়টা নাইলন স্লিং ধরিয়ে দিল, সেগুলো দিয়ে বাক্সটা বেঁধে তারপর বোটে উঠলাম।

এত বেশি ওজন বাক্সটার, বোটের কিনারা দিয়ে সেটাকে তোলার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল আমাদের। আমরা তিনজন মিলে টেনে তুলতে গেলেই বোট কাত হয়ে যাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত একটা মাস্তুল খাড়া করতে হল, সেটাকে আমরা ডেরিক হিসেবে ব্যবহার করলাম। অগত্যা বাধ্য হয়ে পানি থেকে উঠে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে এসে বোটে নামল বাক্সটা। এক মুহূর্ত দেরি না করে হোয়েলবোটে ঘুরিয়ে নিল রডরিক, দ্বীপে ফিরছি আমরা। জোয়ারের ফোলা, ফাঁপা স্রোত পিছু নিয়েছে আমাদের।

রক্তের ভেতর টগবগ করে ফুটছে প্রচণ্ড কৌতূহল, রাফেলা একটা প্রস্তাব দিতেই আমরা সবাই চিৎকার করে তাকে সমর্থন করলাম। ঠিক হল, বাক্সটাকে গুহার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে না, তার আগে সৈকতেই খুলে দেখতে হবে কি আছে ওটার ভেতর।

জেনি বারের সাহায্যে ঢাকনাটাকে আক্রমণ করল রডরিক। ওর ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে পাশাপাশি রাফেলা আর ল্যাম্পনি। ঢাকনির তালাটা প্রকাণ্ড, কিন্তু লোনা পানিতে

অনেকদিন পড়ে থাকায় ক্ষয়ে গেছে পিতল। প্রথমদিকে খুব সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করল সেটা রডরিকের অত্যাচার, তারপর দু'টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। ঢাকনিটা তুলল রডরিক।

সঙ্গে সঙ্গে হতাশার একটা ধাক্কা অনুভব করলাম বুকে। দেখতে পাচ্ছি, সিংহাসন নেই এর ভেতর। কিন্তু রাফেলা যখন হাত ঢুকিয়ে ভেতর থেকে একটা গোল থালা বের করে এনে পরীক্ষা করতে শুরু করল, টনক নড়ে গেল আমার- বুঝলাম, অত্যন্ত দামী একটা সম্পদ পেয়ে গেছি আমরা।

প্রথম দর্শনেই থালাটাকে সোনার তৈরি বলে মনে হল আমার। বাক্সের ভেতর আশ্চর্য সুন্দরভাবে তৈরি করা র‍্যাক থেকে একটা প্লেট ছোঁ মেরে তুলে নিলাম আমি, নেড়েচেড়ে দেখে বুঝলাম সোনা নয়, এগুলো রূপোর তৈরি, তবে সোনার প্রলেপ দিয়ে পালিশ করা হয়েছে।

সোনার প্লেটিং থাকায় একশো বছর ধরে চেষ্টা করেও লোনা পানি সেটটার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি হাতে ধরা প্লেটটার দিকে। একজন অভিজ্ঞ রৌপ্যকারের সারা জীবনের সাধনার ফসল এই অপূর্ব সুন্দর শিল্পকর্ম, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমার মনে। প্লেটের মাঝখানে এই সেটের মালিকের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রতিক চিহ্ন ফুটে এবং ফুলে রয়েছে, আর কিনারা বরাবর গায়ে গা ঠেকিয়ে রয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্য-বনভূমি, হরিণ, মুসলমানী পোশাক পরা শিকারি শাহজাদা এবং পাখি।

প্রায় দুই পাউণ্ড ওজন হবে আমার হাতের এই প্লেটের, সেটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে বাক্সের ভেতর থেকে এক এক করে বের করলাম বাকিগুলো। বাক্সটা অস্বাভাবিক ভারী লাগছিল, তার কারণ বোঝা গেল এখন। সেটে রয়েছে ছত্রিশ জন মেহমানকে পরিবেশন করার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ডিশ, প্লেট, আর কাটলারি। হাত ধোয়ার গামলা, স্যুপের গামলা, মাছের

প্লেট, ডেজার্টের গামলা, বোন আর সাইড প্লেট, ওয়াইন কুলার, ডিশ কাভার, হরেক রকম পেয়ালা-সবগুলোয় ফুটে রয়েছে একই প্রতীক চিহ্ন আর প্রাকৃতিক দৃশ্য। সার্ভিং ডিশগুলো এক একটা বাচ্চাদের বেদিং টাবের মত বড়।

'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন', ওদেরকে বললাম আমি, 'তোমাদের চেয়ারম্যান হিসেবে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে এই আশ্বাস আমি দিচ্ছি যে আমাদের অভিযান এরই মধ্যে লাভের মুখ দেখতে পেয়েছে।'

'স্কিপারের নেশা হয়েছে,' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল ল্যাম্পনি। 'চকচকে কিছু ডিশ আর প্লেটের কি আর এমন মূল্য হতে পারে শুনি?'

'মুঘল সম্রাটদের মাত্র কয়েকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপোর ডিনার সেটের মধ্যে এটা একটা,' ওদেরকে জানালাম আমি। 'এটা একটা অমূল্য সম্পদ।'

'কত?' জানতে চাইল রডরিক। সন্দেহের দোলায় দুলছে সে।

'গুড গড, তা আমি জানব কিভাবে! কার হাতে তৈরি এবং কে মালিক ছিল তার ওপর নির্ভর করছে এর গুরুত্ব আর অ্যান্টিক ভ্যালু। খোদ কোন একজন সম্রাটের হতে পারে এটা। সেক্ষেত্রে এর মূল্য হবে কল্পনাতীত। আবার এটা একজন সিপাহশালারের জিনিসও হতে পারে, হতে পারে কোন রাজকুমারের। সেক্ষেত্রেও প্রচুর অ্যান্টিক ভ্যালু রয়েছে এর।'

রডরিকের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওর কাছে যেন আমি এক মুঠো হলুদ বালি সোনার গুঁড়ো হিসেবে বিক্রি করার চেষ্টা করছি।

'কত?' প্রশ্নটা আবার করল সে।

'অ্যান্টিক কেনাবেচা করে এমন একটা প্রতিষ্ঠান, ধর, এক লাখ পাউণ্ড দিয়ে সাগ্রহে কিনতে চাইবে।'

'কে পাগল?' জানতে চাইল রডরিক। সিরিয়াস দেখাচ্ছে

ওকে। 'যারা অ্যান্টিকের ব্যবসা করে? নাকি তুমি?'

'কথাটা সত্যি রডরিক,' আমার হয়ে উত্তর দিল রাফেলা। 'রানা বরং বেশ একটু কমিয়ে বলছে। এর দাম আরও অনেক বেশি।'

নিজের বিচার বুদ্ধি এবং সৌজন্য বোধ, এই দুই শক্তির মাঝখানের ফাটলে আটকা পড়ে গেছে এবার রডরিক। রাফেলাকে মিথ্যেবাদিনী বলা অভদ্রতা হয়ে যায়, ওদিকে নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে এই সামান্য জিনিসের দাম এক লাখ পাউণ্ড হতে পারে। শেষ পর্যন্ত মধ্যপন্থা অবলম্বন করল সে-স্রেফ বোবা বনে গেল।

তবে, নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে আমরা সবাই টেনে হিঁচড়ে বাক্সটাকে যখন গুহার দিকে নিয়ে যাচ্ছি, ওর আচরণের মধ্যে সতর্কতা এবং শ্রদ্ধা লক্ষ করলাম আমি। পানির ক্যানগুলোর পেছনে রাখলাম আমরা। তখুনি আমি ছুটে গিয়ে নিয়ে এলাম আনকোরা নতুন একটা হুইস্কির বোতল।

'সিংহাসন যদি নাও পাই,' ওদেরকে জানালাম আমি, 'আমার মনে কোন খেদ থাকবে না।'

ঢক ঢক করে গ্লাসের হুইস্কিটুকু শেষ করে বলল রডরিক, 'এক লাখ পাউণ্ড...হতেও পারে। দুনিয়ায় পাগল-ছাগলের তো আর কোন অভাব নেই।'

'ওই হোল্ড আর কেবিনগুলো আরও সাবধানে দেখতে হবে আমাদেরকে। কিছু যদি হাতের ছোঁয়া এড়িয়ে যায়, মূল্যবান জিনিস থেকে বঞ্চিত হব আমরা।'

'ঠিক তাই,' আমাকে সমর্থন করে বলল রাফেলা। 'রূপোর ডিশ আর প্লেটের চেয়ে ছোট জিনিসগুলোরও সাংঘাতিক অ্যান্টিক ভ্যালু রয়েছে। কিছুই ওখানে ফেলে রেখে আসা চলবে না।'

'সমস্যা হল একটু ছোঁয়া লাগলেই কাদার মেঘ সব অন্ধকার করে দিচ্ছে, নিজের নাকের ডগা পর্যন্ত দেখতে পাই না,' অসন্তুষ্ট

হয়ে বলল রডরিক।

হুইস্কি ঢেলে ওর গ্লাসটা আরেকবার ভরে দিয়ে বললাম আমি, 'আচ্ছা, রডরিক, তোমার সেজো কাকার একটা সেন্ট্রিফিউগাল ওয়াটার পাম্প আছে, মাঙ্কি বে-তে, জানো তো?'

'আছে। কেন?'

'ওটা তার কাছ থেকে কদিনের জন্যে ধার চেয়ে আনতে পারবে তুমি?'

চোখ মুখ পাকিয়ে গভীরভাবে দুশ্চিন্তা করছে রডরিক। একটু পর মুখ তুলে বলল। 'তোমার নাম করে চাইলে দেবে। কিন্তু কি হবে ওটা দিয়ে?'

'একটা ড্রজ পাম্প হিসেবে ব্যবহার করতে চাই ওটাকে আমি,' দু'পায়ের মাঝখানে মাটির ওপর একটা নকশা এঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি ওদেরকে। 'পাম্প। হোয়েলবোটে সেট করব আমরা, স্টিম হোসটা নেমে যাবে ভোরের আলোর ভেতর-এইভাবে', আঙুল দিয়ে এঁকে দেখালাম ওদেরকে। 'হোল্ড পরিষ্কার করার জন্যে ওখানে ওটাকে একটা ভ্যাকিউম ক্লিনার হিসেবে ব্যবহার করব আমরা-কাদা, আর তার সঙ্গে টুকিটাকি সব জিনিস টেনে তুলে আনবে বোটের ওপর...'

'হেই, স্কিপার, দারুণ বুদ্ধি বের করেছ!' সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেখাল ল্যাম্পনি। 'তারপর আমরা কাদা থেকে খুঁটে তুলে নিতে পারব যা কিছু মূল্যবান বলে মনে হবে...'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

আরও এক ঘন্টা আলোচনা করে মূল ধারণার গলদগুলো দূর করলাম আমরা। এতক্ষণ অসীম শক্তির পরিচয় দিয়ে কোনরকমে উৎসাহ দেখানো থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরেছে রডরিক, কিন্তু শেষ দিকে নিজেকে চেপে রাখতে পারল না সে, ছোট্ট করে মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ, এতে কাজ হতেও পারে।'

'যাও তাহলে, পাম্পটা নিয়ে এসো।'

'গলাটা আর একটু ভিজিয়ে নিই,' অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল রডরিক।

অর্ধেক খালি বোতলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম আমি, বললাম, 'এটা সঙ্গে করে নিয়ে যাও, তাতে সময় বাঁচবে।'

'একলাখ পাউণ্ড,' বিড় বিড় করে বলল রডরিক, উঠে দাঁড়াল সে। 'কি জানি, হতেও পারে!'

ব্যাপারটা নিয়ে এখনও সশব্দে মাথা ঘামাচ্ছে ও, বুঝতে পেরে অবাক হলাম আমি।

ওভারকোট নিয়ে আসার জন্যে গুহার ভেতর গিয়ে ঢুকেছে রডরিক। রাফেলা বলল, 'কারও চোখে যাতে পড়ে না যায় সে-ব্যাপারে ওকে তুমি সাবধান করে দেবে না?'

'রডরিক আমার চেয়ে অনেক বেশি সাবধানী,' জানালাম ওকে।

ছয়

পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠলাম আমি আর রাফেলা। হাতে সারাদিন কোন কাজ নেই, আর দ্বীপটায় শুধু আমরা আছি, কথাটা মনে পড়তেই অদ্ভুত এক পুলক অনুভাব করলাম শরীরে। রডরিক আর ল্যাম্পনি বিকেলের আগে ফিরবে না।

ব্রেকফাস্ট সেরে দুই সারি পাহাড়ের মাঝখানে ঝুলন্ত বারান্দা ধরে হেঁটে নেমে এলাম আমরা সৈকতে।

অগভীর পানিতে ছুটোছুটি করে খেলছি আমরা। রাফেলা আমাকে, আমি রাফেলাকে লক্ষ করে মুঠো মুঠো বালি ছুঁড়ছি। রীফের বাইরের পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে বুম বুম বোমা ফাটাচ্ছে ঢেউগুলো, সেই ভারী বিস্ফোরণের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে রাফেলার তীক্ষ্ণ, মিষ্টি, খিলখিল হাসি, আর কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না আমি। স্রেফ কপালগুণে মুখ তুলে ওপর দিকে

একবার তাকাতেই দ্বীপের পেছন দিক থেকে হালকা প্লেনটাকে ছুটে আসতে দেখলাম আমি।

'দৌড়াও!' ঝট্ করে মুখ নামিয়ে রাফেলার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু ও মনে করছে আমি ঠাট্টা করছি। দ্রুত হাত তুলে আকাশের প্লেনটাকে দেখালাম ওকে। 'দৌড়াও। পাইলট যেন আমাদেরকে দেখতে না পায়।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রাফেলা। কিন্তু বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পেরে পর মুহূর্তে সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিল ও, বিবস্ত্র অবস্থায় ছুটে উঠে এল পানি থেকে।

ওকে সঙ্গে নিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি আমি, বালির ওপর দিয়ে উঠে যাচ্ছি সৈকতের ওপর দিকে। এতক্ষণে কানে আসছে ইঞ্জিনের শব্দ। ঝট করে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন দিকে তাকালাম। দ্বীপের দক্ষিণ দিকের পাহাড়টার একেবারে গা ছুঁয়ে আড়াআড়িভাবে ছুটে আসছে প্লেনটা, লম্বা সৈকতের ওপর পৌঁছে একটু দিক বদলে সোজা এগোচ্ছে এখন আমাদের দিকে।

'কুইক!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। আমার আগে রয়েছে রাফেলা। লম্বা ভিজে পায়ে সন্ত্রস্ত হরিণীর মত ছুটছে ও, কালো এলো চুল খোলা পিঠের ওপর নিতম্বের কাছে ঝাপটা মারছে ঘন ঘন।

আবার পেছন দিকে তাকালাম আমি। এখনও এক মাইল দূরে রয়েছে প্লেনটা, কিন্তু এগিয়ে আসছে সোজা আমাদের দিকে। দেখতে পাচ্ছি, ডবল ইঞ্জিনের একটা প্লেন ওটা, তুষার সাদা প্রবাল বালির বিস্তৃতির দিকে ঝুলে পড়ছে একটু।

গতি মন্থর না করেই ঝুঁকে পড়ে, ছোঁ মেরে তুলে নিলাম আমাদের খুলে রাখা কাপড়চোপড়। তারপর শেষ কয়েক গজ পেরিয়ে এসে একটা ধরাশায়ী নারকেল গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। ঝড়ের দিনে পড়ে গেছে এই গাছ, সব পাতা ঝরে গেছে তার, কিন্তু মাথা নিচু করে কাণ্ডের নিচে গা ঢাকা দিতে কোন

অসুবিধে হল না আমাদের। হাঁপাচ্ছে রাফেলা, বসে থাকতে না পেরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও। বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে আমিও লম্বা হলাম ওর গা ঘেঁষে।

এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওটা একটা ডবল ইঞ্জিনের সেসনা প্লেন। লম্বা সৈকতের ওপর দিয়ে সোজা ছুটে এল, তীরবেগে উড়ে গেল আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। পানিরেখার বড়জোর বিশ ফুট ওপর দিয়ে। ফিউসিলেজটা হলুদ রঙ করা, সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে-Africair, চিনতে পারলাম প্লেনটাকে, সেন্ট মেরীর এয়ারপোর্টে বার ছয়েক এর আগে দেখেছি আমি, হয় ধনী ট্যুরিস্টদেরকে নামিয়ে দিয়েছে, নয়ত তুলে নিয়েছে। Africair-এর হেড অফিস মেইন ল্যাণ্ডে, এটা একটা প্লেন চার্টার কোম্পানি। এরা ঘন্টা হিসেবে ভাড়া খাটায় নিজেদের প্লেন। ভাবছি, কে ভাড়া করেছে সেসনাটাকে?

প্লেনের সামনের সিটে দু'জন লোককে দেখতে পেয়েছি আমি। একজন নিঃসন্দেহে পাইলট, আরেকজন আরোহী। সগর্জনে আমাদের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় আমাদের দিকে ফেরানো ছিল ওদের মুখ দুটো। দ্রুত গতির জন্যেই মুখ দুটো ভাল করে দেখতে পাইনি আমি, তাই চিনতে পারার প্রশ্ন ওঠে না। তবে, দুজনেই শ্বেতাঙ্গ।

খাঁড়ির ওপর পৌঁছে যথাসম্ভব কম এলাকা জুড়ে একটা চক্কর দিয়ে বাঁক ঘুরল সেসনা, তারপর আবার ফিরে আসতে শুরু করল সোজা আমাদের দিকে।

এবার মাথার আরও কাছ দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা, মুহূর্তের জন্যে পাইলটের পাশে বসা আরোহীর চোখে চোখ আটকে গেল আমার-মনে হল, চিনি আমি লোকটাকে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারব না।

সৈকতের ওপর দিয়ে খানিকদূর এগিয়ে বাঁক নিল সেসনা, কোর্স বদলে নিল মেইন ল্যাণ্ডের দিকে। তার চলে যাবার

সাবলীলতার মধ্যে বিজয়ীর একটা ভঙ্গি ফুটে উঠেছে, কিছু আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাচ্ছে সে।

হামাগুড়ি দিয়ে গাছের নিচ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি আর রাফেলা, ভিজে শরীরে লেপ্টে থাকা শুকনো পাতার টুকরো আর বালি পরিষ্কার করছি।

'তোমার কি মনে হয়, আমাদেরকে দেখে ফেলেছে ওরা?' সসঙ্কোচে জানতে চাইল রাফেলা।

'রোদ লেগে জোড়া আয়নার মত ঝকঝক করছিল তোমার পাছা দুটো-ওরা কানা নাকি?'

'স্থানীয় জেলে বলে ভুল করতে পারে আমাদেরকে ওরা।'

ওর দিকে তাকালাম আমি, ওর মুখের দিকে নয়, তারপর নিঃশব্দে হাসলাম। 'জেলে? তা যদি মনে করে থাকে তাহলে এখনও ওরা মাথা ঘামাচ্ছে সমস্যাটা নিয়ে।'

'সমস্যা? কিসের সমস্যা?'

'ওরা ভাবছে, জেলের বুকে অমন বড় বড় ও দুটো কি?'

'মাসুদ রানা, তুমি একটা ইয়ে, মানে, তুমি একটা জানোয়ার,' বলল রাফেলা। 'ঠাট্টা নয়, রানা, সত্যি বল তো, কি ঘটতে যাচ্ছে এরপর?'

'তা আমিও জানতে চাই, ডারলিং, জানতে পারলে খুব খুশি হতাম,' বললাম ওকে। রূপোর ডিশ আর প্লেটগুলো সঙ্গে করে সেন্ট মেরীতে নিয়ে গেছে রডরিক আর ল্যাম্পনি, কথাটা মনে পড়ে যেতে একটু স্বস্তি বোধ করছি আমি। ওরা সম্ভবত ইতিমধ্যেই টার্টল বে-তে আমার বাড়ির পেছনের মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলেছে সেগুলো। ভাবছি, এখন যদি অভিযান এবং উদ্ধার পর্ব ত্যাগ করতে হয়, তাতেও আমাদের লোকসান নেই।

প্লেনটা চেহারা দেখিয়ে যাওয়ায় আমাদের সবার মনে একটা জরুরী ভাব সেঁধিয়ে গেছে। এখন আমরা নিঃসন্দেহে জানি, গোণা-গুণতি মাত্র অল্প কয়েকটা দিন রয়েছে আমাদের হাতে। যা

করার ঝটপট করে ফেলতে হবে।

সমান অস্বস্তিকর আরেকটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে রডরিক।

'দক্ষিণ দ্বীপমালিকার আশপাশে একনাগাড়ে পাঁচ দিন ঘুর ঘুর করেছে বুমেরাং। কুলি পীক থেকে অনেকেই প্রায় প্রতিদিন দেখতে পেয়েছে তাকে, দেখে মনে হয়েছে কি করছে তা নিজেরই যেন জানা নেই তার।' প্রকাণ্ড মুখের ভাঁজগুলো খুলে সমান হয়ে গেছে রডরিকের, তার মানে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে সে সংবাদটাকে। 'তারপর হঠাৎ করে সোমবারে আবার সে ফিরে এসে নোঙর ফেলেছে গ্র্যাণ্ড হারবারে। টমসন আমাকে জানাল, বুমেরাং-এর মালিক আর তার বেগম হোটেলে গিয়েছিল লাঞ্চ খেতে, সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ফ্রবিশার স্ট্রিটে চলে আসে।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল আমার, ঢ্যাঙা রামাদীনের কথা মনে পড়ে যেতে ভুরু কুঁচকে উঠল। 'তারপর?'

'গোখলে রামাদীনের সঙ্গে তার অফিসে এক ঘন্টা কাটায় ওরা,' বলল রডরিক। 'মিস্টার রামাদীন ওদেরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পৌঁছে দেয় বন্দরে, সেখান থেকে ওরা বুমেরাং-এ ফিরে যায়। এর একটু পরই বুমেরাং নোঙর তুলে রওনা হয়ে যায়।'

'এইটুকুই সব?'

'হ্যাঁ,' বলল রডরিক। 'না, আর একটু আছে। বন্দর থেকে মিস্টার রামাদীন সোজা ব্যাংকে চলে আসে, নিজের সেভিংস অ্যাকাউন্টে জামা দেয় পনেরোশো ডলার।'

'তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'আমার বোনের মেঝো মেয়ে ব্যাংকে চাকরি করে।'

কুৎসিত একদল পোকা আমার তলপেটের চারদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছে অনুভব করলেও, মুখে খুশির ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম আমি। বললাম, 'যাই হোক, মন খারাপ করে কোন লাভ নেই। এসো, পাম্পটা জোড়া লাগাবার কাজটা সেরে ফেলা যাক।

কালকের জোয়ারটা ধরতে চাই আমি।'

ওয়াটার পাম্পটা ধরাধরি করে গুহায় বয়ে নিয়ে এলাম আমরা। কাউকে কিছু না বলে একা আবার ছোট্ট বে-তে হোয়েলবোটের কাছে ফিরে গেল রডরিক। খানিকপর যখন ফিরে এল, ওর হাতে ক্যানভাসে মোড়া লম্বা একটা প্যাকেট দেখতে পেলাম আমি।

'ওটা কি, রডরিক?' জানতে চাইলাম আমি।

একটু ইতস্তত করল রডরিক, সঙ্কোচের সাথে প্যাকেটটা খুলল।

এফ. এন কারবাইন আর তার সঙ্গে এক ডজন স্পেয়ার ম্যাগাজিন নিয়ে এসেছে রডরিক। 'ভাবলাম কাজে লাগতে পারে এটা,' ব্যাখ্যা করল সে।

কারবাইনটা ওর কাছ থেকে নিয়ে জেলিগনাইটের বাক্সগুলোর সঙ্গে মাটির নিচে পুঁতে রাখলাম। ওকে বললাম, 'কাজটা মন্দ করনি।'

রাত জেগে গ্যাস লণ্ঠনের আলোয় কাজ করছি আমরা। মাঝরাতের পর পাম্প আর ইঞ্জিনটা বয়ে নিয়ে এলাম হোয়েলবোটের কাছে। ভারী টিম্বারের তৈরি একটা মেকশিফট মাউন্টিং-এর সঙ্গে বেঁধে সেটাকে আমরা বোটে তুললাম। বোটের ঠিক মাঝখানে রাখলাম সেটাকে। পাম্প নিয়ে আমি আর ল্যাম্পনি সকালবেলাও কাজ করছি, এরই মধ্যে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে হোয়েলবোট ছেড়ে দিয়েছে রডরিক।

পুলে পৌঁছে আধঘন্টা স্থির হয়ে থাকল হোয়েলবোট, তারপর শেষ হল আমাদের কাজ। জোড়া লাগানো হয়ে গেছে, এখন আমরা পরীক্ষা করতে পারি পাম্পটা।

রডরিক, রাফেলা আর আমি পানির নিচে এলাম। কালো, মোটা সাপের মত হোস পাইপটা ধরাধরি করে গানপোর্টের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। হোল্ডের কুয়ায় নিয়ে গিয়ে জায়গা মত ওটাকে বসাতে প্রচুর সময় আর খাটনি গেল আমাদের। রডরিকের কাঁধে চাপড় মেরে ইঙ্গিতে ওকে ওপর দিকটা দেখালাম আমি। ফিন দিয়ে পেডাল করে জাহাজের খোল থেকে বেরিয়ে পানির ওপর উঠে গেল সে।

বেশ খানিকপর হোয়েলবোট থেকে পাম্পের ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল রডরিক, অস্পষ্ট গুঞ্জন আর হোসের গায়ে মৃদু কাঁপুনি অনুভব করে তা টের পেলাম আমরা।

হোল্ডে ঢোকার মুখে কাঠের মোটা একটা থাম রয়েছে, সেটাকে বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে স্থির করে রেখেছি নিজেকে, দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে আছি হোস পাইপের শেষ প্রান্তটা। কার্গোর কালো স্তূপের দিকে ফেলে রেখেছে রাফেলা টর্চের আলো। হোসের খোলা মুখটা ধীরে ধীরে সেদিকে ঘোরালাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম বুদ্ধিটা কাজে দেবে, জঞ্জালের খুদে টুকরোগুলোকে চুম্বকের মত টেনে নিচ্ছে হোস পাইপটা, চোখের পলকে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সব পাইপের মুখের ভেতর। শক্তিশালী একটা স্রোতের মত পাইপে ঢুকছে পানি, ফলে আশপাশে ছোট ছোট ঘূর্ণি সৃষ্টি হচ্ছে।

ইঞ্জিনের ক্ষমতা আর পানির গভীরতার কথা মনে রেখে হিসেব কষে বুঝলাম ঘন্টায় ত্রিশ হাজার গ্যালন পানি টানছে পাম্পটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কাজের জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললাম আমি, এখন আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছুদূর পর্যন্ত। স্তূপে জেনি বার ঢুকিয়ে বড় বড় টুকরো আলাদা করে নিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছি আমাদের পেছন দিকের প্যাসেজে।

ভারী একটা কেস সরাবার জন্যে মাত্র একবার কপিকলটা ব্যবহার করতে হল আমাকে, তাছাড়া বাকি সময় হোস আর জেনি বার দিয়েই কাজ সারতে পারছি।

প্রায় পঞ্চাশ কিউবিক ফুট কার্গো সরাবার পর ওপরে উঠে আমাদের এয়ার বটল বদলাবার সময় হল। প্যাসেঞ্জার ডেকে হোসটাকে শক্ত করে বেঁধে রেখে পানির ওপর উঠে আসতেই বিজয়ীর সম্মান দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হল আমাদেরকে। ল্যাম্পনি আনন্দে লাফাচ্ছে, এমন কি রডরিক পর্যন্ত হাসছে।

হোয়েলবোটের চারদিকের পানি জঞ্জাল আর আবর্জনার কণায় ঘোলাটে নোংরা হয়ে গেছে। পাম্পের আউটলেট দিয়ে রেরিয়ে আসা ছোট ছোট নানান জিনিস একটা বালতিতে তুলেছে ল্যাম্পনি, সেটা প্রায় ভরে গেছে এরই মধ্যে। উঁকি দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেলাম বোতাম, চুলের কাঁটা, আঙটি, খুদে গহনা, পদক, সেই সময়কার রূপো আর সোনার মুদ্রা-কাঁচ, ধাতু আর হাড়ের বিচিত্র একটা সংগ্রহ।

কাজের জায়গায় এখুনি আবার ফিরে যাবার জন্যে অস্থিরতা অনুভব করছি আমি নিজেও, আর রাফেলা তো অধৈর্য হয়ে উঠে আমাকে ঘাড় ধরে নামাতে চাইছে-শেষ পর্যন্ত মাত্র দুটো টান দিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চুরুটটা খয়রাত করে দিতে হল রডরিককে। আবার আমরা পানির নিচে নেমে এলাম।

কাজে হাত লাগাবার পনেরো মিনিট পর বড়সড় একটা বাক্সের কিনারা দেখতে পেলাম স্তূপের ভেতর। এ-ধরনের বাক্স আগেও দেখেছি আমরা, এবং পেছন দিকে সরিয়ে রেখেছি। এটার ওপরের কাঠ পাটখড়ির মত নরম হয়ে গেলেও লোহার পাত আর বড় বড় পেরেক দিয়ে আটাকান বলে প্রথম টুকরোটা টেনে হিঁচড়ে খুলতে বেশ সময় লেগে গেল। প্ল্যাঙ্কটা আমাদের পেছন দিকে সরিয়ে দিলাম আমি। পরের প্ল্যাঙ্কটা সহজেই বেরিয়ে এল। নিচে দেখা যাচ্ছে বিশৃঙ্খল ভাবে গুঁজে রাখা ভিজে খড়। হাত ভরে এর খানিকটা বের করে আনলাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের টানে হোসের মুখের কাছে গিয়ে আটকে গেল সেগুলো। তবে এক সেকেণ্ড পরই পথ করে নিয়ে ঢুকে গেল

পাইপের ভেতর। হোসটা আবার পানি টানতে শুরু করেছে।

বাক্সটার ওপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে অন্যদিকে কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমাকে বাধা দিচ্ছে রাফেলা। তার দাবি, বাক্সটার ওপর আরও সময় ব্যয় করি আমি। রেগে গেছে আমার ওপর ও, হাত নেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যখন দেখল ওর আবদারে কান দিচ্ছি না, টর্চের আলো অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল সে।

অগত্যা ওকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই বাক্সটার দিকে আবার ফিরলাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো ফেলল সেটার দিকে রাফেলা।

বাক্সের ভেতর থেকে অল্প করে টেনে বের করছি খড়, আবার যাতে পাইপের মুখ বন্ধ করে না দেয়। ইঞ্চি ছয়েক গভীর গর্ত হবার পর খড়ের ফাঁক-ফোকরের ভেতর প্রথম চোখে পড়ল ধাতব পদার্থের ধোঁয়াটে কয়েকটা বিন্দু। তলপেটের গভীরে প্রত্যাশায় কাঁপুনি এই প্রথম অনুভব করছি আমি। ব্যগ্র ব্যস্ততার সঙ্গে আরেকটা প্ল্যাঙ্ক ভেঙে সরিয়ে দিলাম পেছন দিকে। ফাঁকটা বড় হওয়ায় আরও সহজে খড় বের করতে পারছি এখন।

ভেতর দিকে স্তরে স্তরে চেপে বসে আছে খড়, সেগুলো আমি অত্যন্ত ধীরে যত্নের সঙ্গে একটু একটু করে বের করে আনছি। স্বপ্নের মধ্যে একটা মুখ ধীরে ধীরে ফুটে ওঠার মত আত্মপ্রকাশ করছে জিনিসটা।

প্রথমে জটিল কারুকাজ করা এক টুকরো ধাতুর সোনালি আভা ঝিকমিক করে উঠল। পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর প্রায় চড়ে বসে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে রাফেলা, আমার কাঁধটা পাঁচ আঙুল দিয়ে খামচে ধরল ও।

একটা মুখের আভাস দেখতে পাচ্ছি, ঠোঁট জোড়া মুখ ব্যাদানের ভয়াবহ ভঙ্গিতে প্রসারিত, ভেতরে দেখা যাচ্ছে এই বড় বড় সোনালি দাঁত আর বাঁকানো একটা তলোয়ারের মত বিশাল

জিভ। উঁচু, চওড়া কপালটা আমার কাঁধের মত বড় চকচকে হলুদ খুলির সঙ্গে প্রায় সেঁটে রয়েছে কান দুটো। চওড়া দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি একটা মাত্র খালি গর্ত, অক্ষিগোলক। আরেকটা চোখের অভাব জানোয়ারটার চেহারার মধ্যে একটা অন্ধ বীভৎস ভাব এনে দিয়েছে, এটা যেন পৌরাণিক যুগের কোন দেবতা, অভিশাপে পড়ে চেহারা এবং বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

প্রকাণ্ড, আর অপূর্ব সুন্দর করে গড়া বাঘের মাথাটার দিকে তাকিয়ে ভক্তি মেশানো ভয় আর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি আমি। কেমন যেন একটা ভীতিকর ঠাণ্ডা অনুভূতি আমার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসছে, নিজের অজান্তে চারদিকের অন্ধকারে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম মুঘল রাজকুমারদের অতৃপ্ত আত্মারা ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

কাঁধের মাংসের ভেতর রাফেলার আঙুলের নখ সেঁধিয়ে যাচ্ছে, ব্যথ্যা পেয়ে কাঁধটা ঝাঁকালাম আমি, আবার ফিরে তাকালাম সোনার মূর্তির দিকে। কিন্তু ভয় আর বিস্ময় আমাকে এমনভাবে আড়ষ্ট করে ফেলেছে যে ওটার দিকে একটানা কয়েক সেকেণ্ডের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারছি না আমি। বাধ্য হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি, জোর করে নিজের কাঁধে চাপিয়েছি ওটার চারপাশ থেকে জঞ্জাল সরাবার কাজটা।

যত্নের সঙ্গে কাজ করছি আমি, জানি এর কোথাও একটু আঁচড় লাগলেই ঝপ্ করে অনেক নেমে যাবে এর মূল্য, হানি ঘটবে এর অতুলনীয় সৌন্দর্যের।

আমাদের কাজের সময় উতরে গেল, পিছিয়ে এসে উন্মোচিত মাথা আর কাঁধের দিকে তাকালাম আমরা। টর্চের আলো লেগে প্রতিবিম্বগুলো সোনালি তীর-এর মত অন্ধকার গহ্বরের সমস্ত দিকে ছুটে যাচ্ছে, ঝলমলে আলো অদ্ভুত একটা পবিত্রতা এনে দিয়েছে পরিবেশে।

অটুট নিস্তব্ধতা আর গভীর অন্ধকারে ওকে রেখে ঘুরে

দাঁড়ালাম আমরা, জাহাজের খোল থেকে বেরিয়ে এসে উঠতে শুরু করলাম। ওপর দিকে। যেন অন্য এক জগৎ থেকে ফিরছি আমরা।

আমাদেরকে দেখেই রডরিক বুঝতে পারল অর্থপূর্ণ কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু তখুনি কোন প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকল সে। হোয়েলবোটে উঠলাম আমরা। নিঃশব্দে স্কুবা গিয়্যার নামাচ্ছি শরীর থেকে। তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে কড়া আর লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া নিলাম বুক ভরে, ভিজে চুল থেকে মুখ বেয়ে সাগরের লোনা পানির ধারা নামছে, সেগুলো মুছে ফেলার ঝামেলায় যাচ্ছি না। আমাদেরকে লক্ষ করছে রডরিক। ওদিকে আমাদের কাছ থেকে একটু সরে গেছে রাফেলা, একা বসে গোপন কি যেন ভাবনাচিন্তায় মগ্ন।

'পেয়েছ, মাসুদ?' অবশেষে জানতে চাইল রডরিক।

ওপর-নিচে একবার মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'হ্যাঁ, রডরিক, রয়েছে ওটা ওখানে,' আমার কণ্ঠস্বর কাঁপা কাঁপা আর খসখসে, নিজেই অবাক হয়ে গেলাম নিজের গলা শুনে।

ধনুকের ছিলার মত উত্তেজনায় টান টান পরিবেশটা টের পায়নি এতক্ষণ ল্যাম্পনি, আমাদের গিয়ারগুলো সামলে রাখছিল ও, আমার কথা শেষ হতেই ঝট করে মুখ তুলে তাকাল। কিছু বলার জন্যে মুখটা খুলল ও, কিন্তু তারপর সেটা ধীরে ধীরে বন্ধ করে ফেলল শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশটা অনুভব করতে পেরে।

হঠাৎ যেন সব কথা ফুরিয়ে গেছে আমাদের। কথা না বলে নড়াচড়া করছি। ব্যাপারটা এরকম হবে তা আমি আশা করিনি। রাফেলার দিকে তাকালাম আমি। বুঝতে পারছে ও, আমি ওর দিকে তাকিয়েছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের দিকে তাকাল না ও। কিন্তু আমি নজর ফেরাচ্ছি না অনুভব করে শেষ পর্যন্ত তাকাল আমার চোখে। ওর চোখে কি এক চকচকে আলো দেখতে পেলাম আমি। আলোটা আমি ঠিক চিনতে পারলাম না।

এটা ভয়, বিস্ময় অথবা লোভেরও প্রতিবিম্ব হতে পারে।
'চল ফেরা যাক, রানা,' চাপা স্বরে বল রাফেলা।
রডরিকের দিকে ফিরে মাথা কাত করলাম আমি। ইঞ্জিন থেকে হোসটা খুলে হোয়েলবোটের কিনার থেকে পানিতে ফেলে দিল ও, কাল আবার পুলের মেঝে থেকে তুলে নেব আমরা।
গিয়ার দিয়ে বোটের বো ঘুরিয়ে নিল চ্যানেলের দিকে রডরিক।
গলুইয়ে আমার পাশে এসে বসল রাফেলা। ওর কাঁধে একটা হাত তুলে দিলাম আমি, কিন্তু দু'জনের কেউ কোন কথা বলছি না।
সূর্যাস্তের সময় আমাদের ক্যাম্পের ওপরে চূড়ায় উঠে পাশাপাশি বসলাম আমি আর রাফেলা। রীফ-এর দিকে তাকিয়ে দেখছি সাগর থেকে মুছে যাচ্ছে দিনের আলো।
'কেমন যেন অপরাধী লাগছে নিজেকে আমার,' ফিসফিস করে বলল রাফেলা। 'আমি যেন কি এক ভয়ঙ্কর নিষিদ্ধ কাজ করে বসেছি।'
'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'কি বলতে চাইছ বুঝতে পারছি।'
'ওটা...ওটা যেন রক্ত-মাংসের জ্যান্ত একটা কিছু। কি আশ্চর্য, ভেবে দেখ, এত থাকতে আমরা ওর মাথাটাই আগে আবিষ্কার করলাম-প্রচণ্ড রাগে বিকৃত হয়ে ওঠা একটা মুখ হঠাৎ দেখতে পেলাম আমরা।' শিউরে উঠল ও, কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল। 'অথচ অদ্ভুত একটা তৃপ্তিও অনুভব করছি, জানো, ব্যাপারটা ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না তোমাকে আমি-তার কারণ দুটো অনুভূতি পরস্পরবিরোধী, অথচ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে আমার ভেতর।'
'আমি বুঝতে পারছি। আমার অবস্থাও তাই।'
'কি করবে এখন, রানা? ওটা নিয়ে কি করতে চাও তুমি?'
মূল্য, ক্রেতা এসব বিষয়ে এই মুহূর্তে আলাপ করতে সায় দিচ্ছে না মন, তাতে যেন গোটা পরিবেশের পবিত্রতা নষ্ট করে দেয়া হয়, তাই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে রাফেলাকে বললাম, 'চল, নিচে যাই। ডিনার নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে ল্যাম্পনি।'
পেটের খালি জায়গাটা গরম আর সুস্বাদু খাবারে ভরে নিয়ে আগুনের ধারে সবার সঙ্গে গোল হয়ে বসেছি আমি, আমার এক হাতে হুইস্কির গ্লাস, আরেক হাতে জ্বলন্ত চুরুট। এতক্ষণে ঘটনাটা বর্ণনা করার একটা আগ্রহ অনুভব করছি নিজের মধ্যে।
কিভাবে আবিষ্কার করেছি ওটা তা ব্যাখ্যা করার পর ভীতিকর সোনার মাথাটার বর্ণনা দিলাম আমি। নিঃশব্দে শুনল ওরা।
'কাঁধ পর্যন্ত মুক্ত করেছি মাথাটা আমরা। আমার ধারণা, ওখানেই শেষ হয়েছে এই অংশটা। খাঁজ কাটা দাগ দেখেছি। সম্ভবত পরবর্তী অংশটা ওখানে জোড়া লাগবে। কাল আমরা পানির ওপর তুলে আনব ওটাকে, কিন্তু কাজটা খুব জটিল। কপিকল দিয়ে স্রেফ টেনে, তুলে নেয়া চলবে না। একচুল নড়াবার আগে ভাল করে দেখে নিতে হবে কোথাও একটু আঁচড়, যেন না লাগে।'
একটা পরামর্শ দিল রডরিক, সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম আমরা। আলোচ্য বিষয়, ক্ষতির যথাসম্ভব কম ঝুঁকি নিয়ে মাথাটাকে কি করে ওপরে তোলা যায়।
'আমরা আশা করতে পারি গুপ্তধনের পাঁচটা বাক্সই এক সঙ্গে, এক জায়গায় রাখা হয়েছিল। সম্ভবত এই হোল্ডেই বাকি বাক্সগুলো পেয়ে যাব আমরা। বাক্সগুলো দেখতেও একই রকম হবার কথা...'
'শুধু পাথরগুলো কাঠের বাক্সে নেই,' আমাকে বাধা দিয়ে বলল রাফেলা। 'কোর্ট-মার্শালে দাঁড়িয়ে সুবাদার রাম পানাত সাক্ষী দেয়ার সময় কি বলেছিল মনে নেই তোমার? লোহার একটা আয়রন সেফে আছে পাথরগুলো।'

'হ্যাঁ,' মনে পড়েছে আমার।
'সেটা দেখতে কেমন, খুলতে পারা যাবে কিনা...' রডরিক কিছু বলতে যাচ্ছিল।
'কাল জানতে পারব,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল রাফেলা।

সাত

পরদিন সকালে মাথায় ঝম ঝম বৃষ্টি নিয়ে সৈকতে পৌঁছুলাম আমরা। মেঘগুলো একেবারে পাহাড় চূড়ার কাছে নেমে এসেছে, ঘন কালো উঁচু বাঁধের মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে, দিগন্তরেখার নিচ থেকে ভাঁজ খুলে আরও আসছে স্তরের পর স্তর, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ঢল বইয়ে দিচ্ছে দ্বীপের গায়ে।
সাগরের বুকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়েই বিস্ফোরিত হচ্ছে, পানির কণা তারের সাদা একটা জালের মত ঢেকে রেখেছে সাগরের শরীর। কয়েকশো গজ পর বাকি সব অস্পষ্ট, ঝাপসা।
হোয়েলবোট থেকে পানি ছেঁচে কূল করতে পারছে না ল্যাম্পনি। বোটের সব কিছু ভিজে সপসপে হয়ে গেছে, পানির ঢল গড়াচ্ছে প্রতিটি জিনিসের ওপর। স্টার্নে দাঁড়িয়ে আছে রডরিক, বৃষ্টির বর্শা থেকে বাঁচার জন্যে চোখ দুটো ঢেকে রেখেছে হাত দিয়ে। চ্যানেল ধরে এগোচ্ছি আমরা।
প্রবাল প্রাচীরের পাশে উজ্জ্বল কমলা রঙের বয়াটা পানির পিঠে লাফালাফি করছে এখনও। সেটাকে ধরে লাইনে টেনে বোটে তুললাম আমরা হোস পাইপের শেষ প্রান্তটা। পাম্পের মাথার সঙ্গে জোড়া লাগানো হল সেটা। একই সঙ্গে নোঙরের কাজ করছে হোসটা, হোয়েলবোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রডরিক।
পানিতে নেমে বৃষ্টির খোঁচা থেকে বাঁচা গেল। ঝাপসা নীলের ভেতর দিয়ে পুলের নিচে নেমে এলাম আমি আর রাফেলা।

আভাসে হুমকি আর প্রকাশ্যে কিছু ঘুষ দিয়ে আমি আর রডরিক শেষ পর্যন্ত আদায় করতে পেরেছি ল্যাম্পনির কাছ থেকে তার শখের কম্বলটা। পানিতে একবার ভালভাবে ভেজার পর আমাদের সঙ্গে সেটা খুব দ্রুত নেমে এল নিচে। ভাঁজ করে, রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছি ওটাকে আমি, তাই গানডেকে ঢোকাতে কোন অসুবিধে হল না। গানডেকে নামিয়ে, সেখান থেকে প্যাসেঞ্জার ডেকে নিয়ে এসে বাঁধন খুলে ভাঁজ মুক্ত করলাম কম্বলটা। তারপর রাফেলাকে নিয়ে চলে এলাম হোল্ডে, এখানে দেখতে পেলাম ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম সেভাবেই রয়েছে বাঘের মাথাটা-একটা মাত্র অন্ধ চোখের কোটর নিয়ে আক্রোশে মুখ ভেঙচাচ্ছে, টর্চের আলোয় দৃশ্যটা দেখে নিজের অজান্তেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল আমার।
দশ মিনিটের চেষ্টায় খড়ের আশ্রয় থেকে বের করে আনা গেল মাথাটাকে। যা ভেবেছিলাম, কাঁধের কাছেই শেষ হয়েছে অংশটা, কিনারাটা নিখুঁত ভাবে খাঁজ কাটা, পরিষ্কার বোঝা যায় সিংহাসনের পরবর্তী অংশের আরেক প্রস্থ খাঁজের সঙ্গে খাপে খাপে এঁটে যাবে।
মাথাটা ধরে একদিকে কাত করে আরেকটা ব্যাপার আবিষ্কার করলাম আমি। কেন যেন ধরে নিয়েছিলাম মূর্তিটা নিরেট সোনা নিয়ে তৈরি, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়, ভেতরটা ফাঁপা।
এক ইঞ্চি পুরু সোনা দিয়ে গড়া হয়েছে মূর্তিটা, ভেতর দিকটা খরখরে আর উঁচু-নিচু। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এও বুঝলাম যে নিরেট সোনা হলে এটার ওজন হত কয়েক টন, আর তাজমহলের মত কীর্তি নির্মাণ করার সাধ্য রয়েছে যাঁদের তাঁদের পক্ষেও নিরেট সোনার এতবড় একটা সিংহাসন তৈরি করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। ধাতুর ছাল এত পাতলা হওয়ায় স্বভাবতই কাঠামোটা খুব শক্তিশালী হয়নি, সেজন্যে মাথাটা এরই মধ্যে এক জায়গায় আহত হয়েছে।

ঘাড়ের একদিকের নিচু কিনারায় চোট লেগেছে, কিনারা টুকু চটে গেছে এক জায়গায়। ভারতীয় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গোপন পরিবহনের সময়, নাকি সাইক্লোনের মুখে পড়ে ভোরের আলো যখন জীবন-মরণ যুদ্ধ করেছিল তখন এই দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটেছে-নিশ্চিতভাবে এখন আর কিছু বলার উপায় নেই।

হোল্ডের ভেতর পা রাখার জন্যে শক্ত একটা জায়গা বেছে নিলাম আমি, তারপর মাথাটার ওজন পরীক্ষা করার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম ওটার দিকে। একটা শিশুকে দু'হাতের ওপর তুলে নেবার ভঙ্গিতে ধরলাম মাথাটা। ধীরে ধীরে একটু একটু করে গায়ে জোর বাড়িয়ে তুলে নিচ্ছি ওটাকে। উঠে আসছে-বুঝতে পেরে বিস্মিত হচ্ছি না, আনন্দ অনুভব করছি।

সন্দেহ নেই, সাংঘাতিক ভারী মূর্তিটা, শক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে গায়ের সবটুকু জোর খাটিয়ে তবেই তুলতে পেরেছি-তবে, সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে এত ভারী নয় যে তোলা অসম্ভব। আমার সতর্ক অনুমান, তিনশো পাউণ্ডের বেশি হবে না এটার ওজন। ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছি আমি। রাফেলা আমাকে টর্চের আলো ফেলে পথ দেখাচ্ছে। দু'পা এগিয়ে ডেকে বিছানো মোটা কম্বলের ওপর ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ে নামিয়ে রাখলাম মূর্তিটা। ধাতুর তীক্ষ্ণ কিনারাগুলো দাঁত বসিয়ে দিয়েছে আমার হাতে, আর ওজনের চাপে টনটন করছে পেশীগুলো। হাত দুটোর যত্ন নেবার ফাঁকে সাগ্রহে কষে ফেললাম অঙ্কটা।

তিনশো পাউণ্ড। ষোলো আউন্সে এক পাউণ্ড। তার মানে চার হাজার আটশো আউন্স। এক আউন্স যদি পাঁচশো হয়, চার হাজার আটশো আউন্সে কত হয়? চব্বিশ লক্ষ টাকা! এটা শুধু একটা অংশ, শুধু মাথাটার মূল্য। সিংহাসনের আরও তিনটে অংশে রয়েছে। সেগুলো সম্ভবত এটার চেয়ে বেশি বড় আর ভারী। এরপর রয়েছে পাথরগুলো। সব যোগ করলে যোগফল দাঁড়াবে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত। এখানেই শেষ নয়, যোগফলের সঙ্গে

যোগ হবে শিল্পগুণ আর ঐতিহ্যের মূল্য-দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ বেড়ে যেতে পারে সিংহাসনের সামগ্রিক মূল্যমান।

নিজেকে ক্ষান্ত করলাম আমি, এখন হিসেব করার সময় নয়। বাঘের মাথাটা কম্বল দিয়ে মুড়ছে রাফেলা, সেটাকে রশি দিয়ে বাঁধতে ওকে সাহায্য করলাম। কপিকলের সাহায্য নিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে মইয়ের কাছে নামিয়ে আনলাম বোঝাটাকে আমরা, ওখান থেকে আবার কপিকলের সঙ্গে বেঁধে ধীরে ধীরে গানডেকে নামিয়ে দিলাম।

গানপোর্টের অল্প পরিসর দিয়ে বোঝাটাকে বাইরে বের করে আনতে হিমশিম খাচ্ছি আমরা। দুজন ধরেছি ওটাকে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোচ্ছে রাফেলা, আর পিছু হটছি আমি। অবশেষে কোথাও ধাক্কা না খেয়ে বেরিয়ে আসতে পারলাম। নাইলন কার্গো নেটের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম বোঝাটাকে, এয়ারব্যাগে বাতাস ভরে সেগুলোও নেটের সঙ্গে বাঁধার কাজ শেষ করলাম। তারপর আবার আমাদেরকে হোয়েলবোটের ওপর মাস্তুল খাড়া করতে হল বোঝাটাকে ওপরে তোলার জন্যে।

হোয়েলবোটে নিরাপদে তুলে আনার পর বাঘের মাথাটাকে ঢেকে রাখতে হবে, মাথার দিব্যি দিয়ে এ-ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি কেউ। তাই আবার আমার আর রাফেলার এবং এই প্রথম রডরিক আর ল্যাম্পনির নয়ন সার্থক করার জন্যে কম্বলের ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে মাথাটাকে উন্মুক্ত করলাম আমি।

ঘোমটা খোলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কদাকার পাহাড়ের গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল রডরিক। আর ল্যাম্পনি নিশ্চলক চোখে আমার হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে ছিল।

কম্বলটা সরে গিয়ে মাথাটা বেরিয়ে পড়তেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রডরিক। আমরা সবাই দেখলাম, চিৎকার করে কেঁদে ফেলতে যাচ্ছে সে। তারপরই তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেলাম ল্যাম্পনির। পরমুহূর্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে দেখলাম কান্নার

ছাপটা রডরিকের মুখে হাসির ছাপে পরিণত হচ্ছে।

আনন্দ এবং লোভ চকচক করছে ওদের দু'জনের চোখে। এই ক'দিনের অবরুদ্ধ উত্তেজনা বাঁধ ভাঙা বন্যার মত বেরিয়ে আসছে ওদের গলা থেকে। ঝাড়া দেড় মিনিট বিচিত্র, দুর্বোধ্য ধ্বনি সহযোগে প্রলাপ বকল রডরিক, চোখ উল্টে গেল ওর, মুখের মাংস ভাঁজের ওপর ভাঁজ খেল, এমন ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে যেন পাঁচ মাইল দৌড়ে এসেছে, আর ল্যাম্পনি খুশিতে বারবার দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকছে নিজের, সারা শরীর কাঁপছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়, ঝম ঝম বৃষ্টির সঙ্গে ধুয়ে যাচ্ছে ওর চোখের পানি।

বুদ্ধি করে, এই উৎসব মুহূর্তের কথা মনে রেখেই আমার গিয়ার ব্যাগে ভরে নিয়ে এসেছি স্কচ হুইস্কির একটা বোতল। উদার হস্তে সবার গ্লাস ভরে দিলাম আমি। এখন ওদের সঙ্গে হাসছে রাফেলাও, আমিও বাদ যাইনি।

এক সময় খালি গ্লাসটা পাশে নামিয়ে রেখে রিস্টওয়াচ দেখলাম আমি। 'আরেকবার ডাইভ দেব আমরা,' সিদ্ধান্ত নিয়ে বললাম আমি। 'পাম্পটা আবার তুমি চালু করতে পার, রডরিক।'

এখন আমরা জানি ঠিক কোথায় তল্লাশি চালাতে হবে। যে বাক্সটায় মাথাটা ছিল সেটার বাকি অংশ ভেঙে সরিয়ে ফেলার পর পেছনের ফাঁকটায় আরেকটা একই আকৃতির বাক্স দেখতে পেলাম আমি। সামনে এগোবার আগে হোস পাইপটা সেদিকে বাড়িয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে নিলাম।

এর আগে জেনি বার দিয়ে প্রথম বাক্সের বাকি অংশ ভাঙার জন্যে ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে আমি সম্ভবত পেছনের বাক্সটার পচা প্ল্যাঙ্কগুলো আলগা করে ফেলেছিলাম, এবার হোস পাইপের একটু ছোঁয়া লাগতেই ভারী একটা পাঁচিলের মত ভেঙে পড়ে গেল কয়েকটা প্ল্যাঙ্ক। দ্রুত পিছিয়ে আসতে পারলাম বলে দুর্ঘটনা এড়াতে পারলাম, কিন্তু কাদায় এমনই ঘোলা হয়ে গেল পানি যে সম্পূর্ণ অন্ধের মত হাতড়াচ্ছি আশপাশটা, কিছুই দেখতে পাচ্ছি

না।

অন্ধকারে রাফেলাকে খুঁজছি আমি, আমাকেও খুঁজছে ও-আমাদের একটা করে হাত পরস্পরকে ছুঁয়েই শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। একটু চাপ দিয়ে আশ্বাস দিয়ে জানাল রাফেলা আহত হয়নি ও। আবার আমি হোসপাইপ ঘুরিয়ে ঘোলা পানি পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এল পানি, নতুন কার্গোটার আকৃতি দেখতে পাচ্ছি। পাশে রাফেলাকে নিয়ে টর্চের আলোয় পথ দেখে হোল্ডের আরও ভেতরে ঢুকলাম আমরা।

কাঠের বহিরাবরণটা প্রায় অর্ধেক খসে পড়ে গেছে, আর ভেতরে দেখতে পাচ্ছি চুপচাপ ম্লান চেহারা নিয়ে বসে রয়েছে লোহার সিন্দুকটা। মরচে ধরে প্রায় ঝুরঝুরে বালির মত হয়ে গেছে সিন্দুকের বাইরের দেয়ালটা, হাত দিতেই খরখরে খড়িমাটির মত লাল আয়রন অক্সাইডের গুঁড়ো খসে পড়ল।

কেসটার দু'দিকে ভারী দুটো আঙটা রয়েছে, এককালে এ-দুটো অনায়াসে ঘোরানো যেত, কিন্তু এখন সিন্দুকের মরচে ধরা গায়ের সঙ্গে শক্ত ভাবে আটকে গেছে। তবু আঙটার ভেতর হাত ঢোকাতে পারলাম আমি, অনেক টানা-হ্যাঁচড়া করে বাক্স আর কাদার ভেতর থেকে বের করে আনলাম। জঞ্জাল সরিয়ে অনায়াসে শূন্যে তুলে নিলাম ওটাকে। আমার অনুমান, সব মিলিয়ে দেড়শো পাউণ্ডের কাছাকাছি হবে এটার ওজন, তার বেশি নয়। এই ওজনের বেশির ভাগটাই দখল করে রেখেছে লোহা, সন্দেহ নেই।

প্রকাণ্ড বাক্সটার তুলনায় এটা খুবই ছোট একটা বোঝা, জাহাজের ভেতর থেকে এটাকে বের করে আনতে কোন অসুবিধেই হল না আমাদের। একটা মাত্র এয়ার ব্যাগের সাহায্যে সহজে তুলেও আনা গেল পানির ওপর।

বিপদের নোটিস নিয়ে গানফায়ার রীফ-এর পাঁচিল টপকাচ্ছে স্রোত আর সাদা ফেনা, আমরা যখন সিন্দুকটা তুলতে চেষ্টা করছি হোয়েলবোট তখন এলোপাতাড়ি দুলছে, অস্থির ভাবে বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যেতে চাইছে। বো-এর কাছে ক্যানভাস ঢাকা স্কুবা-বটলের ওপর রাখলাম ওটাকে আমরা। ইতিমধ্যে মোটর থেকে হোস খুলে ফেলে দেয়া হয়েছে পানিতে, ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বোটের নাক ঘুরিয়ে নিতে দেরি করল না রডরিক।

উত্তেজনার চরমে রয়েছি এখনও আমরা, মদের বোতলটা দ্রুত হাত বদল হচ্ছে আমাদের মধ্যে।

'এখন রীতিমত একজন ধনী লোক তুমি, রডরিক,' চিৎকার করে বললাম ওকে আমি। 'কি রকম লাগছে তোমার?'

বোতলটা থেকে দু'ঢোক গিলে নিয়ে প্রথমে বিষম খাওয়া থেকে রক্ষা করল নিজেকে, তারপর খকখক করে কিছুক্ষণ কেশে নিয়ে নিঃশব্দে হাসল রডরিক।

বলল, 'আগের মতই আছি আমি, ম্যান। কোন পরিবর্তন নেই।'

কিন্তু এভাবে এড়িয়ে যেতে দিল না ওকে রাফেলা, জেদের সুরে জানতে চাইল ও, 'তোমার ভাগটা কি করবে তুমি, রডরিক?'

'হ্যাঁ, বল,' জানতে চাইলাম আমি, 'এই অগাধ সম্পদ কি কাজে লাগাবে তুমি?'

'ভাগটা তোমরা আমাকে অনেক দেরি করে দিলে, ম্যান,' রডরিকের কদর্য চেহারায় বিষাদের ছায়া ফুটে উঠল। 'এই ভাগটা যদি আজ থেকে পনেরো-বিশ বছর আগে পেতাম, হ্যাঁ, তখন এটা কাজে লাগত বটে।' বোতল থেকে আরেক ঢোক খেল সে। 'এই-ই আসলে হয়। যখন তুমি যুবক, তখন শত চেষ্টা করলেও পাবে না। আর যখন বুড়ো হতে চলেছ তখন না চাইতেই পেয়ে যাবে। তোমাদের বেলায় অবশ্য উল্টোটা ঘটেছে।'

'তোমার বক্তব্যটা কি, ল্যাম্পনি?' জানতে চাইল রাফেলা।

কোঁকড়ানো লম্বা চুল ভিজছে ল্যাম্পনির, দু'হাত দিয়ে মুখের দু'পাশ থেকে সেগুলো সরাল সে। কিন্তু চুপ করে আছে, যেন শুনতেই পায়নি রাফেলার প্রশ্ন। 'কি হল, বল!' তাড়া লাগাল রাফেলা। 'তুমি তো এখনও যুবক, নিশ্চয়ই কোন স্বপ্ন আছে তোমার?'

নিজেকে আর দমিয়ে রাখতে না পেরে ফিক করে হেসে ফেলল ল্যাম্পনি। বলল, 'মিস রাফেলা, সেই থেকে এখানে বসে ওই কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ। ইতিমধ্যেই একটা তালিকা তৈরি করেছি যেটা এখান থেকে সেন্ট মেরী, সেন্ট মেরী থেকে এখানে, তারপর আবার সেন্ট মেরীতে গিয়ে পৌঁছবে-এত লম্বা।'

সৈকত থেকে গুহায় দু'বার যাওয়া-আসা করতে হল আমাদেরকে বাঘের মাথা আর লোহার সিন্দুকটা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। একটা গুহা আমরা স্টোররূম হিসেবে ব্যবহার করছি, তাতে ঢুকিয়ে দিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানো হল ওগুলোকে।

একটা হ্যাক-স আর জেনি বার নিয়ে সিন্দুকটার তালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি আর রডরিক। কাজটা সহজ তো নয়ই, বরং সাংঘাতিক কঠিন লাগছে। মরচের নিচে আশ্চর্য শক্ত হয়ে গেছে লোহা। প্রথম আধঘন্টায় তিনটে হ্যাকস ব্লেড ভাঙলাম আমরা। আর রাগের মাথায় আমার মুখ থেকে যেসব গালিগালাজ বেরিয়ে এল সেগুলো প্রচুর হাসির খোরাক হয়ে উঠল রাফেলার জন্যে। কিন্তু একটু পর ওই একই জিনিস লজ্জায় লাল করে তুলল ওর মুখের চেহারা। আমার সহকর্মীদের উৎসাহ বাড়াবার জন্যে ওকে একটা হুইস্কির বোতল খুঁজে আনতে পাঠিয়ে দিলাম আমি।

বিশ্রাম নেবার পর নতুন উদ্যমে কাজে হাত দিলাম আবার আমরা। মূল তালাটা এতবড় আর মোটা যে সেটা ভাঙার চেষ্টাই করছি না আমরা। সিন্দুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দু'পাশের তিনটে তিনটে মোট ছয়টা রডের সঙ্গে ঝুলছে সেটা, এই রডগুলোকে কেটে ফেলে তালাটাকে আলাদা করতে হবে

আমাদেরকে। কাজটা সাংঘাতিক কঠিন। মাত্র দুটো রড কাটতেই সন্ধ্যা উতরে গেল। পরিশ্রম বিবেচনা করে আরেকবার বিরতি ঘোষণা করলাম আমি।

কফির জায়গা আজ পুরোপুরি দখল নিয়েছে স্কচ হুইস্কি, এতে সবচেয়ে বেশি খুশি রডরিক। সবার চেয়ে বেশি ঢালছে সে গলায়, আরও দাবি করছে। আলোচনার সময় সবার পরামর্শ চাইলাম আমি, ল্যাম্পনি বলল, 'হাফস্টিক জেলিগনাইট ব্যবহার করলে কেমন হয়, স্কিপার?'

'সত্যি, কেমন হয়?' দ্রুত জানতে চাইল রডরিক, বিস্ফোরণ ঘটাবার লোভে চকচক করছে চোখ দুটো ওর।

এদিক ওদিক মাথা দুলিয়ে নিরাশ করলাম ওদেরকে আমি।

'আসলে আমাদের একটা ওয়েল্ডিং টর্চ দরকার,' বলল ল্যাম্পনি।

'চমৎকার!' এতটা বিরক্ত বোধ করছি যে বিদ্রূপ না করে পারলাম না। 'সবচেয়ে কাছের ওয়েল্ডিং সেটটা এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে রয়েছে-কথা খুঁজে পেলে না আর?'

দুটো গ্যাস লণ্ঠন জ্বলছে গুহার ভেতর, সিন্দুকটাকে ঘিরে বসে আছি আমরা। সোনার মাথাটা সম্মানের উঁচু একটা আসনে বসে হিংস্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। গুহার পেছনের দিকে দেয়ালের একটা শেলফে তুলে রেখেছে ওটাকে রডরিক। আমরা সবাই হতাশ হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি, একা সিন্দুকটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে রাফেলা, কি যেন আবিষ্কার করতে চাইছে ও।

অবাক কাণ্ড, সত্যি সত্যি সিন্দুকটা খোলার একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেলল ও।

দু'ভাবে খোলা যায় সিন্দুকটা, এটা কিভাবে যেন বুঝতে পারে রাফেলা। ঢাকনির গায়ে একই মাপের পাশাপাশি এবং কয়েক সারি খাদ রয়েছে, খাদের ওপর রয়েছে লোহার সেতু। সবগুলো

সেতুকে পেঁচিয়ে এগিয়ে গেছে একটা রড, রডটা ঢাকনির কিনারার কাছে একটা গর্তের ভেতর ঢুকে গেছে। এই গর্তের ভেতর দিকের দেয়ালে একটা ছোট্ট ফুটো আবিষ্কার করেছে রাফেলা। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করেই বুঝলাম এটা একটা চাবির গর্ত।

কিন্তু চাবি পাব কোথায়! দুই ইঞ্চি লম্বা একটা পেরেক গর্তটার ভেতর ঢোকালাম আমি, জানি এতে কাজ হবে না, কিন্তু পেরেকটা একটু ঘোরাতেই খট্ করে শব্দ বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, সঙ্গে সঙ্গে সব ক'টা সেতু মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গিয়ে খাদের ওপর থেকে দু'পাশে সরে গেল। এরপর বাঁকানো রডটাকে খাদ থেকে তুলে ফেলতে কোন অসুবিধেই হল না।

ঢাকনিটা এখন তুলে ফেলা যেতে পরে। কিন্তু ইচ্ছা করে দেরি করছি আমি, সবাইকে আরও কিছু উত্তেজনা উপভোগ করার সুযোগ দিচ্ছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল রাফেলা। 'তিন সেকেণ্ডের বেশি যদি দেরি কর, তোমার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনব আমি...'

'আমরা আপনাকে সমর্থন করব,' জানিয়ে দিল রডরিক।

আর ল্যাম্পনি সেকেণ্ড গুণতে শুরু করে দিল, 'এক...দুই...'

ঢাকনিটা তুললাম আমি। একটা দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে। ঢাকনির উল্টোদিকের গায়ে সেঁটে আছে গাঢ় রঙের পচা কাপড়। সিন্দুকের ভেতর দেখতে পাচ্ছি কাপড়ের একটা স্তর, ভিজে নিরেট একটা ইঁটের মত দেখাচ্ছে। স্তরটা সিন্দুক থেকে বের করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম এটার নিচে একই ধরনের আরেকটা কাপড়ের নরম স্তর রয়েছে।

'সাবধানে, রানা!' সর্তক করে দিয়ে বলে উঠল আমার ঘাড়ের ওপর থেকে রাফেলা। 'কাপড়গুলো শুধু ঢাকনি নয়, ওগুলোই প্যাকেট-ভেতরে কিছু আছে। সরবে তুমি? নরম হাতে নাড়াচাড়া করা দরকার ওগুলো।'

উদারচিত্তে সুযোগটা দান করলাম ওকে আমি। একটু সরে জায়গা ছেড়ে দিলাম।

হাত নাড়ার জায়গা করার জন্যে দু'পাশ থেকে সবাইকে সরিয়ে দিল রাফেলা, আলতোভাবে ধরে সিন্দুকের ভেতর থেকে তুলে আনল ওপরের ভিজে কাপড়ের স্তরটা।

প্রত্যেকটি সুতো দিয়ে বাঁধা, ছুঁতে না ছুঁতেই ছিঁড়ে যাচ্ছে সুতোগুলো। প্রথম প্যাকেটটা হাতে নিয়েছে রাফেলা, এক সেকেণ্ড পরই কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেল সেটা। মোনাজাতের ভঙ্গিতে দুই হাত এক করে ভেঙে যাওয়া পার্সেলটা ধরে আছে ও, সেটাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল সিন্দুকের পাশে ভাঁজ করা তারপুলিনে। পার্সেল থেকে বেরিয়ে পড়েছে খুদে আকৃতির অসংখ্য শক্ত জিনিস, দিয়াশলাই শলাকার মাথার চেয়ে একটু বড় থেকে শুরু করে পাকা আঙুরের সমান পর্যন্ত আছে। প্রতিটি কাগজ দিয়ে মোড়া, কাপড়ের মতই পচে গেছে। এর একটা বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে ঘষল রাফেলা, পচা কাগজ কাদার মত সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল বড় একটা নীল পাথর, চৌকো করে কাটা, মাত্র একটা দিক পালিশ করা।

'স্যাফায়ার?' জিজ্ঞেস করল ও। ওর হাত থেকে পাথরটা নিলাম আমি, গ্যাস লণ্ঠনের আলোয় পরীক্ষা করে দ্বিমত প্রকাশ করলাম।

'না। এটা সম্ভবত ল্যাপিজ লাজুলাই।' নীল কাগজের কণা এখনও লেগে রয়েছে পাথরটার গায়ে, পাথরের রঙ তাতে একটু নীলচে দেখাচ্ছে। 'কাগজের মোড়কে কালি দিয়ে কিছু লিখে রেখেছিল কর্নেল গুডচাইল্ড, যাতে পাথরগুলো আলাদাভাবে চেনা যায়, অর্থাৎ সিংহাসনের নির্দিষ্ট জায়গায় পাথরগুলো যাতে আবার বসাতে কোন অসুবিধে না হয়।'

'এখন আর তা সম্ভব হবে না,' বলল রাফেলা।

'ঠিক বলতে পারছি না,' বললাম আমি। 'কাজটা কঠিন হতে

পারে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব হবে বলে মনে করি না। চেষ্টা করলে পাথরগুলো নির্দিষ্ট খোপে বসিয়ে দিতে পারব।'

প্লাস্টিকের কিছু প্যাকেট আনতে পাঠালাম ল্যাম্পনিকে। কাগজে মোড়া একটা করে পার্সেল বের করছে রাফেলা, তালুতে রেখে প্রতিটা পাথর ঘষে পরিষ্কার করছি আমরা, আর সেই পার্সেলের সমস্ত পাথর একটা আলাদা প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে রাখছি।

তাড়াহুড়োর কাজ নয় এটা, সবাই মিলে দু'ঘন্টা খাটনি দেবার পর বারোটা প্যাকেটে কয়েক হাজার অমূল্য পাথর ভরতে পারলাম আমরা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ল্যাপিজ লাজুলাই, ক্রাইসো বেরিল, টাইগার'স আই, গারনেট, ভারডাইট, এমিথিস্ট। আরও ছয়টা প্লাস্টিকের প্যাকেট ভরেছি আমরা, কিন্তু এই পাথরগুলো পরিচিত নয় আমাদের।

পচা কাগজের শেষ স্তর থেকে একটা পার্সেল বের করছে রাফেলা, দেখেই বুঝলাম আমরা, এটার ভেতর বড় পাথরগুলো রয়েছে। রাফেলার হাত থেকে নিয়ে মোড়কটা খুললাম আমি, গ্যাস লণ্ঠনের আলোয় সবুজ তারার মত জ্বলজ্বল করছে আমার হাতে অনেকগুলো বড় আকৃতির এমারেল্ড। রুদ্ধ হয়ে গেছে আমাদের সবার নিঃশ্বাস, মুগ্ধ চোখে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছি পাথরগুলোর দিকে।

ধীরে ধীরে তারপুলিনের ওপর নামিয়ে রাখলাম আমি এমারেল্ডগুলো। সিন্দুক থেকে শেষ পার্সেলটা বের করার জন্যে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে রাফেলা। অপেক্ষাকৃত ছোট একটা মোড়ক বের করে আনল ও। কাগজের পচা কাদা সরিয়ে দিতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার বুক। মোড়কে এই একটাই পাথর রয়েছে।

অঞ্জলির মাঝখানে ধরে আছে পাথরটা রাফেলা। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে ওর।

‘এটাই সেই গ্রেট মুঘল ডায়মণ্ড?’ কথাটা কানে ঢোকার পর আবিষ্কার করলাম শব্দগুলো আমার গলা থেকেই বেরিয়েছে।

মুরগির ছোট একটা ডিমের মত আকার পাথরটার। কয়েকশো বছর আগে এর যে বর্ণনা দিয়েছিল ব্যাপ্টিস্ট তাভেরনিয়ের তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

একটু আগে পর্যন্ত যে-সব পাথর নাড়াচাড়া করেছি আমরা সেগুলোর সমস্ত উজ্জ্বলতা এক করলেও এই একটা পাথরের উজ্জ্বলতার কাছে তা ম্লান, নিশ্প্রভ বলে মনে হবে। মাত্র একটা সূর্যের উদয় যেমন গোটা আকাশের সমস্ত তারার উজ্জ্বলতা ম্লান করে দেয়, এ-ও যেন ঠিক তেমনি।

কাঁপা হাত দুটো ধীরে ধীরে ল্যাম্পনির দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে রাফেলা। পাথরটা ধরে পরীক্ষা করার সুযোগ দিতে চাইছে তাকে ও। কিন্তু বিদ্যুৎবেগে নিজের হাত দুটো সরিয়ে নিল ল্যাম্পনি, মুঠো করা হাত দুটো পিঠের আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছে, এখনও পাথরটার দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত, মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টিতে।

গোটা শরীরের সঙ্গে ডায়মণ্ড ধরা হাত দুটো এবার রডরিকের দিকে ঘোরাল রাফেলা, বাড়িয়ে ধরল তার দিকে, কিন্তু রডরিকও গ্রেট মুঘল ছুঁতে রাজি হল না। গম্ভীর ভাবে বলল সে, ‘মিস রাফেলা, আপনি মাসুদকে দিন ওটা। ওর অধিকার সবার আগে।’

রাফেলার হাত থেকে নিলাম ওটা। এমন অপার্থিব একটা আগুনের ছোঁয়া এত ঠাণ্ডা লাগছে অনুভব করে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। উঠে দাঁড়ালাম, ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি বাঘটার দিকে। লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করছে সোনা রঙ। প্রচণ্ড আক্রোশে মুখ ব্যাদান করে আছে বাঘটা, তার খালি কোটরে ঢুকিয়ে দিলাম আমি ডায়মণ্ড।

খাপে খাপে বসে গেল ডায়মণ্ডটা, বেইট-নাইফ দিয়ে সোনার হুকগুলো ঘুরিয়ে বসিয়ে দিলাম জায়গা মত। এই হুকগুলো প্রায় একশো বছর আগে কর্নেল গুডচাইল্ড সম্ভবত বেয়োনেটের ডগা

দিয়ে খুলেছিল।

পিছিয়ে এলাম আমি, ওদের চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দ পাচ্ছি। চাপা গলায় ফিসফিস করছে ওরা। গর্তে চোখটা ফিরে আসায় সোনার জানোয়ারটা জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। তার চেহারা আর ভঙ্গির মধ্যে এখন শুধু অন্ধ আক্রোশ নয়, তার সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তির একটা ভাব ফুটে উঠেছে। এই বুঝি তার বিকট গর্জনে সমস্ত গুহাটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

পিছিয়ে এসে সিন্দুকের পাশে সবার সঙ্গে বসলাম আমি। সবাই মুখ তুলে তাকিয়ে আছি সোনার মাথাটার দিকে।

‘রডরিক, ভাই আমার, আমার প্রাণের বন্ধু! তোমার নামটা হৃদয়ে সোনার হরফে যদি লিখে রাখতে চাও-এই সুযোগটা হাতছাড়া কোরো না।’

মুখের মাংস ভাঁজ খেয়ে চেহারাটা কদাকার হয়ে গেল রডরিকের, সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে জানতে চাইল সে, ‘কি করতে হবে আমাকে, মাসুদ?’

‘স্রেফ হুইস্কির বোতলটা বাড়িয়ে দাও এদিকে,’ বললাম আমি।

একবার নিস্তব্ধতা ভেঙে যাওয়ায়, সবাই যেন নিজেদের কণ্ঠস্বর ফিরে পেল, একজন আরেকজনকে থামিয়ে দিয়ে কথা বলে উঠতে চাইছে। বেশিক্ষণ কাটল না, শুকনো গলা ভেজাবার জন্যে হুইস্কির আরেকটা বোতল বরাদ্দের জন্যে অনুরোধ করতে হল আমাকে, আমার আবেদন সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুর করল রাফেলা।

সেদিন অনেকরাত পর্যন্ত চালিয়ে গেলাম আমরা। এমন কি রাফেলা বার্ডেরও নেশা হল একটু। বৃষ্টিতে ভিজে নিজেদের গুহায় ফেরার সময় আমার গায়ে হেলান দিয়ে আছে ও।

‘সত্যি তুমি আমাকে নষ্ট করে ফেলছ, মাসুদ রানা,’ হোঁচট খেয়ে আমাকে নিয়ে পড়ে যাচ্ছিল রাফেলা, কোনমতে সামলে নিয়ে বলল ও। ‘এই প্রথম মদ খেয়ে টলছি আমি।’

‘নষ্টের দেখেছ কি, এই তো সবে শুরু,’ ওকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললাম আমি। ‘একটু পরই দিচ্ছি তোমাকে নষ্টামীর পরবর্তী ট্রেনিং।’

‘কেন যেন ভয় করছে আমার, রানা,’ হঠাৎ প্রসঙ্গ এবং গলার সুর বদলে আমাকে চমকে দিল রাফেলা।

‘কিসের ভয়, রাফেলা?’

ভাবছি, বুমেরাং আর সিডনি শেরিডানের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে ভয় পাচ্ছে রাফেলা। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পূর্ণ নতুন প্রসঙ্গে কথা বলছে ও।

‘ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে যদি কোনদিন আমাদের মধ্যেও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়...দোষ যারই হোক, ধর আমিই না হয় দায়ী-তখন কি তুমি পারবে আমাকে ক্ষমা করতে?’

‘হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন, রাফেলা?’ সাবধানে জানতে চাইলাম আমি।

‘একটু বেশি খেয়েছি তো, তাই আজেবাজে চিন্তা ঢুকছে মাথায়-ভুলে যাও, রানা।’

ভাবছি, আসলেই কি তাই? রাফেলার ভয়টার পেছনে কি নিরেট কোন ভিত নেই? আজেবাজে বলে যেটাকে চেপে যেতে চাইছে তা কি সত্যি তাই?

আমি বিশ্বাস করি না।

আট

রাত শেষ হবার আগেই ঘুম ভেঙে গেল আমার। পাশে শুয়ে আছে রাফেলা, একই মাপের মৃদু নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি ওর। আলগোছে উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। ঠাণ্ডা লাগছে, তাই শর্টস আর উলেন জার্সি পরে নিলাম।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি পশ্চিমা বাতাসে ভাঙন ধরেছে মেঘের স্তরে। কখন যেন থেমে গেছে বৃষ্টি, মেঘের ফাঁক-

ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে জ্বলজ্বলে তারা, তাদের আলোয় চোখের সামনে হাত তুলে রিস্টওয়াচ দেখলাম আমি। তিনটে বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে।

পেচ্ছাব করে ফিরে যাবার সময় দেখলাম আমাদের স্টোররূমে আলো জ্বলছে, গ্যাস লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম আমরা। ফেরার পথে গুহার ভেতর ঢুকব বলে মুখের সামনে দাঁড়িয়েছি। খোলা সিন্দুকটা যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখানেই পড়ে রয়েছে, বাঘের অমূল্য মাথাটাও রয়েছে জায়গা মত, তার কপালে আগুনের মত জ্বলছে গ্রেট মুঘল। আচমকা একটা আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল আমার শরীরে। চোর সবখানেই আছে, সাবধানের মার নেই-হঠাৎ আশঙ্কাটা অস্থির করে তুলল আমাকে।

গুপ্তধন যতটুকু উদ্ধার করা গেছে তা নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। কাল সকালে নয়, এখনই। মদের নেশা কাটেনি আমার, মাথাটা ব্যথা করছে, কিন্তু এ কাজটা আমি ফেলে রাখতে পারি না। তবে একার কাজ নয় এটা, সাহায্য লাগবে আমার।

ওদের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় একবার ডাকতেই ডোরা কাটা পা'জামা পরে নিঃশব্দে বুনো একটা ভাল্লুকের মত বেরিয়ে এল রডরিক তারার আলোয়। সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে ও, কিন্তু ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে। আমার ডাক শুনেই সতর্ক, হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে-নিমেষে ছুটে গেছে মদের নেশা।

আমার ভয়ের কথাটা বললাম ওকে। ঘোঁৎ করে একটা চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ও, তারপর আমার সঙ্গে রওনা হল স্টোরেজ গুহার দিকে। পাথর ভর্তি প্লাস্টিক প্যাকেটগুলো এক এক করে সিন্দুকে ভরলাম আমরা, ঢাকনিটা বন্ধ করে নাইলনের রশি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধলাম। একটা ক্যানভাস তারপুলিন দিয়ে সোনার মাথাটাকে মুড়ে ফেলল রডরিক। বোঝা দুটো কাঁধে তুলে নিয়ে নারকেল

বাগানের দিকে রওনা হলাম দু'জন। এরপর আবার ফিরে আসতে হল গ্যাস লণ্ঠন আর কোদাল নিয়ে যাবার জন্যে।

লণ্ঠনের আলোয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করছি আমরা। জেলিগনাইট আর স্পেয়ার ম্যাগাজিনসহ এফ. এন কারবাইনটা যেখানে রয়েছে সেখান থেকে কয়েক ফুট দূরে বেলে-মাটি খুঁড়ে দুটো অগভীর গর্ত তৈরি করলাম আমরা। বোঝা দুটো গর্তের ভেতর নামিয়ে মাটি চাপা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তারপর অত্যন্ত সাবধানে জায়গাটা থেকে আমাদের উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার কাজে আধঘন্টা সময় ব্যয় করলাম।

'এখন তুমি খুশি, মাসুদ?' অবশেষে কথা বলল রডরিক।

'হ্যাঁ, রডরিক, এখন আমি খুশি। এবার তুমি যাও, সোজা বিছানায় ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দাও।'

নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে হাতে লণ্ঠন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে রডরিক, একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না ও।

এখন আর চেষ্টা করলেও ঘুম আসবে না আমার, মাটি কাটার খাটনি দিতে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে মাথাটা, জেগে উঠেছে শরীরের ভেতর রক্ত। গুহায় ফিরে গিয়ে সকাল না হওয়া পর্যন্ত রাফেলার পাশে চুপচাপ শুয়ে জেগে থাকার কোন মানে হয় না।

নির্জন আর গোপন একটা জায়গা দরকার এখন আমার। নিবিষ্ট মনে কিছু চিন্তা করতে চাই। যে জুয়া খেলায় জড়িয়ে রয়েছি আমি সেই খেলার পরবর্তী চাল কি হবে তা এখন ভেবে বের করা দরকার আমার। নিচু পাহাড় সারির মাঝখানে ঝুলবারান্দাগুলোর কথা মনে পড়তে সে-পথে পা বাড়ালাম আমি। ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছি, এই সময় বাকি মেঘগুলোকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল বাতাস, হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল হলুদ চাঁদটা। পূর্ণ যুবতী হতে এখনও ছয়দিন বাকি ওর। ঝুলবারান্দা থেকে সবচেয়ে কাছের একটা চূড়ায় উঠলাম আমি। বাতাসের ধাক্কা লাগবে না এমন একটা জায়গা বেছে বের করে বসলাম।

একটা চুরুট থাকলে ভাল হত, মাথাটা আরও হালকা হলে খুশি হতাম-কিন্তু এসব নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই কোন।

আধঘন্টা পর দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছুলাম-এ পর্যন্ত যা উদ্ধার করা গেছে তা সিডনি শেরিডানের নাগালের বাইরে সরিয়ে ফেলতে হবে। সুযোগ আর সময়ের অপেক্ষায় আছে ওরা, যে-কোন মুহূর্তে হানা দিতে পারে। তার আগেই সাবধান হওয়া উচিত আমার। ঠিক করলাম, ভোরের আলো ফুটলেই বাঘের মাথা আর সিন্দুকের পাথর হোয়েলবোটে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে যাব সেন্ট মেরীর উদ্দেশে। সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করা আমার প্ল্যান অনুসারেই ওগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।

পরে আরও অনেক সময় পাব আমরা গানফায়ার রীফে ফিরে এসে পুলের তলা থেকে বাকি যা আছে উদ্ধার করার।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যেতে স্বস্তির পরশে শরীর আর মন হালকা হয়ে গেল আমার। নতুন উদ্যমে পরবর্তী বৃহত্তম ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম আমি।

মিস রাফেলা বার্ড। অকুণ্ঠচিত্তে নিজের কাছে স্বীকার করলাম, হ্যাঁ, ওকে আমি ভালবাসি। কথাটা যখন মেনে নিচ্ছি, অদ্ভুত এক স্বর্গীয় পুলক অনুভব করলাম শরীরে। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ল, ভালবাসি ঠিক, কিন্তু ওকে আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি। এখনও আমার কাছে মস্ত একটা ধাঁধা হয়েই রয়েছে ও। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ের প্রস্তাব দেব ওকে আমি। যা কিছু আমার কাছে সাবধানে গোপন করে রেখেছে ও, তখন সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে। ওর চোখের নীল গভীরে ওই কালো ছায়া কিসের, জানতে চাই আমি। ওকে ঘিরে রয়েছে এমন আরও অনেক রহস্যের উত্তর চাই।

এতক্ষণে আলো ফুটছে পুব আকাশে। মহাসাগরের কালো কর্কশ শরীর আলোর ছোঁয়ায় কোমল চেহারা ফিরে পাচ্ছে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পাথর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, বাতাসের তোড়ের মুখে

বেরিয়ে এসে ধীর পায়ে নামছি নিচের দিকে।

চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে বাতাস। পথ হারিয়ে যাতে অন্যদিকে চলে না যাই তার জন্যে মাঝে-মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখে নিচ্ছি সামনেটা। অনেকটা নিচে দেখা যাচ্ছে আমাদের ক্যাম্প এলাকা।

বাতাসের চাপে আরেকবার দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। নিচের দিকে, দূরে তাকিয়ে আছি। খাঁড়ির একটা বাহু দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি এখনও, তবু বে-র খোলা বাহুর দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম নিঃশব্দে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে একটা কালো ছায়া, দুঃস্বপ্নের মত, ভয়ঙ্কর।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার সময় ছায়াটার বো-এর কাছে পানি ছলকে উঠতে দেখে বুঝতে পারলাম নোঙর ফেলা হল। বাতাসে ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে সেটা, লম্বা শরীরের একটা পাশ পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি এখন। এখন আর কোন সন্দেহ নেই আমার। বুমেরাংই।

আমার হুঁশ ফেরার আগেই ইয়ট থেকে একটা বোট নামানো হয়ে গেল। দ্রুত সৈকতের দিকে এগিয়ে আসছে সেটা।

ছুটতে শুরু করলাম আমি।

পথের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লাম একবার, কিন্তু চূড়া থেকে মাথা নিচু করে ছুটে নামার তীব্র গতি এগিয়ে নিয়ে এল আমাকে, মাত্র একটা গড়ান দিয়ে স্প্রিঙের মত আবার আমি খাড়া হয়ে গেছি, দৌড়ের মধ্যে রয়েছি এখনও, ঢিমে হয়ে পড়েনি গতি।

একটা বিস্ফোরণের মত ঢুকলাম ওদের গুহায়। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছি। চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, গলার দু'পাশের রগগুলো ফুলে উঠল আমার, 'ওঠ, রডরিক, ওঠ! এরই মধ্যে সৈকতে পৌঁছে গেছে ওরা!'

হাত-পা ছুঁড়ে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে বেরিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল ওরা। এলোমেলো হয়ে রয়েছে ল্যাম্পনির মাথার চুল, চোখে পিচুটি আর ঘুম ঘুম ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। কিন্তু রডরিক স্থির, সতর্ক আর প্রস্তুত।

'রডরিক,' দ্রুত বললাম ওকে, 'যাও, মাটির নিচ থেকে আমাদের সবেধন নীলমণিটাকে নিয়ে এসো। কুইক, ম্যান! নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে ওরা।'

কথা বলছি, এরই মধ্যে পোশাক পাল্টে শার্ট আর প্যান্ট পরে নিয়েছে ও, কোমরে কষে বেঁধে নিচ্ছে বেল্টটা। গুহা থেকে ভোরের ম্লান আলোয় ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছন থেকে চিৎকার করে বললাম, 'এক মিনিটের মধ্যে তোমার পিছু নিচ্ছি আমি।'

ল্যাম্পনির কাঁধ ধরে ঝাঁকালাম ওকে। 'বোকার মত তাকিয়ে থেকো না। ঘুম থেকে জাগো! আমি চাই মিস রাফেলার ভার নেবে তুমি, বুঝতে পারছ?'

কাপড় পরা শেষ হয়েছে ওর, আমার প্রশ্নের উত্তরে কাত করল মাথাটা।

'এসো,' প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি আমাদের গুহার দিকে, ল্যাম্পনিকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছি আমি। বিছানা থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলাম রাফেলাকে। কাপড় পরতে শুরু করেছে ও, কি করতে হবে বুঝিয়ে দিচ্ছি ওকে দ্রুত।

'তোমার সঙ্গে ল্যাম্পনি যাচ্ছে। এক ক্যান খাবার পানি নেবে তোমরা। কোথাও না থেমে সোজা চলে যাবে দ্বীপের দক্ষিণ দিকে। তার আগে পাহাড় সারির মাঝখানের কার্নিস পেরিয়ে গা ঢাকা দিয়ে নেবে। চূড়ায় উঠে যেখানে ফার্স্ট মেট বারলোর লেখাটা দেখেছিলাম, সেই চিমনিতে লুকিয়ে থাকবে। বুঝতে পারছ কোন্ জায়গাটার কথা বলছি?'

'পারছি, রানা,' ঘাড় কাত করে বলল রাফেলা।

‘ওখান থেকে নড়বে না। কোন পরিস্থিতিতেই নিচে নামবে না বা ওপরে উঠে মুখ দেখাবে না। মনে থাকবে?’

কোমরে শার্ট গুঁজছে রাফেলা, আবার ঘাড় কাত করল সে।

‘মনে রেখ, এই লোকগুলো খুনী। এখন আর ব্যাপারটা পিকনিক বা খেলা নয়। আমরা একদল হিংস্র নেকড়ের সামনাসামনি হয়েছি।’

‘হ্যাঁ, রানা-আমি জানি।’

‘যাও তাহলে,’ জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম ওকে। একটু ইতস্তত করে বললাম, ‘আবার দেখা হবে।’

দ্রুত বেরিয়ে গেল ওরা গুহা থেকে। পাঁচ গ্যালনের পানি ভর্তি ক্যানটা কাঁধে তুলে নিয়েছে ল্যাম্পনি, তার পেছনে দৌড়াচ্ছে ভীত-সন্ত্রস্ত রাফেলা। নারকেল বনের ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জন।

হালকা হ্যাভারস্যাকে দ্রুত কয়েকটা জিনিস ভরে নিলাম আমি। এক বাক্স চুরুট, দিয়াশলাই, বিনকিউলার, পানির বোতল, ভারী একটা জার্সি, এক প্যাকেট চকলেট, টর্চ-এইসব। বেইট-নাইফের খাপসহ বেল্টটা বেঁধে নিলাম কোমরে, হ্যাভারস্যাকের স্ট্র্যাপটা কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম গুহার বাইরে আমিও, নারকেল সারির ভেতর দিয়ে রডরিকের পথ অনুসরণ করে সৈকতের দিকে যাচ্ছি।

পঞ্চাশ গজ দৌড়েছি, এই সময় গুলি হল। ভোরের নিস্তব্ধতাকে টুকরো করে দিল একটা পিস্তল, একটা চিৎকার ঢুকল কানে, তারপর আবার একটা গুলির আওয়াজ। আমার সরাসরি সামনের দিক থেকে আসছে এসব। খুব কাছাকাছি কোথাও থেকে।

দৌড় থামিয়ে একটা নারকেল গাছের গুঁড়ির পেছনে গা ঢাকা দিয়ে বসে পড়েছি আমি। উঁকি দিয়ে যেদিকটায় আলো দেখছি সেদিকে তাকিয়ে আমি। প্রথমে আওয়াজটা ঢুকল কানে। কেউ

ছুটে আসছে। তারপর অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম মূর্তিটা। সোজা আমার দিকেই চলে আসছে। দ্রুত খাপ থেকে টেনে নিচ্ছি বেইট-নাইফটা।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিলাম, তারপর মৃদু কণ্ঠে ডাকলাম, ‘এদিকে!’

বিন্‌ন্‌ করে ঘুরে গেল আমার দিকে ছুটন্ত মূর্তিটা। দ্রুত তালে, তবে খুব কম শব্দ করে হাঁপাচ্ছে রডরিক। এফ. এন রাইফেল আর ক্যানভাসে মোড়া স্পেয়ার ম্যাগাজিনের প্যাকেটটা নিয়ে এসেছে ও। আমাকে দেখতে পেয়ে গতি মন্থর না করেই কাছে চলে এল, একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আচমকা।

‘ওরা দেখে ফেলেছে আমাকে,’ রুদ্ধশ্বাসে বলল ও। ‘বেজন্মারা অনেক লোক।’

ওর কথা শেষ হবার আগেই গাছের ফাঁকে আরও নড়াচড়া লক্ষ্য করলাম আমি। ‘ওই আসছে,’ চাপা গলায় সতর্ক করে দিলাম ওকে। ‘চল যাই।’

নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে দিতে চাই রাফেলাকে, তাই পাহাড় সারির মাঝখানের পথটা এড়িয়ে গেলাম, সরাসরি ছুটছি দক্ষিণ দিকে। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের পানিতে ডোবা আগাছা আর কাদার বিস্তৃতির দিকে যাচ্ছি।

দেখে ফেলল আমাদেরকে ওরা। আলোছায়ায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো, ওদের সামনে দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে ছুটছি আমরা-চেঁচিয়ে উঠল একজন। চিৎকারটা থামার আগেই কাছেপিঠে থেকে পাঁচটা গুলির শব্দ হল, গাছের ফাঁকে পিস্তলের মাজলে আগুনের ঝলক দেখতে পেলাম। আমাদের মাথার ওপর গিয়ে ছুটে গিয়ে একটা বুলেট নারকেল গাছের গায়ে বিঁধল। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি আমরা, কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের চেঁচামেচি অস্পষ্ট হয়ে এল আমাদের পেছনে।

পানিতে ডোবা আগাছার কিনারায় পৌঁছেছি আমরা, চটচটে

কাদা এড়াবার জন্যে বাঁক নিয়ে একই গতিতে দৌড়াচ্ছি। পাহাড় সারির প্রথম ঢালের গোড়ায় এসে থামলাম, দম নিচ্ছি, কান খাড়া করে শুনছি। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে উজ্জ্বল আলো। একটু পরেই সূর্য উঠবে, তার আগে গা ঢাকা দিতে চাই আমি।

জলমগ্ন কাদার দিক থেকে হঠাৎ একটা হৈ-চৈ ভেসে এল। চেঁচামেচির মধ্যে পরিষ্কার টের পাচ্ছি হতাশার সুর। সামনে কাদা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারছে না আবার আমরা অন্য পথ ধরে দ্বীপের ভেতর দিকে চলে এসেছি। যে-পথে এসেছে সেই পথ ধরে ফিরে যেতে হবে ওদেরকে, ভাবছি আমি, নিঃশব্দে হাসছি।

'সব ঠিক আছে, রডরিক,' নিচু গলায় বললাম আমি। 'চলো।' কথাটা শেষ করেছি, কিন্তু এখনও পা বাড়াইনি, এই সময় অন্য দিক থেকে নতুন একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে।

অনেক দূর থেকে আসছে বলে ভোঁতা লাগছে শব্দগুলো কানে। আসছে দ্বীপের সাগর তীরের দিক থেকে, পাহাড় সারি টপকে। কিন্তু চিনতে ভুল হয়নি আমার, ফড়ফড় করে কাপড় ছেঁড়ার একটানা পরিচিত শব্দ-অটোমেটিক রাইফেলের গুলিবর্ষণ।

স্তব্ধ পাথর হয়ে গেছি আমি আর রডরিক। একই আওয়াজ আরেকবার হল। সাবমেশিনগানের লম্বা বিস্ফোরণ, সন্দেহ নেই। তারপর আবার সব চুপচাপ। তবু আরও তিন কি চার মিনিট একই জায়গায় সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'এসো,' মৃদু গলায় বললাম আমি। আর দেরি করা চলে না। ঢাল বেয়ে দ্রুত উঠে যাচ্ছি দক্ষিণ প্রান্তের শেষ চূড়াটার দিকে।

পথে আর কোন চেঁচামেচি বা গোলাগুলির আওয়াজ পেলাম না, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে গুলির আশঙ্কায় কুঁকড়ে আছে মনটা। সরু কার্নিস ধরে সাবধানে ছুটছি, বারবার পেছনে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছি রডরিক ঠিক মত অনুসরণ করতে পারছে কিনা। অবশেষে গভীর ফাটলের ভেতর ঢুকে পড়লাম আমরা। রাফেলার সঙ্গে এখানেই দেখা করবার ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের।

একটু শব্দ নেই। পাথর ছাড়া চিহ্ন নেই আর কিছুর। জায়গাটা অস্বাভাবিক নির্জন। অমঙ্গল আশঙ্কা করে দুর্বল হয়ে পড়ল আমার শরীর। উত্তর পাব না এই ভয়ে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছি চোখে। তবু মৃদু গলায় ডাকলাম, 'রাফেলা? তুমি আছ, ডারলিং?'

অটুট নিস্তব্ধতাই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়ে বাজল আমার কানে। উত্তর জানা হয়ে গেছে আমার। চরকির মত আধপাক ঘুরে তাকালাম রডরিকের দিকে।

'আমাদের অনেক আগে রওনা দিয়েছে ওরা। অনেক আগেই এখানে পৌঁছে যাবার কথা ওদের,' খানিক আগে শোনা অটোমেটিকের আওয়াজ নতুন অর্থ বহন করছে এখন।

হ্যাভারস্যাক থেকে বিনকিউলারটা বের করে চোখে তুলে ফাটল দিয়ে তাকালাম। খুব বেশি দূর দেখতে পাচ্ছি না, ফুলে ওঠা পাহাড়ের গায়ে বাধা পাচ্ছে দৃষ্টি।

'বিপদে পড়েছে ওরা,' দ্রুত ফিরলাম রডরিকের দিকে। 'এসো। চলো যাই, কি হয়েছে ওদের দেখে আসি।'

কার্নিস থেকে ভাঙা টুকরো আলগা পাথরের রাজ্যে নেমে এলাম আমরা। যদি হোঁচট খাই বা পায়ের চাপে আলগা পাথর পিছলে যায়, গড়িয়ে একেবারে নিচে পড়ব, রক্তারক্তি দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। রাফেলার নিরাপত্তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি, কিন্তু পাহাড় থেকে সৈকতের দিকে নামার সময় সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতা বজায় রাখছি। নিচের বনভূমি বা সৈকত থেকে কেউ আমাদেরকে দেখে ফেলতে পারে, মনে রেখেছি সে-সম্ভাবনাটাও।

দুই পাহাড় সারির মাঝখানের একটা ফাঁকে পা দিতেই সামনে দেখতে পেলাম লম্বা সৈকত, বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে একদিকে, আরও দূরে দেখা যাচ্ছে গানফায়ার রীফ-এর আভাস।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছি আমরা। রডরিকের হাত ধরে দ্রুত টেনে নিয়ে এসেছি আড়ালে।

গানফায়ার রীফের ফাঁকটাকে নাগালের মধ্যে রেখে চ্যানেলের মুখে প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে একটা ক্রাশ বোট, দেখেই চিনতে পারলাম ওটাকে আমরা। জিনবালা বে থেকে এসেছে আমার পুরানো বন্ধু হুমায়ুন দাদা। সৈকত থেকে ক্রাশবোটে ফিরছে ছোট একটা মোটর বোট, তাতে খুদে মূর্তি দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো।

'সর্বনাশ, রডরিক!' হতাশা চেপে রাখতে পারলাম না আমি। 'বুদ্ধি খেলিয়ে প্ল্যানটা করেছে ওরা। সিডনি শেরিডান দল পাকিয়েছে হুমায়ুন দাদার সঙ্গে। এখানে পৌঁছতে সেজন্যেই এত দেরি হয়েছে ওদের। সিডনিকে দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়ে হুমায়ুন দাদা চ্যানেল পাহারা দিচ্ছে, যাতে আগের বারের মত এবার আমরা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারি।'

'সৈকতেও লোক পাঠিয়েছে হুমায়ুন দাদা,' বলল রডরিক। 'ওর লোকেরাই মেশিনগানের গুলি চালিয়েছে একটু আগে। কিন্তু বোট নিয়ে আবার তারা ফিরে যাচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না।'

কেন ফিরে যাচ্ছে তা ভাবতে গিয়ে আশঙ্কায় মাথাটা ঘুরে গেল আমার।

'মিস রাফেলা আর ল্যাম্পনি-ওদেরকে কি...তুমি কি মনে কর ওরা পালিয়ে যেতে পেরেছে? নাকি হুমায়ুন দাদার লোকেরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে?'

বিনকিউলার চোখে তুলে মোটর বোটের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। বাইরে খাঁড়ির ঘোলা পানি কেটে ক্রাশবোটের দিকে এগোচ্ছে সেটা। 'পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না কিছু,' বললাম রডরিককে। বোটের পেছনে ভোরের সূর্য উঠছে, পানিতে পড়া রোদের প্রতিবিম্ব ধাঁধিয়ে দিচ্ছে আমার চোখ, বিনকিউলার দিয়েও বোটের লোকজনদেরকে আলাদা ভাবে চিনতে পারছি না। 'হয়ত

বোটেই রয়েছে ওরা, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। আরও ভাল এবং উঁচু জায়গা থেকে মোটর বোটটাকে দেখতে চাই। রোদের মধ্যে হাঁটছি, নিশ্চয়ই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আমাকে ওরা।

চেনা আগুনের ঝলকটা দেখতে পেলাম, গানস্মোকের লম্বা সাদা পালক বেরিয়ে এল ক্রাশবোটের বো-তে বসানো কুইক-ফায়ারার থেকে। তীব্রগতি ঈগলের ডানা বাতাস কেটে যাবার সময় যে শব্দটা হয়, শুনতে পাচ্ছি পরিষ্কার-ছুটে আসছে কামানের শেল।

'শুয়ে পড়!' চেঁচিয়ে উঠে ডাইভ দিলাম আমি, আলগা পাথরের বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লাম।

কাছেই বিস্ফোরিত হল শেলটা। জ্বলে উঠেই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে নিভে গেল একটা আগুন, মুখ আর হাতে আঁচ অনুভব করলাম আমি। ইস্পাতের টুকরো আর পাথর কুচির ঝাঁক ছুটে গেল আমাদের চারদিকে। লাফ দিয়ে সটান উঠে দাঁড়ালাম আমি। চেঁচিয়ে বললাম, 'দৌড়াও!'

পাঁচ পা এগিয়ে দিগন্তরেখার নিচে আড়াল নিচ্ছি, এই সময় দ্বিতীয় শেলটা এসে গেল আমাদের ওপর। মাথার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড শব্দে ছুটে যাচ্ছে, দু'জনেই মাথা নিচু করে নিলাম আমরা।

কব্জি থেকে রক্ত মুছছে রডরিক, দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ঠিক আছ?'

'ছাল উঠে গেছে একটু, ও কিছু না।'

'রডরিক, ওদের খবর নেবার জন্যে নিচে যাচ্ছি আমি। তুমি এখানে অপেক্ষা কর আমার জন্যে, একসঙ্গে দু'জনের ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।'

'অযথা মুখ খরচা করছ। আমিও যাচ্ছি। চলো।'

রাইফেলটা তুলে নিয়ে অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে নামতে শুরু করল রডরিক। ওকে অনুসরণ শুরু করে ভাবছি এফ. এনটা

ওর কাছ থেকে চেয়ে নেব কিনা। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে চোখ বন্ধ করে গুলি করার পদ্ধতি কোন কাজে দেবে না এখন। কিন্তু ওটা চাইলে মন খারাপ হয়ে যাবে ওর।

ধীর গতিতে নামছি আমরা। আড়াল থেকে বেরুচ্ছি না কখনও, সামনে পা ফেলার আগে যতদূর সম্ভব দেখে নিচ্ছি আগে। গোটা দ্বীপ স্তব্ধ হয়ে আছে। বাতাস আর নারকেল পাতার খসখস শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনছি না।

প্রশস্ত একটা ঢাল বেয়ে নামছি, রাফেলা আর ল্যাম্পনির পায়ের দাগ দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম, তারপর দাগ অনুসরণ করে দ্রুত এগোলাম। ওদের ছুটন্ত পায়ের দাগ বালি ছড়ানো মাটিতে গভীর গর্ত সৃষ্টি করেছে। রাফেলার পায়ের ছাপ সরু, আর ল্যাম্পনির খালি পায়ের ছাপগুলো বড় বড়। ঢাল বেয়ে এগুলো অনুসরণ করে যাচ্ছি। আচমকা এক জায়গায় থেমে গেছে ওরা, এখানে পানির ক্যানটা ফেলে গেছে ল্যাম্পনি, তারপর হঠাৎ বাঁক নিয়ে দু'জনে পাশাপাশি ছুটে গেছে ষাট গজের মত।

ওখানে আমরা পেলাম ল্যাম্পনিকে।

বালির ওপর পড়ে আছে। ঘুমাচ্ছে। ওর এই ঘুম ভাঙায় সে-সাধ্য নেই কারও। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি, তাকিয়ে আছি ল্যাম্পনির দিকে, কিন্তু চোখের সামনে অন্য সব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি আমি। ল্যাম্পনিকেই দেখছি, কিন্তু এ ল্যাম্পনি বোটের দড়িদড়া ধরে ঝুলছে, আমার ব্যাগ আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে রাফেলার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিচ্ছে তার ব্যাগ, গ্রেট মুঘল তার দিকে বাড়িয়ে দেয়ায় ভয়ে পেছনে লুকিয়ে ফেলছে মুঠো পাকানো হাত দুটো, শালা বস বলে চেঁচিয়ে উঠছে, আঁটো প্যান্ট পরে হৈ-হুল্লোড় করছে মেয়েদের সঙ্গে লর্ড নেলসনে। কাঁদছি না আমি, কিন্তু অনুভব করছি কাঁদতে পারলে বেঁচে যেতাম। হেভি ক্যালিবারের তিনটে বুলেট খেয়েছে ও। গায়ের মোটা শার্ট ছিঁড়ে বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়

বড় বড় গর্ত রেখে গেছে বুলেটগুলো।

প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে, কিন্তু প্রায় সবটুকুই শুষে নিয়েছে বালি। থকথকে রক্তের স্তরটা ইতিমধ্যে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে, আর চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে পোকা-মাকড়, প্রথম দলটা এরই মধ্যে ক্ষতগুলোর মুখে জায়গা দখলের জন্যে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছে নিজেদের মধ্যে।

দৃষ্টি দিয়ে রাফেলার পায়ের দাগ অনুসরণ করছি আমি। বিশ পা এগিয়েছে ও, তারপর বোকা মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছে আবার ল্যাম্পনির কাছে, হাঁটু গেড়ে বসেছে ওর পাশে। মস্ত ভুলটা এখানেই করেছে রাফেলা, সেজন্যে প্রচণ্ড রাগ হল ওর ওপর আমার। বিপদের সময় এধরনের বোকামি না করলে বোধহয় পালাতে পারত।

হাঁটু গেড়ে বসে রাফেলা ল্যাম্পনির দিকে ঝুঁকে ছিল, এই অবস্থায় ওকে ধরেছে ওরা, টেনে নিয়ে গেছে নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে সৈকতের দিকে। হিঁচড়ে নিয়ে যাবার লম্বা দাগ দেখতে পাচ্ছি বালিতে। বালির কোথাও কোথাও গভীর গর্ত দেখতে পাচ্ছি, এইসব জায়গায় পা আটকে ওদেরকে বাধা দিতে চেষ্টা করছে রাফেলা।

গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে এগোচ্ছি আমি। গাছের শেষ সারিগুলোর পেছনে চলে এসেছি। নিচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাদা বালি। ওদের পায়ের চিহ্ন অনুরসণ করে সৈকতে তাকালাম। মোটরবোটটা যেখানে থেমেছিল, এখনও সেখানে বালির ওপর তার কীল-এর দাগ রয়েছে।

সব বুঝতে পারছি। মোটরবোটে তুলে ক্রাশবোটে নিয়ে গেছে ওরা রাফেলাকে। তাকিয়ে আছি, এই সময় নোঙর তুলে বাঁক নিতে শুরু করল হুমায়ুন দাদার ক্রাশবোট। কোর্স লক্ষ্য করে বুঝতে পারছি খাঁড়ির ভেতর দিকে বুমেরাঙের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছে ওটা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসব, মুহূর্তের জন্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। কি থেকে কি হয়ে গেল, ভাবতে গেলেই অপরাধবোধে জর্জরিত হচ্ছি। এর সবটুকুর জন্যে আমি দায়ী। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমার। রাফেলা আর ল্যাম্পনিকে চোখের আড়াল করা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। হু-হু করছে বুকটা।

যাই হোক, এখন আর পাথরে মাথা ঠুকলেও ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। বরং মাথাটারই এখন সবচেয়ে বেশি যত্ন নিতে হবে-কারণ, বুদ্ধির খেলা শুরু হয়ে গেছে। ভুলের আর কোন অবকাশ নেই। বুদ্ধি দিয়ে বাঁচতে হবে আমাদেরকে, বুদ্ধি দিয়ে উদ্ধার করতে হবে রাফেলাকে, আর বুদ্ধি দিয়েই কড়ায়-গণ্ডায় প্রতিশোধ নিতে হবে ল্যাম্পনি হত্যার-এর কোনটাই কোনটার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ধীর পায়ে ফিরে এলাম রডরিকের কাছে। কারবাইনটা একপাশে নামিয়ে রেখেছে রডরিক, ল্যাম্পনির শরীরটা দু'হাতে নিয়ে বসে আছে বালির ওপর। ওর প্রকাণ্ড কাঁধের ওপর রয়েছে ল্যাম্পনির মাথা। দুলছে রডরিক। চঞ্চল, ছটফটে বাচ্চাকে মা যেন বুকে নিয়ে আদরের চাপড় মারছে, ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে। নিঃশব্দে কাঁদছে রডরিক, চোখের পানির মোটা ধারা গাল বেয়ে চিবুক থেকে ঝর ঝর করে পড়ছে ল্যাম্পনির কোঁকড়ানো চুলে।

রাইফেলটা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিজেদের চারদিকে তাকাচ্ছি আমি। ওদের পাহারা দিচ্ছি, আর আমার এবং নিজের তরফ থেকে ল্যাম্পনির জন্যে কাঁদছে রডরিক। চোখের পানি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওর দুঃখ, সেজেন্য ঈর্ষা হচ্ছে আমার। ল্যাম্পনিকে ওর মতই ভালবাসতাম তো, কিন্তু তবু রডরিকের মত কাঁদতে পারছি না, তাই অন্তরের গভীর অন্তস্তলে প্রচণ্ড ভাবে খোঁচাচ্ছে ধারালো চোখা কি যেন।

'রডরিক,' অবশেষে মৃদু কণ্ঠে বললাম ওকে, 'ওঠো, চলো যাই।'

ল্যাম্পনিকে দু'হাতের মধ্যে নিয়েই উঠে দাঁড়াল রডরিক। পাহাড় সারি বরাবর পথ ধরে ফিরে আসছি আমরা।

কাঁধ-সমান উঁচু ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখানে ফাঁকা একটু জায়গা দেখে পছন্দ হল আমার। জায়গাটায় ঘাস রয়েছে দেখে খুশি হল রডরিকও। খুব গভীর করে কবর খুঁড়লাম না দুটো কারণে। এক, খালি হাত দিয়ে মাটি খোড়া কঠিন। দুই, আমাদের মধ্যে একজনও কেউ যদি বেঁচে থাকি, এখান থেকে তুলে সেন্ট মেরিতে, জুডিথের কাছে নিয়ে যাব আমরা ল্যাম্পনিকে।

আমার বেইট-নাইফ দিয়ে গাছের ডালপালা আর পাতা কেটে জড়ো করলাম। কবরের তলায় সমান করে ডাল ফেলে, তার ওপর বিছিয়ে দিলাম পাতাগুলো। তারপর ধরাধরি করে কবরে নামালাম আমরা ল্যাম্পনিকে। ওর গায়ে মাটি চাপা দিতে হাত উঠল না আমাদের। তাই আবার ডাল কেটে নিয়ে এলাম আমি। কবরের ওপর আড়াআড়িভাবে ফেলা হল সেগুলো, তার ওপর আবার বিছালাম গাছের পাতা। এরপর মাটি ফেলে উঁচু করলাম কবরটাকে।

হাতের তালু দিয়ে চোখ আর গাল থেকে পানি মুছে উঠে দাঁড়াল রডরিক।

'রাফেলাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা,' শান্তভাবে বললাম ওকে। 'ক্রাশবোটে হুমায়ুন দাদার কাছে রয়েছে এখন ও।'

'মিস রাফেলা আহত হয়েছেন?' জানতে চাইল রডরিক।

'মনে হয় না-এখনও অন্তত নয়।'

'কি করতে চাও তুমি এখন, মাসুদ?' জিজ্ঞেস করল ও।

আমার হয়ে উত্তর দিল একটা তীক্ষ্ণ হুইসেলের শব্দ।

বহুদূর ক্যাম্পের দিক থেকে এল আওয়াজটা। খানিকটা উঠে পাহাড়ের ওপর থেকে দ্বীপের নিচের দিকে তাকাতেই খাঁড়ির

ভেতর-বাহুটা দেখতে পেলাম।

আগে যেখানে দেখেছিলাম সেখানেই রয়েছে বুমেরাং, আর তীর থেকে একশো গজের মধ্যে নোঙর ফেলেছে জিনবালা ক্রাশবোট। দখল করে নিয়েছে ওরা আমাদের হোয়েলবোটটা, সৈকতে লোকজন নামাবার কাজে ব্যবহার করছে সেটাকে।

লোকগুলো ইউনিফর্ম পরা, সশস্ত্র। সৈকতে নেমেই ছড়িয়ে পড়ল সবাই, নারকেল বনের ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। হোয়েলবোট দ্রুত ফিরে যাচ্ছে আবার বুমেরাঙের দিকে।

বিনকিউলার চোখে তুলে বুমেরাঙের দিকে তাকাতেই ঘটনার পরিবর্তন লক্ষ করলাম। সাদা গলা-খোলা একটা শার্ট আর ব্লু স্ল্যাকস পরে রয়েছে সিডনি শেরিডান, মই বেয়ে হোয়েলবোটে নামছে সে, অনুসরণ করছে লোরনা পেজকে। লোরনার চোখে গাঢ় রঙের সান গ্লাস, সোনালি চুলের ওপর হলুদ স্কার্ফ জড়িয়েছে, পরনে এমারেল্ড গ্রীন স্ল্যাক স্যুট। ওদেরকে চিনতে পারা মাত্র আমার তলপেটের ভেতর কেমন যেন কিলবিল করে উঠল।

এরপর যা ঘটছে, দেখে হকচকিয়ে গেলাম আমি। লণ্ডনের কার্জন স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে যে লাগেজগুলো রোলস রয়েসে তুলতে দেখেছিলাম, সেগুলো শেরিডানের দু'জন পাণ্ডা ডেকে নিয়ে এসে জড়ো করছে। তারপর এক এক করে সব লাগেজ নামানো হল হোয়েলবোটে।

ইউনির্ফম পরা একজন নাবিক বুমেরাঙের ডেকে দাঁড়িয়ে স্যালুটের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল চোখের পাশে, উত্তরে বাতাসে হাত ঝাপটা মেরে বিদায় দিল তাকে শেরিডান।

বুমেরাঙের কাছ থেকে রওনা দিয়ে ক্রাশবোটের দিকে এগোচ্ছে হোয়েলবোট। এদিকে শেরিডান, তার রক্ষিতা, বডিগার্ড আর মালপত্তর যখন ক্রাশবোটের ডেকে উঠছে ওদিকে তখন নোঙর তুলে নিয়ে বে-এর মুখের দিকে ঘুরে গিয়ে দৃঢ় ভঙ্গিতে চ্যানেলের গভীর পানির দিকে এগোতে শুরু করেছে বুমেরাং।

'চলে যাচ্ছে বুমেরাং, বিড়বিড় করে বলল রডরিক। 'কেন?'

'চলেই যাচ্ছে বুমেরাং, ঠিক ধরেছ তুমি। কেন? ওটাকে আর শেরিডানের দরকার নেই, তাই। নতুন ইয়ার জুটেছে ওর, তার বোটে থেকেই কাজ সারবে ও। বুমেরাং পুষতে রোজ হাজার পাউণ্ড খরচ।'

আবার আমি বিনকিউলার ঘোরালাম ক্রাশবোটের দিকে। সিডনি আর তার প্রেরণার উৎস কেবিনে ঢুকছে।

'সম্ভবত আরও একটা কারণ আছে বুমেরাংকে বিদায় করে দেবার।'

'আরও একটা কারণ, মাসুদ?'

'ওদের কাজগুলো যত কম লোকের সামনে সম্ভব সারতে চায় ওরা।'

'ঠিক, বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছ,' মাথা ঝাঁকাল রডরিক।

'বুঝলে, রডরিক, আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করতে চাইছে ওরা, তুলনা করলে যেন মনে হয় ল্যাম্পনিকে দয়া করেছে।'

'বোট থেকে নামিয়ে আনতে হবে মিস রাফেলাকে, মাসুদ,' ল্যাম্পনির মৃত্যুর বেমক্কা ধাক্কা সামলে উঠছে রডরিক, কাজের দিকে খেয়াল ফিরে আসছে। 'কিছু একটা করতে হবে আমাদেরকে, মাসুদ।'

'ইচ্ছাটা ভাল, রডরিক, মানি আমি। কিন্তু নিজেরা খুন হয়ে গিয়ে রাফেলার খুব একটা কাজে লাগতে পারব না আমরা, পারব কি? আমার বিশ্বাস, গুপ্তধন ওরা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত রাফেলা নিরাপদেই থাকবে।'

ওর প্রকাণ্ড মুখটা উদ্বিগ্ন একটা বুলডগের মত ভাঁজ খেয়ে গেল।

'আমরা কি করতে যাচ্ছি, মাসুদ?'

'দৌড়ানো ছাড়া আপাতত করার কিছুই নেই আমাদের।'

‘ঠিক কি বলছ?’

‘কান পাতো, শোনো...’ বললাম ওকে।

আবার দূর থেকে ভেসে এল হুইসেলের আওয়াজ, তার সঙ্গে বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে এল অস্পষ্ট কিছু কণ্ঠস্বর।

‘আমাদের পেছনে ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়েছে ওরা,’ মৃদু কণ্ঠে বললাম আমি। ‘দ্বীপটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করেছে দলটা।’

‘চল নিচে নেমে ঝাঁপিয়ে পড়ি,’ চাপাস্বরে হুঙ্কার ছাড়ল রডরিক, এফ. এনটা কক্ করল দ্রুত। ‘ওদেরকে দেবার জন্যে আমার কাছে একটা খবর আছে ল্যাম্পনির তরফ থেকে।’

‘বোকার মত কথা বোলো না রডরিক,’ সাবধানে, ভয়ে ভয়ে বললাম ওকে আমি। জানি, একবার বেঁকে বসলে ওকে সামালানো আমার কাজ নয়। ‘যা বলছি শোন। সংখ্যায় ওরা কত, জানতে চাই আমি। তারপর, সুযোগ পেলে, ওদের একজনের ঘাড় মটকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করব আমরা তার অস্ত্রটা। সুযোগের সন্ধানে থাকো, রডরিক, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পরার ইচ্ছাটাকে চেপে রাখো আপাতত। খুব সাবধানে পা ফেলবে তুমি, বুঝতে পেরেছ?’ লক্ষ্যভেদ করার ব্যাপারে ওর হাস্যকর ব্যর্থতার কথা ওকে আর স্মরণ করিয়ে দিলাম না।

‘ঠিক আছে, মাসুদ,’ আমাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দিয়ে বলল রডরিক।

‘পাহাড় সারির এদিকে থাকছ তুমি। টপকে ওপারে গিয়ে আমিও খুঁজব সুযোগ।’ সম্মতি দিয়ে মাথা কাত করল রডরিক। ‘ক্রাশবোটের কামান যেখানে শেল ছুঁড়েছিল সেইখানে দেখা করব আমরা। দু’ঘন্টা পর।’

নয়

ডালকুত্তাদের নাকের ডগায় থাকতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না আমার। ভয় তাড়াবার জন্যে পরস্পরের নাম ধরে ডাকাডাকি

করছে ওরা, এগোবার মধ্যে গা-ঢাকা দেবারও কোন চেষ্টা নেই। ধীর গতিতে খুব সাবধানে সামনে বাড়ছে।

আমার এদিকে সংখ্যায় ওরা নয়জন। সাতজনই কৃষ্ণাঙ্গ, পরনে ন্যাভাল ইউনিফর্ম, হাতে এ. কে. ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল। বাকি দু’জন সিডনি শেরিডানের লোক। এদের পরনে সাদা স্যুট, হাতে স্মল আমর্স। এদের একজনকে চিনতে পারলাম, অনেকদিন আগে দেখেছি, রোভার গাড়িটা চালাচ্ছিল। আরেকজন জোড়া ইঞ্জিন সেসনার পাইলট।

মাথা গোনার কাজ শেষ করে ওদের দিকে পেছন ফিরে দৌড়ে চলে এলাম জলার বাঁকের কাছে। অনুমান করছি, এই বাধাটার কাছে পৌঁছে ঘাবড়ে গিয়ে আরও ছড়িয়ে পড়বে দলটা, সে-সময় নিঃসঙ্গ একজনকে বাগে পেতেও পারি।

লম্বা গলার মত এক চিলতে জমি কাদার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেছে, বুক সমান উঁচু ঘাস আর ম্যানগ্রোভ ঝোপে ঢাকা। কিনারা ধরে খানিকদূর এগিয়ে সামনে গলাটার ওপর আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকা একটা নারকেল গাছ দেখতে পেলাম, মরা পাতা আর উঁচু ঘাসের ভেতর প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে। ওত পেতে অপেক্ষা করার জন্যে এমন জায়গা আর হয় না।

গাছের আড়ালে শুয়ে পড়লাম আমি। বেইট-নাইফটা বেল্টের খাপ থেকে বের করে হাতে ধরে আছি। মনে মনে শাণ দিচ্ছি ওটাতে। সুযোগ পেলেই ছুঁড়ে মারব।

ধীর কিন্তু সমান গতিতে আসছে ওরা। চেঁচামেচিটা কাছে চলে এসেছে। কিন্তু জলাটার সামনে আসতে এখনও এক-দেড় মিনিট সময় লাগবে ওদের।

আগে গেলে বাঘে খায়, কথাটা জানা নেই লোকটার। খসখস শব্দ শুনে তাকাতেই দেখি ঝোপের একটা অংশ দুলছে। সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা।

আমার কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাড়া

পাবার আশায় হাঁক ছাড়ল সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মাটির সঙ্গে চেপে রেখেছি মুখটা, মরা ডালপালা আর শুকনো পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছি। ঝোপের ছোট্ট একটা ফাঁকে তার পায়ের গোড়ালি আর হাঁটুর নিচ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। পরনে মোটা ব্লু সার্জের ট্রাউজার, মোজা ছাড়া ভোঁতা চেহারার সাদা স্নিকার রয়েছে পায়ে। পা ফেলছে, প্রতিবার দেখা যাচ্ছে জুতোর ওপর আফ্রিকার কালো চামড়া।

লোকটা ক্রাশবোটের একজন নাবিক বুঝতে পেরে খুশি হয়ে উঠল মনটা, নিশ্চয়ই ওর কাছে অটোমেটিক রাইফেল আছে।

ধীরে একটু গড়ান দিয়ে ছুরি ধরা হাতটা মুক্ত করে নিলাম। দুই সেকেণ্ড এই কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এরপর কানের এত কাছ থেকে আবার হাঁক ছাড়ল লোকটা, যে লাফ দিয়ে উঠল শরীরের পেশী। আরেকটু হলে নিজের অজ্ঞাতে আওয়াজ বেরিয়ে যাচ্ছিল গলা থেকে। অনেকটা দূর থেকে পাল্টা সাড়া দিল কেউ।

নরম বালিতে শব্দ পাচ্ছি ওর পায়ের। এখনও সোজা আমার দিকে আসছে।

হঠাৎ একটা ঝোপ এড়িয়ে বেরিয়ে এল ও। সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি ওকে। আমার কাছ থেকে দশ পা দূরে।

ন্যাভাল ইউনিফর্ম রয়েছে পরনে, মাঝখানে ছোট্ট লাল পম-পম লাগানো ব্লু ক্যাপ মাথায়, স্ট্র্যাপের সঙ্গে ঝুলছে কোমরের কাছে ভয়াল চেহারার সাবমেশিন-গানটা। একহারা চেহারার লম্বা এক ছোকরা, বড়জোর বিশ বছর হবে বয়স। মুখটা নিভাঁজ, কিন্তু ভয়ে ঘেমে ভিজে আছে। কালো আঁধার মুখের ওপর চোখ দুটো অস্বাভাবিক সাদা আর উজ্জ্বল।

দেখে ফেলল আমাকে। আঁতকে উঠল, কিন্তু একটু সময় নষ্ট না করে বিদ্যুৎগতিতে ঘোরাচ্ছে আমার দিকে মেশিনগানটা। কিন্তু সেটা ওর ডানদিকের কোমরের কাছে ছিল, ঘুরিয়ে আমার দিকে আনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল ওর নিজের শরীরটাই। গলার নিচে

দুই কলারবোন যেখানে মিলেছে, ছোট্ট গর্তটায় লক্ষ্যস্থির করছি আমি। মাথার ওপর তুলে ফেলেছি হাত। ছুঁড়ে দিচ্ছি ছুরিটা।

ছুরিটা ছেড়ে দেবার আগের মুহূর্তে জোর একটা ঝাঁকি দিলাম কব্জিতে, দ্রুত ডানা ঝাপটে পাখির মত লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা হাত থেকে। ঘ্যাচ করে বিঁধল গিয়ে ঠিক জায়গায়। দুই কলারবোনের মাঝখানে সবটুকু সেঁধিয়ে গেছে ছুরির ফলা, গলার নিচে শুধু বেরিয়ে আছে ওয়ালনাট কাঠের হাতলটা।

মুখ খুলে ফেলেছে লোকটা, জিভের ওপর দিয়ে পেছনের লালচে দেয়াল দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। চিৎকার করতে চেষ্টা করছে ও, কিন্তু কোনরকম শব্দ বেরুচ্ছে না, কারণ সবগুলো ভোকাল কর্ডে পোঁচ দিয়েছে ছুরির ফলাটা-এবং ঠিক এটাই চেয়েছিলাম আমি।

আশ্চর্য মন্থর গতিতে হাঁটু ভেঙে ক্রমশ নিচু হয়ে যাচ্ছে লোকটা, মুখ করে রয়েছে আমার দিকে। হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এখন। দু'পাশে ঝুলছে হাত দুটো। বড় একটা নীল মাছি ওর মাথাটাকে দু'বার চক্কর দিয়ে ফিরে এসে বসল ছুরির হাতলের ওপর। কাঁধের স্ট্র্যাপের সঙ্গে এখনও ঝুলছে কারবাইন।

সোজা আমার চোখে তাকিয়ে আছে ও। যেন চিরকালের জন্যে আটকে গেছে আমাদের দৃষ্টি। মুখটা এখনও খোলা। এরপর হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে কাঁপতে শুরু করল সে, নাক আর মুখ দিয়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত আর লাল বুদবুদ, ঝপ্ করে বসে পড়ল মাটিতে, সেজদার ভঙ্গিতে নেমে এল মাথাটা বালির ওপর।

উঠে দাঁড়িয়েছি আমি, মাথা নিচু করে চলে এসেছি লোকটার কাছে। মারা গেছে কিনা পরীক্ষা করা দরকার মনে করছি না। দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে চিৎ করে দিলাম তাকে, ছোট্ট একটা টানে গলা থেকে বের করে নিলাম ছুরিটা। ওর শার্টের আস্তিনে ঘষে মুছে নিলাম ফলার রক্ত।

দ্রুত স্ট্র্যাপসহ কারবাইন আর বেল্টে আটকানো স্পেয়ার ম্যাগাজিনের বাণ্ডিলটা খুলে নিলাম আমি। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলাম ওকে কাদার মধ্যে, বুকে একটা হাঁটু ঠেকিয়ে চাপিয়ে দিয়েছি শরীরের ভার। ধীরে ধীরে থকথকে মোটা কাদার স্তর চারদিক থেকে উঠে এসে ঢেকে দিচ্ছে শরীরটাকে। প্রথমে মাথাটা ডুবে গেল কাদার ভেতর, তারপর সম্পূর্ণ শরীর। স্পেয়ার ম্যাগাজিনের বাণ্ডিলটা কোমরে গুঁজে তুলে নিলাম সাবমেশিনগান, ছুটলাম বাঁকের দিকে।

ডালকুত্তারা জলার কিনারায় এসে পৌঁছুবার আগেই ঘুরপথে ছুট দিয়ে ওদের পেছনে চলে এসেছি আমি। এখনও দৌড়াচ্ছি, ক্রমশ সরে যাচ্ছি ওদের পেছন দিকে, এই ফাঁকে চেক করে নিচ্ছি এ. কে. ফরটিসেভেন। ম্যাগাজিনটা পুরো আছে এখনও, ব্রীচটাও লোডেড। স্ট্র্যাপটা আমার বাঁ কাঁধে আটকে নিলাম, কোমরের কাছে বাগিয়ে ধরে আছি অটোমেটিক কারবাইন।

শ'তিনেক গজ এগিয়ে থামলাম আমি, গা-ঢাকা দিলাম একটা নারকেল গাছের আড়ালে। থকথকে কাদা ভর্তি জলার মধ্যে বিপদে পড়েছে ডালকুত্তারা, ঘন ঘন হুইসেল আর খ্যাপাটে চেঁচামেচি শুনে তাই মনে হচ্ছে আমার। ওদিকে যেন ফাইনাল খেলা চলছে ফুটবল লীগ-এর।

দিক বদলে এখন আমি দ্রুত আড়াআড়িভাবে দ্বীপটাকে পেরোচ্ছি, দক্ষিণ প্রান্তের চূড়ার দিকে, সেখানে কথা হয়েছে দেখা হবে আমার সঙ্গে রডরিকের। নিচের সারির শেষ ঢালটা পেরিয়ে নারকেল গাছের বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। ঘন হয়ে জন্মেছে এদিকে বুনো ঝোপ-ঝাড়, গা ঢাকা দিয়ে আরও দ্রুত এগোতে পারছি সহজেই।

ঢালটা থেকে নেমে এসেছি, উঠতে শুরু করেছি আরেকটা ঢাল বেয়ে। মাথার দিকে প্রায় অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছি, ছলকে উঠল বুকের রক্ত আনকোরা নতুন একটানা বিস্ফোরণের

আওয়াজে।

চাবুকের ঘায়ে বাতাস কাটার মত গর্জে উঠল এফ. এন কারবাইনটা, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল এ. কে. ফরটিসেভেনের প্রচণ্ড দমকা ঝড়।

বিস্ফোরণের দৈর্ঘ্য আর প্রচণ্ডতা লক্ষ করে বুঝলাম কয়েকটা অটোমেটিক তাদের ম্যাগাজিনের পুরোটা ছুঁড়েছে। তারপরই গুমোট নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল, টুঁ-শব্দ নেই কোথাও।

এত করে নিষেধ করার পরও নিজেকে সামলাতে পারেনি রডরিক, বুঝতে পারছি। রেগে গেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছি এই ভেবে যে না জানি কি ভয়ঙ্কর বিপদে জড়িয়ে ফেলেছে ও নিজেকে। একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই, নাকের ডগার কাছে লক্ষ্যস্থির করে থাকলেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ও।

হাঁটা বাদ দিয়ে ছুটতে শুরু করেছি আমি। সোজা নয়, কোনাকুনি উঠে যাচ্ছি ওপর দিকে, যেদিক থেকে শব্দটা পেয়েছি। ঝোপের ভেতর থেকে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এলাম। রডরিককে জীবিত দেখতে পাব কিনা ভেবে উদ্বিগ্ন। সরু একটা প্যাসেজ দেখতে পাচ্ছি, দুই পাঁচিলের মাঝখানে ঢুকে সোজা ত্রিশ গজ পেরিয়ে উঠে এলাম ঢালের মাথায়, আর একটু হলেই লোকটার দুই হাতের মাঝখানে সেঁধিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। উল্টোদিক থেকে ছুটে আসছে সে, আমারই মত ঝড়ের বেগে।

একই লাইনে এর পেছনে রয়েছে আরও ছয়জন। শেষ লোকটা রয়েছে ত্রিশ গজ পেছনে, নিরস্ত্র, তাজা রক্তে ভিজে গেছে জ্যাকেটটা।

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে ওদের সবার চোখ, স্বয়ং আজরাইল যেন তাড়া করেছে ওদেরকে।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম, রডরিকের গুলি এড়িয়ে পালিয়ে আসা দল এটা। নিশ্চয়ই এমন কিছু দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে এদের যে

ভয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকাবার সুযোগ খুঁজছে। সম্ভবত কোন অলৌকিক উপায়ে লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হয়েছে রডরিক, অনুমান করতে পারছি।

মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধতে যাচ্ছিল, অথচ আতঙ্কে অন্ধ দলটা দেখতেই পায়নি আমাকে। সেফটি ক্যাচ অন করলাম আমি, পিঠ বাঁকা করে ঝুঁকে পড়লাম সামনের দিকে। কোমরের কাছ থেকে কারবাইনটা নাকের সামনে তুলে এনেছি। ওদের হাঁটু লক্ষ্য করে ব্যারেলটা ঘোরালাম একদিক থেকে আরেক দিকে। এ. কে. ফরটিসেভেনের বর্ষণ এত দ্রুত যে পা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে আশা করা যায় লোকটা পড়ে যাবার সময় আরও তিন কি চারটে গুলি খাবে শরীরে।

একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ওরা সবাই, রক্তাক্ত গায়ে গায়ে ধাক্কা খেয়ে, জড়াজড়ি করে পড়ে গেল একই সঙ্গে।

চার পর্যন্ত গোনা শেষ করে ট্রিগার চেপে ধরা আঙুলটা ঢিল করে নিলাম আমি, লাফ দিয়ে প্রায় খাড়া নেমে যাওয়া একটা বিচ্ছিন্ন ঢালের কিনারা লক্ষ্য করে ডাইভ দিলাম। গড়িয়ে নেমে এলাম পনেরো ফুট নিচের প্রায় সমতল বালির ওপর, ঝাঁকি দিয়ে খাড়া হয়েই ঝড়ের বেগে ছুটছি আবার। পেছনে একটা সাবমেশিনগান তড়পাচ্ছে, কিন্তু আমাকে আড়াল দিয়ে রেখেছে ঘন ঝোপ, তাছাড়া এদিকে কোন বুলেট আসছে না। যতদূর বুঝতে পারছি, আচমকা এই হামলা চালিয়ে দুই কি তিনজনকে বিদায় করে দিতে পেরেছি আমি, বাকি সবাই আহত হয়েছে। যাই হোক, ভাবছি আমি, ওদের মধ্যে কেউ যদি বেঁচে ফিরতেও পারে ক্রাশবোটে, দ্বীপে ফিরতে আর সাহস পাবে না। ছোট দুটো হামলায় জিতেছি আমরা, কিন্তু ওদের হাতে এখনও আটকা রয়েছে রাফেলা। তার মানে ওদের পজিশন সব দিক থেকে ভাল। রাফেলা যতক্ষণ থাকবে ওদের হাতে ওরাই নিজেদের ইচ্ছা মত সুতো টেনে পুতুল নাচাবে।

লোকটা অমর, দিব্যি বহাল তবিয়তে চূড়ার কাছাকাছি মাথা-উঁচু একগাদা পাথরের আড়ালে বসে আছে, অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

‘জেসাস, ম্যান!’ চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়ল ও। ‘তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলাম-কি করছিলে এতক্ষণ, মাসুদ?’

যেখানে ফেলে রেখে এসেছিলাম সেখান থেকে আমার হ্যাভারস্যাকটা তুলে নিয়ে এসেছে রডরিক। দুটো ছিনতাই করা এ. কে. ফরটিসেভেন আর স্পেয়ার ম্যাগাজিনগুলোর পাশে পড়ে রয়েছে সেটা। পানির বোতলটা বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে ও, এতক্ষণে টের পেলাম আমার গলা আর বুক শুকিয়ে কারবালার ময়দান হয়ে গেছে। কিন্তু মাত্র তিন ঢোক পানি বরাদ্দ করলাম নিজেকে।

‘অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মাসুদ, খুবই দুঃখিত আমি। তোমার নিষেধ অমান্য করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল আমাকে। পিকনিকে আসা ছেলেমেয়েদের মত দল বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা, যীশুর কসম, লোভ সামলাতে পারিনি। দু'জনকে সঙ্গে সঙ্গে খতম করেছি, বাকিরা মুরগির বাচ্চার মত পালিয়েছে-সোজা আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ছিল।’

‘হুঁ,’ বললাম ওকে। ‘ঢালে ওঠার সময় দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে আমার।’

‘গুলির আওয়াজ শুনেছি। একটু পরেই যেতাম তোমার খোঁজে।’

পাথরের ওপর ওর পাশে বসলাম আমি। হ্যাভারস্যাক থেকে চুরুট বের করে ধরালাম দু'জন। অখণ্ড নিস্তব্ধতাটুকু উপভোগ করছি, কিন্তু রডরিক সমস্যার কথা পেড়ে নষ্ট করল সেটা।

‘ওদের লেজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি আমরা। ফিরে আসবে বলে মনে করি না। কিন্তু ওদের কাছে এখনও মিস রাফেলা

রয়েছে, ম্যান। তার মানে ওরাই জিতেছে।'
'ওদেরকে গুণেছ, রডরিক?'
চুরুটের লাল মাথার দিকে তাকিয়ে আছে ও, বলল, 'দশজন। দু'জনকে বাদ দাও। আরেক জনের হাত উড়িয়ে দিয়েছি বগলের কাছ থেকে, সে-ও বাদ। সাতজন।'
'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'সাতজনকেই দেখেছি আমি। ধরো, এই দলে চারজনের বেশি নেই। ওদিকে রয়েছে আরও আটজন। এরা বারোজন ছাড়াও ক্রাশবোটে রয়েছে সাত কি আটজন। তার মানে আরও বিশটা রাইফেলের সঙ্গে লড়তে হবে আমাদেরকে।'
ক্যাপটা তুলে কামানো গম্বুজটায় আদর করে একবার হাত বুলাল রডরিক। 'ঘাবড়াই না,' চেহারাটাকে কদাকার করে তুলে বলল ও।
সবচেয়ে নতুন সাবমেশিনগানটা বেছে নিলাম আমি, সঙ্গে থাকল পাঁচটা পুরো ম্যাগাজিন। বাকিগুলো পাথরের একটা ফাটলে লুকিয়ে রাখলাম। আরও দু'ঢোক করে পানি খেয়ে নিয়ে উঠলাম আমরা। রডরিককে পেছনে নিয়ে সাবধানে পাথরের ওপর দিয়ে এগোচ্ছি, সামনের দিকে ঝুঁকে মাথা নিচু করে আছি, নিচ থেকে কেউ যাতে আকাশের গায়ে দেখতে না পায় আমাদেরকে। পরিত্যক্ত ক্যাম্পের দিকে ফিরে যাচ্ছি আমরা।
যেখানে দাঁড়িয়ে প্রথম আসতে দেখেছিলাম বুমেরাংকে সেখান থেকে দ্বীপের পুরো উত্তর এলাকাটার ওপর চোখ বুলাচ্ছি। যা ভেবেছিলাম, সিডনি শেরিডান আর হুমায়ুন দাদা তাদের লোকজনকে ডেকে নিয়েছে দ্বীপ থেকে। ছোট মোটর বোট আর রডরিকের হোয়েলবোট, দুটোই ভিড়েছে ক্রাশবোটের গায়ে। ডেকের ওপর লোকজনের ছুটোছুটি, ব্যস্ততা দেখতে পাচ্ছি। আহতদের নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে ওরা, কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি কেবিনের ভেতর উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে হুমায়ুন দাদা আর সিডনি শেরিডান।

'ক্যাম্পে ফিরছি আমি, রডরিক,' বললাম ওকে। 'দেখে আসি আমাদের জন্যে কিছু রেখে গেছে কিনা।' বিনকিউলারটা ধরিয়ে দিলাম ওর হাতে। 'তুমি এখান থেকে পাহারা দেবে আমাকে। পরপর তিনটে গুলি মানে ওয়ার্নিং সিগন্যাল।'
'ঠিক আছে,' সহজেই রাজি হল রডরিক। চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাল ক্রাশবোটের দিকে। ঘুরে দাঁড়াতে যাব, এই সময় চোখ থেকে নামিয়ে নিঃশব্দে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ও বিনকিউলারটা।
কিছু জিজ্ঞেস না করে ওর হাত থেকে নিলাম ওটা, চোখে তুলে তাকাতেই দেখতে পেলাম বিশাল চেহারার হুমায়ুন দাদাকে, কেবিন থেকে বেরিয়ে ব্রিজের দিকে এগোচ্ছে সে।
সাদা ইউনিফর্ম পরে আছে হুমায়ুন দাদা, রোদ লেগে ঝিকমিক করছে তার প্রকাণ্ড বুক ভর্তি পদকগুলো। তার সঙ্গে রয়েছে কয়েকজন ক্রু, পিঁপড়ের মত ঘিরে রেখেছে তাকে, দরকার হলেই যাতে সাহায্য সেবায় লাগতে পারে।
ব্রিজে উঠছে হুমায়ুন দাদা, ক্রুরা তাকে সাহায্য করছে। ওপরে উঠে থামল সে, বিশাল একটা হাত বাড়িয়ে দিল একদিকে। তার হাতে একটা ইলেকট্রিক বুলহর্ন ধরিয়ে দেয়া হল। ঘুরে তীরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল হুমায়ুন দাদা, মুখের সামনে তুলল বুলহর্নটা। দেখতে পাচ্ছি, বড় কালো ঠোঁট জোড়া নড়ছে তার।
এক মুহূর্ত পরই তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল আমাদের কানে।
'মাসুদ রানা। আশা করি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি। শুধু তোমার সম্মানে আজ সন্ধ্যায় একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছি আমরা। ক্রাশবোটটা দেখা যায় এমন এক জায়গায় দয়া করে থেকো তুমি।' অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে দিয়ে তার কণ্ঠস্বর ভরাট আর কর্কশ হয়ে বাজছে কানে। 'কথা দিচ্ছি, তোমার জন্যে অনুষ্ঠানটা মনোমুগ্ধকর হবে। সন্ধ্যা ন'টায় এই জাহাজের

আফটার ডেকে হবে অনুষ্ঠানটা। দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার, রানা। সুযোগটা হারিয়ো না।'

ক্রুদের একজনকে বুলহর্নটা দিয়ে নিচে নেমে গেল প্রকাণ্ডদেহী হুমায়ুন দাদা।

'রাফেলার কোন ক্ষতি করতে যাচ্ছে ওরা,' বিড় বিড় করে বলল রডরিক, কোলের ওপর শুইয়ে রাইফেলটার গায়ে হাত বুলাচ্ছে।

'ন'টার সময় জানতে পারব,' ক্রাশবোটের দিকে চোখ রেখে বললাম আমি। দেখতে পাচ্ছি, ডেক থেকে মোটরবোটে নামছে বুলহর্ন হাতে নিয়ে একজন অফিসার। মোটরবোট ছেড়ে দিল একজন ক্রু, দ্বীপটাকে ঘিরে মন্থর গতিতে ঘুরতে শুরু করল সেটা। হুমায়ুন দাদার তরফ থেকে আমাকে দাওয়াত করছে ওরা। দর্শক হিসেবে আমাকে পাবার জন্যে সাংঘাতিক ব্যগ্র মনে হচ্ছে হুমায়ুন দাদাকে।

'ঠিক আছে, রডরিক,' রিস্টওয়াচ দেখলাম আমি। 'এখনও কয়েক ঘন্টা সময় আছে হাতে। ক্যাম্পে যাচ্ছি, তুমি পাহারায় থাক।'

ক্যাম্পটা চরম অবহেলার সাথে তছনছ করা হয়েছে। গুহাগুলোর ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ভাঙাচোরা সরঞ্জাম, অর্ধভুক্ত খাবার। দামী জিনিসগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ওরা। তবু কিছু জিনিস দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ওদের।

কাজে লাগতে পারে এমন কিছু সাজ-সরঞ্জামের সঙ্গে পাঁচ ক্যান ভর্তি ফুয়েল অন্য এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলাম আমি। ওখান থেকে সাবধানে নেমে ঝোপের কাছে এসে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে স্বস্তির সাথে দেখলাম সিন্দুক আর বাঘের মাথাটা যেখানে রয়েছে তার ওপরের মাটিতে কোথাও একটু আঁচড়ও পড়েনি।

পাঁচ ক্যান পানি, তিন টিন শুকনো বীফ আর দুই টিন ভেজিটেবল নিয়ে উঠে এলাম আমি। কোন কথা নয়, আগে

আমরা খাওয়া সারলাম।

'যদি পার খানিকটা ঘুম দিয়ে নাও,' রডরিককে বললাম আমি। 'সামনে কঠিন একটা রাত আসছে। দুনিয়ার ঝড়ঝাপ্টা বয়ে যাবে আজ রাতে।'

'হুঁ' করে চাপা হুঙ্কার ছেড়ে প্রকাণ্ড কালো একটা ভল্লুকের মত কর্কশ ঘাসে পিঠ দিয়ে চিৎ হল ও, একটু পরই মৃদু এবং নিয়মিত নাক ডাকার শব্দ পেলাম ওর।

চুরুট ধরিয়ে বুদ্ধি পাকাচ্ছি, কিন্তু লাভ হচ্ছে না কিছু। একে একে তিনটে চুরুট ধ্বংস করলাম। তারপর সূর্য যখন দিগন্তরেখা ছুঁচ্ছে, মাথায় খেলে গেল বুদ্ধিটা। একেবারে সহজ, অথচ দারুণ এক কৌশল পেয়ে গেছি আমি-এত সহজ বলেই তীব্র সন্দেহ হল আমার, তাই আরও দু'বার গোটা ব্যাপারটা গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ভেবে দেখে পরীক্ষা করে নিলাম।

ইতিমধ্যে নেতিয়ে পড়েছে বাতাস। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারদিকে এখন গাঢ় অন্ধকার। জিনিয়াস মনে হচ্ছে নিজেকে, বুদ্ধিটার কোথাও একটু গলদ নেই। নিঃশব্দে হাসছি এখন।

ক্রাশবোটের সব ক'টা পোর্টে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, এক জোড়া ফ্লাড লাইট আলোকিত করে রেখেছে আফটার ডেকটাকে। খালি একটা স্টেজের মত দেখাচ্ছে সেটাকে।

রডরিকের ঘুম ভাঙালাম আমি, তারপর খেতে বসলাম।

'চল বীচে যাই,' বললাম ওকে। 'ওখান থেকে ভাল দেখা যাবে।'

'ব্যাপারটা ফাঁদ হতে পারে, মাসুদ,' মৃদু গলায় স্মরণ করিয়ে দিল আমাকে ও।

'আমার তা মনে হয় না। দ্বীপে কেউ নেই ওদের। তাছাড়া ওরাই শক্তিশালী পক্ষ, এখনও ওদের হাতে রাফেলা রয়েছে। এ-ধরনের কৌশল খাটাবার দরকার করে না ওদের।'

'ম্যান, একটু যদি ক্ষতি করে ওরা মেয়েটার...,' নিজেই চুপ

করে গেল রডরিক। উঠে দাঁড়াল ও। বলল, 'ঠিক আছে, চলো যাওয়া যাক।'

ঝোপের আড়ালে আবডালে থেকে খুব সতর্কতার সঙ্গে নামছি আমরা। রাইফেল কক্ করে নিয়েছি দু'জনেই, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে রেখেছি ট্রিগার।

রাতটা নিঝুম, পরিবেশটা নির্জন। সৈকতের কিনারায়, গাছের শেষ সারির পেছনে থামলাম আমরা। মাত্র দুশো গজ দূরে ক্রাশবোট। একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে চোখে বিনকিউলার তুলে তাকালাম ওটার দিকে। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারব, এত কাছে চলে এল ওটা। একজন ক্রু সিগারেটের প্যাকেট বের করল পকেট থেকে, প্যাকেটের গায়ের লেখাগুলো পরিষ্কার পড়তে পারছি আমি।

সত্যি, ভয় লাগছে আমার। ঠিক কি করতে যাচ্ছে হুমায়ুন দাদা কল্পনা করতে গিয়ে আরও বাড়ছে ভয়টা, তার ইচ্ছাটাকে আন্দাজ দিয়েও ছুঁতে পারছি না আমি।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে নিচু গলায় বললাম রডরিককে, 'রাইফেল বদল করি এসো।'

লম্বা ব্যারেলের এফ. এনটা আমাকে দিল ও, আমার কাছ থেকে নিল এ. কে. ফরটিসেভেন। লক্ষ্যভেদ করার বিশেষ গুণ রয়েছে এফ-এন-এর, ক্রাশবোটের ডেকে গুলি ছুঁড়তে হলে সেটা দরকার আমার। রাফেলা যতক্ষণ অক্ষত থাকবে ততক্ষণ ওদেরকে শায়েস্তা করার কোন ব্যবস্থা নিতে পারব না আমি, এ-কথা ঠিক। কিন্তু ওর যদি কোন ক্ষতি করে ওরা-ও একা যাতে না ভোগে তার ব্যবস্থা যেভাবেই হোক করতে হবে আমাকে।

নারকেল গাছটার পাশে বসে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম রাইফেলের সাইট, লক্ষ্যস্থির করেছি একজন ডেক গার্ডের কপালের ওপর ঘামের ফোঁটায়। জানি এখন এই জায়গায় বসে থেকে লোকটার মগজ উড়িয়ে দিতে পারি আমি।

সন্তুষ্ট হয়ে কোলের ওপর নামিয়ে রাখলাম রাইফেলটা। অপেক্ষা করছি।

জলা থেকে প্রথম ঝাঁকের মশাগুলো আগেই এসে পৌঁছেছে, আমাদের মাথাটাকে ঘিরে উড়ছিল এতক্ষণ, এবার হাতে আর মুখে বসতে শুরু করেছে। খুদে বেলুনের মত রক্তে ফুলে উঠছে এক একটা, জ্বালা অনুভব করছি, কিন্তু চড়-চাপড় মেরে তাড়াতে পারছি না ওদেরকে। একটা চুরুট ধরাতে পারলে ভাল হত, কিন্তু ঝুঁকিটা নেয়া চলে না এখন।

ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সময়। যত দেরি হচ্ছে ততই একের পর এক নতুন ভয় ঢুকেছে মনে। অবশেষে, নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট আগে, ক্রাশবোটের ওপর একটা ব্যস্ততা লক্ষ করলাম।

কেবিন থেকে আবার বেরিয়ে এসেছে হুমায়ুন দাদা। মই বেয়ে উঠতে তাকে সাহায্য করছে নাবিকরা। ব্রিজ রেইলের কাছে তার নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসল সে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে নিচের আফটার ডেকের দিকে তাকাল। দরদর করে ঘামছে সে, দুই বগলের কাছে ভিজে গেছে ইউনির্ফম জ্যাকেট। অপেক্ষার সময়টা সম্ভবত আমাদের কাছ থেকে লুট করা স্কচ খেয়ে কাটিয়েছে সে।

তার দু'পাশে দাঁড়ানো ক্রু আর নাবিকদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছে হুমায়ুন দাদা। হাতির পিঠের মত দুই কাঁধ আর ফুলে থাকা মস্ত পেটটা কাঁপছে হাসির দমকে।

মই বেয়ে এবার উঠে আসছে সিডনি শেরিডান, লোরনা পেজকে অনুসরণ করছে সে।

সাপের মত ঠাণ্ডা একটা ভাব রয়েছে সিডনির চেহারায়। অত্যন্ত দামী কাপড়ের স্যুট পরেছে সে, দাঁড়াল সবার কাছ থেকে একটু সরে। তেমন যেন আগ্রহ নেই এসবে তার, উৎসাহিত বোধ করার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। বাচ্চাদের অনুষ্ঠানে সে যেন একমাত্র বয়স্ক লোক, মনে হচ্ছে আমার, একঘেয়ে আর একটু

তিক্ত দায়িত্ব পালন করতে এসেছে।

ঠিক উল্টো ভাব দেখছি লোরনার চেহারায়। এই প্রথম যেন বাড়ির বাইরে ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে এসেছে সে, ছটফট করছে উত্তেজনায়, কি এক প্রত্যাশায় চকচক করছে চোখ দুটো।

কারণে অকারণে খিলখিল করে হাসছে লোরনা, মুখ আর হাত নেড়ে অনর্গল কথা বলছে হুমায়ুন দাদার সঙ্গে। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই সে। চঞ্চল ভাবে এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে-আগুপিছু করছে বারবার-উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না কোনমতে। একবার সে রেইলের ওপর ঝুঁকে নিচের খালি ডেকের দিকে তাকাল। কিছু একটা কল্পনা করে উত্তেজনা বেড়ে গেল তার, শক্তিশালী গ্লাস দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি গাল দুটো লাল হয়ে গেছে-রুজ নয় ওগুলো।

লোরনার দিকে তাকিয়ে আছি, তাই নিচে কি ঘটছে টের পাইনি। হঠাৎ নিঃশ্বাস আটকে ফেলল রডরিক, চঞ্চল ভাবে নড়ে উঠল ওর শরীরটা, পরমুহূর্তে আঁতকে ওঠার শব্দ করল ও। দ্রুত নিচের ডেকে তাকালাম আমি।

ওখানে দেখতে পাচ্ছি রাফেলাকে, দু'জন ইউনিফর্ম পরা নাবিকের মাখঝানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা দু'জন দুটো হাত ধরে রেখেছে রাফেলার, মাঝখানে ছোট্ট আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে।

আজ সকালে তাড়াহুড়ো করে পরা সেই পোশাকটাই রয়েছে রাফেলার পরনে, চুলগুলো কাকের বাসার মত জটিল একটা স্তূপ হয়ে রয়েছে মাথায়, মুখে ব্যথা আর প্রচণ্ড ক্লান্তির ছাপ। অনিদ্রার কালো ছোপ দেখতে পাচ্ছি চোখের নিচে-কিন্তু এক মুহূর্ত পরই ভুলটা ভাঙল আমার-ওগুলো আঁচড় আর ক্ষতের দাগ। রাগের ঠাণ্ডা শিহরণের সাথে দেখছি ঠোঁট দুটো বেঢপ ভাবে ফুলে আছে ওর, যেন মৌমাছি কামড়েছে। নাকের দু'পাশেও আঁচড়ের দাগ দেখতে পাচ্ছি।

রাফেলাকে ওরা মারধোর করেছে। এখন যখন খুঁজছি, ওর

নীল শার্টে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগও ধরা পড়ছে আমার দৃষ্টিতে। এই সময় একজন গার্ড চরম অসম্মানের সাথে ওর গায়ে হাত দিয়ে ওকে তীরের দিকে ঘুরিয়ে দিল, এখন দেখতে পাচ্ছি একটা হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে ওর, সেটার ওপর কালচে দাগটা শুকনো রক্ত নাকি অ্যান্টিসেপটিক মলমের দাগ, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ক্লান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছে রাফেলাকে, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। রাগটা আমার সমস্ত বিবেচনাবোধকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত জায়গা দখল করে নিচ্ছে মাথার ভেতর, অনুভব করতে পারছি আমি। রাফেলার এই করুণ অবস্থার জন্যে যারা দায়ী তাদেরকেও ওর মত যন্ত্রণার ভাগ দেবার জন্যে তৈরি হয়ে গেছি প্রায় নিজের অজান্তেই। কোল থেকে তুলেছি রাইফেলটা। নিজেকে প্ররোচিত করছি মনে মনে। ওদের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণায় হাত দুটো কাঁপছে আমার। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে। চোখের পাতা চেপে বন্ধ করে আছি, নিজেকে শান্ত করার জন্য গভীর একটা শ্বাস টানলাম। সময় এবং সুযোগ আসবে, জানি আমি-এখন কিছু করে বসলে সেটার সম্ভাবনাই শুধু নষ্ট করা হবে, লাভ হবে না কিছুই।

আবার চোখ খুলে বিনকিউলার দিয়ে তাকালাম আমি। দেখি, হুমায়ুন দাদা তার মুখের সামনে তুলে ধরেছে ইলেকট্রিক বুলহর্নটা।

'শুভ সন্ধ্যা, রানা, আমার পরম বন্ধু! তোমার সম্মানে আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। আমি শিওর, এই সুন্দরী মেয়েটিকে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না তোমার।' লম্বা করে হাত নেড়ে রাফেলাকে দেখাল হুমায়ুন দাদা, আর রাফেলা অসুস্থ, মন্থর ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকাল তার দিকে। 'ওকে আমরা জেরা করেছি। অপ্রীতিকর কৌশল দু'একটা ওর ওপর ব্যবহার করতে হয়েছে বলে দুঃখিত, রানা-সিনসিয়ারলি বলছি। যাই হোক, শেষ

পর্যন্ত জেনেছি, আমি আর আমার বন্ধু-বান্ধবরা যে সম্পদ সম্পর্কে আগ্রহী সেটা কোথায় আছে তা ওর জানা নেই। ও বলছে, তুমি কোথাও লুকিয়ে রেখেছ।' থামল হুমায়ুন দাদা, সঙ্গে সঙ্গে একজন ক্রু তার হাতে ধরিয়ে দিল একটা তোয়ালে, সেটা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিল সে।

তারপর আবার বলল, 'তোমার এই সঙ্গিনীর সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই-ওর ওপর কোন লোভও নেই। কিন্তু ওর গুরুত্ব আর মূল্য সম্পর্কে আমি পূর্ণ সচেতন। বিনিময় ব্যবসাতে হাতে এই রকম পুঁজি থাকলে লোকসানের কোন ভয় থাকে না। ঠিক কিনা, রানা, পরম বন্ধু? তুমি রাজি? বিনিময়ের জন্যে সমান গুরুত্ব আর মূল্যের পুঁজি তোমার কাছেও তো রয়েছে। রাজি? তবে সবুর, এখনই কোন সিদ্ধান্ত নিয়ো না। আসল অনুষ্ঠান শুরুই হয়নি এখনও-আগে সেটা দেখো।'

দ্রুত, বিরক্তির সঙ্গে হাত নাড়ল হুমায়ুন দাদা। সঙ্গে সঙ্গে নাবিক দু'জন ধরল রাফেলাকে, একরকম ঠেলতে ঠেলতেই নিচে নামিয়ে নিয়ে গেল ওকে।

রাফেলা চলে যেতে বুকটা খালি হয়ে গেল আমার। জানি না আর কোনদিন দেখতে পাব কিনা ওকে।

খালি ডেকে উঠে এল হুমায়ুন দাদার চারজন লোক। এদের সবার কোমর থেকে ওপরের অংশটা উদোম, মসৃণ কালো চামড়ার নিচে ঢেউ জেগে রয়েছে পেশীর।

চারজনের হাতে একটা করে ছোট কুঠার রয়েছে, হাতলগুলো কাঠের, আধ হাতের একটু বেশি লম্বা। কুঠারের ফলাগুলো মোটা ইস্পাতের, আলো লেগে চকচক করছে, কিনারার দিকটা চওড়া আর ধারাল-প্রত্যেকটা চার ইঞ্চি লম্বা, ইঞ্চি দুয়েক চওড়া। খোলা ডেকের চারকোণে নিঃশব্দে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল ওরা।

এবার দু'জন গার্ড একজন লোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল খোলা ডেকে, ফাঁকা মাঝখানটায় দাঁড় করাল তাকে। হাত দুটো

পিছমোড়া করে বাঁধা রয়েছে লোকটার। তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে গার্ড দু'জন। তাদের দু'জোড়া হাত হঠাৎ অলস ভঙ্গিতে মাঝখানে দাঁড়ানো লোকটাকে ধরে ঘোরাতে শুরু করল। লাটিমের মত।

বুলহর্নের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল হুমায়ুন দাদার ভারী আর কর্কশ কণ্ঠস্বর।

'কি, চিনতে পারছ ওকে, রানা?'

ক্যানভাস দিয়ে তৈরি জেলখানার ওভারঅলস পরে রয়েছে লোকটা। সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে সে, গার্ড দু'জনের হাত দুটো এখন দ্রুত হয়ে উঠেছে। পড়ে যেতে চাইছে লোকটা, পরিষ্কার ফাঁকি দেবার মতলব। কিন্তু গার্ড দু'জনের দুই জোড়া হাত তাকে পড়ে যেতে দিচ্ছে না। ঘোরাচ্ছে অবিরাম। লোকটার গায়ের রঙ সাদা ফ্যাকাসে, চোখ দুটো গর্তে ঢোকা, সোনালি জট পাকানো চুল নেমে এসেছে মুখের ওপর, মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

প্রায় সব ক'টা দাঁত হারিয়েছে লোকটা, সম্ভবত নির্মম ঘুসি মেরে উপড়ে ফেলা হয়েছে মাড়ি থেকে।

'পারছ, রানা?' হো হা হো হা করে খানিক হাসল হুমায়ুন দাদা। চিনতে পারছ? এর পেশা ছিল লোকজনকে ধরে ঠেঙানো আর কয়েদ করা। দুর্ভাগ্য আর বলে কাকে, ওর নিজের কপালেও তাই জুটেছে।'

এতক্ষণে লোকটাকে চিনতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। জলকুমারী থেকে বাইরের দিকের খাঁড়িতে ফেলে দিয়েছিলাম ওকে, গানফায়ার রীফের চ্যানেল ধরে হুমায়ুন দাদাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসার সময়।

'হ্যাঁ, ও হচ্ছে ইন্সপেক্টর পিটার টালি,' ভেসে এল হুমায়ুন দাদার কণ্ঠস্বর। 'এই শালা বানচোতই ডুবিয়েছে আমাকে। আমাকে যারা ডোবায় তাদেরকে আমি পছন্দ করি না, রানা। আর

আমি যাদেরকে পছন্দ করি না তাদের কপালে খারাবি আছে, এ তো জানা কথা। কি সেই খারাবি? তা তোমাকে স্রেফ নমুনা হিসেবে দেখাবার প্রয়োজন হতে পারে মনে করেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা। এই ধরনের প্রদর্শনী সাংঘাতিক কাজে দেয় রানা। চোখে না দেখলে মানুষ শাস্তির নির্মমতা ঠিক বুঝতে পারে না। বিশ্বাস কর, তোমার স্বার্থেই ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাতে চাই আমি।'

মুখ আর ঘাড় থেকে ঘামের স্রোত মোছার জন্যে আরেকবার বিরতি নিল হুমায়ুন দাদা। একজন লোকের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে এক চুমুকে শেষ করল রঙিন মদটুকু।

গার্ড দু'জনও একটু বিশ্রাম নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আর এই সুযোগে দুই হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে পিটার টালি হুমায়ুন দাদার দিকে। আতঙ্কের রেখা আর ভাঁজ পেঁচিয়ে গিয়ে কদাকার হয়ে উঠেছে মুখের চেহারা। ঠোঁট দুটো নড়ছে তার, বোঝা যাচ্ছে, করুণা ভিক্ষা চাইছে। ঠোঁটের দুই প্রান্ত বেয়ে নেমে আসছে থুথু আর লালা।

'বন্ধুবর রানা, তুমি রেডি? এবার তাহলে শুরু করতে পারি আমরা?' হো হা করে হাসল হুমায়ুন দাদা।

একজন গার্ড বড় একটা কালো কাপড়ের ব্যাগ পরিয়ে দিল টালির মাথায়, গলা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেল তার। ফিতেটা টান করে গলার চারদিকে এঁটে বেঁধে দিল গার্ড। তারপর ওরা দু'জন মিলে টেনে দাঁড় করাল টালিকে।

'বাচ্চাদের একটা খেলা, তাই না, রানা?' কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি হুমায়ুন দাদার। 'এর নাম কানামাছি খেলা, তুমি জানো। অনুষ্ঠানটাকে তোমার স্বার্থে রোমাঞ্চকর করার জন্যে খেলার ধরন একটু পাল্টেছি আমরা।'

ভিজে যাচ্ছে টালির ক্যানভাস ট্রাউজারের সামনেটা, চরম আতঙ্কে খালি হয়ে যাচ্ছে ওর ব্লাডার। বোঝা যাচ্ছে, জিনবালা

জেলে থাকার সময় এই খেলা দেখেছে সে।

'বন্ধু রানা, আমি চাই তোমার কল্পনাশক্তিকে একটু খাটাও। এই নোংরা জীবটাকে দেখ না, ওর জায়গায় দেখতে চেষ্টা কর তোমার প্রিয় সঙ্গিনীকে।' দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছে হুমায়ুন দাদা। একজন ক্রু তার দিকে আবার বাড়িয়ে দিল তোয়ালেটা।

হাত তুলে প্রচণ্ড একটা থাবড়া মারল লোকটাকে হুমায়ুন দাদা। ছিটকে পড়ল লোকটা, ডিগবাজি খেয়ে রেলিংয়ের সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খেল। শান্তভাবে কথা বলে চলেছে হুমায়ুন দাদা, যেন কিছুই হয়নি। 'কল্পনা কর, রানা, তোমার সঙ্গিনী এই অবস্থায় কি রকম আতঙ্ক বোধ করবে, চিন্তা কর।'

গার্ড দু'জন আবার নিজেদের মাঝখানে ঘোরাতে শুরু করেছে টালিকে। খেলার মধ্যে ছেলেরা ঠিক এইভাবেই একজনকে ধরে ঘোরায়। কোন বিরতি নেই, ওরা তাকে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে ঘুরিয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা টালির অস্পষ্ট চিৎকার আর গোঙানি শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ গার্ড দু'জন টালিকে রেখে পিছিয়ে এল দ্রুত। এবার এগিয়ে আসছে অর্ধনগ্ন চারজন লোক। তাদের একজন হাতের কুঠারটা উল্টো করে ধরে টালির শিরদাঁড়ার শেষ গিঁটে হাতল চেপে রেখে সামনের দিকে জোরে একটা ধাক্কা মারল।

একটা ঝাঁকি খেল টালি, টলতে টলতে এগোল সামনের দিকে। সামনে কুঠার নিয়ে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে আরেকজন, টালির পেটে হাতল দিয়ে গুঁতো মারবে সে।

বারবার হাতলের গুঁতো খেয়ে আগুপিছু করছে টালি। পড়ে যাবে, সে উপায় নেই তার। হাঁটু ভাঁজ খাবার আগেই গুঁতোর ঠেলায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে যাচ্ছে তার, ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে, পরমুহূর্তে সামনে বা পাশ থেকে আরেকটা গুঁতো খাচ্ছে- এই ভাবে চলছে তো চলছেই। অবশেষে একজন তার কুঠারটা সিধে করে ধরে মাথার পেছনে তুলল, তারপর গায়ের সবটুকু

শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনল সেটা টালির পাঁজরে। খ্যাঁচ করে গেঁথে গেল ফলাটা।

এটা সমাপ্তি টানার একটা ইঙ্গিত।

ডেকে পড়ে গেছে টালি। চারজন ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তার ওপর। তাদের হাতের কুঠারগুলো উঠছে আর নামছে, উঠছে আর নামছে-ভীতিকর একটা ছন্দের তালে তালে। কুঠারের কোপগুলো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি খাঁড়ির এপার থেকে-ঘ্যাচ-ঘ্যাচ, ঘ্যাচ-ঘ্যাচ...দ্রুত।

পালা করে একটু পর পর ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে আসছে ওরা। টালির শরীরটা দলা পাকিয়ে পড়ে আছে ডেকের ওপর। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে তার হাড়গোড়।

'নিষ্ঠুর, তুমি বলবে, রানা-কিন্তু সাংঘাতিক ফলপ্রসূ, এ-কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।'

বর্বর কাণ্ডটা অসুস্থ করে ফেলেছে আমাকে। আমার পাশ থেকে বিড়বিড় করছে রডরিক, 'ও মানুষ নয়, দানব,' আতঙ্কে সরল স্বীকারোক্তি বেরিয়ে এল ওর গলার ভেতর থেকে, 'আমার ভয় লাগছে, মাসুদ।'

'কাল দশটা পর্যন্ত সময় দিচ্ছি তোমাকে, রানা,' যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে হুমায়ুন দাদার। 'ঠিক সকাল দশটায় নিরস্ত্র অবস্থায় আপোসের মনোভাব নিয়ে আমার কাছে আসবে তুমি। আমার সাধ্যমত খাতির করব তোমাকে। আমরা দু'জন, তুমি আর আমি, গল্পগুজব করব, কাঁধে হাত রেখে পায়চারি করব, হাসি-ঠাট্টা করব-বিশ্বাস কর, দারুণ জমবে দুই পরম বন্ধুতে। তারপর কিছু ব্যাপারে একমত হব আমরা। কিছু বিনিময় করব। তারপর বন্ধুত্ব বজায় রেখে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেব আমরা। তুমি রাজি রানা?

ক্রুরা টালিকে নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তা দেখার জন্যে চুপ করে আছে হুমায়ুন দাদা। দুই কব্জিতে নাইলনের রশি

বেঁধে ক্রাশবোটের মাস্তুলের মাথার কাছে তুলে ঝুলিয়ে দেয়া হল টালিকে। টপ টপ করে রক্ত ঝরছে থেঁতলানো শরীরটা থেকে। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে দৃশ্যটা গোগ্রাসে গিলছে লোরনা পেজ। মাথাটা পেছন দিকে নুয়ে পড়েছে তার, সোনালি চুলগুলো ঝুলছে পিঠ বরাবর। পরিষ্কার দেখতে পেলাম জিভের লাল ডগা বের করে নিচের ঠোঁটটা চেটে নিল সে।

'আর যদি রাজি না হও, রানা,' শেষ কথাটার খেই ধরে শুরু করল আবার হুমায়ুন দাদা, 'ঠিক কাল দুপুরে এখন যেখানে ঝুলতে দেখছ টালিকে সেখানে ঝুলতে দেখবে তোমার বান্ধবীকে। চিন্তা কর, রানা। তাড়াহুড়ো কোরো না, প্রচুর সময় রয়েছে তোমার হাতে। ভাল করে ভেবে দেখ ব্যাপারটা।'

হঠাৎ নিভে গেল ফ্লাড লাইট দুটো। উঠে দাঁড়াল প্রকাণ্ড দানবটা। অনুচরদের সাহায্য নিয়ে মই বেয়ে নামছে সে। তাকে অনুসরণ করছে লোরনা পেজ আর সিডনি শেরিডান। মই বেয়ে নামার সময় বারবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে লোরনা ঝুলন্ত মাংসপিণ্ডটাকে। কিন্তু ভুরু কুঁচকে রয়েছে সিডনি শেরিডানের, কি যেন ভাবছে সে।

'আমি অসুস্থ বোধ করছি, মাসুদ,' বিড় বিড় করে বলল রডরিক।

'কাটিয়ে ওঠ,' বললাম ওকে। 'কারণ সামনে আমাদের গাধার খাটুনি রয়েছে।'

দশ

রডরিককে পেছনে নিয়ে নিঃশব্দে নারকেল গাছ তলায় চলে এলাম আমি। পালা করে মাটি কেটে গর্ত খুঁড়ছি আমরা, একজন সব সময় কাছেপিঠে পাহারায় থাকছি। ক্রাশবোট থেকে কারও চোখে পড়ে যেতে পারি। সেই ভয়ে আলো জ্বালিনি। কাজের সময় চরম সতর্কতা বজায় রেখেছি যাতে লোহার সঙ্গে লোহার ঠোকাঠুকি

লেগে শব্দ না হয়।

বিস্ফোরণের সরঞ্জাম আর বাকি জেলিগনাইটের বাক্স, তারপর আরেক জায়গায় মাটি খুঁড়ে মরচে ধরা সিন্দুকটা বের করলাম আমরা। অনেক ভেবে বেছে বের করা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বয়ে নিয়ে এলাম এগুলো। প্রায় খাড়া একটা ঢালের নিচে জায়গাটা। ঢাল-এর পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে মাটি ফুলে-ফেঁপে ভাঁজ খেয়ে আছে, সেটা ঝোপ আর বুনো লম্বা ঘাসে ঢাকা।

এর নিচে সিন্দুকটার জন্যে একটা গভীর গর্ত খুঁড়ছি আমরা। নরম মাটির নিচে পানি দেখতে পেয়ে থামলাম। সিন্দুকটা নতুন করে প্যাক করা হল, পুঁতে দেয়া হল এই সদ্য তৈরি করা গর্তে। ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে রডরিক, পঞ্চাশ ফুট উঠে ঝোপ আর ঘাসের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কি করতে হবে ওখানে জানে ও।

নিচে আমি একা, কিন্তু বসে নেই। সাবমেশিনগানটা রি-লোড করে আমার পুরানো একটা শার্ট দিয়ে জড়িয়ে নিলাম সেটা, সঙ্গে রেখেছি পুরো পাঁচটা ম্যাগাজিন। সবচেয়ে কাছের একটা নারকেল গাছের পাশে, এক ইঞ্চি বালির নিচে শুইয়ে কবর দিলাম এগুলোকে। জায়গাটার পাশ দিয়ে একটা অগভীর নালা এগিয়ে গেছে। ঢাল বেয়ে বৃষ্টির পানি নেমে এসে তৈরি করেছে এটা। এই শুকনো নালা আর নারকেল গাছ থেকে সদ্য পোঁতা সিন্দুকটার দূরত্ব চল্লিশ গজের মত, যথেষ্ট নিরাপদ দূরত্ব বলে অনুমান করছি আমি। নালাটা দুই ফুটের একটু বেশি গভীর, গা ঢাকা দেবার কাজে লাগবে।

মাঝরাতের পর উঠে এল চাঁদ, তার আলোয় পরীক্ষা করে নিচ্ছি আমাদের আয়োজন। ঢালের ওপর থেকে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দেয়া অবস্থায় নিচে আমাকে দেখতে পাচ্ছে কিনা তা যাচাই করে নিচ্ছে রডরিক। নারকেল গাছ আর নালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি। চাঁদের আলোয় ঝোপের বাইরে বেরিয়ে

এসে হাত নাড়ল ও। নিঃশব্দে ঢাল বেয়ে ওর কাছে উঠে এলাম আমি। ওর লুকাবার জায়গা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম আয়োজনটা।

আগুন আড়াল করে চুরুট ধরালাম আমরা, জ্বলন্ত ডগা মুঠোর ভেতর নিয়ে ধোঁয়া টানছি। এই ফাঁকে প্ল্যানটা সম্পর্কে রডরিককে আরও পরিষ্কার ধারণা দেবার জন্যে আলোচনা করছি।

আমার প্ল্যানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করছে সময় আর ইঙ্গিত। এ-ব্যাপারে একচুল এদিক-ওদিক হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেজন্যেই ভয় পাচ্ছি। পরপর তিন বার গোটা ব্যাপারটা পুনরাবৃত্তি করালাম রডরিককে দিয়ে। আপত্তি না তুলে প্রতিবার রিহার্সেল দিল ও। আমি এখন সন্তুষ্ট। চুরুট নিভিয়ে ফেললাম আমরা, বালির নিচে পুঁতে দিলাম সেগুলো। তারপর ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এসে নারকেল গাছের শুকনো লম্বা কাঠি আর পাতা দিয়ে ঝাড়ু দিলাম জায়গাটা, আমাদের উপস্থিতির কোন চিহ্ন রাখলাম না।

আমার প্ল্যানের প্রথম অংশটা পূরণ হয়েছে। এরপর বাঘের মাথা আর অবশিষ্ট জেলিগনাইটের কাছে ফিরে এলাম আমরা। নতুন আরেক গর্তে লুকালাম আমরা সোনার মাথাটাকে। তারপর আমি পুরো এক কেস জেলিগনাইট নিয়ে কাজে বসলাম, বিস্ফোরণের জন্যে তৈরি করলাম ওটাকে।

এক্ষেত্রে বিস্ফোরণের জন্যে ইলেকট্রিসিটি বা ইনসুলেটেড ওয়্যার ব্যবহার করতে পারব না আমি, কাজ আদায় করতে হবে টাইমপেন্সিল ডিটোনেটর দিয়ে। এই হালকা কিন্তু মেজাজী জিনিসটাকে সাংঘাতিক অপছন্দ করি আমি। এর কাজের পদ্ধতি হল-মোটা একটা তার খেতে খেতে এগোয় অ্যাসিড, তারের শেষ মাথায় একটা হাতুড়ি থাকে, একটা পাউডার ক্যাপে বাড়ি মারতে উদ্যত। অ্যাসিড তার খেয়ে শেষ করলেই হাতুড়ির বাড়ি পড়ে পাউডার ক্যাপে, অমনি সেটা বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের সময়

কমানো বাড়ানো নির্ভর করে অ্যাসিডের শক্তি আর ওয়্যারটা কত মোটা তার ওপর।

এই ব্যবস্থার মধ্যে সবরকম গোলমালের বীজ রয়েছে। ওয়্যারে গোলমাল থাকতে পারে, অ্যাসিড তার কাজে দেরিও করতে পারে আবার তাড়াতাড়িও সেরে ফেলতে পারে। একটু এদিক-ওদিক হলেই প্রচুর সময়ের হেরফের হয়ে যাবে, অথচ এক সেকেণ্ড আগে-পরে বিস্ফোরণ ঘটলে আমার গোটা প্ল্যানটাই হিতে বিপরীত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে পুরোমাত্রায়। যাই হোক, এক্ষেত্রে বাছবিচার করার কোন অবকাশ নেই আমার। সাত ঘন্টা দেরিতে বিস্ফোরিত হবে এমন একটা পেন্সিল বেছে নিলাম আমি, জেলিগনাইটের সঙ্গে ব্যবহার করার জন্যে এটাকেও তৈরি করে নিলাম।

লুটেরাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে আমার পুরানো অক্সিজেন রিব্রিদিং আণ্ডারওয়াটার সেটটা। ব্যবহার করার প্রশ্নে টাইম পেন্সিলের চেয়ে এটাও কোন অংশে কম মারাত্মক নয়। অ্যাকুয়ালাঙ কমপ্রেসড এয়ার ব্যবহার করে, কিন্তু রিব্রিদিং সেটটা প্রতিটি নিঃশ্বাসের কার্বন-ডাই অক্সাইড ফিল্টার করে নিয়ে নির্ভেজাল অক্সিজেন ফেরত পাঠায় ব্যবহারকারীর ফুসফুসে। কিন্তু গভীর পানিতে খাঁটি অক্সিজেন নেয়া মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার, ওটা কার্বন-মনোক্সাইডের মতই বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। তেত্রিশ ফুট পানির নিচে খাঁটি অক্সিজেন টানলে যে-কেউ মারা যাবে। এই সেট নিয়ে পানিতে নামতে হলে দুঃসাহস দরকার। কিন্তু এর একটা মস্ত সুবিধেও আছে। এ থেকে বুদবুদ বেরোয় না, ফলে পানির ওপর থেকে ডুবুরীর অস্তিত্ব টের পাবার কোন উপায় নেই কারও।

সৈকতে ফিরে আসার সময় তৈরি করা জেলিগনাইট কেস আর রাইফেলটা বয়ে নিয়ে এল রডরিক। রাত তিনটের পর পানিতে নেমে অক্সিজেন সেটটা পরীক্ষা করে নিলাম আমি,

তারপর রডরিকের হাত থেকে জেলিগনাইট নিয়ে ওটা কতখানি ভেসে উঠতে চায় যাচাই করলাম। কয়েক পাউণ্ড সীসার ওজন যোগ করতেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া গেল, এখন ওটাকে পানির ভেতর দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হবে না।

বে-র ভোঁতা একটা শিং-এর আড়াল থেকে পানিতে নেমেছি আমি। উঁচু বালির ঢিবি আর নারকেল গাছ আমাকে আড়াল করে রেখেছে ক্রাশবোট থেকে।

লম্বা, ক্লান্তিকর সাঁতার কাটছি আমি। শিংটাকে ঘুরে বে-তে বেরিয়ে আসতে হল আমাকে, এরই দূরত্ব প্রায় এক মাইল। বিস্ফোরক টেনে নিয়ে আসা আরেক বিচ্ছিরী হাঙ্গামার ব্যাপার। ধস্তাধস্তি করে প্রায় এক ঘন্টা এগোবার পর স্বচ্ছ পানির ভেতর দিয়ে আমার মাথার ওপর ক্রাশবোটের ঝলমলে আলো দেখতে পেলাম।

পানির তলার কাছাকাছি থেকে নিঃশব্দে এবং মন্থর গতিতে এগোচ্ছি সামনের দিকে। সম্পূর্ণ সজাগ এবং সতর্ক হয়ে আছি। খাঁড়ির নিচে ধবধবে সাদা বালি, স্বচ্ছ পানির ওপরও উজ্জ্বল চাঁদের আলো পড়েছে-ওপর থেকে বিশ ফুট নিচে আমার কাঠামোটা। উঁকি দিলেই পরিষ্কার দেখতে পাবে যে-কেউ ক্রাশবোট থেকে।

ক্রাশবোটের ছায়ায় ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম আমি, ধীরে ধীরে চলে এলাম খোলের নিচে। এখানে যতক্ষণ আছি, ওদের চোখে ধরা পড়ার কোন ভয় নেই আমার। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে ভাগিয়ে দিলাম ক্লান্তিটাকে, তারপর বেল্ট থেকে নাইলন স্লিংগুলো বের করে নিয়ে জেলিগনাইটের কেসের সঙ্গে আটকালাম।

রিস্টওয়াচ দেখলাম। চারটে বেজে দশমিনিট হয়েছে।

টাইম পেন্সিলের কাঁচের অ্যাম্পুল ভেঙে পথ খুলে দিলাম

অ্যাসিডের, এখন ওটা ধীরেসুস্থে খেতে শুরু করেছে ওয়্যারটাকে। বিস্ফোরকের কেসের গায়ে ওর জন্যে তৈরি করা খোপে ঢুকিয়ে দিলাম পেন্সিলটাকে। কমবেশি সাত ঘন্টা পর দুশো পাউণ্ড এরিয়াল বোমার শক্তি আর গতি নিয়ে বিস্ফোরিত হবে আমার টাইম বম্ব।

খাঁড়ির তলা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠছি এখন আমি ক্রাশবোটের খোলের দিকে। বোটের গায়ে দাড়ির মত ঝুলছে পিচ্ছিল লতাপাতা, সার সার সেঁটে আছে অসংখ্য শুক্তি। এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল না যেখানে কেসটা শক্ত করে বাঁধতে পারি। বাধ্য হয়ে রাডারের ফলাটাই বেছে নিতে হল।

সবটুকু নাইলনের রশি দিয়ে ওটার সঙ্গে বাঁধলাম কেসটা, কাজ শেষ করে টেনেটুনে পরীক্ষা করে বুঝলাম, ক্রাশবোট তুমুল গতিতে তার সবটুকু দ্রুততা নিয়ে ছুটতে শুরু করলেও পানির তোড়ে এই শক্ত বাঁধন ছিঁড়তে পারবে না।

সন্তুষ্ট হয়ে আবার নেমে এলাম খাঁড়ির তলায়। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে ফিরে আসছি আমি। সঙ্গে বোঝা নেই, তাই দ্রুত ফিরে আসতে পারছি। সৈকতে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে রডরিক।

'কাজ শেষ করেছ, মাসুদ?' জিজ্ঞেস করল ও, অক্সিজেন সেটটা খুলতে সাহায্য করছে আমাকে।

'হ্যাঁ,' বললাম ওকে। 'এখন একমাত্র ভরসা পেন্সিলটার ওপর।'

এত ক্লান্ত আমি, নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে টলতে টলতে এগোচ্ছি। গতরাতে ঘুমিয়েছি কি ঘুমাইনি, আর তারপর থেকে এখন পর্যন্ত দুই চোখের পাতা এক করার সুযোগ পাইনি।

এবার রডরিককে পাহারায় রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। মনে হল পরমুহূর্তে জেগে উঠলাম। রডরিকের ধাক্কায় ঘুম ভাঙল। ঘড়িতে দেখি সকাল সাতটা। ইতিমধ্যে ফুটে উঠেছে দিনের

আলো।

ক্যান থেকে বের করে ঠাণ্ডা ব্রেকফাস্ট সারলাম আমরা। সারভাইভাল কিট থেকে এক মুঠো হাই-এনার্জি গ্লুকোজ ট্যাবলেট বের করে পানিতে গুলিয়ে চালান করে দিলাম পেটে। ঘড়ি দেখছি বার বার।

বেল্টের খোপ থেকে বেইট-নাইফটা বের করে মুঠোর ভেতর থেকে ছুঁড়ে দিলাম সবচেয়ে কাছের নারকেল গাছটার দিকে। গেঁথে গিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সেটা।

'এর মানে কি?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল রডরিক। যতই ঘনিয়ে আসছে সময় ততই মন খারাপ করে ফেলছে ও। মুখের চেহারা অস্বাভাবিক সরল আর নিভাঁজ-এমন গম্ভীর হতে এর আগে দেখিনি কখনও ওকে।

ওর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছি আমি। চেহারায় সহজ আর উদ্বেগশূন্য ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। খালি হাত দুটো দু'দিকে মেলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বললাম, 'দেখ-কোন অস্ত্র নেই আমার কাছে।'

'তুমি রেডি, মাসুদ?' আবার বিড়বিড় করে জানতে চাইল রডরিক।

দাঁড়িয়ে পড়েছি আমরা দু'জন। তাকিয়ে আছি একজন আরেকজনের দিকে। অনেকটা অপ্রতিভ, বোকার মত। কোন কথা বলল না রডরিক। আমাকে ও কখনই শুভেচ্ছা জানাবে না, জানি আমি। ওর ধারণা, বিদায় বেলা শুভেচ্ছা উচ্চারণ করলে অশুভ শক্তির দৃষ্টিও আকৃষ্ট করা হয়।

'পরে দেখা হবে,' বিড় বিড় করে বলল রডরিক।

'ঠিক আছে, রডরিক,' আমার হাতটা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

হাতটা ধরে চাপ দিল রডরিক, তারপর ঘুরে দাঁড়াল, হাঁটার পথে ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল এফ. এন কারবাইনটা, গাছের ভেতর

দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে।

যতক্ষণ দেখতে পাচ্ছি তাকিয়ে আছি ওর দিকে। একবারও পেছন ফিরে দেখল না ও আমাকে।

আমি নিজেও এবার ঘুরে দাঁড়ালাম। নরম বালির ওপর দিয়ে হেঁটে নামছি সৈকতে।

গাছের শেষ সারিটা পেছনে রেখে সৈকতে বেরিয়ে এসেছি আমি। আরও এগিয়ে পানির কিনারায় দাঁড়ালাম। পানির ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছি ক্রাশবোটের দিকে। স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করলাম মাস্তুলের সাথে ঝুলন্ত লাশটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়েই আছি। ডেকে ঘোরাফেরা করছে সেন্ট্রিরা, কিন্তু কেউ দেখতে পায়নি এখনও আমাকে। দশটা বেজে এক মিনিট পেরিয়ে যেতে মাথার ওপর হাত তুলে নাড়ছি হাত দুটো, হ্যালো হ্যালো করে চিৎকার করছি। তিন সেকেণ্ড পর ক্রাশবোটে সাংঘাতিক দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল।

সিডনি শেরিডান আর লোরনা পেজ উদয় হল রেইলের কাছে, দু'জনে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অনর্গল কথা বলছে লোরনা, ওর ঠোঁট নড়া দেখে বুঝতে পারছি। সাংঘাতিক উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ অনুভব করছে ও। শেরিডান গম্ভীর। ওদিকে হুড়োহুড়ি করে নামছে ছয়জন লোক হোয়েলবোটে। এক মুহূর্ত পর দ্রুত ছুটে আসতে শুরু করল সেটা সৈকতের দিকে।

তীরে এসে বোট ভিড়তে না ভিড়তে লাফ দিয়ে নেমে এল হুমায়ুন দাদার ছয়জন অনুচর, দ্রুত চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল আমাকে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে এ. কে. ফরটি সেভেন, ব্যগ্রতার সঙ্গে নলগুলো চেপে রেখেছে আমার পিঠ আর তলপেটের ওপর।

মাথার ওপর হাত তুলে দিয়েছি আমি, চেহারায় বিষণ্ন ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, একজন পেটি অফিসার চেক করছে

আমাকে। আমার কাছে কোনরকম অস্ত্র নেই দেখে সম্ভবত বেজার হল সে, আমার শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে একটা হাত রেখে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল হোয়েলবোটের দিকে। আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, তাই আছাড় খেয়ে পড়লাম না। কিন্তু পেটি অফিসারের আচরণটাকে অবাধ লাইসেন্স হিসেবে ধরে নিয়ে অতি উৎসাহী তার এক লোক প্রচণ্ড একটা গুঁতো চালাল রাইফেলের নল দিয়ে আমার কিডনি লক্ষ্য করে। গুঁতোটা ছয় ইঞ্চি ওপরে খেলাম, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ।

আবার কেউ সুযোগ নেবে, এই ভয়ে দ্রুত পা চালিয়ে হোয়েলবোটে উঠে পড়লাম আমি, ভিড় করে উঠে এল আমার সঙ্গে ওরাও, মেশিনগানের নলগুলো আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ঠেকিয়ে রেখেছে।

ক্রাশবোটে যখন উঠছি, আমাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল সিডনি শেরিডান, 'আবার দেখা হল, কেমন!' নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে ওর ঠোঁটের বাঁকা হাসিটা। 'আমি জানতাম!'

'জানতে মানে? তোমার তো ধরে নেবার কথা সেভার্নের পানিতে ডুবে মরেছি আমি।'

'বুমেরাং থেকে তুমি যখন লাফ দিয়ে পড়লে, তখন খুশিই হয়েছিলাম,' হাসছে শেরিডান। 'আসলে ভোরের আলো ঠিক কোথায় ডুবে আছে সে-ব্যাপারে পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না আমাদের। লোরনা জায়গাটা চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ ছিল আমার। তাই গাইড হিসেবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হত আমাকে। যখন পালিয়ে গেলে, ভাল করে আর খুঁজলাম না। ধরে নিয়েছিলাম নির্দিষ্ট জায়গায় আবার পাওয়া যাবে তোমাকে। তুমি যে অত সহজে মরবে না, সে তো জানা কথা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, আমার পেছনে দাঁড়ানো লোকটাকে নিঃশব্দে ইশারা করল শেরিডান। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম দুই

শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে, ডেকের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে এসেছি ছিটকে। প্রচণ্ড রাগে আগুন ধরে গেল শরীরে, দাঁতে দাঁত চেপে সামলাতে চেষ্টা করছি নিজেকে। রাফেলার কথা মনে করতেই সহ্য করার একটা শক্তি পেলাম মনের ভেতর।

সাদামাঠা ক্যানভাস কুশনে মোড়া নিচু একটা কাউচে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে কমাণ্ডার হুমায়ুন দাদা, কাউচ-এর চারদিক থেকে উপচে পড়ছে তার শরীর। ইউনিফর্ম জ্যাকেটটা খুলে রেখেছে সে, তার পাশের বাল্কহেডের সঙ্গে একটা হুকে ঝুলছে সেটা সবগুলো পদক সহ। পরে রয়েছে শুধু একটা ঘামে ভেজা আস্তিন ছাড়া ধূসর রঙের ভেস্ট। এই সাত-সকালেও তার হাতে মদের গ্লাস দেখতে পাচ্ছি আমি।

'এই যে, রানা, পরম বন্ধু-নাকি চরম শত্রু?' কয়লার তৈরি বিশাল একটা মূর্তির মত দেখাচ্ছে ওকে, নিঃশব্দে হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। 'আছ কেমন? সব খবর ভাল? মানসিক অবস্থা? আমার ওপর রাগ করে নেই তো?'

জোর করেও হাসতে পারলাম না আমি। ওর সঙ্গে বিদ্রূপ বিনিময় করব, মনের সে-অবস্থা নেই। আমি আর রাফেলা কতটুকু ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে আটকা পড়েছি সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ভুল ধারণা নেই আমার। উত্তেজনা আর ভয়ে টান টান হয়ে আছে স্নায়ু।

'আমার বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে,' কেবিনে ঢুকছে সিডনি শেরিডান আর লোরনা, ইঙ্গিতে ওদেরকে দেখিয়ে আমাকে বলছে হুমায়ুন দাদা, 'তোমার সম্পর্কে আশ্চর্য সব গল্প শুনেছি আমি, রানা। বিশ্বাস কর, তুমি যে এতবড় প্রতিভা আর এমন করিৎকর্মা পুরুষ, আগে তা বুঝিনি আমি।'

'ধন্যবাদ, হুমায়ুন,' বললাম ওকে। 'সত্যিই তুমি নিরেট একটা ইঁট ভরে রেখেছ মাথার ভেতর। কিন্তু পরস্পরের প্রশংসা

করার সময় পরে আরও পাওয়া যাবে। কাজের কথায় আসা যাক এবার, কি বল?'

'খাঁটি কথা!' সায় দিয়ে মাথা দোলাল হুমায়ুন দাদা। 'লক্ষ্মী ছেলে, কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না!' শেষ মন্তব্যটা করল সিডনির দিকে তাকিয়ে।

'বাঘ-সিংহাসনটা তুলেছ তুমি, রানা,' অকারণ রূঢ় কণ্ঠে বলল শেরিডান। 'আমরা জানি।'

এদিক-ওদিক মাথা দোলালাম আমি। 'পুরোটা নয়, অংশ বিশেষ। বাকি অংশগুলো নেই ওখানে। যতটুকু ছিল, হ্যাঁ, তুলেছি।'

'ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম তোমার কথা,' বলল সিডনি। 'এবার বল কি উদ্ধার করেছ?'

'বাঘের মাথাটা। সোনার তৈরি। প্রায় তিনশো পাউণ্ড ওজন।'

দ্রুত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল শেরিডান আর হুমায়ুন দাদা।

'আর?'

প্রশ্নটা করল সিডনি এবং ওর চোখের পাতা নড়ে উঠতে দেখেই বুঝলাম নির্যাতনের সময় যতটুকু জানে তার প্রায় সবটুকু ওদেরকে বলে দিয়েছে রাফেলা। এর জন্যে ওকে দোষ দিতে পারি না। এটাই আশা করেছিলাম আমি।

'আর রয়েছে জুয়েলের সিন্দুকটা।' সিংহাসন থেকে খুলে সব পাথর রাখা হয়েছিল এই সিন্দুকটায়।'

'তারপর?' লোভ আর জেদের সুরে জানতে চাইল সিডনি। 'ডায়মণ্ডটা-গ্রেট মুঘল?'

'পেয়েছি আমরা ওটাও,' মৃদু কণ্ঠে, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিলাম আমি।

ফিস ফিস করছে ওরা, হাসছে, পরস্পরকে সায় দিয়ে মাথা

নাড়ছে ঘন ঘন।

'কিন্তু,' ওদেরকে জানালাম, 'কোথায় আছে সেটা তা শুধু একা আমি জানি।'

সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি নিভে গেল ওদের। টান টান হয়ে উঠল পেশী, বোবা হয়ে গেছে দু'জনেই। একচুল নড়ছে না আর কেউ।

'এবার বিনিময় ব্যবসা করার মত কিছু রয়েছে আমার কাছে, সিডনি। তুমি আগ্রহী?'

'আমরা আগ্রহী, রানা-সাংঘাতিক আগ্রহী,' শেরিডানের হয়ে উত্তর দিল হুমায়ুন দাদা।

গুপ্তধন প্রায় দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে আসায় আমার দুই শত্রুর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে টের পাচ্ছি আমি।'

'আমার দাবি, রাফেলা বার্ডকে চাই আমি।'

'রাফেলা বার্ড?' দাবিটা শুনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল শেরিডান, তারপর এমন কৌতুক বোধ করল যে হাসির দমকে খক্‌খক্ করে কাশতে শুরু করে দিল সে। হাসি আর কাশি থামিয়ে বলল সে, 'যতটা ভেবেছিলাম তুমি তার চেয়ে আরও অনেক বড় বোকা, রানা।'

'মেয়েটার কোন গুরুত্ব নেই আমাদের কাছে-আমরা ওর ব্যাপারে আগ্রহী নই', গ্লাসে চুমুক দিয়ে মদটুকু নিঃশেষ করল হুমায়ুন দাদা, গ্লাসটা ছুঁড়ে দিল শূন্যে। ডেকে পড়ার আগেই একজন ক্রু লুফে নিল সেটা। 'ওকে তুমি ফিরিয়ে নিতে পার, রানা।'

'দ্বীপ থেকে চলে যাবার জন্যে আমার হোয়েলবোট, ফুয়েল আর পানি চাই আমি।'

'ন্যায্য দাবি, রানা, খুবই ন্যায্য দাবি,' হাসছে শেরিডান। যেন গোপন মতলবটা স্মরণ করছে এই মুহূর্তে।

'আর বাঘের মাথাটা চাই আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসির বিস্ফোরণ ঘটল কেবিনের ভেতর।

'রানা! রানা!' এখনও হাসছে হুমায়ুন দাদা, অথচ দুঃখে কাতর ভঙ্গিতে নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে হাত দিয়ে।

'রানা লোভী!' ফোঁড়ন কাটল লোরনা।

'রানা বোকা!'

'কি আশ্চর্য! আমি কি কিছুই পেতে পারি না? ডায়মণ্ডটা নিচ্ছ তোমরা, প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের একগাদা মূল্যবান পাথর দিচ্ছি...' যতটা সম্ভব আহত আর অভিমানের সুরে দরকষাকষির অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছি, ওদের চোখে এটাই স্বাভাবিক মনে হবে। '...এসবের তুলনায় মাথাটা তো কিছুই নয়। এক গ্রেট মুঘলই ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ ডলারে বেচবে তোমরা, আর মাথাটা বিক্রি করে টেনেটুনে খরচটা শুধু উঠবে আমার।'

'তুমি খুব কঠিন পাত্র, রানা,' নিরাশ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক প্রকাণ্ড মাথাটা দোলাচ্ছে হুমায়ুন দাদা। 'অবশ্য কঠিন জিনিসকে তুলোর মত নরম করার সমস্ত কৌশল জানা আছে আমার।'

'এ থেকে তাহলে কি পাচ্ছি আমি?' জানতে চাইলাম আমি।

'দুটো জীবন পাচ্ছ-তোমার আর তোমার বান্ধবীর। আর এই দুটো পেয়েই সুখী ও কৃতজ্ঞ বোধ করতে হবে তোমাকে, নিচু গলায় কথাগুলো বলল শেরিডান। ওর চোখে তাকিয়ে মনে মনে শিউরে উঠলাম আমি, অদ্ভুত একটা শীতলতা রয়েছে ওর দৃষ্টিতে, সাপের মত। গুপ্তধন একবার ওকে দেখিয়ে দেবার পর কি করবে ও তা লেখা রয়েছে সেখানে পরিষ্কার।

'কিন্তু তোমাদেরকে আমি বিশ্বাস করব কিভাবে?' অসহায় চোখে তাকালাম প্রথমে হুমায়ুন দাদা, তারপর শেরিডানের দিকে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল শেরিডান। 'তোমার আর কোন উপায় নেই, রানা।'

‘রানা,’ বলল হুমায়ুন দাদা, ‘আমাদেরকে তুমি বিশ্বাস করবে নাইবা কেন? তোমাদেরকে খুন করে সম্ভাব্য কি লাভ পেতে পারি আমরা?’

‘লোকসানটাই বা কোথায়?’ ভাবলাম আমি। কিন্তু একটু চিন্তা করার ভান করে মাথা নাড়লাম, বললাম, ‘ঠিক আছে। আর কোন উপায় যখন নেই।’

আবার ওরা হাসি খুশি হয়ে উঠল। চোখে-চোখে ভাব বিনিময় হচ্ছে। একজন ক্রুর বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে হুইস্কি ভরা গ্লাসটা নিয়ে নিঃশব্দ স্যালিউটের ভঙ্গিতে কপালের পাশে তুলল সেটাকে হুমায়ুন দাদা। ‘ড্রিঙ্ক, রানা?’ আদরের সুরে আমন্ত্রণ জানাল সে।

‘সকালের দিকে অভ্যাস নেই, হুমায়ুন,’ জানালাম ওকে। ‘তবে রাফেলাকে এখন দেখতে পেলে খুশি হব আমি।’

নিজের একজন লোককে ইঙ্গিত করল হুমায়ুন দাদা। ‘যাও নিয়ে এসো ওকে।’

‘ফুয়েল আর পানি থাকবে হোয়েলবোটে, সেটা তোমরা সৈকতে রাখবে আমাদের জন্যে,’ জেদের সুরে স্মরণ করিয়ে দিলাম আমি।

রাজি হয়ে মাথা কাত করল হুমায়ুন দাদা, নিজের আরেকজন লোককে ইশারায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে বলল।

‘আমরা যখন সৈকতে যাব, মিস রাফেলাও থাকবে আমাদের সঙ্গে। সিন্দুক আর বাঘের মাথা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবার পর ওগুলো সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে তোমরা,’ পালা করে দু’জনের দিকে তাকালাম আমি। ‘দ্বীপে আমাদেরকে তোমরা রেখে যাবে অক্ষত অবস্থায়-রাজি?’

‘অবশ্যই, রানা,’ নিরস্ত্র ভঙ্গিতে হাত দুটো দু’দিকে ছড়িয়ে দিল হুমায়ুন দাদা। ‘তোমার সঙ্গে আমরা সবাই একমত।’

ভয় পাচ্ছি, আমার চোখের অবিশ্বাস ওদের দৃষ্টিতে ধরা না

পড়ে যায়। ফাঁকি দেবার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছি, কেবিনের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখলাম রাফেলাকে। সুখ আর স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করছি শরীরে।

কিন্তু রাফেলার দিকে ভাল করে তাকাতেই দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল আমার সারা গায়ে।

ফুলে রয়েছে রাফেলার ঠোঁট দুটো। ‘রানা,’ অতি কষ্টে, বিকৃত উচ্চারণে বলল ও, ‘তুমি এসেছ-ওহ্ গড, তুমি এসেছ!’ টলমল করছে রাফেলা, আমার দিকে ছুটে আসতে চাইছে-কিন্তু শরীরের শক্তিতে কুলাচ্ছে না ওর। এক পা এগিয়ে তাল সামলাতে চেষ্টা করছে ও।

গালের দু’দিকেই দগদগে ক্ষত রয়েছে ওর, দেখে মনে হচ্ছে একদিকের চোয়ালের হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চোখের নিচে আঁচড়ের দাগগুলো ভূতুড়ে ভাব এনে দিয়েছে চেহারায়। নাকের ফুটো দুটোর কিনারায় এঁটে বসে আছে শুকনো রক্ত। ওর এই দুর্দশা দেখে চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি, আলিঙ্গনের মধ্যে নিয়ে এসে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখলাম ওকে।

সকৌতুক কৌতূহলের সঙ্গে আমাদেরকে দেখছে ওরা। ওদের দৃষ্টির স্পর্শ পাচ্ছি আমি শরীরে। চোখ খুলেছি, কিন্তু আমার চোখে খুনের নেশাটা ওদেরকে দেখতে দিতে চাই না বলে ঘাড় ফিরিয়ে দু’জনের কারও দিকে তাকাচ্ছি না।

দ্রুত নিজেকে সামলে নিলাম আমি। ‘ঠিক আছে,’ ওদের দিকে ফিরে বললাম আমি, ‘চলো, ঝামেলাটা সেরে ফেলা যাক।’

‘দুঃখিত, রানা-তোমাদের সঙ্গে সৈকতে যেতে পারছি না আমি,’ কোচে বসে থেকেই বলল হুমায়ুন দাদা। ‘ছোট বোটে ওঠানামা, গায়ে রোদ নিয়ে বালির ওপর হাঁটাহাঁটি, এসব আমার ধাতে নেই। আমি তোমাকে এখান থেকেই শুভ বিদায় জানাব, রানা,’ আবার সে ইঙ্গিতে শেরিডান আর লোরনাকে দেখাল,

'আমার বন্ধুরা আমার প্রতিনিধি হিসেবে যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে। আর, মনে রেখো, আমার নিজের বারোজন লোক যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে-ওরা সবাই অস্ত্র আর আমার নির্দেশ বহন করবে।' বুঝলাম হুমায়ুন দাদার প্রচ্ছন্ন হুমকিটা শুধু আমাকে উদ্দেশ্য করেই নয়।

'গুডবাই, হুমায়ুন। আবার হয়ত দেখা হবে আমাদের।'

'আমার তা মনে হয় না, রানা,' তৃপ্তির সঙ্গে একটা ঢোক গিলে বলল হুমায়ুন দাদা। হাতের প্রকাণ্ড আর লালচে তালু দিয়ে বাতাসে একটা থাবা মেরে আমাকে বিদায় জানাল সে।

মোটর বোটে আমার পাশে বসল রাফেলা। আমার গায়ে হেলান দিয়ে আছে ও। শীতার্ত পাখির ছানার মত কাঁপছে। ওর কাঁধের ওপর হালকা করে একটা হাত তুলে দিয়েছি আমি, ওর মাথাটাকে রাখতে দিয়েছি আমার কাঁধে।

কয়েকবার চেষ্টা করল রাফেলা, কিন্তু যা বলতে চাইছে তা উচ্চারণ করতে পারছে না। ওর ঠোঁটের কাছাকাছি নামালাম মুখটা, কানটা এগিয়ে দিলাম।

'ওরা আমাদেরকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে, রানা,' ফিসফিস করে বলল ও। 'তুমিও তা জানো, তাই না?'

এগারো

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম আমি। রাফেলার হাতের ব্যাণ্ডেজের ওপর আঙুল বুলিয়ে নরম গলায় জানতে চাইলাম, 'তোমার হাতের কি অবস্থা?'

চকিতে সিডনির পাশে বসা স্বর্ণকেশী লোরনার দিকে তাকাল রাফেলা। শিউরে উঠল ও, ফিস ফিস করে বলল, 'লোরনা...লোরনা আমাকে...' কথাটা শেষ করতে পারল না।

চোখ বড় বড় করে চেয়ে রয়েছে লোরনা, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। পাশে বসা শেরিডানের মুখের কাছে মুখ নিয়ে চাপা উত্তেজনার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে সে। সামনে থেকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে ফিতের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে চুল, বাতাসে সেগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে না। প্রচুর সময় আর যত্ন নিয়ে প্রচুর কসমেটিকস ব্যবহার করেছে মুখে, নানান রঙ ঝলমল করছে সেখানে। আগুনের মত জ্বলছে লাল লিপস্টিক লাগানো ঠোঁট দুটো। রূপালী সবুজ ব্যবহার করেছে চোখের পাতায়, একই রঙের টানা ভুরু এঁকেছে বন-বিড়ালী চোখের ওপর।

'ওরা কয়েকজন শক্ত করে ধরে রেখেছিল আমাকে-আর একটা একটা করে লোরনা আমার আঙুলের নখ উপড়েছে,' আবার শিউরে উঠল রাফেলা।

ছোট্ট, হালকা শব্দ করে হেসে উঠল লোরনা। সোনালী ডানহিল লাইটার জ্বেলে ওর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে শেরিডান।

'সিংহাসনটা কোথায় জানতে চাইছিল ওরা-আমি উত্তর দিতে না পারলেই লোরনা প্লায়ার্স দিয়ে একটা করে নখ উপড়ে নিচ্ছিল আমার। রানা, মাংস থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার সেই শব্দ এখনও আমি শুনতে পাচ্ছি...' প্রায় নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছে রাফেলা। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি আমি।

'শান্ত হও, রাফেলা, ভুলে যেতে চেষ্টা করো', অনুনয়ের সুরে ফিস ফিস করে বললাম ওকে। আমার আরও একটু কাছে সরে এল ও। আমার কাছ থেকে শক্তি সাহস আশা ভরসা এইসব পেতে চাইছে ও। এদিকে মাথার ভেতরটা বিস্ফোরিত হবার আগেই প্রচণ্ড রাগটাকে আবার ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছি আমি।

তীরে এসে ভিড়ল মোটরবোট। সৈকতে নেমে রাফেলার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদেরকে ঘিরে রয়েছে সশস্ত্র সেন্ট্রিরা।

'ঠিক আছে, রানা?' হাত বাড়িয়ে অল্প দূরে নোঙর করা হোয়েলবোটটা দেখাল আমাকে শেরিডান। 'ফুয়েল ঢেলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে ট্যাঙ্কগুলো। যথেষ্ট পানিও তুলে দেয়া হয়েছে। সোনাদানাগুলো কোথায় দেখিয়ে দাও-তারপর চলে যেতে পারবে তোমরা।' শেরিডান যেন মাটির মানুষ, সরল শান্ত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল সে।

কিন্তু ওর পাশে দাঁড়ানো মেয়েটা তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে-ঠিক শিয়াল যেভাবে মুরগীর দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভাবছি, কে জানে আমাদের জন্যে কি ধরনের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা মনে মনে ঠিক করে রেখেছে ও। আমাদের প্রয়োজন ফুরোলে, সন্দেহ নেই, ওর হাতে আমাদেরকে তুলে দেবে শেরিডান, এ ব্যাপারে কথাবার্তা হয়ে গেছে ওদের মধ্যে।

'আশা করি ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে খামোকা সময় নষ্ট করবে না তুমি, রানা।'

লক্ষ করছি, সঙ্গে করে নিজের চারজন লোককেও নিয়ে এসেছে শেরিডান। তারা নিঃশব্দ ইঙ্গিত পেয়ে ইতিমধ্যেই প্রায় ঘিরে ফেলে পাহারা দিচ্ছে তাকে। এদের প্রত্যেকের হাতে পিস্তল রয়েছে। একজনকে চিনতে পারছি-রোভার গাড়িটার ড্রাইভার।

হুমায়ুন দাদার তরফ থেকে রয়েছে একজন পেটি অফিসারের অধীনে দশজন আফ্রিকান নিগ্রো ক্রু। টের পাচ্ছি, আমার শত্রুরা ইতিমধ্যেই দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, দুই দলের মধ্যেই নিঃশব্দে বেড়ে উঠছে উত্তেজনা। কৌশলে প্রতিপক্ষ দলের দু'জন লোককে অকেজো করে দিল শেরিডান। মোটরবোট পাহারা দেবার জন্যে এই দু'জনকে সৈকত ছেড়ে কোথাও যেতে নিষেধ করল সে।

এরপর আমার দিকে ফিরল আবার। 'চলো, রানা। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।'

নারকেল গাছগুলোকে এড়িয়ে এঁকেবেঁকে উঠছি আমরা। কনুই ধরে হাঁটতে সাহায্য করছি রাফেলাকে আমি। টলছে ও, এলোমেলোভাবে পা ফেলছে আর হাঁপাচ্ছে। গুহাগুলোর কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই ক্লান্তি, ব্যথা আর দুর্বলতায় নিঃশব্দে ফোঁপাতে শুরু করল।

'আহা রে,' পেছন থেকে প্রলম্বিত লয়ে সুর করে বলল, লোরনা, 'ঢং দেখে বাঁচি না!'

শক্ত হয়ে গেল রাফেলার কাঁধের পেশী, কিন্তু কিছু বলতে চেষ্টা করল না ও। আমিও হজম করলাম ব্যাপারটা।

পেছনে সশস্ত্র লোকদের নিয়ে ঢালের নিচের কিনারা ধরে এগোচ্ছি আমরা। পথে একবার মাত্র চুপিসারে তাকালাম রিস্টওয়াচের দিকে। ক্রাশবোটের নিচে জেলিগনাইট বিস্ফোরিত হতে এখনও আধ ঘন্টা বাকি।

সিন্দুক কোথায় পোঁতা আছে তা ওদেরকে দেখিয়ে দেবার আগে একটু অভিনয় করতে হল আমাকে। সবচেয়ে কাছের গাছটার পাশ থেকে পা গুণে গুণে এগোলাম আমি, এক জায়গায় থেমে বাঁক নিলাম, আবার সামনে বাড়লাম কয়েক পা। এখানে দাঁড়িয়ে পায়ের দিকে তাকালাম, যেন চারপাশের মাটি পরীক্ষা করছি। সামনে থেকে উঠে গেছে ঢালটা, পঞ্চাশ ফুট ওপরে ভাঁজ খাওয়া মাটি ঢাকা পড়ে রয়েছে ঘন ঝোপ আর লম্বা ঘাসে-এসব কল্পনার চোখে দেখছি আমি, মুখ তুলে সেদিকে তাকাবার ঝুঁকি নিচ্ছি না।

পায়ের সামনের মাটি আঙুল দিয়ে দেখালাম সিডনিকে। পিছিয়ে সরে আসতে শুরু করে বললাম, 'এখানে খুঁড়তে বল।'

চারজন ক্রু তাদের একজন সহকর্মীর কাছে অস্ত্রগুলো জমা রাখল, সঙ্গে নিয়ে আসা ছোট ভাঁজ করা আর্মি-টাইপ কোদালগুলো জোড়া লাগাচ্ছে দ্রুত।

এমনিতেই নরম মাটি, তার ওপর এর আগে নাড়াচাড়া করা হয়েছে, আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে গভীর করে তুলছে ওরা গর্তটাকে।

‘ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে ও,’ ইঙ্গিতে রাফেলাকে দেখিয়ে শেরিডানকে বললাম আমি, ‘দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না-কোথাও বসতে হবে ওকে।’

ঝট্ করে আমার দিকে তাকাল সিডনি শেরিডান। আমার কোন মতলব আছে কিনা, চোখের লেখা পড়ে বুঝতে চাইছে।

দ্রুত চিন্তা করছে শেরিডান। দৌড়ে পালিয়ে যাবে রাফেলা, সে শক্তি নেই ওর, বুঝতে পারছে সে। হুমায়ুন দাদার আরও দু’জন লোককে দূরে সরিয়ে দেবার অর্থাৎ অকেজো করে দেবার মস্ত একটা সুযোগ এটা। এইসব ভাবছে সে, তার মুখের চেহারা দেখে পরিষ্কার ধরতে পারছি আমি।

পেটি অফিসারের সঙ্গে ব্যস্ত ভঙ্গিতে কথা বলল সে। তারপর আমার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল ছোট্ট করে।

রাফেলার হাত ধরে সবচেয়ে কাছের নারকেল গাছটার দিকে পা বাড়ালাম আমি। অগভীর নালার পাশে, গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসলাম আমরা। পাশাপাশি হেঁটে এসেছে দুজন সশস্ত্র গার্ড। দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দু’পাশে।

বসে এখন আরাম পাচ্ছে রাফেলা। আমার রুমালটা দিলাম ওকে। ধীরে ধীরে কপাল আর মুখ থেকে ঘাম মুছছে ও। এখন আর তত জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে না।

ঢালের ওপর দিকে আলগোছে একবার চোখ বুলালাম আমি। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ছে না ওখানে। তবে, আমি জানি উত্তেজনায় ব্যগ্র হয়ে একদৃষ্টিতে আমাদেরকে দেখছে রডরিক। দু’জন গার্ড ছাড়া বাকি সবাই গর্তের ভেতর দাঁড়ানো চারজন লোকের চারদিকে ভিড় করে রয়েছে, আশায় আর উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে ওদের সবার পেশী।

আমাদের দু’জন গার্ডকেও কুরে খাচ্ছে কৌতূহল। বারবার ঘাড় ফিরিয়ে চল্লিশ গজ পেছনের ভিড়টার দিকে তাকাচ্ছে ওরা।

সিন্দুকের গায়ে লোহার কোদালের বাড়ি লাগল-ক্ল্যাঙ্ক শব্দটা পরিষ্কার ভেসে এল আমার কানে। পরমুহূর্তে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল গর্তের চারদিক থেকে ওরা সবাই। হৈ-চৈ-এর সঙ্গে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল ওরা, একজন আরেক জনের কনুই ধরে পেছন দিকে টানছে, গর্তের ভেতরটা ভাল করে দেখার সুযোগ খুঁজছে। আমাদের গার্ড দু’জনও দূর থেকে তাকিয়ে আছে ওদিকে, ঘুরে গেছে ওরা, পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের দিকে।

শেরিডান ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল দু’জন ক্রুকে, গর্তের ভেতর মাটি কাটছে যারা তাদের পাশে নামল সে লাফ দিয়ে। ওর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি আমি, ‘ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি কর! দড়ি এনে বাঁধ একটাকে, তারপর সবাই মিলে টেনে তোল। সাবধান, কিছু যেন নষ্ট না হয়!’

গর্তের দিকে ঝুঁকে রয়েছে স্বর্ণকেশী লোরনাও। নিখুঁত পরিস্থিতি। এর বেশি আমি কিছু আশা করতে পারি না।

ডান হাতটা তুলছি আমি। ধীরে ধীরে কপালটা মুছছি হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে। জানি, আমার দিকে তাকিয়ে আছে রডরিক। দেখতে পাচ্ছে সিগন্যালটা।

কপাল থেকে ঝট্ করে নামিয়ে নিলাম হাতটা। রাফেলাকে আঁকড়ে ধরেছি, ওকে সঙ্গে নিয়ে কাত হয়ে পড়ে গিয়েই দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছি অগভীর নালাটার দিকে।

হতভম্ব হয়ে গেছে রাফেলা। নালার ভেতর আশ্রয় নিতে দেরি হয়ে যাবে এই ভয়ে নির্মমভাবে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছি ওর সঙ্গে আমি। আহত শরীরের ওপর চাপ, ধাক্কা আর গুঁতো খাচ্ছে ও, ব্যথায় গোঙাচ্ছে।

বিন করে একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল আমাদের দিকে গার্ড দু'জন। ঘোরার মধ্যেই তুলে ফেলেছে সাবমেশিনগান, গুলি করতে যাচ্ছে। অগভীর নালা কোন আড়ালই দিচ্ছে না আমাদেরকে।

'খোদার দোহাই, রডরিক, এখন!' আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে আমার চোখ, চেয়ে আছি একজোড়া মেশিনগানের গভীর কালো নলের ফুটোর দিকে, ঝাঁপিয়ে পড়েছি রাফেলার ওপর আমার শরীর দিয়ে ওকে ঢেকে রাখার জন্যে। বড়জোর এইটুকুই ওর জন্যে করতে পারি, আমাকে শেষ করে তারপর ওর গায়ে বিঁধুক বুলেটের ঝাঁক।

সেই মুহূর্তে, সেই মারাত্মক সর্বশেষ মুহূর্তে খিলখিল করে হেসে উঠল লোরনা, আগুনের আঁচের মত কানের পর্দায় এসে লাগছে তার হাসি, ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের ধাক্কায় ঝাঁকি খাবার জন্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তৈরি হয়ে গেছি আমি। আর সেই মুহূর্তে, সেই প্রিয় মুহূর্তে ইলেকট্রিক ব্যাটারি ব্লাস্টারের নবটা টিপে দিল রডরিক। আগের রাতে সাবধানে লুকিয়ে রাখা ইনসুলেটেড ওয়্যার বেয়ে নেমে আসছে বিদ্যুৎ। সিন্দুকে ঠাসা রয়েছে হাফ কেস জেলিগনাইট-আমার আর রাফেলার নিরাপত্তার কথা ভেবে যতটুকু বিস্ফোরক ভরা সম্ভব সবটুকু ভরে রেখেছি ওতে। প্রচণ্ড আওয়াজ করে ফাটল বোমাটা।

সিন্দুকটা বিস্ফোরিত হওয়ায় রডরিকের নিঃশব্দ হাসি কল্পনা করতে পারছি আমি। গর্তের গায়ে ধাক্কা খেয়ে, গর্তটাকে আরও বড় করে তুলে সিন্দুকসহ সবকিছু উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। গর্তের কিনারায় যারা দাঁড়িয়ে ছিল, কেউ বাদ গেল না। বন বন করে পাক খাচ্ছে চামড়া ছেলা রক্তাক্ত লোকগুলো, ডিগবাজি খাচ্ছে শূন্যে-উঠে যাচ্ছে এখনও ওপর দিকে। ওদেরকে ছাড়িয়ে একশো ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে ধুলো আর বালির খাড়া একটা স্তম্ভ।

মাটির প্রচণ্ড কাঁপনে ঠোকাঠুকি খেলাম আমি আর রাফেলা, পরমুহূর্তে আমাদের দিকে ছুটে এল শক ওয়েভ। এক ধাক্কায় চিৎ করে ফেলে দিল গার্ড দু'জনকে, শরীরের কাপড় ছিঁড়ে দিয়ে গেছে।

আমার কানের পর্দা দুটো ফেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু রাফেলার কান দুটো হাত দিয়ে চেপে রেখেছিলাম, তাই বেঁচে গেছে ওরগুলো।

ধুলোবালির নিচে চাপা পড়ে গেছি আমরা। গড়িয়ে নেমে এলাম রাফেলার ওপর থেকে, ব্যগ্র উন্মত্ততার সঙ্গে নালার বেলে মাটি খুঁড়ছি নখ দিয়ে। সাবমেশিনগানের গায়ের সঙ্গে আটকে গিয়ে আঙুলের একটা নখ প্রায় উল্টে গেল আমার। ভ্রূক্ষেপ না করে বালির নিচ থেকে টেনে বের করে নিলাম অস্ত্রটা, জড়িয়ে থাকা শার্টটা খুলে ফেলে দ্রুত উঠে দাঁড়াচ্ছি হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে।

আমার কাছের গার্ড দু'জনেই বেঁচে রয়েছে। একজন বসে বসে টলছে, কানের পর্দা ফেটে গেছে তার, জুলফি বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে রক্তের ধারা। আরেকজন হামাগুড়ি দিচ্ছে। ছোট্ট করে দু'বার ট্রিগার টিপে শেষ করলাম ওদেরকে, দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে রয়েছে দেখে ব্যারেলের গুঁতো মেরে বসে থাকা লোকটাকে বালির ওপর তাড়াতাড়ি পড়ে যেতে সাহায্য করলাম।

এবার তাকালাম গর্তের চারদিকে ছড়ানো মাংসপিণ্ডের ভাঙাচোরা স্তূপের দিকে।

ওখানে মন্থর গতিতে মোচড় খাচ্ছে মাংসপিণ্ড, নরম গোঙানির শব্দ উঠছে। নালা থেকে উঠে এলাম আমি, থরথর করে কাঁপছি। মুখ তুলে তাকাতেই ঢালের ওপর দেখতে পাচ্ছি রডরিককে, পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেক কালো পাহাড়। গলার দু'পাশের রগগুলো ফুলে উঠেছে ওর, চিৎকার

করে কি যেন বলছে, কিন্তু কানের ভেতর ঝন ঝন শব্দে একনাগাড়ে বাজছে বিস্ফোরণের সেই প্রচণ্ড আওয়াজ, আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমি।

দাঁড়িয়ে আছি এখানে, নিজে থেকেই সামনে পিছনে মৃদু দোল খাচ্ছে শরীরটা, হতভম্ব বোকার মত তাকাচ্ছি চারদিকে। ধীরে ধীরে উঠে বসছে রাফেলা, দেখতে পাচ্ছি আমি। আমার পাশে এসে দাঁড়াল ও। হাত রাখল আমার একটা কাঁধে। স্বস্তির শীতল পরশ অনুভব করলাম শরীরে ওর কণ্ঠস্বর অস্পষ্টভাবে আমার কানে আসছে বুঝতে পেরে।

বিস্ফোরিত জায়গার দিকে তাকালাম আবার। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলাম আমি আর রাফেলা।

মানুষেরই একটা মূর্তি ওটা, সব কাপড়চোপড় এবং বেশিরভাগ গায়ের ছাল শরীর থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। কাঁচা, রক্তঝরা একটা ভীতিকর বস্তু। কাঁধের খোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে আধখানা হাতের হাড়, এক চিলতে রক্তাক্ত মাংসের সঙ্গে ঝুলছে সেটা শরীরের পাশে। ধীরে ধীরে গর্তের ভেতর থেকে উঠে আসছে সে, যেন প্রাচীন কবর থেকে উঠে আসছে গলিত লাশ।

গর্তের ওপর উঠে এক সেকেণ্ডের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল সে স্থির হয়ে, এতক্ষণে শেরিডানকে চিনতে পেরে আবার একবার শিউরে উঠলাম আমি। এই রকম প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে গেছে ও, তা যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু তার চেয়েও অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আমার দিকে সোজা হেঁটে আসছে ও।

মাটিতে ঘষে ঘষে পা ফেলছে ও, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, ক্রমশ কাছ থেকে আরও কাছে চলে আসছে জ্যান্ত একটা আতঙ্কের মত। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, অন্ধ হয়ে গেছে ও। দুই চোখের কোটর ভরাট হয়ে গেছে বালিতে। এক ইঞ্চি চামড়া

নেই ওর মুখে। সুন্দর চুল সহ খুলির ওপর থেকে মাথার সবটুকু ছাল গায়েব হয়ে গেছে।

অস্পষ্ট কিন্তু একটানা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পাচ্ছি রাফেলার, ভয়ে আমার পিঠের মাংস আঁকড়ে ধরেছে ও, মুখ লুকাচ্ছে আমার দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে।

ধীরে ধীরে তুললাম সাবমেশিনগানটা। বুলেটের সরল রেখা শেরিডানের বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল। মৃত্যু এসে বাঁচিয়ে দিল ওকে।

আচ্ছন্নবোধটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি এখনও। চারদিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিজের তৈরি হত্যাযজ্ঞটা দেখছি, এই সময় আমার কাছে পৌঁছুল রডরিক। আমার একটা হাত চেপে ধরেছে ও। শুনতে পাচ্ছি ওর চিৎকার, 'তুমি ঠিক আছো, মাসুদ?' নিঃশব্দে মাথাটা একদিকে কাত করলাম আমি, তাই দেখে আবার চেঁচিয়ে উঠল রডরিক, 'হোয়েলবোট! যেভাবে হোক ওটাকে হাতছাড়া করা চলবে না আমাদের।'

রাফেলার দিকে ফিরলাম আমি, দু'হাতে মুখ ঢেকে এখনও ফোঁপাচ্ছে ও। 'গুহায় ফিরে যাও তুমি। ওখানে অপেক্ষা কর আমার জন্যে,' বললাম ওকে। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'এদের ব্যাপারে আগে নিশ্চিত হওয়া যাক,' বিড় বিড় করে বললাম রডরিককে। ওকে পাশে নিয়ে হাড়গোড় আর মাংসের স্তূপের দিকে এগোলাম আমি। ওরা সবাই মারা গেছে নয়ত মারা যাচ্ছে। মাটিতে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে লোরনা পেজ। লেস দিয়ে তৈরি আণ্ডার-ওয়্যারটা ছাড়া শরীরের আর সব কাপড় ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে, শুধু কোমরের কাছে রক্ত আর দলা পাকানো মাংসের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে এক টুকরো সবুজ স্ল্যাক স্যুটের কাপড়। একটা হাঁটু ভেঙে গেছে ওর, সাদা হাড়ের ওপর দিয়ে বেরিয়ে আসছে এখনও রক্তের স্রোত।

বিস্ফোরণটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে লোরনার পরিপাটি করে যত্ন নেয়া চুলের সাজ এখনও অটুট হয়ে রয়েছে, শুধু পাউডারের মত মিহি বালির গুঁড়ো সাদা করে দিয়েছে চুলগুলোকে। ওকে নিয়ে মহা এক কৌতুক সৃষ্টি করেছে মৃত্যু-বিস্ফোরণের ধাক্কায় সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এসে ব্লু ল্যাপিজ লাজুলির একটা টুকরো সেঁধিয়ে গেছে লোরনার কপালের ঠিক মাঝখানে, হাড়ের সঙ্গে শক্ত ভাবে আটকে রয়েছে সেটা। ভাবছি, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিশ্চয়ই কোন ভাবে কয়েকটা পাথর সিন্দুকের ভেতর রয়ে গিয়েছিল।

লোরনার নিজের চোখ দুটো বন্ধ হয়ে রয়েছে, কিন্তু কপালের মাঝখানে মূল্যবান তৃতীয় চোখটা অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'একজনও বেঁচে নেই,' বিড় বিড় করে বলল রডরিক।

'হ্যাঁ,' ওর সঙ্গে একমত হয়ে ছিঁড়ে আনলাম মেয়েটার ওপর আটকে যাওয়া আমার চোখের দৃষ্টি। বিজয়ের উল্লাস বা প্রতিশোধ গ্রহণের তৃপ্তি অনুভব করছি না লক্ষ করে আশ্চর্য হচ্ছি আমি। প্রতিশোধ চরিতার্থের অনুভূতি মিষ্টি তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ বিস্বাদ, রডরিককে অনুসরণ করে সৈকতের দিকে যাবার সময় ভাবছি।

বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি আমি, কান দুটো পরিষ্কার হয়ে এলেও শরীরের বল শক্তি ফিরে পাচ্ছি না। রডরিককে দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখার জন্যে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাকে। প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে আশ্চর্য হালকাভাবে হেঁটে যাচ্ছে ও, আর ভারী বোঝার মত কষ্ট করে নিজেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি আমি।

গাছের শেষ সারি পেছনে রেখে সৈকতে বেরিয়ে এলাম আমরা। আমার কাছ থেকে দশ পা সামনে রয়েছে রডরিক। সৈকতের কিনারায়, ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম আমি।

যেখানে দেখে গিয়েছিলাম সেখানেই ভাসছে হোয়েলবোট, কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনার পর কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে মোটরবোট নিয়ে রওনা হয়ে গেছে গার্ড দু'জন। এরই মধ্যে ক্রাশবোটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। একজন আমাদেরকে দেখতে পেয়েই মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। কিন্তু ওটার নাগালের অনেক বাইরে আমরা, তাই গা ঢাকা দেবার কোন চেষ্টা করলাম না। তবে গুলির শব্দ শুনে ক্রাশবোটের বাকি ক্রুরা সৈকতের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল আমাদেরকে। লাফ দিয়ে ছুটল তারা বো-তে ফিট করা কুইক ফায়ারার কামানের দিকে।

'বিপদ হল দেখছি,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল রডরিক।

প্রথম শেলটা আমাদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে ছুটে গেল, পেছনের নারকেল গাছে লেগে বিস্ফোরিত হল সেটা, চারদিকে শ্র্যাপনেল ছুটোছুটি করার শব্দ পেলাম আমরা।

দ্রুত পিছিয়ে এসে গাছের আড়ালে শুয়ে পড়েছি আমি আর রডরিক, বালির উঁচু ঢেউ-এর নিচে নামিয়ে রেখেছি মাথা।

'এরপর কি?' জানতে চাইল রডরিক।

'হরে দরে সমান সমান,' বললাম ওকে। কামানের পরবর্তী দুই রাউণ্ড গোলা আমাদের পেছনের গাছের মাথায় প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল। কিন্তু তারপরই কয়েক সেকেণ্ড আর কোন আওয়াজ নেই। মাথা তুলে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে উঁকি দিতেই দেখি কামানের লম্বা ব্যারেলটা দ্রুত অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে ওরা।

পরবর্তী শেলটা হোয়েলবোটের পাশে অগভীর পানিতে পড়ল, পানির একটা খাড়া স্তম্ভ লাফ দিয়ে উঠল ওপর দিকে। বাচ্চার বিপদ দেখে রাগে সিংহী যেমন গর্জে ওঠে, সেই রকম বিকট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল রডরিকের গলার ভেতর থেকে।

‘ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করছে ওরা হোয়েলবোট...’ প্রকাণ্ড কালো শরীরটা রাগে কাঁপছে, ওর মুখের কথা শেষ হবার আগেই এসে পড়ল পরবর্তী শেলটা, সৈকতের ওপর পড়ে চারদিকে মেঘ ওড়াল সাদা বালির।

‘আমাকে দাও ওটা,’ দ্রুত বললাম ওকে, ওর হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলাম এফ-এন কারবাইনটা, আরেক হাত বাড়িয়ে ধরিয়ে দিয়েছি ওকে শর্ট ব্যারেলের এ. কে. ফরটি সেভেন। ওর কাঁধ থেকে হ্যাভারস্যাকের স্ট্র্যাপটা খসিয়ে নিচ্ছি। লক্ষ্যভেদ করার জন্যে এই মুহূর্তে যে নিপুণতা দরকার তা নেই ওর।

‘নোড়ো না এখান থেকে,’ বললাম ওকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মাথা নিচু করে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি বে-এর বাঁকটার দিকে। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছি আমি। একছুটে চলে এসেছি বে-এর বাঁকে, শিং-এর মাথায়। এখান থেকে নোঙর ফেলা ক্রাশবোটের দূরত্ব সবচেয়ে কম। বালির ওপর ডাইভ দিয়ে পড়লাম আমি। এফ. এনের লম্বা ব্যারেলটা ঠেলে দিলাম সামনের দিকে।

গান ক্রুরা এখনও হোয়েলবোটের ওপর টার্গেট প্র্যাকটিস করছে। ওটাকে ঘিরে বারবার লাফ দিয়ে উঠছে বালি আর পানি। কামানের সামনের প্রতিরোধ প্লেটের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গান ক্রুরা, ঘাড় ফিরিয়ে পাশের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে আমাকে।

এফ. এনের ফায়ার সিলেক্টর সিঙ্গেল শটের ঘরে ঠেলে দিলাম আমি, গভীর কয়েকটা শ্বাস টেনে দৌড়ে আসার হাঁপানিটুকু দূর করে নিলাম। গান-লেয়ার পেডাল মেরে কামানের ব্যারেল একদিক থেকে আরেকদিকে সরাচ্ছে, হাতল ঘুরিয়ে প্রয়োজন মত সেটাকে উঁচু-নিচু করে নিচ্ছে-গান সাইটে চোখ রাখার ফুটোর ওপর নরম প্যাডে চেপে ঠেকিয়ে রেখেছে কপালটা।

সাইটে চোখ রেখে লক্ষ্যস্থির করলাম ওর কানের পাশে, ট্রিগার টিপে বের করে দিলাম একটা বুলেট। সিট থেকে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। ছেড়ে দেয়া এইমিং হ্যাণ্ডেলটা ধীরে ধীরে ঘুরছে,আর অলস ভঙ্গিতে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে কামানের ব্যারেলটা।

হতচকিত দু’জন গান-লোডার বোকার মত তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। ব্যারেল ঘুরিয়েই আরও দুটো গুলি ছুঁড়লাম ওদের দিকে। পাথরের মূর্তি দুটো জ্যান্ত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, লাফ দিয়ে পড়ল ডেকের ওপর, সেখানে থেকে গড়িয়ে চলে গেল আড়ালে। পাশ থেকে খোলা ব্রিজ লক্ষ্য করে পর পর গুলি করলাম তিনটে, অফিসার আর নাবিকরা এ ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সেখান থেকে। মোটরবোটটা ভিড়েছে ক্রাশবোটের পাশে, সেদিকে আরও তিনটে গুলি করে গার্ড দু’জনকে পড়িমড়ি করে ডেকে উঠে পড়তে সাহায্য করলাম, এরাও চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ডেক থেকে। মোটরবোটটাকে বেঁধে রেখে যায়নি ওরা, ক্রাশবোটের পাশ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে সেটা।

এফ. এনের ম্যাগাজিন বদল করলাম আমি। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে বোটের কাছাকাছি দিকের প্রত্যেকটা পোর্টহোলের ভেতর একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে দিচ্ছি। প্রতিটি গুলি ছোঁড়ার পরপরই কাঁচ ভাঙার শব্দ পাচ্ছি আমি।

ব্যাপারটা সহ্যের অতিরিক্ত বাইরে বলে মনে হল হুমায়ুন দাদার, নোঙর তুলে ফেলার শব্দ শুনে বুঝলাম সুমতি হয়েছে তার। পানির নিচে ঘুরতে শুরু করেছে ক্রাশবোটের প্রপেলারগুলো, সাদা ফেনা নিয়ে উথলে উঠছে পানি। খাঁড়ির মুখের দিকে ঘুরে যাচ্ছে ক্রাশবোট।

আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে বোটটা, অবিরাম গুলির মধ্যে

রেখেছি ওটাকে, যাতে বিদায় নিতে দেরি না করে। নোংরা কিন্তু মোটা একটা ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে ব্রিজটাকে, জানি পেছনেই মাথা নিচু করে শুয়ে আছে হেলম্‌সম্যান। ক্যানভাস ফুটো করে একের পর এক বেরিয়ে যাচ্ছে আমার গুলি, ওর পজিশন আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু কাজ হচ্ছে না বুঝতে পেরে আবার মনোযোগ দিলাম পোর্টহোলগুলোর দিকে, আশা করছি বুলেটগুলো খোলের ভেতর ছুটোছুটি করে কিছু একটা ক্ষতি করবে।

দ্রুত বাড়ছে ক্রাশবোটের স্পীড। শিং ঘুরে আড়ালে চলে যাচ্ছে সে। উঠে দাঁড়ালাম আমি, হাতের ঝাপটা মেরে কাপড় থেকে বালি ঝাড়লাম। তারপর রাইফেলটাকে রি-লোড করে নিয়ে ছুটলাম নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে।

দ্বীপের উত্তর প্রান্তের একটা ঢালের মাথায় চড়ে দেখি প্রায় মাইলখানেক দূরে, গভীর পানির চ্যানেলে চলে গেছে ক্রাশবোট। আফ্রিকা মেইনল্যাণ্ডের দিকে ছুটছে সে। সবুজাভ সাগরের বুকে ছোট সাদা একটা আকৃতির মত দেখাচ্ছে তাকে।

এফ. এনটা বগলদাবা করে মাটির ওপর বসে পড়লাম, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রাশবোটের চলে যাওয়া দেখছি। রিস্টওয়াচের কাঁটা বলছে এগারোটা বেজে সাত মিনিট হয়েছে। উদ্বেগের সঙ্গে ভাবতে শুরু করেছি, ক্রাশবোটের স্টার্নের নিচে জেলিগনাইট আছে, না নেই? পানির তোড়ে বাঁধন ছিঁড়ে গিয়ে থাকলে-নেই।

জলমগ্ন আউটার রীফ পেরোচ্ছে ক্রাশবোট। একটু পরই খোলা ইনশোর পানিতে ঢুকবে সে। ঢেউ সরে গেলেই প্রতিবার কদর্য চেহারা নিয়ে দেখা দিচ্ছে প্রবাল প্রাচীরের মাথাগুলো, পরমুহূর্তে পরবর্তী ঢেউটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সাদা ফেনায় পরিণত করছে।

ছোট সাদা আকৃতিটা চুপচাপ বিস্ফোরিত হল। অনেক দূর থেকে দেখছি, তাই খুঁটিনাটি কিছুই ধরা পড়ছে না চোখে, আর বাতাস উল্টোদিকে বইছে বলে কোন শব্দই এল না এদিকে। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল পানি, খুদে বোটটাকে ঢেকে ফেলল সম্পূর্ণ। অস্ট্রিচ পাখির একটা পালকের মত দেখাচ্ছে-নরম আর হালকা, বাতাসে দুলছে। যতটা ওপরে ওঠার উঠে ঝুঁকে পড়ছে নিচের দিকে, দ্রুত হারিয়ে ফেলছে আকৃতি, তারপর এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়ল উত্তাল সাগরে, পানির সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাগরের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ক্রাশবোট, তার কোন চিহ্নই আর দেখতে পাচ্ছি না আমি।

জানি জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের গন্ধ পেয়ে দল বেঁধে ছুটে আসবে আলবাকোর হাঙ্গর। কিন্তু ক্রাশবোটের একজনকেও জীবিত পাবে না ওরা। বিস্ফোরণের পরে ওদের কারও বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। হুমায়ুন দাদার প্রকাণ্ড শরীরটা কল্পনা করে ক্ষীণ একটু দুঃখ বোধ করলাম আমি। অত বড় আকৃতি আগে কখনও দেখিনি, ভবিষ্যতেও আবার দেখব কিনা সন্দেহ। কলকাঠি নেড়ে এমন একটা বিস্ময়কর নমুনাকে ধ্বংস করে দিয়েছি দুনিয়ার বুক থেকে, দুঃখ সেখানেই। জানি, অন্য কিছু করার ছিল না আমার, তবু।

নিজের সঙ্গে কৌতুক করছি, হঠাৎ বুঝতে পেরে, আপন মনে হেসে ফেললাম আমি। উঠে দাঁড়ালাম। দ্রুত হেঁটে নেমে আসছি গুহার দিকে।

লুটপাট করার সময় আমার মেডিক্যাল কিটটা ভেঙে রেখে গেছে ওরা, তবে রাফেলার নখ উপড়ানো আঙুলগুলো ধুয়ে ড্রেস করে দেবার মত যথেষ্ট ওষুধ ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় পাওয়া গেল গুহার মেঝে থেকে। মাংসের ভেতর থেকে টেনে ছিঁড়ে নেয়া

হয়েছে তিনটে নখ। আমার ভয়, শিকড়গুলোও বুঝি নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন করে আর নখ গজাবে না। কিন্তু রাফেলাও এই একই আশঙ্কা প্রকাশ করায় সেটা আমি হেসেই উড়িয়ে দিলাম। যথেষ্ট ভুগেছে ও, এরপর আর মন খারাপ করে দিতে চাই না।

ওর ক্ষতগুলোর যত্ন নেয়ার পর দুটো পেইন-কিলার ট্যাবলেট খেতে দিলাম ওকে। গুহার পেছন দিকে বিছানা পেতে শুইয়ে দিলাম।

'চোখ বোজো,' বললাম ওকে আমি, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে ঝুঁকে আছি ওর ওপর। কপালে হালকাভাবে চুমু খেলাম। 'ঘুমুতে চেষ্টা কর। রওনা হবার সময় ডেকে নেব তোমাকে।'

দরকারী কাজগুলোয় এরই মধ্যে হাত লাগিয়েছে রডরিক। হোয়েলবোটটা পরীক্ষা করেছে ও। শ্রাপনেল লেগে কয়েক জায়গায় শুধু ফুটো হয়ে গেছে সেটা, বাকি সব ঠিক আছে। টুল-কেস থেকে পুডিং বের করে ফুটোগুলো বন্ধ করলাম আমরা। বোটটা সৈকতে রেখেই ফিরে এলাম দু'জন।

গর্তের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হাত-পা ধড় ও মুণ্ডু। এক এক করে সেগুলো আমরা সাজালাম গর্তের ভেতর। মৃতদের ওপর রাগ থাকতে নেই, তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম ধড় আর মুণ্ডুর সঙ্গে যার যার হাত-পাগুলো এক করে রাখতে। তারপর বালি চাপা দিয়ে ভরাট করে দিলাম গর্তটা।

আরেকটা গর্ত খুঁড়লাম আমরা। এর ভেতর রয়েছে বাঘ সিংহাসনের সোনার মাথাটা। চওড়া কপালে শোভা পাচ্ছে বিরাট গ্রেট মুঘল। বহু কষ্টে ধরাধরি করে নিয়ে আসছি সেটাকে, ওজনের ভারে নুয়ে পড়েছি আমরা।

হোয়েলবোটের তলায় কুশন দিয়ে মুড়ে রাখলাম মাথাটা। পাথর ভর্তি প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট কিভাবে কখন যেন ছিঁড়ে

গেছে, আরেকটা প্যাকেটে ভরলাম সেগুলো। সোনার মাথাটার কাছে রাখলাম ওগুলো। স্যাফায়ার আর এমারেল্ডের প্যাকেটগুলো ভরে নিলাম আমার হ্যাভারস্যাকে।

এরপর গুহায় ফিরে এসে সমস্ত অক্ষত ইকুইপমেন্ট আর মালপত্তর উদ্ধার করে জড়ো করলাম এক জায়গায়। এসব বেঁধেছেঁদে বয়ে নিয়ে হোয়েলবোটে তুলতে বেলা শেষ হয়ে গেল। মালপত্রের স্তূপের ওপর এফ. এন কারবাইনটা নামিয়ে রেখে পিছিয়ে এলাম আমি। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছি। একটু বিশ্রাম নিতে পারলে হত। কিন্তু না, এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যাওয়াই ভাল।

'ঠিক আছে, রডরিক?' চুরুট ধরাচ্ছি আমরা, এতক্ষণে নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমি। 'এবার বোধহয় রওনা হতে পারি আমরা, কি বল?'

চুরুটে মস্ত একটা টান দিয়ে একমুখ নীল ধোঁয়া ছাড়ল রডরিক। মুখটা অস্বাভাবিক নিভাঁজ আর সরল দেখাচ্ছে। 'একটা কাজ শুধু বাকি রয়েছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'যাই, ল্যাম্পনিকে তুলে নিয়ে আসি।'

নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে আছি ওর দিকে আমি। তাই দেখে আবার বলল ও, 'এখানে ওকে কিভাবে রেখে যাই? এমন নির্জন জায়গা, ওর ভাল্লাগবে না। সেন্ট মেরীর কবরস্থানে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে থাকতে পারলে খুব খুশি হবে ও।'

সন্ধ্যা নামছে। দ্রুত ঘন হয়ে উঠছে অন্ধকার। খানিকটা ক্যানভাস নিয়ে একাই রওনা হয়ে গেল রডরিক। ওর দিকে তাকিয়ে আছি একদৃষ্টিতে, দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

নড়ছি না আমি। বসে বসে চুরুটটা শেষ করলাম। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়ালাম, রাফেলাকে নিয়ে আসার জন্যে ফিরে যাচ্ছি আবার গুহায়।

গাঢ় ঘুম সহজে ভাঙতে চায় না, কিন্তু একবার ভাঙতেই পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল রাফেলা। 'কি হয়েছে, রানা?' উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইল ও।

'আর কিছু হবার নেই,' বললাম ওকে। 'চলো, রওনা হবার সময় হয়েছে আমাদের।'

রাতে ঠাণ্ডা পড়বে সাগরে, তাই আমার একটা জার্সি পরিয়ে দিয়েছি রাফেলাকে। আরও দুটো পেইন-কিলার ট্যাবলেট খাইয়ে সৈকতে নিয়ে এলাম ওকে।

চারদিক অন্ধকার। এক হাতে টর্চ, আরেক হাতে রাফেলাকে ধরে আছি। পৌঁছে গেছি প্রায়, বালির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি ওকে নিয়ে। এমনি সময়ে হঠাৎ কেন যেন দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। নিজেরই অজ্ঞাতে কি যেন একটা বিচ্যুতি ধরা পড়েছে চোখে। বুঝতে পারছি, কোথাও কিছু একটা ঘটে গেছে। মালপত্তর ভরা হোয়েলবোটের ওপর টর্চের আলো ফেললাম দ্রুত।

সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস করে উঠল বুক, গোলমালটা টের পেয়ে গেছি। গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে আমার।

'রাফেলা!' চরম উত্তেজনা চেপে রেখে ফিস ফিস করে বললাম ওকে, 'পানিতে নেমে গা ডুবিয়ে থাকো, যতক্ষণ না আবার উঠতে বলি আমি।'

হাঁটু ভাঁজ করে দ্রুত বসে পড়ল রাফেলা। আমার কণ্ঠস্বর শুনে বিপদ আঁচ করতে পেরেছে ও। হোয়েলবোটের খোলের পাশে নেমে গেল ও, পানির ওপর শুধু মুখটা তুলে রেখেছে।

উদভ্রান্তের মত নিজের চারদিকে তাকাচ্ছি আমি, একটা অস্ত্র দরকার আমার, যে-কোন ধরনের। স্পিয়ারগানের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু সেটা ফুয়েল ক্যানের নিচে চাপা পড়ে আছে। আমার বেইট-নাইফটা এখনও গাঁথা রয়েছে নারকেল গাছের গায়ে-এতক্ষণ সেটার কথা মনেই পড়েনি। টুলবক্সে রয়েছে...

মাত্র এইটুকুই চিন্তা করার সময় পেলাম আমি।

'হ্যাঁ, কারবাইনটা আমিই নিয়েছি।' ঠিক আমার পেছনের অন্ধকার থেকে ভেসে এল ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠস্বর। আমি স্তব্ধ। পাথর। 'খবরদার! পেছন দিকে তাকিয়ো না বা নোড়ো না।'

রাইফেলটা হোয়েলবোট থেকে নিয়ে নিশ্চয়ই নারকেল গাছের কাছে ফিরে গিয়েছিল ও, ওখানে গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে ছিল অন্ধকারে। নিঃশব্দ পায়ে এখন চলে এসেছে আমার পিঠের কাছে।

'পেছন দিকে না ঘুরে টর্চটা দাও আমাকে-স্রেফ কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দাও।'

নিঃশব্দে তাই করলাম আমি। ঝুঁকে পড়ে টর্চটা তুলে নিচ্ছে, ওর পায়ের চাপে ভাঁজ খাচ্ছে বালি, শুনতে পাচ্ছি শব্দটা।

'ঠিক আছে, ঘোরো এবার-সাবধানে, ধীরে।'

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। টর্চের শক্তিশালী আলো ফেলল ও আমার চোখে। চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেল আমার। তবু অস্পষ্টভাবে ওর প্রকাণ্ড কালো শরীরটার কাঠামো দেখতে পাচ্ছি টর্চের পেছনে।

বারো

'সাঁতার খুব উপভোগ করেছ, তাই না?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে। আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি, শুধু ছোট একটা সাদা আণ্ডারপ্যান্ট পরে রয়েছে ও। ওর বিশাল, ফোলা পেট আর বেঢপ পা দুটো আলোর আভায় চকচক করছে-গায়ের পানি এখনও শুকায়নি।

'ঠাট্টা কোরো না। তোমার রসিকতা শুনলে গা চুলকায় আমার, রানা,' ভরাট গলায় বলল হুমায়ুন দাদা। হঠাৎ, কিন্তু অনেক দেরিতে, মনে পড়ল আমার-অতিরিক্ত মোটা লোক আশ্চর্য হালকা হয়ে যায় সাগরের লোনা পানিতে, তাই তার শক্তিও

অনেকটা বেড়ে যায়। তাছাড়া, সাঁতরাবার সময় জোয়ার এসে পড়ায় প্রচুর সাহায্য পেয়েছে ও। কিন্তু তবু প্রায় দু'মাইল উত্তাল সাগর পেরিয়ে ফিরে আসা অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। তারচেয়ে বিস্ময়কর লাগছে, এমন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর ও বেঁচে আছে কিভাবে?

'শুরু বোধহয় তলপেট থেকেই করতে হয়, নাকি?' আবার কথা বলছে হুমায়ুন দাদা। দেখতে পাচ্ছি, রাইফেলের স্টকটা সে তার বাঁ হাতের কনুইয়ের উল্টোদিকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ওই হাতেই ধরে রয়েছে টর্চটা, আলো ফেলেছে আমার চোখের ওপর। 'শুনেছি ব্যথাটা ওখানেই নাকি সবচেয়ে বেশি লাগে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে আছি আমরা। সশব্দে গভীর, লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ছে হুমায়ুন দাদা, আর বিদুৎগতিতে চিন্তা করছি আমি কিভাবে ওর মনোযোগ সরানো যায় অন্য দিকে। এফ. এনের ব্যারেলটা খপ্ করে ধরার জন্যে শুধু আধ সেকেণ্ডের একটা সুযোগ চাই আমি।

'নাক মলা কান মলা খেয়ে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে মাফ চাইবে না তুমি, আমি জানি-নাকি তা-ও চাইবে? প্রাণ কি তোমার কাছে অতটা প্রিয়?' জিজ্ঞেস করল ও।

চুপ করে আছি আমি। একটু বাতাস নেই কোথাও, কিন্তু কানের পাশে তীব্র ঝড়ের শব্দ শুনছি।

'না, তা তুমি চাইবে না। সব জায়গায় সব সময় বড় থাকতে চাও তুমি। ছোট হওয়া তোমার ধাতে নেই। কিন্তু, যদি মাফ চাইতে-পেতে না বটে, কিন্তু দারুণ উপভোগ করতাম আমি সেটা। তার মানে, বঞ্চিত করছ আমাকে তুমি। কি আর করা, দুঃখটা থাকল। কিন্তু মেয়েটা? ও যদি নাকে খত্ দেয়, হাঁটু গেড়ে মাফ চায়-তোমার সম্মানে শক্ত ঘা লাগবে, কি বল? কিন্তু ভেবে দেখ, তা যদি করে ও, হয়ত মাফ করেও দিতে পারি ওকে। তুমি

বিদায় নাও, ও থাকুক। কেমন হবে সেটা?' নিজের রসিকতায় হো হা শব্দে অট্টনাদ ছাড়ল সে।

হঠাৎ থেমে গেল হাসিটা। 'সময় নষ্ট করছি,' বলল ও। 'চুকিয়ে ফেলা যাক ঝামেলা। তুমি রেডি?'

ঠিক এমনি সময়ে আমরা দু'জনেই আওয়াজ পেলাম রডরিকের।

হুমায়ুন দাদার সব কথা শুনতে পেয়েছে ও, বুঝলাম। আধ সেকেণ্ডের একটা সুযোগ খুঁজছিলাম, ও-ও পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে-আর সময় নেই, লোকটার মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাতে না পারলে এক সেকেণ্ড পর লাশে পরিণত হব আমি, ওর প্রিয় মাসুদ। তাই ধুপধাপ পা ফেলে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে রডরিক। হুমায়ুনের কাছে পৌঁছান ওর পক্ষে সম্ভব হবে না-আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও নিজেও তা জানে।

অন্ধকার ফুঁড়ে তীরবেগে ছুটে আসছে রডরিক। এক ঝটকায় রাইফেল ঘুরিয়ে রডরিকের ওপর তাক করল হুমায়ুন দাদা। যেন দেখতেই পায়নি রডরিক, মহাসাগরের ঢেউয়ের মত ভ্রূক্ষেপ না করে ধেয়ে আসছে সে।

বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম আমি, বিজলীর মত আগুনের লম্বা জিভ বেরিয়ে গেল মাজল থেকে। কিন্তু তারও আগে প্রকাণ্ড কালো লোকটার দিকে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছি আমি। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, পড়ে গেল রডরিক। রাইফেলটা এবার আমার দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে হুমায়ুন দাদা।

এফ. এনের ব্যারেল ঘষা খেল আমার গায়ে, ধাক্কা দিয়ে ওটাকে পাশ কাটালাম, পরমুহূর্তে হুমায়ুন দাদার বুকের ওপর দড়াম করে পড়লাম কাঁধ দিয়ে।

একটা তীব্রগতি সাত টনী ট্রাকের মত ছুটে এসে ধাক্কা মেরেছি ওকে, পাঁজরগুলো ভেঙে পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে যাবার

কথা। কিন্তু চর্বি আর মাংসের মোটা স্তর প্রচণ্ড সংঘর্ষটাকে পাত্তাই দিল না, বেমালুম হজম করে নিল-এমন কি নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ল না পর্যন্ত হুমায়ুন দাদা। বরং রিবাউন্স খেয়ে আমিই পিছিয়ে এসেছি একটু। লাভের মধ্যে আমার গায়ের ধাক্কা লেগে টর্চ আর কারবাইনটা পড়ে গেছে ওর হাত থেকে। অটল এক বিশাল থামের মত সটান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে। এখনও তাল সামলে উঠিনি আমি, কার সঙ্গে লেগেছি অনুমান করতে পেরে ভয়ে শিউরে উঠছি, এই সময় হাত বাড়িয়ে আমাকে আলিঙ্গনের ভেতর মুড়ে নিল হুমায়ুন দাদা।

দু'হাত দিয়ে মাটি থেকে তুলে নিল আমাকে ও, টেনে তুলছে উঁচু আর নরম বুকে। ওর আলিঙ্গনের মধ্যে আমার দুটো হাতই আটকা পড়ে গেছে, আর ওপরদিকে তুলে নিচ্ছে বলে পা দুটো ওর শরীরের কোথাও পেঁচিয়ে নেবার সুযোগ পাচ্ছি না।

এক অদ্ভুত শক্তির ফাঁদে চাপা পড়ে গেছি আমি। তেমন জোর খাটাচ্ছে না লোকটা, অনায়াসে ধরে আছে আমাকে, অবলীলায় ওপরদিকে তুলে নিচ্ছে, কিন্তু লোকটার আসুরিক শক্তি অনুভব করে অবিশ্বাসের ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে যাচ্ছে আমার ভেতর। নিষ্ঠুর, কঠিন একটা শক্তি নয়-এর বিশাল ব্যাপকতা এতই বেশি যে মনে হচ্ছে এর যেন কোন শেষ-সীমা নেই, অনেকটা সাগরের ফুলে-ফেঁপে ওঠা জোয়ারের চাপের মত, ভয়ঙ্কর, প্রাকৃতিক-যেন এই শক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই, গা এলিয়ে দেয়া ছাড়া।

হাঁটু আর কনুই দিয়ে চেষ্টা করছি আমি, গুঁতো আর বাড়ি মেরে ওর নরম কিন্তু অচ্ছেদ্য বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে চাইছি, কিন্তু একটা আঘাতও নিরেট কোথাও লাগছে না বা লোকটাকে একচুল টলাতে পারছে না। ধীরে ধীরে আমার চারদিকে এঁটে বসা ঘেরটা আরও ছোট হয়ে আসছে, বিশাল পাইথনের মত চাপ দিয়ে পিষে ফেলছে আমাকে। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, এই ভাবে চাপ বাড়িয়ে আমাকে পিষে মেরে ফেলার শক্তি রয়েছে

লোকটার গায়ে। হাড় ভাঙার মট মট শব্দ পাবার আশায় উৎসুক হয়ে আছে ওর কান দুটো। দাঁতে দাঁতে চেপে ফাঁক করে রেখেছে ঠোঁট দুটো-মনে হয় হাসছে।

প্রচণ্ড আতঙ্কে মরিয়া হয়ে উঠেছি আমি। পিঠ, ঘাড়, কাঁধ আর উরুর পেশী মোচড় দিয়ে উন্মত্ত চেষ্টা করছি আলিঙ্গন ঢিলে করার। আরও জোর খাটাচ্ছে ও, ফোঁস ফোঁস করে দমকা বাতাসের মত বেরিয়ে আসছে হুইস্কির গন্ধ মেশানো নিঃশ্বাস। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে ক্রমে, উঁচু হচ্ছে বিশাল দুই কাঁধ। প্রচণ্ড চাপে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে আমার পিঠ, একটু পর মট করে ভেঙে যাবে শিরদাঁড়াটা।

পেছন দিকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি মাথাটা, মুখ খুলে রয়েছি। হঠাৎ দুই সারি দাঁতের মাঝখানে ওর চওড়া নাকটাকে নিয়ে মুখ বন্ধ করলাম। সবটুকু শক্তি দিয়ে কামড়াচ্ছি ওটাকে, পরিষ্কার টের পাচ্ছি ওর নাকের মাংস আর নরম হাড় ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে আমার দাঁতগুলো। উষ্ণ, নোনতা রক্তের বন্যায় ভরে উঠছে মুখের ভেতরটা। এখন আমি শুধু কামড়াচ্ছি না, মাথা নেড়ে এদিক-ওদিক ঝটকা মারছি, কুকুরের মত টেনে ছিঁড়ে আনতে চেষ্টা করছি নাকটাকে।

আক্রোশ আর যন্ত্রণায় অসহ্য কষ্ট পাচ্ছে লোকটা, মুখের ভেতর থেকে ভোঁতা গর্জন বেরিয়ে আসছে। আমার শরীর পেঁচিয়ে রাখা হাত দুটো ঢিল হয়ে গেল। বুঝতে পারছি, এবার একহাতে আমার চুল, অপর হাতে চিবুক ধরতে চাইবে হুমায়ুন দাদা, এক ঝটকায় মট করে ভেঙে দিতে চেষ্টা করবে আমার ঘাড়টা।

হাত দুটো মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার শরীরে, মোচড় দিয়ে কাত হয়ে গেলাম একপাশে, শক্ত ভিজে বালিতে নামিয়ে দিয়েছি দুটো পা, যাতে ওর ভারসাম্য নষ্ট করে

কোমর দিয়ে ধাক্কা মারতে পারি। নাকের যন্ত্রণায় এতই অস্থির হয়ে রয়েছে ও, যে ধাক্কাটা কিভাবে কোত্থেকে এল, টেরই পেল না। মাংস ছিঁড়ে নাকের অর্ধেকটা রয়ে গেল আমার মুখের ভেতর, আমার পিঠের ওপর দিয়ে বিশাল শরীরটা ডিগবাজি খেয়ে ধড়াশ করে পড়ল বালিতে, চিত হয়ে।

থোঃ করে মুখের ভেতর থেকে কুৎসিত মাংসের টুকরোটা ফেলে দিলাম আমি। ড্রাকুলার মত ঠোঁটের দুই কোণ বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্তের ধারা। মুখের ভেতর রক্তের নোনা স্বাদ-ভ্রূক্ষেপ করলাম না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই ফিরলাম ওর দিকে।

বিশাল ব্যাঙের মত পা ভাঁজ করে বালিতে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে হুমায়ুন দাদা, দুই হাতে চেপে রেখেছে চোখের নিচ থেকে ঠোঁটের ওপর পর্যন্ত। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সড়সড় করে নেমে আসছে রক্ত-অন্যদিকে মুখ করে বালিতে পড়ে থাকা জ্বলন্ত টর্চের ম্লান আলোয় চিকচিক করছে ধারাগুলো, কালো দেখাচ্ছে।

জানি, এক্ষুণি আবার উঠে দাঁড়াবে লোকটা, উঠে দাঁড়ালেই সর্বনাশ-হাতাহাতিতে পারব না আমি ওর সঙ্গে; তাই কোন সুযোগ না দিয়ে ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি মারলাম ওর ফুটবলের মত মাথায়। ঝাঁকি খেল মাথাটা, এবং হুঁশ ফিরে এল। দ্বিতীয় লাথিটা মারতে গিয়ে তাজ্জব হয়ে গেলাম আমি। সাঁৎ করে উঠে বসেছে হুমায়ুন দাদা, চোখের পলকে সরে গেছে মাথাটা যেখানে ছিল সেখান থেকে।

শূন্যে লাথি মেরে তাল হারিয়ে ফেলেছি, পড়ে গেলাম। পড়েই দুই গড়ান দিয়ে সরে গেলাম কিছুটা দূরে। আছড়ে-পাছড়ে উঠে রাইফেলের দিকে এগোবার চেষ্টা করতে গিয়ে আড়চোখে লক্ষ করলাম উঠে দাঁড়িয়েছে হুমায়ুন দাদা, ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে আমার ওপর। চট করে শুয়েই চিৎ হলাম আমি, হাঁটু দুটো ভাঁজ করে নিলাম। ছোট্ট একটা গর্জন ছেড়েই ডাইভ দিল বিশাল পাহাড়। ইতিমধ্যেই পা দুটো তুলে ফেলেছি শূন্যে। মস্ত থলথলে

ভুঁড়িতে দুই পা বাধিয়ে ওরই গতিবেগকে কাজে লাগিয়ে আমার শরীরের ওপর দিয়ে পার করে দিলাম ওর শরীরটা, শেষ মুহূর্তে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়লাম পা দুটো। মাথা নিচু পা উঁচু এই রকম প্রায়-খাড়া অবস্থায় শূন্য থেকে নেমে এল সে ভেজা বালির ওপর।

একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম অদ্ভুত কায়দায় শরীরটাকে রিঙের মত গোল করে ফেলেছে হুমায়ুন দাদা, কোথাও চাপ বা চোট না খেয়ে বালির ওপর একটা ডিগবাজি দিয়েই উঠে দাঁড়াল আমার দিকে পেছন ফিরে। চট্ করে ঘুরল আমার দিকে, এবং ঘুরতে গিয়েই চোখ পড়ল ওর রাইফেলটার ওপর। ওটার কাছে পৌঁছতে হলে ওকে ডিঙিয়ে ওপাশে যেতে হবে আমার। লাফিয়ে শূন্যে উঠে ওর বুকের ওপর কারাতে কিক মারলাম একটা। টলে উঠল, কিন্তু ধরাশায়ী হল না দানব, বরং আমি মাটিতে পা ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ধরে ফেলল জাপটে। এবার আমার নাক-মুখ চেপে রেখেছে নিজের বুকের সঙ্গে।

জুডো-ল্যাঙ মারলাম, পড়ল পাহাড়, কিন্তু আমাকে ছাড়ল না। এক ফোঁটা বাতাসের জন্যে ছটফট করছি আমি ওর বুকে মুখ গুঁজে। উপায়ন্তর না দেখে ঢালের দিকে গড়ান দিলাম। একবার আমি ওপরে, একবার হুমায়ুন দাদা, গড়াচ্ছি আমরা, নেমে যাচ্ছি ঢালু সৈকত থেকে পানির দিকে। এরই ফাঁকে খামচে তুলে নিয়েছি আমি ওর একটা চোখ, জুডো হোল্ডে ধরে মটকে দিয়েছি বাম হাতের দুটো আঙুল, ভেঙে দিয়েছি ডান হাতের কব্জি। আমার নিজেরও যে পাঁজরের একটা হাড় চিড় খেয়েছে টের পাইনি তখন মরণ-যুদ্ধে রত অবস্থায়।

জড়াজড়ি করে নেমে এলাম আমরা খাঁড়ির উষ্ণ, অগভীর পানিতে। কপাল খারাপ, প্রথমে তলে পড়লাম আমি। শরীরের সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিয়েছে আমার ওপর। যেন বিশাল এক জলহস্তী। পানির নিচের চলমান বালিতে হাত-পা-হাঁটু বাধিয়ে যে জোর করব তার উপায় নেই-শক্ত কিছুই পাচ্ছি না, যার ওপর ভর

দিয়ে জোর খাটাব। মস্ত বেকায়দায় পড়ে গেলাম।

পানির নিচে ডুবে রয়েছি, একটু বাতাসের জন্যে ছটফট্ করছি, চোখের সামনে নাচানাচি করছে অসংখ্য আগুনের ফুলকি। চেষ্টার ত্রুটি করছি না, কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না-শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে আমার। বুঝলাম জ্ঞান হারাচ্ছি।

শব্দটা চাপা আর ভোঁতা লাগল আমার কানে। তখনও চিনতে পারিনি, ভাবছি, শরীরের কোন্ হাড়টা ভাঙল। পিঠের ওপর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছি। হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল হুমায়ুন দাদা, স্থির পাথর হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অনুভব করছি, কেন যেন হঠাৎ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তার, চেপে বসা ভারটা গড়িয়ে নেমে গেল আমার ওপর থেকে।

কাশছি, গোগ্রাসে গিলছি বাতাস, সেই সঙ্গে উঠে বসছি আমি। চুল থেকে নেমে এসে চোখ দুটো ভিজিয়ে দিচ্ছে লোনা পানি। পড়ে যাওয়া টর্চের আলোয় দেখতে পাচ্ছি পানির কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে রাফেলা বার্ড। ওর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে এখনও রয়েছে রাইফেলটা, ম্লান রক্তশূন্য মুখে ভীতির ছাপ।

আমার পাশে অগভীর পানিতে উপুড় হয়ে ভাসছে হুমায়ুন দাদা, জাঙ্গিয়া পরা বিশাল কালো শরীরটা চকচক করছে ডলফিন মাছের মত। উঠে দাঁড়ালাম ধীরে ধীরে, কাপড়চোপড় থেকে হুড়হুড় করে পানি ঝরছে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে রাফেলা। মানুষ হত্যা করে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে গেছে ও।

'ওকে আমি...রানা...আমি...ওহ্ গড!' বিড় বিড় করে প্রলাপ বকছে রাফেলা।

'ডারলিং,' দম ফেলার ফাঁকে বললাম ওকে, 'এই মাত্র জীবনের সবচেয়ে ভাল কাজটা করেছ তুমি।' ওকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছি আমি, যেদিকে শুয়ে রয়েছে রডরিক।

উঠে বসার চেষ্টা করছে রডরিক, নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে।

'থামো, রডরিক, নড়াচড়া কোরো না,' ধমক দিলাম ওকে, ঝুঁকে পড়ে তুলে নিলাম টর্চটা। তাজা রক্তে ভিজে রয়েছে ওর শার্ট, বোতাম খুলে মুক্ত করলাম ওর চওড়া কালো বুক।

নিচে এবং বাঁ দিকে, কিন্তু লেগেছে ফুসফুসে। গভীর কালো গর্তটা থেকে প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুদবুদ বেরিয়ে আসতে দেখছি। বুলেটের অনেক রকমের জখম দেখেছি আমি, নিজেকে এ-ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করতে পারি। মন খারাপ হয়ে গেল আমার, জখমটা ভাল না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখ লক্ষ্য করছে রডরিক। 'কি মনে হচ্ছে?' ব্যগ্র গলায় জানতে চাইল ও। 'খারাপ? খুব খারাপ? ব্যথা নেই কিন্তু।'

'আরে না,' গম্ভীর ভাবে বললাম ওকে। 'এখন থেকে যতবার বিয়ার খাবে তুমি, এই গর্ত দিয়ে কুল কুল করে সব বেরিয়ে আসবে।'

নিঃশব্দে হাসছে ও। উঠে বসতে সাহায্য করলাম ওকে আমি। পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবার গর্তটা নিখুঁত আর পরিষ্কার। এফ. এন লোড করা ছিল নিরেট অ্যামুনিশনে, ঢোকার গর্তের চেয়ে বেরিয়ে যাবার গর্তটা সামান্য একটু বড়। হাড়গোড়ের সঙ্গে ঘষা খায়নি কোথাও বুলেটটা।

মেডিকেল চেস্টে এক জোড়া ফিল্ড ড্রেসিং পাওয়া গেল, ওকে হোয়েলবোটে উঠতে সাহায্য করার আগে ক্ষতটা বেঁধে দিলাম আমি। একটা কম্বল বিছিয়েছে রাফেলা, তার ওপর শুইয়ে ওর গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম আমি।

'ল্যাম্পনিকে ভুলে যেয়ো না,' ফিস ফিস করে বলল রডরিক।

ক্যানভাসের লম্বা বাণ্ডিলটা ফেলে রেখে এসেছে রডরিক

সৈকতে। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওটার সামনে। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। ল্যাম্পনিকে তুলে নিয়ে এলাম বোটে। ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলাম একপাশে। শক্ত হয়ে গেছে শরীরটা।

পানিতে নেমে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি হোয়েলবোট। কোমর পানি পর্যন্ত নেমে এলাম, তারপর কিনারা টপকে উঠে পড়লাম ওপরে। একটু যেন ব্যথা লাগল বুকের পাঁজরে। আঙুল বুলিয়ে বুঝলাম চোট লেগেছে হাড়ে। ইঞ্জিন চালু করছি। এখন আমার একমাত্র চিন্তা উপযুক্ত চিকিৎসার জন্যে রডরিককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এখান থেকে সেন্ট মেরী অনেক দূর আর অনেক দেরির পথ।

ফ্লোরবোর্ডে রডরিকের পাশে বসেছে রাফেলা, ওর আরামের জন্যে যৎসামান্য যা করার আছে সাধ্যমত করছে সে।

আর এক বুক একাকীত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি স্টার্নে, দুই মোটরের মাঝখানে-গভীর পানির চ্যানেল ধরে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বোটটাকে ফুল স্পীডে।

তারপর বাঁক নিয়ে দক্ষিণমুখো কোর্স ধরলাম আমি। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে আকাশ ভর্তি ঠাণ্ডা সাদা তারা। হঠাৎ বাতাস ছেড়েছে, কানের দু'পাশে হা-হুতাশ আর হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। অন্ধকার উত্তাল সাগরে নিঃসঙ্গ এক নাবিক আমি, বয়ে নিয়ে চলেছি মৃত, মৃত্যুপথযাত্রী আর আহতের বোঝা-বড় বেশি আদরের আর প্রিয় বোঝা এসব আমার।

প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে এগোচ্ছি আমরা, এই সময় বোটের পাটাতনে বিছানো চাদরের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল রাফেলা। আমার দিকে আসছে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। কি খবর নিয়ে আসছে জানি না।

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে রডরিক,' শান্তভাবে বলল রাফেলা, তারপর হঠাৎ ঝোঁকের বশে সামনের দিকে ঝুঁকে ঠাণ্ডা

বরফ ভাল হাতটা দিয়ে আমার মুখ ছুঁল ও। ফুঁপিয়ে উঠতে গিয়ে শব্দটাকে চাপা দিল, বলল, 'রানা-ও বোধহয় চলে যাচ্ছে।'

নড়ছি না। কথা বলছি না। শুধু তাকিয়ে আছি রাফেলার মুখের দিকে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কিছু।

'যাও,' আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল রাফেলা, ফিস ফিস করে বলল, 'ও ডাকছে তোমাকে।'

'আসছি আমি, রডরিক,' বিড় বিড় করে বললাম, বলার পর হুঁশ হল কিছু একটা বলেছি।

'যাও!' আমাকে দেরি করতে দেখে চাপা স্বরে প্রায় ককিয়ে উঠল রাফেলা।

এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। ভীষণ ভয় করছে আমার। কিভাবে যাই আমি রডরিকের সামনে! কিভাবে সহ্য করব...

নিজেকে সামলে নিলাম আমি। হুইলটা রাফেলাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'ওই ওদিকে বড় দুটো তারা দেখতে পাচ্ছ? সোজা ও-দুটোর মাঝখান দিয়ে নিয়ে চল বোট।' রডরিক যেখানে শুয়ে আছে সেদিকে পা বাড়ালাম আমি।

প্রথম কিছুক্ষণ মনে হল আমাকে চিনতে পারছে না রডরিক। হাঁটু গেড়ে বসলাম ওর পাশে, পানির নরম কলকল শব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। তারপর হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল ও। তারার আলো লেগে চিকচিক করে উঠল চোখ দুটো। চিবুক একটু তুলে তাকাল আমার দিকে। ওর দিকে ঝুঁকে পড়লাম আমি। আমাদের মুখের মাঝখানে কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান।

নিঃশব্দে হাসছে রডরিক। প্রাণ ফিরে পেলাম ধড়ে আমি। 'কি ভাবছ, মাসুদ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ও। কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার কৌতুকের সুর টের পেলাম আমি। 'আরে না, মিস্টার মাসুদ রানা, ডাক পড়লেও তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না আমি। জানি, তুমি আমাকে যেতে দেবে না। দেবে, মাসুদ?' শেষ দিকের

কথাগুলো মুখের ভেতর জড়িয়ে গেল ওর।

নিঃশব্দে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে জবাব দিলাম ওকে। বুঝতে পারছি, আমার মনটা হালকা করতে চাইছে ও। চাইছে, আমি যেন মুষড়ে না পড়ি।

'অনেক বড়-বড় মাছ ধরেছি আমরা, তাই না, মাসুদ?' ফিস ফিস করে বলল ও। শেষ মুহূর্তে আমার মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দিতে চাইছে।

সদ্যোজাত শিশুর মত ভাষাহীন লাগছে নিজেকে আমার। বলার মত একটা কথাও খুঁজে পাচ্ছি না আমি।

'সেই যে যেবার মোজাম্বিক স্রোতে ছয়টা মারলিন ধরলাম দুই দিনে-মনে আছে?' অস্পষ্ট গলায় বলছে রডরিক। 'ইস্, কি সাংঘাতিক মজা হয়েছিল সেবার! রোদ ঝলমলে দিন ছিল সেসব, বাতাসের সঙ্গে গলা চড়িয়ে সারা দিন গান গাইছিলাম বলে কি বকুনিটাই না দিয়েছিলে তুমি আমাকে-আহা, সেসব দিন! কী সুন্দর ছিল! মাসুদ, যদি আবার মাছ ধরতে যাও...আমার কথা...তারপর...'

'রডরিক, আবার আমরা মাছ ধরব,' হঠাৎ ভাষা খুঁজে পেয়েছি, কথাটা বলার পর আবিষ্কার করলাম আমি। 'আবার আমরা একটা মনের মত সুন্দর বোট কিনতে পারব। আগামী মউসুমে তুমি আর আমি আবার মাছ মারতে যাব-অনেক বড় বড় মাছ-দারুণ মজা হবে...' বলতে বলতে থেমে গেলাম।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম আমরা। একসময় টের পেলাম আমার হাত ধরার জন্যে হাতড়াচ্ছে ও। ওর হাতটা ধরলাম আমি, ধরে আছি শক্ত করে। শক্ত দড়িদড়া নাড়াচাড়া করে শক্ত কড়া পড়ে গেছে ওর হাতে, কর্কশ ছোঁয়া পাচ্ছি আমি।

'মাসুদ,' এখন পরিষ্কার নয় ওর কণ্ঠস্বর, ওর মুখের কাছে মাথা নামিয়ে ঠোঁটে কান ঠেকিয়ে রেখেছি আমি, শুনতে পাচ্ছি,

'বলব বলব করে যে কথাটা কক্ষনও কোনদিন বলা হয়নি, সেই কথাটা আজ তোমাকে বলতে যাচ্ছি আমি। ইউ আর এ গুড বয়, মাসুদ। আই লাভ ইউ, ম্যান। আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসি আমি তোমাকে।'

'আমিও, রডরিক,' বললাম।

কিছুক্ষণের জন্যে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে থাকল ও, তারপর ঢিল পড়ল ওর মুঠোয়। ওর পাশে বসে আছি আমি, ধীরে ধীরে মস্ত কর্কশ থাবাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে আমার মুঠোর ভেতর, আর অন্ধকার সাগরের বুকে একটু একটু করে ফুটছে নতুন ভোরের আলো।

কালো শোকের পোশাক পরে সন্ধ্যা নামছে ঢাকার বুকে। ভেজা চোখের মত আকাশের গায়ে মিট মিট করছে দু'একটা তারা।

মাসুদ রানার বাংলো। বাগান থেকে রজনী গন্ধার সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে, গুন্ধে উন্মনা হয়ে উঠছে বাতাস। অন্ধকার বারান্দায় বসে আছে ওরা। নড়ছে না কেউ, বা কথা বলছে না।

বাংলোর নিচু পাঁচিলের ওপারে খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে, খানিক আগেও ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি আর চেঁচামেচিতে মুখর ছিল পরিবেশটা, এখন আবছা অন্ধকারে অবহেলিত, পরিত্যক্ত বসনের মত পড়ে আছে মাঠটা। কিন্তু সন্ধ্যার কালিমা নেমে আসতে দেখে সবাই যখন যে যার ঘরে ফিরে যায় তখনও একজন বসে থাকে ওখানে। কোনদিন তাকে দেখা হয়নি রানার। অন্ধকার মাঠে গভীর রাত পর্যন্ত বসে থাকে সে। কিসের পাগল কে জানে! তবে বোঝা যায়, নিঃসঙ্গ। রোজ মাঝরাত পর্যন্ত একটাই ধ্যান তার, করুণ সুরে বাঁশের বাঁশি বাজানো। আজও বাজাচ্ছে। সুরেলা বিলাপ শুনে স্তব্ধ হয়ে আছে প্রকৃতি।

টপ টপ করে দু'ফোঁটা পানি ঝরে পড়ল রানার চোখ থেকে।

মুখটা আরেক দিকে ফিরিয়ে নিয়ে কড়ে আঙুল দিয়ে হালকা ভাবে মুছে নিল দুই চোখের কোণ।

আবছা অন্ধকারে সোহানার দিকে ফিরল রানা। দেখল অঝোর ধারায় দুই চোখ বেয়ে নেমে আসছে পানি। রানার দিকে তাকাল না ও। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাথরুমের দিকে।

চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে আবার ফিরে এসে বসল সোহানা রানার পাশের চেয়ারে। রানার একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। আলতো করে হাত বুলাচ্ছে-যেন সান্ত্বনা দিতে চায়, ভুলিয়ে দিতে চায় রানার সব দুঃখ।

অনেকক্ষণ কথা বলল না কেউ। দূরে বাজছে বাঁশের বাঁশি। গাঢ় হয়ে গেছে চারদিক। জ্বলজ্বল করছে আকাশ ভরা অসংখ্য তারা। 'তারপর?' একসময় মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল সোহানা।

'এখানেই আমার গল্প শেষ, সোহানা,' বলল রানা।

'শেষ? কিন্তু তারপর কি হল? রাফেলা বার্ড-শেষ পর্যন্ত কি কথা হল ওর সঙ্গে তোমার? আর সেই সোনার মাথা, গ্রেট মুঘল-ওগুলো কি করলে তুমি?'

অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে রানা।

'সে-সব কি আরও দুঃখের, রানা?' মৃদু কণ্ঠে বলল সোহানা।

পাশের টিপয় হাতড়ে চুরুটের বাক্স আর লাইটারটা তুলে নিল রানা। 'না, আসল গল্প এখানেই শেষ, সোহানা। এর পরেরটুকু তেমন কিছু নয়। সেটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত হার-জিতের কাহিনী। এখন সে-কাহিনীর কোন আবেদন নেই। তুচ্ছ বলে মনে হয়।'

'কিন্তু, তা সে যত তুচ্ছই হোক, তুমি যখন জড়িত, তার মানে আমিও জড়িত-শেষটুকু শুনতেই হবে আমাকে।'

চুরুট ধরিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ছে রানা। 'বেশ,' রাজি

হল ও। 'শোন তবে।'

নিঃসঙ্গ সেই পাগলটা পুরিয়া-ধানেশ্রী ছড়াচ্ছে মাঠে।

তেরো

দু'জন হাত ধরাধরি করে গিয়েছিলাম আমরা, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম কবর দুটোর পাশে, আমার বন্ধুদেরকে ওরা শুয়ে দিচ্ছিল।

ওখান থেকে রাফেলাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমি চলে গেলাম দুর্গে, ওখানে প্রেসিডেন্ট গডফ্রে পিডল আর ইন্সপেক্টর টমসনের সঙ্গে দু'ঘন্টা কাটালাম।

পরবর্তী তিন সপ্তাহ টার্টল-বে ছেড়ে বড় একটা বেরোইনি আমি বা রাফেলা।

মন্থর আর শান্ত লাগছে সময়টা। ক্ষতগুলো শুকাচ্ছে, কিন্তু বড় ধীরে ধীরে।

মনের চেয়ে শরীরের ক্ষতগুলো তাড়াতাড়ি শুকাল। এক দিন সকালে রাফেলার হাতের ড্রেসিং বদলাচ্ছি, ক্ষতের গোড়ার দিকে সাদা বীজ দেখতে পেলাম, বুঝলাম আবার নখ গজাতে শুরু করেছে। সরু লম্বা হাতগুলোকে সুন্দর করে তোলার জন্যে আবার নখ হবে ওর-সেজেন্য স্বস্তি আর কৃতজ্ঞ বোধ করলাম আমি।

দিনগুলো সুখের নয়, স্মৃতিগুলো এখনও বড় বেশি তাজা। বিশাল পাহাড়ের মত নিঃশব্দে বুকে চেপে বসে আছে শোক। কথা বলি না, শুধু থেকে থেকে বুক ছোট করে দিয়ে বেরিয়ে যায় দীর্ঘশ্বাস। প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুর। আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা নেই, কিন্তু আমি রয়েছি-সেজন্যে কেমন যেন স্বার্থপর মনে হয় নিজেকে, তাতে শতগুণ বেড়ে যায় যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে চমকে উঠে ভাবি, ভারি পা ফেলে ওই তো আসছে রডরিক! তারপর মনে পড়ে যায়।

এসব ছাড়াও আরেক সমস্যা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে আমার আর রাফেলার মাঝখানে। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে পরিষ্কার সঙ্কট রয়েছে একটা। ওর আচরণে তার আঁচ পাচ্ছি। সারাক্ষণ ম্লান মুখে কি যেন ভাবছে ও। সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে, কিন্তু নিতে না পেরে সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে একা-একা। সেজন্যেই হঠাৎ অকারণে বদমেজাজী হয়ে উঠলেও ক্ষমা করে দিচ্ছি ওকে, কিছু মনে করছি না। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলছে না ও। প্রায়ই হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যাচ্ছে বাড়ি থেকে, ঘন্টার পর ঘন্টা সৈকতে গিয়ে বসে থাকছে একা, মাথা নিচু করে কি সব চিন্তা করছে।

এই সঙ্কটের মুখোমুখি এক সময় আমাদেরকে হতেই হবে, তাই আর বেশি দেরি না করে এক সন্ধ্যায় কথা পাড়লাম আমি। সেন্ট মেরীতে ফেরার পর এই প্রথম উদ্ধার করা গুপ্তধনের কথা পাড়লাম ওর কাছে।

বাড়ির সামনের উঁচু উঠানের নিচে রয়েছে ওগুলো। বারান্দায় পাশাপাশি বসেছি আমরা, হাতে হুইস্কির গ্লাস, মাঝেমধ্যে চুমুক দিচ্ছি। কথাগুলো নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে রাফেলা।

'আমি চাই আমার আগেই জুরিখে পৌঁছে যাও তুমি। এয়ারপোর্টের কাস্টমস থেকে কফিন বাক্সটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করবে, গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যাবে রেড অক্স হোটেলে। এই হোটেলটা বেছে নিয়েছি, কারণ, ওখানে একটা আণ্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং গ্যারেজ আছে। তাছাড়া, হেড পোর্টারের সঙ্গে জানাশোনা আছে আমার। ওর নাম হ্যাক্স।' প্ল্যানটা ওকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছি আমি। 'কিভাবে কি করতে হবে সব বলে দেবে ও তোমাকে। সদ্য স্বামীহারা বিধবার অভিনয় করতে হবে তোমাকে এয়ারপোর্টে। পরে হোটেলের গ্যারেজের ভেতর তোমার গাড়ি থেকে ব্যাংকের গাড়িতে তুলে নেয়া হবে কফিন বাক্সটা। তার আগে অবশ্য আমার ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ

করবে তুমি। ব্যাংকের হেড অফিসে বাঘের মাথাটা নিয়ে যাবার জন্যে ওরা একটা আর্মার্ড কার পাঠিয়ে দেবে।'

'আগেই সব ঠিকঠাক করে রেখেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' গ্লাসে আরেকটু হুইস্কি ঢেলে নিলাম আমি। 'আমার ব্যাংকের নাম ফ্যালে এট ফিলস। ম্যানেজার এম. জেংকিনসকে আমার নাম আর অ্যাকাউন্ট নাম্বার বললেই বিশেষ খাতির পাবে ওর কাছ থেকে তুমি। খরিদ্দারদেরকে ডেকে সোনার মাথাটা দেখাবার জন্যে ওর সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাংকের ভেতর একটা প্রাইভেট কামরার ব্যবস্থা করে রাখবে তুমি...' খুঁটিনাটি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি রাফেলাকে, গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে ও। সবশেষে ওর প্লেনের টিকেট আর ট্রাভেলার্স চেক বইটা বের করলাম আমি।

'রিজার্ভেশনগুলোও সেরে ফেলেছ এর মধ্যে?' বিস্ময়ে প্রায় চমকে উঠল রাফেলা। আমাকে ওপর নিচে মাথা নাড়তে দেখে আবার জানতে চাইল, 'কখন যাচ্ছি আমি?'

'কাল দুপুরের প্লেনে।'

'আর তুমি কখন যাচ্ছ?'

'কফিনের সঙ্গে একই প্লেনে-তিন দিন পর, শুক্রবারে। বি. ও. এ. সি-র একটা ত্রিশ মিনিটের ফ্লাইটে যাব। হাতের সব কাজ সেরে আমার জন্যে অপেক্ষা করার সময় পাবে তুমি।'

রাতটা ঠাণ্ডা আর জ্যোছনায় ভরা। এমন রাতেই জেগে থাকতে হয়, প্রেমে পড়তে হয়, কিন্তু তবু লক্ষ করলাম রাফেলার মুখে বিষাদের ছায়া আরও গাঢ় হয়ে ফুটেছে, যেন বিদায়ের আশঙ্কায় মন খারাপ করে আছে ও।

ভোর অন্ধকার থাকতে ওকে নিয়ে সাঁতার কেটে বে-এর মুখে চলে এলাম, আমাদের পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল ওখানে। প্রায় অর্ধেকটা সকাল ডলফিনদের পিঠে চড়ে কাটালাম আমরা।

তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এলাম সৈকতে।

পুরানো পিকআপে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলাম রাফেলাকে আমি। যাবার পথে প্রায় সারাক্ষণ চুপ করে আছে ও, কিন্তু হঠাৎ কি যেন বলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল।

কি বলতে চাইছে, ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না। বক্তব্যটা যেন ওর নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়। প্রচুর ইতস্তত করে শেষ করল এই ভাবে: '...ধরো কখনও যদি আমাদের মধ্যে কিছু ঘটে, মানে...তুমি নিশ্চয়ই জান কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয়, তাই না...'

'থামলে কেন?'

'না, থাক-কিছু না আসলে। পরস্পরকে আমরা ক্ষমা করার চেষ্টা করব, যদি তেমন কিছু ঘটে-এই আর কি।' এর বেশি কিছু বলল না ও।

এয়ারপোর্ট ক্যারিয়ারের কাছে দ্রুত ছোট্ট করে চুমো খেল আমাকে ও, আমার কাঁধে দুই হাত রেখে এক সেকেণ্ড প্রায় ঝুলে থাকল, তারপর হঠাৎ ব্যস্ততার সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। অপেক্ষারত প্লেনের দিকে এগোচ্ছে ও। মই বেয়ে ওপরে ওঠার সময় পেছন ফিরে তাকাল না একবারও, হাতও নাড়ল না।

টার্টল বে-তে একা ফিরে এলাম আমি।

ও নেই, তাই গোটা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। অদ্ভুত এক শূন্যতা বোধ ঘিরে রেখেছে আমাকে, অস্থিরভাবে এ-ঘর থেকে সে-ঘরে পায়চারি করছি। ভাবছি, এক এক করে সবাই চলে যাচ্ছে আমাকে ছেড়ে-প্রথমে ল্যাম্পনি, তারপর রডরিক... তারপর?

গভীর রাত। মশারির ভেতর মস্ত বিছানায় শুয়ে আছি আমি। ভাবছি, আর কোন উপায় নেই বলেই এত বড় ঝুঁকি নিতে হচ্ছে আমাকে। মনে মনে গোটা ব্যাপারটা আরেকবার স্মরণ করলাম।

সন্দেহ নেই, ঝুঁকিটা ভয়ঙ্কর। কিন্তু এ-ঝুঁকি নেয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানি, এখানে অর্থাৎ আমার জীবনে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে রাফেলাকে। ওকে ছাড়া বেঁচে থাকব, কিন্তু সে বেঁচে থাকায় কোন স্বাদ পাব না। অনেকগুলো ব্যাপার আমার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওকে, কিন্তু আমিও নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে কাছে টানব ওকে-দুই শক্তির এই টাগ অফ ওঅরে জিততে আমাকে হবেই। অবশ্য সিদ্ধান্তটা ওকেই নেবার সুযোগ দেব আমি, কিন্তু সিদ্ধান্তটা যাতে আমার অনুকূল হয় তার জন্যে ওকে প্রভাবিত করার সম্ভাব্য সব কৌশল কাজে লাগাব।

সকালে রামাদীনস্ ট্রাভেল এজেন্সিতে এলাম আমি। তর্ক, টাকা এবং প্রতিজ্ঞা বিনিময়ের পর আমার পিকআপে কফিন বাক্সটা তুলে দিল ঢ্যাঙা রামাদীন। বাক্সটার দু'দিকে তামার হাতল ঝকঝক করছে, ভেতরটা লাল ভেলভেট দিয়ে মোড়া। ক্যানভাস দিয়ে মুড়ে টার্টল বে-তে নিয়ে এলাম ওটাকে।

ধীরে-সুস্থে ভরাট করলাম বাক্সের ভেতরটা। তারপর স্ক্রু এঁটে বন্ধ করে দিলাম ঢাকনি। এখন এটার ওজন পাঁচশো পাউণ্ডের কম নয়।

সন্ধ্যার পর শহরে ফিরে এলাম আমি। কয়েকটা কাজ সারতে দেরি হল অনেক। লর্ড নেলসনে ঢুকলাম। প্রায় বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে ওদের। এক চুমুক হুইস্কি খাবার সময়ও পেলাম না, জিনিসপত্র গোছগাছ করে নেবার জন্যে গাড়ি চালিয়ে ফিরে এলাম টার্টল বে-তে।

পরদিন দুপুরে, রাফেলা বার্ডের সঙ্গে আয়োজিত সময়ের ঠিক চব্বিশ ঘন্টা আগে, মেইনল্যাণ্ডগামী একটা প্লেনে চড়ে বসলাম আমি। সন্ধ্যায় বি. ও. এ. সি-র নাইরোবি ফ্লাইট ধরলাম।

পুরো একদিন আগে পৌঁছেছি জুরিখে, তাই এয়ারপোর্টে

কাউকে আশা করিনি আমি। কাস্টমস আর ইমিগ্রেশনের ঝামেলা দ্রুত শেষ করে বিশাল অ্যারাইভাল হলে বেরিয়ে এলাম। পরিকল্পনার এলোমেলো সুতোগুলো শক্ত করে বেঁধে নেবার আগে লাগেজ চেক করে নিলাম। তারপর খোঁজ নিয়ে জানলাম, পরদিন একটা বিশ মিনিটে ফিরতি ফ্লাইট পাব একটা। আমার পরিকল্পনার সঙ্গে খাপে খাপে মিলে গেল ব্যাপারটা। মাত্র একটা টিকেট বুক করলাম আমি।

অনুসন্ধান ডেস্কে সুইস এয়ারের ড্রেস পরা সুন্দরী মেয়েটা খুব ব্যস্ত, সুতরাং দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি আমি। যখন দেখলাম ও একা, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর সামনে।

লম্বা সময় নিয়ে ব্যাখ্যা দিলাম ওকে। প্রথম দিকে আমার অনুরোধ জেদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল ও। কিন্তু নরম সুরে, চোখ টিপে, মেয়ে পটাবার হাসিটা মুখে লটকে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর ওকেও বারবার খিলখিল করে হেসে উঠতে হল। এরপর একদম পানির মত সহজ হয়ে গেল ব্যাপারটা।

'কালও তুমি এখানে ডিউটিতে থাকবে তো?' ব্যগ্রভাবে জানতে চাইলাম আমি।

'হ্যাঁ, মশিয়ে, থাকব-চিন্তা কোরো না তুমি।'

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলাম আমরা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে অল্প দূরের জুরিখ হলিডে ইনে চলে এলাম রাত কাটাবার জন্যে। একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে শাওয়ার সারলাম, তারপর আরাম করে বসলাম টেলিভিশনের সামনে।

পরদিন দুপুরের খানিক আগে এয়ারপোর্টে একটা কাফেতে বসে আছি আমি, মুখের সামনে দৈনিক পত্রিকা মেলে ধরে পড়ার ভান করছি। আসলে কাগজটার ওপর দিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে আছি অ্যারাইভাল হলের দিকে। আমার ব্যাগ এবং টিকেট চেক করানো হয়ে গেছে এরই মধ্যে, বাকি শুধু কয়েক পা হেঁটে

ডিপারচার লাউঞ্জ পেরিয়ে বিদায় নেয়া।

আজ সকালে কেনা ধূসর রঙের একটা স্যুট পরে আছি আমি, এতই ঢিলেঢালা যে আরেকজন লোককে এর ভেতর লুকিয়ে নিতে পারব অনায়াসে। মাসুদ রানা এ-ধরনের জোব্বা পরে প্রকাশ্যে বেরুতে পারে তা দেখেও কেউ বিশ্বাস করবে না। তবে, আমার আকৃতি বদলে নিয়েছি হোটেলের তোয়ালেগুলোকে প্যাড হিসেবে শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় জড়িয়ে বেঁধে নিয়ে। শুধু তাই নয়, চুল ছেঁটে অর্ধেক করে নিয়েছি আমি, আর সাদা ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে পনেরো বছর বাড়িয়ে নিয়েছি বয়সটা। সোনার ফ্রেমের চশমা পরে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে চিনতে পারিনি আমি।

একটা সাত মিনিটে টার্মিনাল ভবনের মেইন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল রাফেলা বার্ড। উলের তৈরি সাদা কালো ডোরাকাটা স্যুট পরে আছে ও, লম্বা একটা কালো লেদার কোট চড়িয়েছে তার ওপর, এর সঙ্গে মিল রেখে মাথায় বসিয়েছে সরু কার্নিসের লেদার হ্যাট। এই পোশাকে একটু বেশি স্মার্ট আর খুব কাজের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে ওকে। গাঢ় রঙের সানগ্লাস দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে রেখেছে ও, কিন্তু মুখের চেহারায় অদ্ভুত অপরিচিত একটা কাঠিন্য দেখতে পাচ্ছি আমি। দৃঢ়, লম্বা পা ফেলে ট্যুরিস্টদের ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে ও।

যা ভয় করেছিলাম তাই, আমার আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে, বুঝতে পেরে নিমেষে অসুস্থ বোধ করছি আমি, হাতে ধরা পত্রিকাটা কাঁপছে একটু একটু। ওর পাশে এবং এক হাত পেছনে থেকে ওকে অনুসরণ করছে ছোটখাট কিন্তু শক্তিশালী একজন বয়স্ক লোক, পরনে নিখুঁত পোশাক, মুখে গাম্ভীর্য এবং সঙ্গে পিস্তল-কোটের পকেটটা ফুলে রয়েছে দেখে বুঝতে পারছি। এই লোকটার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমাকে রাফেলা বার্ড, ওর নাকি আঙ্কেল। আঙ্কেল বার্ডের মাথায় সুতির একটা ক্যাপ

রয়েছে, হাতে রয়েছে একটা ভাঁজ করা ওভারকোট। পূর্ণ সজাগ লোকটা, শিকারির ধূতর্তা ফুটে রয়েছে চোখে-মুখে। তার একটু পেছনে রয়েছে আরও চারজন সশস্ত্র যুবক।

'শয়তান পাজি মেয়ে!' বিড়বিড় করে বললাম আমি। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার একথাও ভাবছি, ব্যাপারটা এত বেশি তিক্ত লাগছে কেন! অনেক আগেই তো এসব জানা হয়ে গেছে আমার।

রাফেলা এবং তার পাঁচজন পুরুষ সঙ্গী হলের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ডিয়ার আঙ্কেল বার্ড দ্রুত আর বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে নির্দেশ দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। নিরেট নির্ভেজাল পেশাদার লোক, আমার জন্যে হলটাকে যেভাবে চারদিক থেকে বন্ধ করে ফেলল তা দেখেই পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে। বেরিয়ে যাবার প্রত্যেকটি দরজায় এবং অ্যারাইভাল গেটে লোক দাঁড় করাল সে।

শান্তভাবে দাঁড়িয়ে শুনছে রাফেলা বার্ড, মুখের চেহারায় কোন ভাবের ছাপ নেই, চোখ দুটো সানগ্লাসে আড়াল করা। আঙ্কেল বার্ড তাকে কিছু বলতেই ঝট্ করে মাথা ঝাঁকাল সে, সঙ্গী চারজন নিজেদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবার পর ঘুরে অ্যারাইভাল গেটের দিকে মুখ করল ওরা দু'জন। দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

'আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, এবার পালাও, রানা!' ভেতর থেকে শুভবুদ্ধি ব্যাকুলভাবে সতর্ক করছে আমাকে। 'এই সর্বনেশে খেলায় মেতো না। এরা আরেক দল নেকড়ে। পালাও, রানা, পালাও!'

ঠিক তখই পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে একটা ফ্লাইট ছাড়ার ঘোষণা দেয়া হল। এটা আমার ফেরার ফ্লাইট, যে ফ্লাইটের টিকেট কেটে রেখেছি। আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে প্লেনটা টেকঅফ করতে। টিকেটধারীদেরকে ডিপারচার লাউঞ্জে যেতে বলা হচ্ছে।

টেবিল ছেড়ে উঠলাম আমি। সস্তাদরের ঢোলা স্যুটটা টেনে-টুনে ঠিক করে বসিয়ে নিলাম গায়ে, তারপর বেরিয়ে এলাম কাফে থেকে। কোনদিকে না তাকিয়ে দ্রুত চলে এসেছি অনুসন্ধান ডেস্কের সামনে । সুইস এয়ারের ড্রেস পরা মেয়েটা দেখেও চিনতে পারল না আমাকে, পরমুহূর্তে চোখ দুটো বিস্ফারিত আর মুখটা ঝুলে পড়ল ওর।

সময় বুঝে সেই মোহন হাসিটা ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে। প্রচণ্ড কৌতুকে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি সামলাচ্ছে ও। এর সবটুকু আমার বেশভূষার কৃতিত্ব।

'সব শেষের বুদটা,' ফিস ফিস করে বলল ও। 'ডিপারচার গেটের সবচেয়ে কাছের সারির শেষ বুদটা।'

চোখ টিপে ধন্যবাদ জানালাম ওকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত এগোচ্ছি। টেলিফোন বুদে ঢুকে রিসিভার তুলে কথা বলার ভান করছি, কিন্তু আঙুলের চাপ দিয়ে কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছি আমি। কাঁচের দরজা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরের হলের দিকে।

সুইস এয়ারের ড্রেস পরা মেয়েটা কথা রেখেছে। লাউডস্পীকারে ওর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

'অ্যাটেনশন, প্লীজ। মিস রাফেলা বার্ড, আপনি দয়া করে অনুসন্ধান ডেস্কে রিপোর্ট করুন।'

কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল রাফেলা, কথা বলছে মেয়েটার সঙ্গে। হাত তুলে মেয়েটা আমার পাশের বুদটা দেখাল ওকে। ঘুরে দাঁড়াল রাফেলা। সোজা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বুদের সারিগুলো আঙ্কেল বার্ড এবং সঙ্গীদের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে ওকে।

ওর লম্বা পায়ের চারদিকে ঢেউ খেলছে লেদার কোট, প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে দোল খাচ্ছে কাঁধের কাছে চকচকে কালো চুল। হাতের ক্ষত ঢেকে রাখার জন্যে কালো চামড়ার দস্তানা পরেছে

ও। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার এই মুহূর্তে কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

আমার পাশের বুদে ঢুকে ফোনের রিসিভারটা তুলল ও। দ্রুত আমার নিজের রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে বুদ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। ওর বুদের দরজা খুলছি, চরম বিরক্তির সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল ও।

'ঠিক আছে, মহিলা-পুলিস-কেন তোমার মাথা ভাঙব না তার উপযুক্ত কারণ দর্শাও,' বললাম ওকে।

বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে রাফেলা। স্যাঁত করে একটা হাত উঠে গেল মুখের কাছে। 'তুমি!' আঁতকে উঠল ও। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা।

'আসল রাফেলা বার্ডের খবর বল আগে। কি হয়েছিল তার?' জানতে চাইছি আমি। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে উঠতে সাহায্য করল ওকে আমার প্রশ্ন।

'মারা গিয়েছিল। আমরা তার লাশ পাই-প্রায় চেনার উপায় ছিল না-শহরতলীর একটা জঙ্গলে।'

'সিডনি শেরিডান আমাকে বলেছিল সে তাকে খুন করেছে,' বললাম আমি। 'কিন্তু কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি। তারপর ঝুঁকি নিয়ে যখন ক্রাশবোটে গেলাম তোমাকে উদ্ধার করে আনার জন্যে, তখনও শেরিডান হেসেছিল। আমি তোমাকে রাফেলা বলে ডাকায় আমাকে সে বোকা বলে টিটকারি দেয়,' ঠোঁট বাঁকা করে হাসছি আমি। 'মিথ্যে বলেনি সে-তাই না? বোকাই ছিলাম আমি।'

চুপ করে আছে ও, আমার চোখে তাকাতে পারছে না। কথা বলে যাচ্ছি আমি, আমার অনুমানগুলো সত্য কিনা যাচাই করে নিচ্ছি।

'তার মানে রাফেলা বার্ড মারা গেলে তোমার ডিপার্টমেন্ট খবরটা চেপে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, আর তোমাকে পাঠায় বার্ডদের বাড়িতে ওত পেতে বসে থাকার জন্যে। আশা করছিলে, খুনীরা নবাগতার পরিচয় জানার জন্যে ওখানে ফিরে আসবে আবার। অথবা অন্য কোন স্বার্থ-সন্ধানী দল ওখানে ঢুঁ মারতে এসে তোমাদেরকে পথ দেখাবে। তোমার ডিপার্টমেন্ট এ-কাজের জন্যে তোমাকেই বেছে নিল কেন? কারণ, তুমি একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত পুলিস ডাইভার। ঠিক কি না?'

ঘাড় কাত করল রাফেলা। এখনও তাকাতে পারছে না আমার দিকে।

'কিন্তু মস্ত একটা ভুল করে ফেলে ওরা। কংকোলজি সম্পর্কে তোমাকে কিছু জ্ঞান দান করা উচিত ছিল ওদের। তা যদি দিত, তাহলে তুমি সেই ফায়ার কোরালটা ধরতে যেতে না, আমিও বিরাট একটা ঝামেলা থেকে বাঁচতাম।'

আমার অপ্রত্যাশিত উদয় হতভম্ব করে দিয়েছিল ওকে, কিন্তু এরই মধ্যে বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে ও। এখন ওর সময় হয়েছে হুইসেল বাজিয়ে আঙ্কেল বার্ড আর সঙ্গীদের ডাকার, তাই যদি করতে চায় ও।

মুখটা অন্য দিকে একটু ঘুরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ও। তামাটে সোনালী মুখে রক্তের লালচে আভা ফুটে উঠেছে।

'প্রথম রাতে তুমি টেলিফোন করেছিলে, ভেবেছিলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তুমি তোমার সুপিরিয়র অফিসারকে রিপোর্ট করছিলে যে এক বোকা পা দিয়েছে ফাঁদে। তোমাকে আমার সঙ্গে অভিনয় চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। আর, ওহ্ গড, কি খেলাই না খেললে তুমি আমার সঙ্গে!'

অবশেষে আমার দিকে তাকাল ও। নীল চোখের পাতা ঝুলে পড়ছে, যেন আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বলতে চাইছে, আমাকে এভাবে দুষো না। জোড়া লাগানো ঠোঁটের পেছনে শব্দগুলো যেন ফুটছে, কিন্তু সেগুলো আটকে রেখেছে ও, বেরুতে দিচ্ছে না।

'সেজন্যেই নিরোর দোকানে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়েছিলে তুমি আমাকে, যাতে প্রতিবেশীরা কেউ তোমাকে দেখতে না পায়। সেজন্যেই শেরিডানের লোকেরা গ্যাসের আগুনে তোমার আঙুল পোড়াতে এসেছিল। তোমার পরিচয় জানতে চেয়েছিল ওরা, কেননা ওরা জানত তুমি রাফেলা বার্ড হতে পার না। ওরাই তো খুন করেছিল রাফেলা বার্ডকে।'

এখন আমি চাইছি কথা বলুক ও। ওর মৌনতা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে আমার স্নায়ুতে।

'আঙ্কেল বার্ডের পদটা কি? ইন্সপেক্টর?'

'চীফ ইন্সপেক্টর।'

'ওকে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার।'

'সবই যখন জানো, নতুন করে এসব কথা তুলছ কেন তুমি?' জানতে চাইল ও।

'প্রথম দিকে কিছুই জানতাম না, শুধু সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু যখন নিশ্চিতভাবে জানলাম তখন নিরেট বোকার মত তোমার প্রেমে অন্ধ হয়ে গেছি।'

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে নিজেকে আলিঙ্গন করল রাফেলা, আমি যেন আঘাত করেছি ওকে। কিন্তু নির্মমভাবে বলে যাচ্ছি আমি।

'ভেবেছিলাম আমরা দু'জন একসঙ্গে এমন কিছু করেছি যার ফলে আমার সম্পর্কে কিছু ভাল অনুভূতি হবে তোমার মধ্যে। আমার সমস্ত জীবনের শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা বলে কেউ যখন কাউকে ভালবাসে সেই ভালবাসার কথা ভুলে থাকা যায় না।'

'আমি একজন পুলিস,' দু'জনের ব্যবধানটা আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছে ও, 'আর তুমি একজন খুনী।'

'এমন একজনকেও আমি খুন করিনি যে প্রথমে আমাকে খুন করতে চায়নি,' পাল্টা ওর চোখে আঙুল দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলাম ওকে, 'ঠিক যেভাবে হুমায়ুন দাদাকে খুন করেছ তুমি।'

প্রচণ্ড আঘাতের মত লাগল কথাটা ওকে, প্রায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা হয়েছে ওর। নিজের চারদিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন একটা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে।

'তুমি একটা চোর', আবার হামলা করল ও।

একটু ইতস্তত করে মেনে নিলাম আমি, 'হ্যাঁ-কিন্তু চোর ছিলাম অনেকদিন আগে। তারপর থেকে সৎ থাকার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করছি আমি। আমি একজন সৎ মানুষ, একথা এখন গর্ব করে বলতে পারি।'

'না, পার না,' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল রাফেলা। 'বাঘ-সিংহাসনের মাথা, গ্রেট মুঘল...এগুলো কোন্ অধিকারে তুমি নিজের কাছে রেখেছ?'

'না, মাদাম,' মৃদু কণ্ঠে বললাম আমি। নিঃশব্দে হাসছি। 'তুমি ভুল করছ।'

'কি বলতে চাও? কফিনে করে কি এসেছে তাহলে?'

'টার্টল বে-র পাঁচশো পাউণ্ড নির্ভেজাল ভিজে বালি। ওগুলো দেখে তোমার মনে পড়বে কিভাবে ওখানে সময়টা কাটিয়েছিলাম আমরা।'

'সোনার মাথা-কোথায় সেটা?'

'সেটার ওপর আইনসম্মত অধিকার রয়েছে যার তাকেই দিয়ে এসেছি।'

'কে...কার কথা বলছ তুমি?'

'দ্বীপবাসীদের কথা বলছি-তাদের প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট গডফ্রে পিডলের কাছে রয়েছে এখন সব।'

'তুমি দিয়ে দিয়েছ?' অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় করে তাকাল রাফেলা। তারপর অন্য একটা ভাব এসে অবিশ্বাসটুকু মুছে ফেলতে শুরু করল ওর চোখ থেকে। 'কেন, রানা, কেন?'

'বললাম না, সৎ থাকার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করছি

আমি।' আবার আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি। তারপর হঠাৎ দেখলাম স্বচ্ছ পানির পাতলা, সূক্ষ্ম একটা স্তর জমছে ওর গাঢ় নীল চোখে।

'আর তুমি এখানে এসেছ-আমি কি করব তা জানা সত্ত্বেও?'

'তোমাকে সত্যিই ভালবাসি, তাই আমি চেয়েছি পথ বেছে নেবার একটা সুযোগ যেন পাও তুমি,' বললাম আমি। ওর চোখের নিচের পাতায় পানির ফোঁটাগুলো মুক্তোর মত ঝুলছে। ওকে বলছি, 'এখন এই বুথ থেকে বেরুব আমি। হল পেরিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাব। কেউ যদি হুইসেল না বাজায়, পরবর্তী ফ্লাইট ধরে এখান থেকে চলে যাব। পরদিন প্রবাল প্রাচীর পেরিয়ে যাব সাঁতার কেটে, দেখব ডলফিনরা আসে কিনা। তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি...বেশ অনেকদিন।'

'কিন্তু পুলিস তোমাকে ওখানেও শান্তিতে থাকতে দেবে না, রানা।'

'দেবে। যা কিছু ঘটেছে তার সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে রাজি হয়েছেন প্রেসিডেন্ট পিডল। তিনি কথা দিয়েছেন, আমাকে রক্ষার জন্যে যা যা করা এবং বলা দরকার সব তিনি করবেন এবং বলবেন। সেন্ট মেরিতে কেউ আমাকে ছুঁতে পারবে না।'

আবার আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি। তারপর নিঃশব্দে হাসলাম আমি। 'একটা কথা বলা হয়নি তোমাকে। সুখবর। তোমার জন্যে কিনা জানি না। কিন্তু আমার জন্যে বটে। প্রেসিডেন্ট আমার জন্যে একটা বোটের অর্ডার দিয়েছেন। হুবহু জলকুমারীর মত হবে সেটা। বো-এ সোনার হরফে লেখা থাকবে নামটা-জলকুমারী। এই দেখ অফিশিয়াল অর্ডার।' পকেট থেকে প্রেসিডেন্টের সীলমোহর করা চিঠিটা বের করে দেখালাম ওকে। বললাম, 'আশা করছি মাস তিনেকের মধ্যেই পাব। ওটা দ্বীপবাসীদের ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে আমার জন্যে উপহার।'

নির্বিকার তাকিয়ে আছে রাফেলা। চোখ দুটো কি ঝিক্ করে উঠল? ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বুদের দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম আমি। ধীর কিন্তু দৃঢ় পায়ে হাঁটছি ডিপারচার গেটের দিকে। এই সময় লাউডস্পীকারে আবার আমার ফ্লাইট ছাড়ার ঘোষণা শুরু হল। আমার সমস্ত জীবনের সবচেয়ে লম্বা পদচারণা এটা, প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে বুকের খাঁচায় বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কেউ আমাকে বাধা দিল না। আমিও পেছন ফিরে তাকাবার ঝুঁকি নিইনি।

প্লেনে বসে ভাবছি, কি আশ্চর্য, আরও কত কথা বলার ছিল রাফেলাকে, অথচ সব ভুলে গেলাম কিভাবে! ওর আসল নামটা পর্যন্ত জানা হয়নি আমার!

'তারপর, রানা? তারপর কি হল?' উত্তেজনায় কাঁপছে সোহানার কণ্ঠস্বর, ব্যগ্রভাবে জানতে চাইছে, 'চুপ করে গেলে কেন? বল! তারপর কি হল?'

'তারপর? তারপর...রাজপুত্র দেখল, সেই বিশাল গাছে হাজার হাজার চড়ুই পাখি বসে রয়েছে। একটা পাখিকে রাজপুত্র পশ্ন করল, 'পাখি, তুমি রাজকন্যেকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছ?' নিঃশব্দে হাসছে রানা, 'পাখিটা কোন জবাব না দিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। রাজপুত্র তখন আরেকটা পাখিকে ওই একই প্রশ্ন করল। সেই পাখিটাও ফুড়ুৎ-চলল এইভাবে।'

'ঠাট্টা না, প্লীজ, রানা, তোমার পায়ে পড়ি, বল কি হল তারপর।'

'ফুড়ুৎ!'

'রানা!' কেঁদে ফেলবে যেন সোহানা।

'ফুড়ুৎ!'

'তুমি...তুমি এমন শয়তান লোক জানলে...'

‘কি আশ্চর্য, সব পাখি উড়ে না গেলে আমার কিছু করার আছে, তুমিই বল?’ কিন্তু সোহানা নাকের জলে চোখের জলে ভাসতে যাচ্ছে দেখে দয়া হল ওর, বলল, ‘আচ্ছা, বেশ, কি জানতে চাও বলো?’

‘রাফেলা...সে...কি সেন্ট মেরিতে ফিরে এল?’

‘সে যদি আসত তাহলে তুমি আজ এখানে আমার পাশে কেন?’

‘এল না!’ কেমন যেন নিরাশ হল সোহানা। ‘কিন্তু, কেন, রানা? সে-ও তো ভালবেসেছিল তোমাকে। তবে এল না কেন?’

‘আমি চোর, খুনী, এ কথাটা ভুলতে পারেনি ও। লণ্ডনে যে ডায়মণ্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ফেলেছিল পুলিস, খুনের আসামী হিসেবে পরোয়ানা বের করেছিল গ্রেফতারের- আমার সেই অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনি ও। হাজার হোক পুলিস তো। নীতির বেড়া ভেঙে আমাকে মেনে নিতে পারেনি।’ একটু থেমে আবার বলল রানা, ‘একটা কথা বললেই সব মেনে নিত ও, আমি জানতাম। কিন্তু সে কথা আমি বলিনি ওকে।’

‘কি কথা, রানা?’

‘আমি যে পি. সি. আই-এর একজন এজেন্ট, এই কথাটা। জানি, বললেই আমার সবকিছু পানির মত পরিষ্কার হয়ে যেত ওর কাছে। ও বুঝত, আমিও এক ধরনের পুলিসই, ব্যক্তিগত স্বার্থে বা লোভে পড়ে কিছুই করিনি আমি, করেছি দেশের স্বার্থে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে। কিন্তু হোক না প্রথম প্রেম, বিদেশিনীর কাছে অফিশিয়াল সিক্রেট ভাঙা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। ব্যাপারটা বিয়ের পর্যায়ে গেলে ওপরঅলার অনুমতি নিয়ে হয়ত জানাতাম, কিন্তু তার আগে জানাবার কথা কল্পনাও করিনি। তুমি হয়ত জান, প্রচণ্ড নির্যাতনের মুখেও আজ পর্যন্ত কোথাও কারও কাছে আমি আমাদের কোন সিক্রেট আউট করিনি-এই জন্যেই আমি মাসুদ রানা।’

শ্রদ্ধার দৃষ্টি ফুটে উঠল সোহানার চোখে। দেশের স্বার্থে কতবড় ত্যাগ স্বীকার করেছে রানা, ভাবতে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারল না সে।

‘আচ্ছা, নতুন জলকুমারী পেয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোথায় এখন সেটা?’

‘আছে। কোথায় জিজ্ঞেস কোরো না। অফিশিয়াল সিক্রেট।’

‘আর বাঘ সিংহাসনের বাকি অংশ? পরে গানফায়ার রীফ থেকে সেগুলো উদ্ধার করেছিলে?’

‘আমি নিজে যাইনি আর-নকশা এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, ওরাই ব্যবস্থা করেছিল তোলার।’

‘আর, শেরিডানের ব্যাপারে লণ্ডনে যে-সব তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলে...’

‘ও, হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল রানা, ‘জুরিখ থেকে দ্বীপে ফিরে আসার সাতদিনের মধ্যেই ঢাকা থেকে টেলিগ্রাম এসে হাজির। ডেকে পাঠিয়েছেন মেজর জেনারেল।’

‘ফিরে এলে?’

‘রাফেলার জন্যে আরও তিন হপ্তা অপেক্ষা করে শেষে ফিরেই এলাম।’

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল রানা। তারপর মৃদু হাসল, ‘আশ্চর্য হালকা লাগছে, সোহানা। এতদিনের চেপে রাখা কথাগুলো কাউকে বলতে পেরে ভারমুক্ত হয়ে গেল বুকটা। যাই হোক, কেমন লাগল বল তো গল্পটা?’

‘দারুণ, অপূর্ব, তুলনাহীন,’ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বিস্ফোরণ বেরিয়ে এল সোহানার উজ্জ্বল মুখ থেকে। হাসল সে-ও, ‘ভাগ্যিস তুমি লিখতে জানো না!’

যেন একটা ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠল রানা, আরেকটু হলে

পড়ে যাচ্ছিল দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুটটা। 'তারমানে? লিখতে জানি না?'

'গল্প লেখার কথা বলছি, গো। যদি পারতে, না খেয়ে মারা যেত বেচারা কাজী আনোয়ার হোসেন। তোমারটা ছেড়ে কেউ আর তার লেখা পড়তে যেত না।'

'তাই নাকি? এতই ভাল বলেছি? তাহলে তো তোমাকে আরও গল্প শোনাতে হয়!'

'আরও গল্প? সত্যিই? আরও আছে?'

'অ-নে-ক।'

[সমাপ্ত]